শ্রী শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৯

প্রকাশক
ভারতজ্যোতি প্রকাশনী
৩০ রাখালদাস আঢ্য রোড,
কলিকাতা-২৭

মুদ্রাকর
শ্রীসলিল কুমার বসু
এশিয়ান প্রিণ্টার্স
পি-১২, সি. আই. টি. রোড,
কলিকাতা-১৪

প্রচ্ছদপট
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

১

গৌড় কাহিনীতে আমরা দেখেছি, প্রাচীন কালে বাংলা নামে কোন ভূভাগ বা বাঙালী নামে কোন সম্প্রদায় ছিল না। পুরাযুগীয় রাঢ় বিবর্তিত হোতে হোতে এক সময়ে বঙ্গ ও বরেন্দ্রের দুইটি অংশ গ্রাস করে গৌড়ে পরিণত হয়, কিন্তু পূর্ব দিকে বঙ্গ অনুরূপভাবে স্ফীতকলেবর হয়েও নিজ সত্তা অক্ষুণ্ণ রাখে। ষোড়শ শতাব্দীতে এই সম্প্রসারিত জনপদ দুইটিকে একত্রীভূত করে সুবা বাংলা সৃষ্ট করা হোলেও তার স্থায়ী রূপদান কোন দিন সম্ভব হয় নি; প্রতিনিয়ত অবয়ব পরিবর্তিত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে যে সম্মিলিত বাংলা জন্মলাভ করে আমাদের প্রথম রাজনৈতিক চেতনা স্ফুরণের সঙ্গে সেটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকায় তাকে ঘিরে জনমনের উপর এক অনির্বচনীয় আবেশের সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রাথমিক উচ্ছ্বাস কাটবার পর দেখা গেল যে বালির বাঁধের উপর সৌধটি নির্মিত হয়েছে। নূতন প্রদেশের অর্দ্ধাংশেরও বেশী নরনারী সংশ্লিষ্ট আন্দোলনে সাড়া দেয় নি এবং পরে তার সাফল্য উৎসবে অংশ গ্রহণ করে নি। হয় তো তারা ভ্রান্ত, কিন্তু কথার মায়াজাল রচনা করে আমরা তাদের হৃদয় জয় করতে পারলাম না, আমাদের সকল মিলন সঙ্গীত অর্থহীন প্রতিপন্ন করে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত বাংলা আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পূর্বার্দ্ধ এক নূতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের

অঙ্গীভূত হোল এবং পশ্চিমে গৌড় তার পূর্ব সত্তার ফিরে এল।

পশ্চিমবঙ্গই সেই ইতিহাসবিশ্রুত জনপদ গৌড়। এই রাজ্যটির সৃষ্টিতে আমার কিছুটা হাত ছিল বলে পুরা যুগ থেকে এখানকার ইতিবৃত্ত রচনার দায়িত্ব আমার উপর বর্তায়। তিন খণ্ডে পরিকল্পিত সেই ইতিহাসের প্রথম খণ্ড গৌড় কাহিনী বিদগ্ধ সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। তারপর বখ্‌তিয়ার খিলজির নেতৃত্বে তুর্কী যাযাবরগণ এসে যে মধ্য যুগের অবতারণা করে সেই যুগের কাহিনী বর্তমান গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

২

এই দুই যুগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনাহীনতার জন্য বহিরাগতগণ বারবার বিনাযুদ্ধে জনপদটি অধিকার করে নিয়েছে। প্রতিরোধ দেওয়া দূরের কথা তারা প্রতিবারই অজ্ঞাতপরিচয় বহিরাগতগণকে পরম সমাদরে অভিনন্দন জানিয়েছে। কেন এমন হয়?—কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হোলে ভূভাগটির প্রাকৃতিক গঠন ও জলবায়ুর গতিপ্রকৃতি পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

গৌড়ের ভূমি উর্বরা এবং বৃষ্টিপাত পর্য্যাপ্ত হওয়ায় জনসাধারণ চিরদিন অতি অল্প আয়াসে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যশষ্য উৎপাদন করেছে। কিন্তু এই খাদ্যের মধ্যে ফ্যাট্ ও প্রোটিনের পরিমাণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর, কারণ, আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য এখানকার গাভীদের দুগ্ধ প্রদান শক্তি খুব অল্প। তার উপর বিস্তীর্ণ সমভূমির কোথাও কোন পাহাড়পর্বত বা মরুঅঞ্চল না থাকায় তারা কর্কশ জীবনযাত্রার সঙ্গে একেবারেই অনভ্যস্ত। সবার উপরে কাল হয়ে দেখা দিয়েছে এখানকার

বায়ুর আর্দ্রতা। মহাসমুদ্র থেকে উত্থিত জলরাশি হিমালয়ের দিকে ধাবিত হবার সময়ে কেবল স্নিগ্ধ মলয়বায়ু বহে আনে না, সেই সঙ্গে আনে সংপৃক্ত জলরাশি। এই অদৃশ্য জলকণার কল্যাণে গৌড়ের মাঠঘাট যেমন চিরহরিৎ অধিবাসীদের অবয়বও তেমনি ঘর্মসিক্ত থাকে। তার ফলে তাদের দেহ সর্বদা অবসাদগ্রস্ত, মন বাস্তব দায়িত্ব পরিহারের জন্য উদগ্রীব।

শ্রমিকশ্রেণী চিরদিন গৃহাভ্যন্তরে বসে নানাবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের ভিতর দিয়ে আপনাদিগকে বিকশিত করেছে এবং উচ্চতর শ্রেণী ছায়াশীতল স্থানে বসে কৃষ্টি সাধনায় দিন কাটিয়েছে। এই পরিবেশের মধ্যে বাস করায় তাদের ভিতর থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন সম্রাট চন্দ্রগুপ্তর দীক্ষাগুরু শ্রুতকেবলি ভদ্রবাহু; তাদেরই ভিতর থেকে আবির্ভূত মহাস্থবির বোধিধর্ম, দীপঙ্কর অতীশ, পরিব্রাজক কুমারঘোষ ও মহাভিক্ষুণী তারাদেবী তথাগতের বাণী নিয়ে দেশান্তরে চলে গিয়েছিলেন। এই গৌড়ের ছায়াচ্ছন্ন প্রান্তরে বসে প্রাড়বিবাক জীমূতবাহন সৃষ্টি করেছিলেন অনবদ্য আইনগ্রন্থ দায়ভাগ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন রচনা করেছিলেন তাঁর কালজয়ী স্মৃতিসার। এখানকার স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় বৌদ্ধ ও বৈদিক দর্শন পরস্পরের মধ্যে মিশে গিয়ে এক নূতন প্রাণবন্ত দর্শনে পরিণত হয়েছে; চৈতন্য-নিত্যানন্দ এসে তাকে আবিলতামুক্ত করেছেন, উৎখাত করেন নি। এই দর্শন ধ্বনিত হয়েছে জয়দেবের কোমলকান্ত পদে, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যঝঙ্কারে। গৌড়ের সমকক্ষ ভূভাগ কোথায় আছে?

৬

আবার এরূপ অভিশপ্ত ভূভাগই বা কই? এখানকার অধিবাসীদের বাস্তববিথতা ও রাজনৈতিক চেতনাহীনতারমূ

জন্য বিদেশীরা বার বার অবলীলাক্রমে এখানে এসে শাসনদণ্ড স্থাপন করেছে ও এখানকার সম্পদে সম্পদশালী হয়েছে, আর জনসাধারণ পরম উৎসাহের সঙ্গে তাদের সাহায্য দিয়েছে ! সে সব ভূলের সংশোধন কখনও হয় নি, বিদেশী শাসন থেকে মুক্তি পাবার জন্য কেউ কোন দিন চেষ্টা করে নি। এই দীর্ঘ বিদেশী অধিকারের সময়ে গৌড়ের সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে যে সব ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে সেগুলির বর্ণনা আছে।

অন্যের সাহায্য ব্যতীত এরূপ ঘটনাবহুল গ্রন্থ প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। সেরূপ সাহায্যকারী ছিলেন আমার কন্যা শ্রীমতী সুনন্দা। একে এম. এ. ক্লাসের ছাত্রী, তায় সঙ্গীত ও শিল্পানুরাগ ছিল অত্যন্ত প্রবল , কিন্তু তারই মধ্যে কত প্রাচীন পুঁথিপত্র অধ্যয়ন করে, কত লাইব্রেরীতে ঘুরে এই গ্রন্থের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করে দিতেন। কিন্তু আজ সেই লক্ষ্মীসমা রূপসী কন্যা আমাদের মধ্যে নেই—চিরবিদায় নিয়েছেন। তাই অশ্রুসজল নয়নে তাঁর কথা স্মরণ করছি।

পুস্তকখানির মুদ্রণকার্য্যে শ্রীবিভাকর দত্ত এবং পাণ্ডু-লিপির অনুলিখনে ও প্রুফ সংশোধনে শ্রীনেপালচন্দ্র চন্দ্র আমাকে যেভাবে সাহায্য করেছেন সেজন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

মদনভস্মের পরে

বখতিয়ার খিলজীর নদীয়া জয়

ইসলামের জন্য ভারত জয়ের পরিকল্পনা কি ভাবে খলিফার রাজধানী বাগদাদে রচিত হয়েছিল তার বিবরণ গৌড় কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই দিগ্বিজয়ে মহম্মদ ঘোরী ও তাঁর সৈনিকরা ছিলেন উপলক্ষ্য মাত্র—ব্লু-প্রিণ্ট তৈরী হয়েছিল ওই নগরীতে। সেখানকার নিজামিয়া মাদ্রাসা ছিল মুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন। যে সব শক্তিশালী উলেমা সেই মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন তাঁদের মধ্যে পীর সিহাবুদ্দীন সাহ্‌রোয়ার্দী ও আবদুল কাদের আল-জিলানি ছিলেন অগ্রগণ্য। আল-জিলানির কাছে শিক্ষা লাভ করেন পারস্যের, তথা ইসলাম ইতিহাসের, শ্রেষ্ঠতম কবি সেখ সাদি। কবি তাঁর বুস্‌তানে পঞ্চ মুখে এই মুরশিদের গুণগান করেছেন। আবার পীর সিহাবুদ্দীন সাহ্‌রোয়ার্দীর কাছে তিনি সুফীবাদ শিক্ষা করেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে হিন্দুদের ত্রাণ করবার জন্য ছলেবলেকৌশলে ইসলামে দীক্ষা দেওয়া একান্তই কর্তব্য। খলিফা আল-নাসের (১১৮৮-১২০৫) যখন মহম্মদ ঘোরীর অভিযানের উপর জেহাদের টীকা পরিয়ে দেন তিনিও তাতে যোগ দিয়ে ভারতে আসেন। ঘোরীর সৈন্যবাহিনীতে তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট যোদ্ধা।

শেখ সাদির দুজন সতীর্থ শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তি ও শেখ জালালুদ্দীন মকদুম শাহ তাব্রেজীও সেই জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন—তবে পরোক্ষে। নিজামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা সমাপনের পর উভয় পীর আসেন পৃথ্বিরাজের রাজ্য আজমীর-দিল্লী ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্য গৌড়ে। শেখ চিস্তির আস্তানা স্থাপিত হয় আজমীরে—

আনা সাগরের তীরে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চল্লিশজন অনুচর। পরিকল্পনা অনুযায়ী অজয়পাল প্রমুখ সাতশ' হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করবার পর তিনি পৃথ্বিরাজের প্রতি আহ্বান জানান ওই ধর্ম গ্রহণ করবার জন্য। সে আহ্বান অগ্রাহ্য হওয়ায় তাঁর গোপন ইঙ্গিতে মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বিরাজের রাজ্য আক্রমণ করেন এবং তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করে সোজা চলে যান আজমীরে পীরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য।

শেখ চিস্তির সতীর্থ মকতুম সাহ তাব্রেজী আসেন লক্ষ্মণসেনের রাজ্য গৌড়ে। যে বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি সঙ্গে এনেছিলেন তা দিয়ে বর্দ্ধমান জেলায় বাইশ হাজারী নামে এক জমিদারী ক্রয় করা হয়। তার উপসত্ব দিয়ে স্বয়ং গৌড়েশ্বর লক্ষণসেন থেকে সুরু করে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে মূল্যবান উপঢৌকন বিতরণ করে পীর তাঁদের মনোরঞ্জন করেন। কবি উমাপতিধর প্রমুখ কয়েকজন সভাসদ তাঁকে যথেষ্ট সন্দেহের চক্ষে দেখলেও অন্যদের তিনি এমনভাবে বশীভূত করেছিলেন যে শেষ পর্য্যন্ত কেউ তাঁর বিরুদ্ধে কোন কথা বলতে সাহস পেত না। রাজপ্রাসাদে তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল। স্বয়ং গৌড়েশ্বরী বসুদেবীও মাঝে মাঝে তাঁর কাছে ধর্মকথা শুনতেন। আবার অন্য দিকে পাণ্ডুয়াবাসী বৃদ্ধ গোপ কালু ঘোষ প্রমুখ কিছু লোককে ইসলামে দীক্ষা দিয়ে তিনি সবার অলক্ষ্যে বসে রাজশক্তির বিরুদ্ধে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেন। তাঁর কর্মতৎপরতার ফলে শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে মাত্র অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে বখতিয়ার খিলজী যখন নবদ্বীপে এসে আবির্ভূত হন তখন পথে বা প্রাসাদ দ্বারে কেউ তাঁকে বাধা দেয় নি। বিনা যুদ্ধে তিনি নবদ্বীপ অধিকার করেন।

কর্মবীর বিশ্বরূপ সেন

অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে নবদ্বীপ অধিকার করলেও বখতিয়ারের লক্ষ্য ছিল নবদ্বীপ নয়—স্বয়ং লক্ষণসেন। তাঁকে বন্দী করতে পারলে মুক্তিমূল্য হিসাবে খিলজী যোদ্ধা দাবী করতেন বিনা শর্তে সমগ্র রাষ্ট্রশক্তির আত্মসমর্পণ। সে দাবী কি ভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন যুবরাজ বিশ্বরূপ সেন? পিতার প্রতিভূরূপে তিনি রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে বসে সমগ্র গৌড়রাজ্য পরিচালিত করলেও রাষ্ট্রশক্তি

কেন্দ্রীভূত ছিল সেই অশীতিপর বৃদ্ধের মধ্যে। তিনিই ছিলেন গৌড়েশ্বর। তিনি যার করায়ত্ত হবেন সে হবে সমগ্র গৌড়ের ভাগ্যবিধাতা। সে কথা ভাল করে জানতেন বলেই বখতিয়ার খিলজী রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে না গিয়ে অতি সঙ্গোপনে চলে এসেছিলেন লক্ষ্মণসেনের তীর্থাবাস নবদ্বীপে। একবার তাঁকে হস্তগত করতে পারলে যে মূল্য তিনি দাবী করতেন বিনা দ্বিধায় তাই দিতে হোত। নতুবা অতি ঘৃণ্যভাবে সেই বৃদ্ধকে হত্যা করে তুর্কীরা তাঁর মৃতদেহ নিয়ে পথে পথে শোভাযাত্রা করে বেড়াত!

বখতিয়ারের পরিকল্পনা বেশ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে তৈরী হোলেও তার মধ্যে কোথাও একটা গলদ ছিল। তাই তিনি সবার অগোচরে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নবদ্বীপ প্রাসাদে এসে আবির্ভূত হোলেন, কিন্তু গৌড়েশ্বরকে করায়ত্ত করতে পারলেন না। তাঁর চক্ষের সম্মুখ দিয়ে সেই বৃদ্ধ প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন। কেন এমন হোল? হয় তো বখতিয়ারের আদেশ অমান্য করে কোন সৈনিক প্রাসাদ দ্বারে সোরগোল তুলেছিল। হয় তো বা অলিন্দের উপর থেকে কোন পরিচারিকা তার মাথায় ময়লা জল ঢেলে বিরক্তির উদ্রেক করেছিল। কারণ যাই হোক কয়েকজন তুর্কী সৈনিক প্রাসাদ তোরণ পার হয়েই হত্যা ও লুণ্ঠন সুরু করায় লক্ষ্মণসেন তাদের আগমন বার্তা জানতে পারেন, তাদের চক্ষের সম্মুখে খিড়কি দরজা দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গঙ্গার ঘাটে বাঁধা নৌকায় গিয়ে উঠে বসেন। বত্রিশ দাঁড়ের সেই নৌকা তীর বেগে দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

খিলজী যোদ্ধা হতবাক। তাঁর পরিকল্পনার এরূপ আকস্মিক ব্যর্থতা তিনি স্বপ্নেও অনুমান করেন নি। ওই নৌকা চলেছে! ওর আরোহী সামান্য ব্যক্তি নন—স্বয়ং গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন। তাঁকে ধরতেই হবে। বখতিয়ার তাঁর অশ্বারোহীদের প্রতি আদেশ দিলেন: ফেলে রাখো লুঠতরাজ, ধাওয়া করো ওই নৌকার পিছনে। যে ওই নৌকা ধরে আনবে তাকে দেব লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, দেব নদীয়ার আমীরি। যাও, এক মুহূর্ত সময় নষ্ট কোরো না। আদেশ শুনে সৈনিকরা কেউ উঠে বসল ঘাটে বাঁধা নৌকায়, কেউ বা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল নদীর তীর ধরে। কিন্তু সব বৃথা, ময়ূরপঙ্খী নৌকা নিমেষ মধ্যে দিকচক্রবালে মিলিয়ে গেল।

গজনী থেকে রওনা হয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করবার পর তুর্কীদের পরিকল্পনা এই

প্রথম ব্যর্থ হোল নবদ্বীপে এসে। দিল্লীর পৃথ্বিরাজ, কনৌজের জয়চন্দ্র ও মগধের গোবিন্দপালের পরাজয়ের ফলে তারা যেরূপ অবলীলাক্রমে আর্য্যাবর্তের অধিকাংশ ভূভাগ অধিকার করেছিল লক্ষ্মণসেনের নিষ্ক্রমণের ফলে গৌড়ে তেমন কিছু ঘটল না। প্রায় সমগ্র সেন রাজ্য তাদের নাগালের বাইরে থেকে গেল। তাই তুর্কী অশ্বারোহীরা যখন নবদ্বীপ প্রাসাদ লুণ্ঠন করছিল বখতিয়ার তখন নিভৃতে বসে এই ব্যর্থতার জন্য অদৃষ্টকে ধিক্কার দিচ্ছিলেন। নবদ্বীপ এখন তাঁর—কিন্তু সমগ্র গৌড়ের তুলনায় নবদ্বীপ কতটুকু? বাকি সেনরাজ্য জয় করতে হোলে তাঁকে রীতিমত যুদ্ধ করতে হবে। তাতে অবশ্যই মহম্মদ ঘোরীর কাছ থেকে উৎসাহ আসবে—হয় তো বা তিনি নূতন নূতন সৈন্য পাঠাবেন। কিন্তু এই নদীবহুল দেশে সেই সব পদাতিক বা অশ্বারোহী দিয়ে কতক্ষণ যুদ্ধ চালান সম্ভব হবে?

বখতিয়ার প্রমাদ গণলেন!

রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে বসে যুবরাজ বিশ্বরূপসেন তখন পিতার নামে সমগ্র গৌড়রাজ্য শাসন করছিলেন। রাত্রিশেষে দূত এসে যখন নবদ্বীপের পতন সংবাদ তাঁর কাছে পৌছে দিল তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে শত্রু যে ভাবে চক্রান্তজাল রচনা করেছে তাতে রাজধানী রক্ষার চেষ্টা করলে শেষ পর্য্যন্ত নিজেকে সেই জালে জড়িয়ে পড়তে হবে। তাই তিনি নিশাবসানের পর মন্ত্রী ও সভাসদদের ডেকে নদী পথে সমগ্র রাজধানী অপসারণের আদেশ দিলেন। হাজার হাজার নৌকা এসে লক্ষ্মণাবতীর ঘাটে নোঙর করল। তাতে আরোহণ করে রাজপরিবার, রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকরা চলে গেলেন বঙ্গে। সৈন্য ও সমরোপকরণও সেখানে চলে গেল। সরকারী নথীপত্রও গেল। কর্মমুখর লক্ষ্মণাবতী জনহীন শ্মশানে পরিণত হোল!

কয়েক দিন পরে বখতিয়ার খিলজী সসৈন্যে লক্ষ্মণাবতীতে এসে দেখেন কেউ তাঁকে বাধা দিল না। দুর্ভেদ্য দুর্গ একডালার প্রবেশদ্বারে কোন সৈনিক তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল না। দুর্গদ্বার আপনিই খুলে গেল। নবদ্বীপের ন্যায় গৌড় রাজধানীও বিনা যুদ্ধে তাঁর করতলগত হোল। প্রথানুযায়ী তিনি আদেশ দিলেন: সকল হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার ভেঙ্গে মসজিদে পরিণত করো, লোককে

ইসলামে দীক্ষা দিয়ে বেহেস্তের পথ সাফ করো। সে আদেশ যথারীতি পালিত হোল। কিন্তু তার পর? গৌড় রাজ্যের চার-পঞ্চমাংশ ভূভাগ এখনও সেন শক্তির অধিকারে রয়েছে; কেমন করে তিনি সেখানে নিজ শাসন প্রসারিত করবেন? বল্লালসেনের দুই প্রতিভাবান সৈন্যাধ্যক্ষ হরি ঘোষ ও তাঁর ভ্রাতা মহেশ ঘোষ যে শক্তিশালী নৌবহর তৈরী করে গিয়েছিলেন তার সম্মুখীন হবার মত আয়ুধ তাঁর কোথায়?

বখতিয়ার বিমর্ষ হয়ে পড়লেন!

১ শৈলেন্দ্র কুমার ঘোষ, গৌড় কাহিনী, পৃঃ ৩৪৫-৫৫

2 Rouart S. & N. *Encyclopaedia of Arabic* Civilisation, *p.* 418

3 Begg M. W. *Holy Biography of Khwaja Moinuddin Chisti, p. 42-67*

দ্বিতীয় অধ্যায়

বখতিয়ারের বিপর্য্যয়

তিব্বতে ব্যর্থ অভিযান

লক্ষ্মণসেন যেমন ছিলেন আত্মভোলা ও অদূরদর্শী বখতিয়ার খিলজী ছিলেন তেমনি স্থূলবুদ্ধি ও হঠকারী। একজন বিশাল রাজ্য ও বিপুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে মুষ্টিমেয় তুর্কীর অনুপ্রবেশ রোধ করতে পারেন নি, অন্যজন নবদ্বীপ-লক্ষ্মণাবতী জয়ের পর সেই জয়কে সম্প্রসারিত করবার জন্য গুরুতর কোন প্রয়াসের পরিচয় দেন নি। সমগ্র মগধ এবং গৌড়ের যে অংশটুকু বখতিয়ার অধিকার করেছিলেন তার সম্পদ দিয়ে সেন শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সেরূপ কোন উদ্যোগ করবার পরিবর্তে তিনি উত্তরে দেবীকোট নগরীতে রাজধানী অপসারিত করে তিব্বত জয়ের জন্য তৈরী হোতে লাগলেন।

মিন্‌হাজ-উস-সিরাজ বলেন ঃ নবদ্বীপ জয়ের কয়েক বৎসর পরে তিব্বত ও তুর্কীস্থান জয়ের জন্য বখতিয়ার দশ হাজার অশ্বারোহী একত্রিত করে ১২০৪ খৃষ্টাব্দের এক শুভ দিনে দেবীকোট থেকে রওনা হোলেন। লখনৌতি রক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হোল মালিক মহম্মদ সিরানের উপর। এই দেশ ও তিব্বতের মধ্যে কোচ, মেচ ও থিরু নামে তিনটি উপজাতি বাস করে ; তাদের অবয়ব কতকটা তুর্কীদের মত। ভাষা না হিন্দী না তিব্বতী। আলি নামে এক মেচ সর্দারকে ইসলামে দীক্ষা দিয়ে বখতিয়ার তাঁকে পথপ্রদর্শক নিযুক্ত করলেন। সেই নব-মুসলমান তাঁর পুরোভাগে চলতে লাগল। তার নির্দেশিত পথ ধরে অগ্রসর হোতে হোতে বখতিয়ারের সৈন্যরা করতোয়া ও ত্রিস্রোতা অধ্যুষিত অঞ্চল পার হয়ে উপনীত হোল বর্দ্ধনকোটে। প্রবাদ এই যে গুরসাম্প শাহ কামরূপের ভিতর দিয়ে চীন থেকে ফেরবার সময়ে ওই নগরটি স্থাপন করেছিলেন।

তুর্কীরা এখন কামরূপ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। বর্দ্ধনকোটের পাশ দিয়ে যে বাগমতী নদী প্রবাহিত হচ্ছে তার প্রসার ও গভীরতা গঙ্গার তিন গুণ। এই নদীর তীর ধরে দশ দিন পথ চলবার পর তারা উনত্রিশ খিলানযুক্ত এক পুলের কাছে এসে উপনীত হোল।

কামরূপ কোন দুর্বল রাজ্য ছিল না। তবুও এখানকার অধিপতির কাছ থেকে কোন প্রতিরোধ এল না, বরং তিনি দূত মারফত বখতিয়ারকে জানালেন যে তিনি যদি আপাততঃ নিরস্ত হয়ে পর বৎসর বৃহত্তর বাহিনী নিয়ে আসেন তা হোলে কামরূপ সৈন্য তুর্কীদের পুরোভাগে থেকে তিব্বত জয়ে সাহায্য করবে। এই অযাচিত উপদেশে কান দেওয়া সমীচীন বলে বখতিয়ার মনে করলেন না; পুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক প্রান্তে একজন খিলজী ও অন্য প্রান্তে একজন তুর্কী অফিসারের অধীনে দুই রেজিমেণ্ট সৈন্য রেখে সম্মুখপানে এগিয়ে চললেন। আলি এখান থেকে বিদায় নিয়ে স্বদেশের দিকে রওনা হোল।

এর পর তুর্কীরা বিনা পথপ্রদর্শকে উত্তর দিকে অগ্রসর হোতে লাগল। ধীরে ধীরে সমতল ভূমি শেষ হয়ে সুরু হোল হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। যতই তারা সামনে এগিয়ে যায় পথ হয়ে ওঠে ততই বন্ধুর এবং আবহাওয়া ততই শীতলতর। এই পরিবর্তনের জন্য বখতিয়ার প্রস্তুত ছিলেন; পর্বতবহুল দেশের অধিবাসী তিনি প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সঙ্গে এনেছিলেন। আহার, ঔষধ ও শীতবস্ত্রের কোন অভাব ছিল না। তাই তাঁর সৈন্যরা বাগমতী পুল পার হবার পর ষোড়শ দিবসে যখন তিব্বতের মালভূমিতে এসে উপনীত হোল তখন তাদের একটুও ক্লান্ত দেখায় নি।

দেশটি যেমন ঊষর তেমন নির্বান্ধব। দিল্লী ও নবদ্বীপে তুর্কী ফৌজের আগমনের জন্য দুজন শক্তিশালী পীরের নেতৃত্বে যে ভাবে আগে থেকে জমি তৈরী করা হয়েছিল এখানে কেউ তা করে নি। তাই কোন তিব্বতী তাঁর সৈন্যদের অভিনন্দন জানাল না, কেউ স্বদেশের মুক্তির আশায় নৃত্য করে উঠল না। চারিদিক থমথম করছে! তুর্কীরা যতই অগ্রসর হচ্ছে শূন্য ব্যোম মুখব্যাদন করে ততই তাদের গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আসছে। বখতিয়ার দিশাহারা হয়ে পড়লেন।

তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবে তিব্বতীরা বিস্মিত হোলেও মনোবল হারায় নি।

যেখানে গিয়ে তিনি উপস্থিত হয়েছিলেন সেটি ছিল বেশ জনাকীর্ণ ও গ্রামগুলি সমৃদ্ধ। সেখানকার দুর্গের উপর তুর্কীরা আক্রমণ সুরু করবার সঙ্গে সঙ্গে শুধু দুর্গরক্ষীরা নয় আশপাশের গ্রাম থেকে হাজার হাজার নওজোয়ান এসে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুরু হোল তুর্কী ও তিব্বতীতে প্রচণ্ড সংগ্রাম। মিন্‌হাজ বলেন : বাঁশের তৈরী বর্শা ও তীরধনুক এবং রেশমে তৈরী উরস্ত্র, ঢাল ও শিরস্ত্রাণ ব্যতীত কোন আয়ুধ তিব্বতীদের ছিল না ; কিন্তু তাই দিয়ে তারা এরূপ প্রচণ্ড-ভাবে যুদ্ধ করতে লাগল যে তার বেগ সহ্য করা বখতিয়ারের পক্ষে অসম্ভব হোল। তাঁর ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, অধিকাংশ সৈনিক হয় নিহত নয় আহত হোল। যুদ্ধ সকাল থেকে সুরু হয়ে বিকালের নমাজ পর্য্যন্ত চলবার পর বখতিয়ার বুঝে নিলেন যে তাঁর জয়ের কোন আশা নেই।

যে মুষ্টিমেয় তিব্বতীকে খিলজী সেনাপতি বন্দী করেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ধকার ঘনিয়ে এলে তাদের কাছে শুনলেন যে পাঁচ পার্শং দূরে কর্মবাতান নগরীতে সাড়ে তিন লক্ষ মোগল ধনুর্দ্ধারী রণসাজে সজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে। স্বধর্ম রক্ষার জন্য সেই বৌদ্ধ যোদ্ধারা সব সময়ে আত্মদান করতে প্রস্তুত। মুসলমান ফৌজ তিব্বতে উপনীত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে সংবাদ পৌছে দেবার জন্য এক সংবাদবাহক কর্মবাতানের দিকে রওনা হয়েছে ; কাল প্রভাতে সে গন্তব্যস্থলে পৌছাবে। একথা শুনে বখতিয়ার বুঝলেন যে সেই মোগল যোদ্ধারা এসে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হোলে তাঁর সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, বিপর্য্যয়ের সংবাদ দেবীকোটে পৌছে দেবার জন্য একজন লোকও অবশিষ্ট থাকবে না। তাঁর দিগ্বিজয়ের খোয়াব ভেঙে গেল, প্রাণ নিয়ে লখনৌতিতে ফিরতে পারলে তিনি খোদাকে মোবারকবাদ জানাবেন।

আর না। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হোলে বখতিয়ার অতি সন্তর্পণে পশ্চাদাপ-সরণ সুরু করলেন। সূচীভেদ্য অন্ধকারে তাঁর গতিবিধি অনুধাবন করতে না পারার জন্য হোক বা নিজেদের সংখ্যাল্পতার জন্য হোক তিব্বতীরা তাঁর অনুসরণ করল না। বিপদ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চলল। আসবার সময়ে তিনি পথ যেরূপ কুসুমাবৃত দেখেছিলেন এখন আর তা নেই। সমস্ত পার্বত্য অঞ্চল চঞ্চল হয়ে উঠেছে, অসংখ্য অশরীরী আত্মা তাঁর সৈনিকদের উপর অলক্ষ্যিতে আঘাত হানছে। কোন তিব্বতীই তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল না, কেউ তাঁকে কোন

প্রশ্নও করল না। আঘাত কিন্তু চলতে লাগল। আসবার সময়ে পথের উভয় পার্শ্বে যে সব জনাকীর্ণ গ্রাম ও সম্ভারপূর্ণ বিপণি তিনি দেখেছিলেন সেগুলি কোন এক আলাদীনের প্রদীপ স্পর্শে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সমস্ত অঞ্চলকে পোড়ামাটিতে পরিণত করে গ্রামবাসীরা কোথায় চলে গেছে। পোনেরো দিনের মধ্যে বখতিয়ারের পক্ষে সৈন্যদের জন্য কয়েক বস্তা চাউল বা ঘোড়াদের জন্য কয়েক আঁটি ঘাস সংগ্রহ করা সম্ভব হোল না। ঘোড়াগুলি ক্ষুধার তাড়নায় চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগল, সৈনিকরা তাদের মাংস খেয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাল।

এই নীরব প্রতিরোধের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে বখতিয়ার যখন বাগমতী তীরে এসে উপনীত হোলেন তখন সেটি পারাপারের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। যে দুই জন অফিসারের উপর পুল রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছিলেন তারা পরস্পরের সঙ্গে কলহ করে কোথায় চলে গেছে এবং হিন্দুরা এসে পুলটি ধ্বংস করে দিয়েছে। নদী পার হবার আর কোন পথ নেই। কাছাকাছি এমন একখানি নৌকাও নেই যে তাতে তুলে কয়েকজন সৈনিককে ওপারে পাঠান যায়। এই নূতন বিপদ বখতিয়ারকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তুলল।

এত দুঃখের মধ্যেও তুর্কী তার স্বভাব ভোলে নি। অদূরে ছিল সুন্দর কারুকার্য্য খচিত এক বৃহৎ দেবমন্দির। তার ভিতরে প্রতিষ্ঠিত দু'তিন হাজার মিশকাল ওজনের এক স্বর্ণ বিগ্রহ ছাড়া আরও বহু ধাতু নির্মিত বিগ্রহ বখতিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হিন্দুর দেবমন্দির, অবশ্যই আরও অনেক ধনদৌলত ভিতরে আছে! সেগুলি লুণ্ঠনের জন্য হোক বা সাময়িক আশ্রয়ের জন্য হোক মন্দিরের পবিত্রতা অগ্রাহ্য করে বখতিয়ার কয়েকজন সৈন্যসহ ভিতরে প্রবেশ করলেন। বাকি সৈন্যরা চলে গেল ভেলা তৈরীর জন্য কাঠ ও দড়ি সংগ্রহ করতে।

ঘৃতে অগ্নি সংযোগ করা হোল। মন্দিরের শুচিতা রক্ষার জন্য আশপাশের গ্রাম থেকে দলে দলে নওজোয়ান এসে বখতিয়ায়ের সহচরদের অবরোধ করে দাঁড়াল। এর পর যদি কামরূপ বাহিনী সেখানে এসে উপনীত হয় তা হোলে তাদের সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হোতে হবে। সেই বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বখতিয়ার হিন্দু অবরোধের ভিতর দিয়ে একটি সরু পথ করে নিয়ে সসৈন্য

নদীর কিনারায় এসে উপস্থিত হোলেন। হিন্দুরাও তাঁকে পিছন থেকে তাড়া করতে করতে সেখানে চলে এল।

তুর্কীদের এখন জলে কুমীর, ডাঙ্গায় বাঘ। মৃত্যু সম্মুখে এসে দাঁড়ালে নিমজ্জমান ব্যক্তি খড় ধরেও বাঁচবার চেষ্টা করে। তুর্কীরাও তাই করল। একজন সৈনিক সাহস করে নিজের অশ্বসহ জলে অবতরণ করে দেখল যে তীর বর্ষণের দূরত্ব পর্য্যন্ত পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব। তার পরে যে কি হবে তা জানা না গেলেও বাকি সৈন্যরা তাঁকে অনুসরণ করে সেই পর্য্যন্ত চলে গেল। কিন্তু আর বেশী দূর এগোবার পূর্বে সাঁতার না জানার জন্য প্রায় সকলেই বাগমতীর জলের নীচে তলিয়ে গেল। যে কয়জন প্রাণে বেঁচে রইল তাদের নিয়ে বখতিয়ার যখন দেবীকোটে ফিরে এলেন তখন তাঁর অভিযাত্রী বাহিনীর মধ্যে এক শ' সৈনিকও জীবিত নেই।

বখতিয়ারের জীবনাবসান

বখতিয়ার খিলজীর সমর প্রতিভার উপর তুর্কীদের অনড় আস্থা ছিল। তাঁর নেতৃত্বের ফলে ছিন্নবস্ত্র পরিহিত সেই যাযাবরগণ পূর্ব ভারতে এসে এক একজন আমীর হয়ে বসেছিল। সুলতানী লাভের আশাও কেউ কেউ রাখত। সেই তিনি যখন এক শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে তিব্বত জয়ের জন্য যাত্রা করেন তখন তাদের কারও মনে সন্দেহ ছিল না যে ওই দেশ তাদের অধিকারে চলে আসবে। সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে তিনি বাঁকা পথ ধরে তুর্কীস্থানে যাবেন, হয় তো বা চীন আক্রমণ করবেন। তারপর তাদের কেউ পাবে আমীরি, কেউ বা জায়গীর। কিম্বদন্তীর সোনার পাহাড় থেকে সোনা এনে সবাই ভাণ্ডার ভরবে, বেগমদের গায়ে উঠবে হীরামুক্তার জেওয়র। দু'চারটা হুরীও কোন কোন সিপাহীর কপালে জুটবে। এমনি আশা আকাঙ্খার মধ্যে তুর্কীদের মন যখন আলোড়িত হচ্ছিল সেই সময়ে বখতিয়ার তাঁর বিশাল বাহিনীকে হিমালয়ের গহন অরণ্যে ও বাগমতীর খর জলে কবরস্থ করে দেবীকোটে ফিরে এলেন! দিকে দিকে কান্নার রোল উঠল। ওয়ালেয়াৎ-ই-লখনৌতিতে এমন একটিও তুর্কী পরিবার ছিল না যার জোয়ানরা সেই অভিযানে যোগ দেয় নি। তাদের

সবাই ভয়ব্যাকুল নেত্রে দেখল যে অভিযানের নায়ক ফিরে এলেন, কিন্তু তাদের ছেলেরা ফিরল না! পুত্রহারা জননী ও স্বামীহারা নারীর কান্নায় লখনৌতির আকাশ বাতাস বিষাদময় হয়ে উঠল।

এ সময়ে প্রতিবেশী কোন রাজ্য থেকে আক্রমণ এলে তার প্রতিরোধ করবে কে? দূর দেশে এসে শত্রু পরিবৃত হয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকবার মত কোন সম্বল তুর্কীদের আছে? অনাগত বিপদের আশঙ্কায় সকলের মুখমণ্ডল পাংশু বর্ণ ধারণ করল। সবাই ভাবতে লাগল, নিঃসম্বল অবস্থায় হিন্দুস্থানে এসে যে স্বর্ণমুকুট তারা লাভ করেছে তা কি শেষ পর্য্যন্ত ধুলায় লুটিয়ে পড়বে? নির্বান্ধব শত্রুপুরীতে কি পোকামাকড়ের মত অসহায়ভাবে জীবন দিতে হবে? রাজ্যভোগের সাধ আর নেই, প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পারলে সবাই আল্লাহকে মোবারকবাদ জানাবে।

বখতিয়ারের বিরুদ্ধে তুর্কীদের এখন আক্রোশের অন্ত নেই। ক্ষোভে ও লজ্জায় তিনি আর কারও সামনে বার হন না। ক্বচিৎ বেরোলে সবাই পূর্ব উপকারের কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁকে ধিক্কার দেয়। তুর্কী রমণীরা প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে তাঁর উপর অভিশাপ বর্ষণ করে। মনঃক্ষোভে তিনি শেষ পর্য্যন্ত বাড়ীর বাইরে আসা বন্ধ করলেন। সদর দরজার ওপারে যান না, কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। সৈন্যরা মরেছিল প্রাণে, বখতিয়ার মরলেন মনে। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেল, মানসিক অবসাদে তিনি শয্যা গ্রহণ করলেন। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে সেনশক্তি হয় তো প্রত্যাক্রমণ স্বরু করবে, হয় তো বা তাদের তরবারির আঘাতে সকল তুর্কীকে শহীদ হোতে হবে। সবাই সেইরূপ কিছু আশঙ্কা করছে এমন সময়ে একদিন গভীর রাত্রে বখতিয়ারের অন্তরঙ্গ সহকর্মী আলী মর্দান খিলজী গোপন পথে প্রভুর কক্ষে প্রবেশ করে তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে দিলেন। সেই আঘাতে তাঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের উপর শেষ যবনিকা পড়ল।

ঘোরীর সূর্য্য অস্তমিত

বখতিয়ারের তিব্বতাভিযান কোন আকস্মিক ঘটনা নাও হোতে পারে। তিনি যখন তিব্বত জয়ের জন্য যাত্রা করছিলেন সেই সময়ে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত তুর্কী সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক মহম্মদ ঘোরী তাঁর অগ্রজ গিয়াসুদ্দীন সহ মধ্য এশিয়ার

খোয়ারজিম রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেন। পরিকল্পনা সুস্পষ্ট। একই সময়ে সাম্রাজ্যের দুই প্রান্ত থেকে দুই দেশের বিরুদ্ধে সাঁড়াশী অভিযান চালিয়ে ঘোরী তাঁর অধিকারকে আরও সম্প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। পূর্বে তিব্বত ও উত্তরে খোয়ারজিম জয় করতে পারলে ঘোর সাম্রাজ্যের উভয় প্রান্ত পামির উপত্যকায় গিয়ে মিলত—প্রায় অর্দ্ধেক এশিয়া তাঁর পদানত হোত। তার পর তিনি পূর্বে চীন ও উত্তরে মোঙ্গলিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। তারও ওপারে যদি আরও দেশ থাকে সেখানেও অভিযান চালাতেন। দিগ্বিজয়ীদের উচ্চাকাঙ্খা পৃথিবীর শেষ প্রান্তে না পৌছান পর্য্যন্ত চরিতার্থ হয় না!

খেয়ারজিম শাহ আলাউদ্দীন মহম্মদের সম্পদ ছিল অপরিমিত। তাঁর রাজধানী সমরখন্দ সে যুগের এক বিশিষ্ট নগরী; শিল্পসমৃদ্ধ বোখারার কোন তুলনা ছিল না। সেখানে কয়েক লক্ষ লোক বাস করত। মহম্মদ ঘোরী এই সম্পদশালী রাজ্য আক্রমণ করায় তিনি প্রতিবেশী খোরাসান ও কারাখিতার অধীশ্বরদের স্মরণাপন্ন হন। উভয় রাজ্য থেকে অনুকূল সাড়া আসে, আমুদরিয়া নদীর তীরে ত্রিপক্ষের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে মহম্মদ ঘোরীর সাক্ষাৎ হয়। পূর্বের রণক্ষেত্রে তিব্বতীরা প্রস্তুত না থাকায় বখতিয়ার খিলজী যেটুকু সুবিধা পেয়েছিলেন মহম্মদ ঘোরী এখানে তাও পেলেন না। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর তাঁকে পরাজয় বরণ করে পশ্চাদপসরণ করতে হোল। তাতেও আলাউদ্দীন মহম্মদ শাহ তাঁকে নিষ্কৃতি দেন নি, তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে একেবারে ঘোর সীমান্ত পর্য্যন্ত চলে আসেন।

ঘোরী ছুটছেন, তাঁর পিছনে ছুটছে খোয়ারজিম শাহর অশ্বারোহীগণ। তাদের তীর ও তরবারির আঘাতে পলায়মান ঘোর সৈনিকরা দলে দলে ধরাশায়ী হচ্ছে। কিন্তু শত শত মাইলের মধ্যে কোথাও রুখে দাঁড়ান তাদের সর্বাধ্যক্ষের পক্ষে সম্ভব হোল না। শেষ পর্য্যন্ত কোনক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে তিনি যখন গজনীতে এসে উপনীত হোলেন তখন তাঁর বিশাল অভিযাত্রী বাহিনীর মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েক শতের বেশী সৈনিক জীবিত নেই। এত দুর্য্যোগের পরও ঘোরীর অদৃষ্টে বিশ্রাম ছিল না। পাঞ্জাবের গক্করগণ পূর্বে ছিল তাঁর বন্ধু, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে শত্রু। তাঁর বিরুদ্ধে তারা অস্ত্র ধারণ করেছে শুনে তিনি চলে এলেন লাহোরে। হিন্দু-স্থানের সকল আমীর এসে তাঁর পাশে দাঁড়ানয় তিনি অল্প আয়াসে সেই হিন্দুদের

দমিত করে তাদের রক্তে নদীতে বন্যার সৃষ্টি করলেও দেশে ফেরা তাঁর অদৃষ্টে ছিল না। লাহোর ছেড়ে গজনীর পথে যখন তিনি অল্পমাত্র অগ্রসর হয়েছেন তখন সেই পৌত্তলিকদের হাতে পড়েন। তারা তাঁকে হত্যা করে (১২০৬, মার্চ ১৪)। ঠিক সেই সময়ে সুদূর দেবীকোটে এক অন্তরঙ্গ বন্ধুর ছুরিকাঘাতে বখতিয়ার খিলজীর জীবনাবসান হয়। অবচেতন অনুভূতির সাহায্যে তিনি সর্বাধিনায়কের মৃত্যুর কথা জানতে পেরেছিলেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার পূর্বে শুশ্রূষাকারীদের সেই কথা বলে চক্ষু মুদ্রিত করেন।

1. Minhaj-us-Siraj *Tabakat-i-Nasiri, Tabakat XX, Eng. trans. Elliot H.M.*
2. *Ibid. Ibid Tabakat XIX*
3. Hasan Nizami *Tazul Masir, Eng. trans. H.M. & Dowson J. p. 235*

তৃতীয় অধ্যায়

মামলুকদের তাণ্ডব

গজনী অধিকারের লড়াই

মহম্মদ ঘোরী ও বখতিয়ার খিলজী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যের দুই প্রতিষ্ঠাতা। দুজনের কেউই প্রতিভাশালী সমরনায়ক না হোলেও তাঁদের উদ্যোগের ফলে সেই বিশাল সাম্রাজ্য এশিয়ার বুকের উপর ভেসে ওঠে; আবার উভয়ের মৃত্যুর পর তা নিদাঘতপ্ত তুষারস্তুপের মত দ্রবীভূত হতে থাকে। আলী মর্দান খিলজী যেমন বখতিয়ারকে হত্যা করে লখনৌতির মসনদ অধিকার করেছিলেন সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানী গজনীতেও তেমনি উচ্চাভিলাষীর অভাব ছিল না। লাহোর থেকে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু সংবাদ সেখানে পৌঁছালে মালিক তাজুদ্দীন ইলদুজ সঙ্গে সঙ্গে ওই নগরী অধিকার করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। ইলদুজ পূর্বে ছিলেন ঘোরীর ক্রীতদাস, প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করে আমীরের পদে উন্নীত হন। কিন্তু সে কথা ভেবে লাভ নেই। এমনি সব ক্রীতদাস দিয়েই তো ঘোরী তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। পরবর্তী জীবনে যে তারা সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্তা হয়ে বসবে তাতে বিস্ময়ের কি আছে?

ইলদুজের হাত থেকে রাজধানী পুনরুদ্ধারের জন্য ঘোরীর ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী গিয়াসুদ্দীন সাধ্যমত চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন আমীর তাঁর পাশে গিয়ে না দাঁড়ানয় কিছু সুবিধা হোল না। শেষ পর্য্যন্ত অসহায় গিয়াসুদ্দীন কুতুবুদ্দীন আইবেকের সাহায্য চেয়ে দিল্লীতে লোক পাঠালেন। কুতুব যে ইলদুজ অপেক্ষা বেশী প্রভুভক্ত ছিলেন তা নয়, তবু তিনি গজনীর দিকে চললেন নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য। কিন্তু চল্লিশ দিন ধরে ওই নগরী

মামলুক=ক্রীতদাস

অবরোধের পরও যখন ইলতুজের বশ্যতা আদায় করা গেল না তখন প্রভুকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে দিল্লীতে ফিরে এলেন।

কুতুবুদ্দীনের বৈচিত্র্যময় জীবন

ইলতুজের মত কুতুবুদ্দীনের জীবনও রোমাঞ্চে ভরা। দিল্লীর তখ্‌তে আরোহণের কয়েক বৎসর পূর্বেও তিনি ছিলেন কপর্দকহীন ক্রীতদাস। ঘোর থেকে বহু দূরে তুর্কীস্থানের এক যাযাবরের তাঁবুতে তাঁর জন্ম হয়। যখন তিনি একেবারেই শিশু পিতা তাঁকে অভাবের তাড়নায় বিক্রয়ের জন্য এক নাখাসে নিয়ে যান। নিশাপুরের কাজী ফকরুদ্দীন আবতুল আজিজ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। পণ্যের তুলনায় মূল্য সুলভ দেখে তিনি কুতুবকে ক্রয় করেন এবং তাঁর মাথায় মালপত্র চাপিয়ে বাড়ীর দিকে রওনা দেন। সেখানে বালকের খিদমদে কাজী সাহেবের পরিবার পরিজন বিশেষ প্রীত হন।

দিন ভালই কাটছিল। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১) পৃথ্বিরাজের কাছে পরাজিত হবার পর থেকে মহম্মদ ঘোরী নূতন করে সৈন্য সংগ্রহ সুরু করেন, তাঁর তাজির-উল-মাসালিকগণ সর্বত্র নাখাসে নাখাসে ঘুরে ক্রীতদাস কিনতে থাকেন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় যোগান কম হওয়ায় দাম হু হু করে বেড়ে যায়, বাজার তেজী হয়ে ওঠে। যুদ্ধের বাজারে দু'পয়সা কামিয়ে নেবার জন্য গৃহস্থরা নিজেদের ক্রীতদাসগুলি উচ্চ মূল্যে বেচে দেয়। কাজী ফকরুদ্দীনও দেখলেন, এমন মওকা আর পাওয়া যাবে না। কুতুবকে বেচে মোটা মুনাফা পয়দা করবার আশায় তিনি তাকে নিয়ে চললেন নাখাসে। সেখানে অনেক দর কষাকষির পর ঘোরীর এজেণ্ট তাঁকে মোটা দামে কিনে নেন।

এমনি হাজার হাজার হতভাগ্য ক্রীতদাস দিয়ে মহম্মদ ঘোরীর অভিযাত্রী বাহিনী গঠিত হয়েছিল। নূতন জীবন তাদের মুক্তি না দিলেও মর্য্যাদা বড় কম দেয় নি। এখন তারা শুধু ঘৃণ্য ক্রীতদাস নয়—ইসলামের দীন সেবক। যে ধর্মে তাদের পিতৃপিতামহগণ দীক্ষিত হয়েছিলেন তার প্রসারের জন্য জান-মাল কবুল করা তাদের অবশ্য কর্তব্য। শরীর ও মন সুস্থ থাকলে এই পবিত্র কাজ সকলকেই করতে হবে। যত দিন না সমস্ত দুনিয়া ইসলামে দীক্ষিত হয় তত দিন নিরস্ত হোলে চলবে না।

জেহাদের রীতি অনুযায়ী আজমীরে বসে শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তি দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজের কাছে ইসলাম কবুল করবার জন্য আহ্বান পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেই ঘৃণ্য কাফের এই উদার আহ্বান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করায় মুসলমানদের জিম্মি হয়ে থাকবার অধিকার পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলে। এখন আর কোন বাধা নেই, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলে বহু পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। যুদ্ধবন্দীরা জেহাদীদের ক্রীতদাস হবে, লুঠের চার-পঞ্চমাংশ তাদের হিস্যায় পড়বে। আর আল্লাহ্ না করুন, সেই ধর্ম্মযুদ্ধে যদি কারও জান কোরবানি হয় তার স্থান হবে বেহেস্তে। এরূপ যুদ্ধে জিতলে লাভ, হারলেও লাভ। আবার মরলেও লোকসান নেই!

কুতুব ছিলেন এই ধর্ম্মোন্মাদগণের মধ্যে সব চেয়ে তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি। তিনি অল্পস্বল্প লেখাপড়াও জানতেন। কাজী ফকরুদ্দীনের বাড়ীতে অবসর সময়ে কিছু কিছু ফার্সী ও আরবী শিখেছিলেন। কোরাণও পড়তে পারতেন। অবয়ব কদাকার হোলেও সাহস ও অশ্বারোহণে পটুতা ছিল যথেষ্ট। হাতের একটি আঙ্গুল ভেঙে যাওয়ায় সবাই তাঁকে বলত আইবেক—হাতভাঙা। মহম্মদ ঘোরী গুণীর কদর করতেন। যুদ্ধজয় বা আমোদপ্রমোদের পর অনুরক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অর্থ বিতরণ ছিল তাঁর অভ্যাস। গৃহভৃত্যরা সেই অর্থ দিয়ে হয় জুয়া খেলত নয় সরাব খেত, কিন্তু কুতুব সবটুকু জমিয়ে ফৌজী দফতরের কয়েক জন অফিসারকে মূল্যবান উপহার দ্রব্য কিনে দেন। সে খবর ঘোরীর কানে পৌছালে তিনি খুশী হয়ে কুতুবকে মঞ্জিল থেকে দরবারে বদলী করেন। সেখানে পদন্নোতি হোতে হোতে আমীর-ই-আখুন বা অশ্বশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তখন যুদ্ধাশ্বের জন্য ঘাস সংগ্রহের দায়িত্ব তাঁর। খোরাসান যুদ্ধের সময় সে কাজ করতে গিয়ে তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হন। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মহম্মদ ঘোরী জয়ী হওয়ায় তাঁকে বন্দীশালা থেকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় প্রভুর সম্মুখে আনা হয়। এরূপ একজন প্রভুভক্ত কর্মচারীকে পুরস্কৃত করা অবশ্য কর্তব্য বিবেচনা করে সুলতান তাঁকে কাহরাম জেলায় একটি জায়গীর প্রদান করেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বিরাজ পরাজিত হোলে কুতুবের নেতৃত্বে এক তুর্কী রেজিমেণ্ট মীরাট জয় করে।

পৃথ্বিরাজের পতনের পর মহম্মদ ঘোরী দিল্লীতে না এসে চলে গিয়েছিলেন

আজমীরে—শেখ চিস্তির আস্তানায় শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্ত। সেখান থেকে রণক্ষেত্রে ফিরে এসে তিনি মীরাট জয়ে কুতুবের বীরত্বের কথা শুনে তাঁর উপর অধিকতর দায়িত্ব প্রদান করেন এবং দিল্লী অবরোধের সময়ে তাঁকে প্রধান সহকারী করে নেন। শেষ পর্য্যন্ত চৌহান শক্তি পুরাপুরি ধ্বংস হোলে দিল্লীতে রাজধানী স্থাপন করে গজনীতে ফিরে যাবার সময়ে তিনি কুতুবকে হিন্দুস্থানে সিপাহ্‌শালার পদে অভিষিক্ত করে যান। সেই জয়কে স্মরণীয় করবার জন্য কুতুবুদ্দীন একদিকে যেমন কুতুব মিনারের নির্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করেন অন্য দিকে তেমনি আত্মপ্রসারের জন্য আয়োজন করতে থাকেন। দিল্লীর পূর্ব দিকে কনৌজ। পৃথ্বিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে কনৌজরাজ জয়চন্দ্রের সাহায্যের কথা বিস্মৃত হয়ে তিনি তাঁর রাজ্য আক্রমণ করেন। পরে কালিঞ্জর, গোয়ালিয়র ও অনিলবাড়ার যুদ্ধে তাঁর সমর প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

কুতুবুদ্দীনের পূর্বতন মালিক কাজী ফকরুদ্দীন কোন দিন তাঁকে সুনজরে দেখেন নি। কাজে অবহেলার জন্য প্রায়ই ভৎর্সনা করতেন। ঘোরীর কাছে তাঁকে বিক্রয় করে শুধু যে বেশ দু'পয়সা লাভ করেন তা নয় এক অপদার্থ ভৃত্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে সেই কুতুব একজন আমীর হয়ে বসল এবং ক্রমে হিন্দুস্থানের সিপাহ্‌শালার পদে নিযুক্ত হোল! খবরটি কাজীর কাছে পৌছালে তিনি তাজ্জব বনে যান। কিন্তু মনের ভাব মনে চেপে রেখে সবাইকে বলেন, তিনি কুতুবকে চিনেছিলেন; তাই উট চরান, জল তোলা প্রভৃতি ছোট কাজে আটকে না রেখে হিন্দুস্থানে গিয়ে কাফেরদের সঙ্গে লড়াই করতে পাঠিয়েছিলেন!

ঘোরী যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন সকল আমীর কুতুবের প্রাধান্য মেনে চলত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর চাকা ঘুরে গেল। তাঁরই মত অপর দু'জন ক্রীতদাস তাজুদ্দীন ইলতুজ ও নাসিরুদ্দীন কুবাচা গজনী ও সিন্ধু অধিকার করে নিজ নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচার সুরু করলেন। পূর্বাঞ্চলেও তাঁর আধিপত্য লোপ পেল। বখতিয়ার খিলজীর নিধনের পর লখনৌতির মসনদ নিয়ে এখানকার আমীররা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করলেও কুতুবকে অস্বীকার করা সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতদ্বৈধ ছিল না। এই কলহের ফলে বিহার লখনৌতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, কিন্তু দিল্লীর আধিপত্য কারও উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

কুতুব জীবিত থাকলে হয় তো এই সব অবাধ্য আমীরদের দমন করতে পারতেন। কিন্তু ১২১০ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র আরাম শাহ সিংহাসনে আরোহণ করলে দেখা গেল যে তিনি আরাম করতে জানেন, রাজনীতির ধার ধারেন না। যুদ্ধও জানেন না। তাঁর অকর্মন্যতার ফলে দিল্লীর মসনদ তাঁরই ভগ্নিপতি বুদাইনের শাসক সামসুদ্দীন আলতামাসের হাতে চলে যায়।

লখনৌতির হানাহানি

একই ভাঙন চলছিল ওয়ালেয়াৎ-ই-লখনৌতিতে। আলী মর্দান যদি বখতিয়ারের বুকে ছুরি বসিয়ে নিজের কাজ হাসিল করতে পারে অন্য আমীররা বা তা পারবে না কেন? তারা কম কিসে? সৈন্যবল অবশ্য কারও বিশেষ ছিল না; তিব্বতের মালভূমিতে সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সে কথা বিবেচনা না করে যার যা ছিল তাই নিয়ে তারা পরস্পরকে নিধন করতে লাগল।

আলী মর্দানের মত বখতিয়ারের সৈন্য বাহিনীতে মহম্মদ শিরান ও আহম্মদ ইরান নামে দুই ভাইয়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। আলী মর্দানের মত তাঁরাও ছিলেন খিলজী। তাঁর সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে মহম্মদ শিরান নিজ জায়গীর লখনোর থেকে রাজধানী দেবীকোটের দিকে রওনা হন। সে সংবাদ আলী মর্দানের কাছে পৌছালে তিনিও সসৈন্যে এগিয়ে যান, কিন্তু বরস্থলের যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন। কিন্তু আলী মর্দানের মত ধুরন্ধর ব্যক্তিকে কারাকক্ষের ভিতর আটকে রাখা সহজ কথা নয়। কোতোয়াল বাবা ইস্পাহানীর চক্ষে ধুলা দিয়ে তিনি সোজা চলে যান দিল্লীতে। সেখানে কুতুবুদ্দীনের তখন বিরাট সমস্যা। সিন্ধুতে তাঁর নিজের জামাতা নাসিরুদ্দীন কুবাচা বিদ্রোহী, আবার লাহোরের অধিকার নিয়ে কুবাচা ও ইলতুজের মধ্যে মন কষাকষি চলছে। লখনৌতির উপর আধিপত্যের আশা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, সেখানে কেউ তাঁকে আমল দেয় না। সেই কারণে আলী মর্দান খিলজী গিয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখানয় তিনি খুসী হোলেন। অযোধ্যার শাসনকর্তা কুয়েমাজ রুমির কাছে আদেশ পাঠালেন তিনি যেন সসৈন্যে লখনৌতির দিকে রওনা হন। আদেশ পেয়ে কুয়েমাজ পূর্ব দিকে এগিয়ে এলে মহম্মদ শিরানের বিশ্বস্ত অনুচর হুসামুদ্দীন ইউয়াজ খিলজী কোশী নদীর তীরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

হুসামুদ্দীনের এই দলত্যাগের ফলে শিরান দিশাহারা হয়ে পড়েন, আত্মরক্ষা অসম্ভব বুঝে লখনৌতি ছেড়ে পুনর্ভবা নদীর ওপারে পালিয়ে যান।

হুসামুদ্দীন যখন নিজ প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কুতবী সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তখন লখনৌতি অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য। তাঁকে এখানকার মসনদে অভিষিক্ত করে কুয়েমাজ রুমি অযোধ্যার দিকে রওনা হোলেন। কিন্তু মহম্মদ শিরান সাময়িকভাবে আত্মগোপন করলেও চুপচাপ বসে থাকেন নি, কয়েকজন খিলজী আমীরকে দলে টেনে নিয়ে হুসামুদ্দীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। সে সংবাদ কুয়েমাজ রুমির কাছে পৌঁছালে তিনি আবার দেবীকোটে ফিরে আসেন। এবার মহম্মদ শিরানের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়। শিরান পরাজিত হয়ে কামরূপ সীমান্তের কাছাকাছি কোন জায়গায় পালিয়ে গেলে জনৈক খিলজী সর্দার তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন।

উদ্বাস্তু সৈন্যবাহিনী

মহম্মদ শিরান গেলেন, কিন্তু আলী মর্দানের তাতে কোন লাভ হোল না। লখনৌতির তখ্‌ত পেয়ে গেলেন উভয়ের সাধারণ দুষমন হুসামুদ্দীন ইউয়াজ খিলজী। আলী মর্দান তাতে আশাহত হোলেও হাল ছাড়েন নি, কৌশলে কাজ হাসিল করবার জন্য কুতুবুদ্দীনের সেবায় মনপ্রাণ সঁপে দেন। সে সময়ে কুতুব গজনীতে তাজুদ্দীন ইলদুজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করায় তাঁর সম্মুখে নূতন সুযোগ এসে উপস্থিত হয়। তিনি কুতুবের সঙ্গে গজনীতে গিয়ে ইলদুজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। কিন্তু চল্লিশ দিন অবরোধের পরও যখন ওই নগরী অধিকার করা গেল না কুতুব তখন জয়ের আশা ত্যাগ করে দিল্লীতে ফিরে এলেন। আলী মর্দান শত্রুহস্তে বন্দী হয়ে গজনীতে পড়ে রইলেন।

তুর্কীদের এই গৃহবিবাদের সুযোগ হেলায় হারাবার পাত্র খোয়ারজিম শাহ্ আলাউদ্দীন মহম্মদ ছিলেন না। নিজ রাজধানী সমরখন্দ থেকে রওনা হয়ে তিনি আর একবার ঘোর সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেন। তাঁর সৈন্যরা প্রায় বিনা বাধায় গজনী পৌঁছায় এবং ওই নগর অধিকার করে লাহোর ও দিল্লীর দিকে অগ্রসর হবার আয়োজন করে। কিন্তু খোয়ারজিমের উত্তর সীমান্ত তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, মোঙ্গলগণ সেখানে সৈন্য সমাবেশ করছিল। তাই

খোয়ারজিম শাহ্‌কে দিল্লী জয়ের আশা ত্যাগ করে সমরখন্দে ফিরে যেতে হয়। দিল্লীতে কুতবুদ্দীন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন—গজনীতে আলী মর্দান মুক্তি পান।

খোয়ারজিম বাহিনী সমরখন্দ থেকে রওনা হবার পর পথের উভয় পার্শ্বে হত্যা ও বিভীষিকা ছড়াতে ছড়াতে গজনীতে এসে উপনীত হয়েছিল। তাদের হাতে বহু গ্রাম ভস্মীভূত হয়, অসংখ্য নরনারীর জীবনাবসান ঘটে। সেই বিভীষিকার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য দলে দলে নরনারী দেশ ছেড়ে ভারতের দিকে রওনা হয়। তারা গজনীর কাছাকাছি এসে পৌছালে তাঁদের দুর্দশা দেখে সদ্য কারামুক্ত আলী মর্দানের চক্ষে জল আসে, তিনি দুঃস্থ মানবতার সেবায় মনপ্রাণ সঁপে দেন! এই শরণার্থীদের মধ্যে যে সব শক্তিমান যুবক ছিল তাদের সংগঠিত করে তিনি এক সৈন্যবাহিনী গঠন করেন।

সেই উদ্বাস্তু সৈন্যবাহিনী নিয়ে আলী মর্দান দিল্লীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন দেখে কুতুবুদ্দীন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। তাঁকে কুতুব ভাল করে চিনতেন। তিনি যখন স্বপক্ষীয় তখন তাঁর বিরোধিতা করা চলে না, আবার তাঁর যখন একটি নিজস্ব সৈন্যবাহিনী হয়েছে তখন দিল্লীতে রাখা নিরাপদ নয়। কখন কি করে বসেন তা বলা যায় না! যে বখতিয়ার খিলজী তাঁকে পথের ধুলা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলেন তাঁকে রোগ শয্যায় হত্যা করতে যখন তাঁর বাধে নি তখন নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি সব কাজই করতে পারেন। চক্রান্ত চালনায় তিনি দক্ষ, উৎকোচ প্রদানে মুক্তহস্ত, আবার গুপ্ত হত্যায় সুনিপুণ। তাঁকে দিল্লীতে না রেখে কোন দূরবর্তী অঞ্চলে সরিয়ে দেওয়া বিজ্ঞোচিত কাজ মনে করে কুতুবুদ্দীন লখনৌতির উপর তাঁর অধিকার স্বীকার করে এক সনদ লিখে দিলেন। অথচ এই সে দিন তাঁর সম্মতি নিয়ে হুসামুদ্দীন ইউয়াজ লখনৌতির তখ্‌তে আরোহণ করেছিলেন!

আলাউদ্দীন আলী মর্দান খিলজী

একে কুতুবুদ্দীনের সনদ, তায় যোশ দেখাবার মত এক উদ্বাস্তু বাহিনী সঙ্গে নিয়ে আলী মর্দান যখন লখনৌতিতে ফিরে এলেন মালিক হুসামুদ্দীনের তখন বুঝতে বাকী রইল না যে তাঁকে বাধা দিয়ে বিশেষ সুবিধা হবে না। তাই বিনা যুদ্ধে তাঁর হাতে মসনদ ছেড়ে দিয়ে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন। সুলতান

আলাউদ্দীন নাম নিয়ে আলী মর্দান আর একবার লখনৌতির তখ্‌তে আরোহণ করলেন।

স্বগোত্রীয় খিলজী আমীরগণ যে তাঁর বিরোধী একথা সুলতান আলাউদ্দীন ভাল করে জানতেন। তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি নিজস্ব উদ্বাস্তু বাহিনী ছাড়া এক নূতন সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করেন। আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ বা বহিরাক্রমণে তাঁর অধিকার যাতে ক্ষুন্ন না হয় সেজন্য সর্ব প্রকার আয়োজন তিনি সম্পূর্ণ করেছিলেন। খোয়ারজিম বিতাড়িত মধ্য-এশিয়ার উদ্বাস্তুদের প্রতি তাঁর মমত্বের কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় সেখান থেকে নূতন নূতন শরণার্থী এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের বলে বলীয়ান হয়ে তিনি দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের স্বপ্ন দেখতে থাকেন।

দুই বৎসরের মধ্যে সে সুযোগ এসে গেল। ১২১০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কুতুবুদ্দীনের মৃত্যু হোলে নূতন সাম্রাজ্যের সর্বত্র দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। দিল্লীতে খিলজী আমীরগণ বুদাইনের শাসক শামসুদ্দীন আলতামাসকে ও লাহোরে কুতবী আমীরগণ কুতুবুদ্দীনের পুত্র আরাম শাহকে মসনদে বসিয়ে পরস্পরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হন। আলাউদ্দীন আলি মর্দান সেই দ্বন্দ্বে কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে নিজেকে গৌড়ের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তাঁর দুজন পূর্বসূরী বখতিয়ার খিলজী ও মহম্মদ শিরান মুখে দিল্লীর প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে স্বাধীন নরপতির মত আচরণ করতেন; তিনি সেই মৌখিক আনুগত্যটুকুও ত্যাগ করে নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচার সুরু করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর আলাউদ্দীন সব সময়ে রঙীন স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। তিনি যখন লখনৌতির সুলতান তখন সারা দুনিয়ায় তাঁর সমকক্ষ কে? মাঝে মাঝে প্রকাশ্য দরবারে ঘোষণা করতেন যে গজনী, ঘোর ও খোরাসান তাঁর হুকুমতের অধীন। যে সব সভাসদ এ কথায় সায় দিতেন তাঁদের দেওয়া হোত ইনাম, কেউ সংশয় প্রকাশ করলে পেত ভ্রূকুটি। চাটুকাররা তাঁকে ভাল করে চিনেছিল; তাই মন-যোগান কথা বলে কেউ বা খোরাসান, কেউ বা ইস্পাহান, আবার কেউ বা বোখারায় একটা জায়গীর আদায় করে নিত। সুলতানের হুকুমে ফরমান লিখতেন উজীর, আর সদ্যপাওয়া জায়গীরে যাবার জন্য রাহা খরচ দিতেন খাজাঞ্চী। দানগ্রহীতা বুঝত, ওইটুকুই লাভ!

এই বহ্বাড়ম্বর সত্ত্বেও আলাউদ্দীন নির্বোধ ছিলেন না। খিলজী আমীরগণ তাঁর স্বগোত্রীয় হয়েও যে বখতিয়ার হত্যার পর তাঁকে দেশ ছাড়া করেছিলেন এ কথা তিনি সব সময়ে মনে রাখতেন। সুযোগ পেলে পাছে তারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে সেই ভয়ে তাঁর নিজস্ব উদ্বাস্তু বাহিনীকে সর্বদা তৈরী রাখা হোত। নিজেও অতি সাবধানে চলাফেরা করতেন। এত সব সতর্কতা সত্ত্বেও খিলজীরা হুসামুদ্দীন ইউয়াজের নেতৃত্বে গোপন চক্রান্ত চালায় এবং এক দিন সুযোগ বুঝে আলাউদ্দীনকে হত্যা করে (১২১৩)।

হুসামুদ্দীন ইউয়াজ আবার নূতন করে লখনৌতির মসনদে আরোহণ করেন।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন

হুসামুদ্দীন ইউয়াজ ছিলেন বখতিয়ার খিলজীর সহকর্মী—বোধ হয় নবদ্বীপ বিজয়ী অষ্টাদশ অশ্বারোহীর একজন। এক দিন যখন তিনি গাধার পিঠে মাল বোঝাই করে জাওয়ালিস্থান থেকে পাসাফোর্জে যাচ্ছিলেন সেই সময়ে দুজন দরবেশ এসে কিছু খাবার চায়। ইউয়াজ নিজ থলির ভিতর থেকে দুই টুকরা রুটি ও কিছু জল বার করলে তাই খেয়ে দরবেশরা বলেন: সর্দার! হিন্দুস্থানে যাও। যে দেশের ওপারে আর কোন মুসলমানকে দেখতে পাবে না সেই দেশটি আমরা তোমাকে দিলাম। ইউয়াজ ভাবলেন, দরবেশরা নিশ্চয়ই কোন জেব্রাইল—তাঁকে একটা রিয়াসৎ দিয়ে গেল। সেই অজানা রিয়াসতের দখল নেবার জন্য স্ত্রীকে গাধার পিঠে চাপিয়ে তিনি চলে এলেন হিন্দুস্থানে।

বখতিয়ার খিলজী সেই সময়ে সালাৎ ও সালি থেকে পূর্ব দেশে লুঠতরাজ চালাচ্ছিলেন। লোকবল একেবারেই কম থাকায় তিনি হুসামুদ্দীনকে পেয়ে খুসী হয়ে নিজ দলে ভর্তি করে নেন। এই ভাবে দুই যাযাবরের ভাগ্য এক সূত্রে গেঁথে যায়। বখতিয়ারের তিরোধানের সাত বৎসরের মধ্যে গিয়াসুদ্দীন নাম নিয়ে সেই হুসামুদ্দীন লখনৌতির তখ্‌তে আরোহণ করেন (১২১১)।

পূর্বতন তিনজন খিলজী আমীরের মত নিরক্ষর হোলেও গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজ যথেষ্ট স্থিরবুদ্ধি ও কূটনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে দিল্লীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গেলে গৌড় নগরীতে রাজধানী স্থাপন একেবারে গোড়ার কথা। তাই দেবীকোট থেকে সেখানে রাজপাঠ তুলে এনে অনেকগুলি

মঞ্জিল ও মসজিদ নির্মাণ করেন। একডালা দুর্গেরও সংস্কার সাধন করা হয়। কিছু দিন পরে যখন তিনি শুনলেন যে অযোধ্যায় ব্যাপক হিন্দুবিদ্রোহ দেখা দিয়েছে এবং চেঙ্গিস খাঁর বিধর্মীগণ দিল্লী সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তে আবির্ভূত হয়েছে তখন বুঝে নিলেন যে দিল্লী দূর অস্ত। তাঁকে বশে রাখবার মত সম্বল দিল্লীশ্বর আলতামাসের নেই। তাই তিনি দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করে নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচার সুরু করেন। কিন্তু আলতামাস একটু বিপন্মুক্ত হোলেই যে তাঁর দিকে এগিয়ে আসবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। তার চেয়ে বেশী ভাবনার কথা নিহত সুলতান আলী মর্দান সংগঠিত উদ্বাস্তু তুর্কোমান বাহিনী। আপাত দৃষ্টিতে তারা শান্ত আছে বটে কিন্তু সুযোগ পেলেই প্রভু হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে।

এই সব সম্ভাবনার সম্মুখীন হবার জন্য সামরিক বল অপেক্ষা রাজনৈতিক কর্মসূচী যে অধিকতর কার্য্যকরী নিরক্ষর হোলেও গিয়াসুদ্দীন তা ভাল করে বুঝেছিলেন। তাই সামরিক বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রচুর উপঢৌকনসহ বাগদাদে খলিফা এল-নাসিরের কাছে দূত পাঠিয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য জানান। হোন তিনি নখরদন্তহীন সিংহ, তবু তাঁর স্বীকৃতি পেলে আলতামাসের নৈতিক বল শিথিল হবে এবং তুর্কোমান শরণার্থীদের বশে রাখা যাবে। গিয়াসুদ্দীনের দূত বাগদাদে পৌছালে খলিফা বিস্মিত হয়ে যান। আজও যে একটি মুসলমান রাজ্য স্বেচ্ছায় তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে একথা জেনে তাঁর মনে পুলক জাগে। গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজকে লখনৌতির সুলতান বলে স্বীকৃতি দিলে তাঁর লোকসান নেই, বরং সেই দেশ যে তাঁর প্রতি অনুগত একথা ভেবে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতে পারবেন। ইউয়াজের দূতকে আপ্যায়নের পর তিনি উজিরকে ডেকে সনদ লিখতে বললেন। সেই সনদ নিয়ে দূত লখনৌতিতে ফিরে এলে গিয়াসুদ্দীন নিজেকে খলিফার নাসির বা সাহায্যকারী বলে জাহির করলেন। মুদ্রার উপর তাঁর নামের সঙ্গে খলিফার নামও খোদাই করা হোল।

যিনি খলিফার নাসির তাঁকে ইসলামের জন্য কিছু খিদমদ করতেই হয়। বহু ধার্মিক মুসলমানকে বৃত্তি দিয়ে গিয়াসুদ্দীন স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। হিন্দু পণ্ডিতদেরও তিনি উৎসাহ দিতেন। নিজের অক্ষরজ্ঞান না থাকলেও প্রজাদের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি বিধানের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতেন। গৌড়

নগরীতে তিনি কয়েকটি বৃহৎ অট্টালিকা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। দানে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। ফিরোজ-কোর ইমাম তাঁর দরবারে এলে প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা উপহার দিয়ে আপ্যায়িত করেন। ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-উস-সিরাজ লখনৌতিতে এসে তাঁর দানের পরিমাণ দেখে বিস্মিত হন।

খলিফার স্বীকৃতির কথা শুনে তুর্কোমান সৈন্যরা বাহ্যত শান্ত হোলেও তাদের বিশ্বাস করা যায় না। যাতে তারা চুপচাপ বসে থেকে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের সৃষ্টি করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে গিয়াসুদ্দীন তাদের একবার কামরূপ, একবার মিথিলা এবং আরও একবার বঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠান। কিন্তু প্রতি রণাঙ্গন থেকে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ফিরে আসায় নিজ অধিকারের বাইরে কোন ভূভাগ জয় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

দিল্লীশ্বর সামসুদ্দীন আলতামাসের উত্তর সীমান্তে মোঙ্গল আতঙ্ক তখনও বিদ্যমান। কখন কি হয় তা বলা যায় না। খলিফার স্বীকৃতির মূল্য তাঁর কাছে কাণাকড়ি না থাকলেও এই বিপদের জন্য তিনি গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারছিলেন না। কিছু দিন পরে মোঙ্গল তরঙ্গের গতি অন্য ধারায় প্রবাহিত হোলে তিনি এক দিন সসৈন্যে বিহারে এসে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে লখনৌতির উপর আক্রমণ চালাবার আয়োজন করেন। গিয়াসুদ্দীন তাঁর প্রধান অবলম্বন নৌবাহিনী নিয়ে গঙ্গার উপর দিয়ে কিছু দূর অগ্রসর হবার পর বুঝে নেন যে স্থলযুদ্ধে দিল্লী সৈন্যদের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব হবে না। সেই কারণে তিনি সন্ধির প্রস্তাব করে আলতামাসের কাছে দূত পাঠান (১২২৫)। দিল্লীশ্বর তাতে সম্মত হোলে সন্ধির সর্ত অনুসারে তাঁর এক সৈন্যাধ্যক্ষ মালিক আলাউদ্দীন জানির হাতে বিহারের শাসনভার ছেড়ে দেওয়া হয়। লখনৌতির উপর গিয়াসুদ্দীনের অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে।

নাসিরুদ্দীন মামুদ

সুলতান গিয়াসুদ্দীনের এই বশ্যতা স্বীকার ছিল একেবারেই মৌখিক। আলতামাস দিল্লী ফিরে যাবার কয়েক দিন পরে তিনি আলাউদ্দীন জানিকে বিহার থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ওই রাজ্য পুনরধিকার করেন। কিন্তু আলতামাস নিরুপায়। মোঙ্গলরা আবার এসে তাঁর উত্তর সীমান্তে হানা দিচ্ছে এবং

অযোধ্যায় নূতন করে বিদ্রোহ সুরু হয়েছে। পৃথু নামক এক যোদ্ধার অধীনে সেখানকার হিন্দুরা সংঘবদ্ধ হয়ে তুর্কী শাসনের অবসান ঘটিয়ে লক্ষাধিক মুসলমানের জীবন নাশ করেছে। এই গণ অভ্যুত্থানের ফলে দুই তুর্কী রাজ্য দিল্লী ও লখনৌতি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। সেই বিদ্রোহ দমন করে অযোধ্যার উপর পুনরায় নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে আলাতামাসের দুই বৎসর সময় লাগে। তার পর গিয়াসুদ্দীনের শাস্তি বিধানের জন্য তিনি নিজে না এসে পুত্র নাসিরুদ্দীন মামুদকে সসৈন্যে গৌড়ে পাঠিয়ে দেন। এরূপ কিছু যে ঘটবে তা অনুধাবন করতে না পেরে গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজ তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে পূর্ব দিকে সেন শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য যাত্রা করেছিলেন। নাসিরুদ্দীন মামুদের আগমন সংবাদ বঙ্গে তাঁর শিবিরে পৌছাতে তিনি শশব্যস্ত হয়ে লখনৌতিতে ফিরে এসে দেখেন, শত্রুসৈন্য ওই নগরীর উপকণ্ঠে ছাউনি ফেলেছে। সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, হাজার হাজার তুর্কী সৈন্যের মৃতদেহে মাঠঘাট ভরে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত গিয়াসুদ্দীন পরাজিত ও বন্দী হোলে বিজয়ী নাসিরুদ্দীন মামুদ তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন।

নাসিরুদ্দীন মামুদের এই সাফল্যের জন্য আলতামাস তাঁকে নূতন খলিফা আল-মুস্তাসিন বিল্লার কাছ থেকে পাওয়া খিলাতের এক অংশ ও মালিক-উস-সফ বা পূর্ব দেশের অধীশ্বর উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে কোন অজ্ঞাত কারণে নাসিরুদ্দীনের মৃত্যু হোলে গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজ খিলজীর দলভুক্ত ইখতিয়ারউদ্দীন বালখা খিলজি দিল্লী সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়ে লখনৌতির মসনদ অধিকার করেন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌছালে আলতামাস নিজে গৌড়ে এসে বালখা খিলজীকে পরাজিত ও বন্দী করেন (১৩৩০, নভেম্বর)। তাঁকেও গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজের মত নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

আলাউদ্দীন জানি আলতামাসের নিজের লোক ছিলেন বলে দুই বৎসর পূর্বে তাঁকে বিহারে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। কিন্তু গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজ তাঁকে বিতাড়িত করে ওই রাজ্যটি পুনরধিকার করায় তিনি এত দিন ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, কোথাও কোন সুযোগ পাচ্ছিলেন না। ইখতিয়ারউদ্দীন নিধনের পর তাঁর সেই দুর্দিনের অবসান হয়, আলতামাস তাঁকে লখনৌতির মসনদ প্রদান করে দিল্লীতে ফিরে যান। কিন্তু কয়েক মাস পরে দেখা গেল যে তিনি অপসারিত হয়েছেন

এবং সইফুদ্দীন আইবেক তাঁর স্থানে লখনৌতির ও তুঘ্রাল তুঘান খাঁ বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে এসেছেন। নিয়োগের কিছু দিন পরে তুঘ্রাল তুঘান দিল্লীতে আলতামাসের কাছে কয়েকটি হস্তী উপঢৌকন পাঠিয়ে উঘান তাট উপাধি লাভ করেন।

লখনৌতির নূতন শাসনকর্তা সইফুদ্দীন ছিলেন খিতার এক তুর্কী ক্রীতদাস। আলতামাসের পুত্র নাসিরুদ্দীন তাঁকে উচ্চ মূল্যে কিনে নিজের পরিচারকের কাজে নিযুক্ত করেন। সেই সময়ে প্রভুকে নানা ভাবে খিদমদ করে তিনি সৈন্য বাহিনীতে একটু স্থান করে নেন। তাতে যোগ্যতা দেখানয় তাঁর দ্রুত পদোন্নতি হয় এবং গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধের সময়ে যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়ে দরবারে আসন লাভ করেন। মোঙ্গল আক্রমণের সময়েও তিনি সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে থাকতেন। তাঁর এই সব গুণের কথা বিবেচনা করে গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজের পতনের পর আলতামাস তাঁকে লখনৌতির মসনদ প্রদান করেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে আলতামাসের মৃত্যু হোলে তুর্কী-ভারতের সর্বত্র যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় সেই সময়ে দুষমনরা তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। আততায়ী বোধ হয় আউর খাঁ আইবেক ; কারণ তার পরই তাঁকে লখনৌতির তখ্‌তে অধিষ্ঠিত দেখা যায়। কিন্তু তাঁর অদৃষ্টেও রাজ্য ভোগ বেশী দিন ছিল না—বিহারের শাসনকর্তা তুঘ্রাল তুঘান খাঁ তাঁকে বিতাড়িত করে লখনৌতি অধিকার করে নেন।

সুলতান* রাজিয়া ও তুঘ্রাল তুঘান খাঁ

দিল্লীশ্বর সামসুদ্দীন আলতামাস ছিলেন তুর্কীস্থানের আলবারি উপজাতির এক সর্দারের পুত্র। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক উৎকর্ষতার জন্য সহোদর ভ্রাতাদের মনে ঈর্ষার উদ্রেক হয়, তারা পিতামাতার অগোচরে তাঁকে এক অশ্ব ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রয় করে। ব্যবসায়ীটি সামসুদ্দীনকে নিয়ে বেচাকেনা করে বেশ দু'পয়সা লাভ করলেও হতভাগ্যের কোথাও স্থায়ী আস্তানা মেলে না ; বিভিন্ন বণিকের কাছে হাত বদল হোতে হোতে শেষ পর্য্যন্ত চলে আসে গজনীর এক নাখাসে। সেখানে বিক্রেতা অত্যন্ত চড়া দাম হাঁকলেও সওদার দৈহিক

*রাজিয়া ছিলেন সুলতান—সুলতানা অর্থাৎ সুলতান মহিষী নয়

সৌন্দর্যের কথা বিবেচনা করে মহম্মদ ঘোরী তাতেই সম্মত হন। তিনি তাঁর খাজাঞ্চিকে চুক্তিমাফিক এক হাজার দিনার মূল্য দিতে আদেশ দেন, কিন্তু বণিক জামালউদ্দীন চাস্ত্ কাবা ঝানু ব্যবসায়ী। হাওয়ার গতি দেখে তিনি বুঝে নেন যে সেই দুর্লভ সওদাকে আরও কিছু দিন ধরে রাখলে মুনাফার অঙ্ক আরও বাড়বে। দিল্লীতে কুতুবের হাতে তখন অপরিমিত অর্থ—পৃথ্বিরাজের রাজকোষ তাঁর হস্তগত হয়েছে। আলতামাসকে নিয়ে জামালউদ্দীন চাস্ত্ সেখানে এলে এক লক্ষ চিতাল মূল্যে তাকে কিনে নেন। এই লেনদেনে জামালউদ্দীন খুশী, কুতুবুদ্দীনও খুশী—আলতামাস আরও খুশী!

মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর ক্রীতদাস কুতুবুদ্দীন যেমন দিল্লীর তখ্‌তে আরোহণ করেছিলেন কুতুবুদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর ক্রীতদাস আলতামাসও তেমনি তাতে অভিষিক্ত হন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে রাজিয়া ছিলেন রূপেগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইসলামী প্রথা অগ্রাহ্য করে তিনি এই কন্যাকে মসনদের ভাবী উত্তরাধিকারিণী-রূপে মনোনয়ন করেন। গোয়ালিয়র জয়ের পর তিনি প্রকাশ্য দরবারে তাজ-উল-মালিক মামুদকে এই কথা লেখবার নির্দেশ দেন যে সাম্রাজ্যের ভাবী সুলতান তাঁর কোন পুত্র নয়—কন্যা রাজিয়া।

আলতামাসের নির্দেশ যাই হোক তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল যে সে নির্দেশ মানবার লোক যেমন আছে অমান্য করবার লোকও তেমনি কম নেই। প্রাসাদের অভ্যন্তরে রাজিয়ার বিমাতা শাহ্ তুর্কান এবং দরবারের প্রধান উজীর জুনাইদি প্রমুখ ব্যক্তিগণ রাজিয়াকে পাশ কাটিয়ে শাহ্ তুর্কানের পুত্র রুকনুদ্দীনকে মসনদে বসিয়ে রাজ্য শাসন সুরু করেন। শাহ্ তুর্কান প্রথম জীবনে ছিলেন এক গৃহস্থের পরিচারিকা। বেগম হবার পরও তাঁর মনোবৃত্তি পরিচারিকার মতই থেকে যায়। নিজ পুত্রের জন্য সিংহাসন নিষ্কণ্টক করবার অভিসন্ধি নিয়ে তিনি সপত্নীগণকে হত্যা এবং এক সপত্নীপুত্রের চক্ষু উৎপাটিত করেন। রাজিয়াকেও হত্যা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পরিণামে নিজেই তাঁর হাতে বন্দী হন। রুকনুদ্দীন ও তাঁর সকল আমীরকে যুদ্ধে পরাজিত করে সেই রূপসী তরুণী দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন।

সুলতান রাজিয়া ছিলেন তুর্কী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। মিন্‌হাজ বলেন, রাজোচিত সকল গুণ তাঁর মধ্যে প্রভূতভাবে বিদ্যমান থাকলেও তিনি পুরুষ না

হওয়ায় আমীর ওমরাহদের কাছে সে সবের কোন কদর ছিল না। সিংহাসনে আরোহণের পরও তাঁকে অহর্নিশি তাঁদের চক্রান্তের সম্মুখীন হোতে হয়। তার ফলে তিনি স্বস্তিতে রাজ্য শাসন করবার সুযোগ পান নি। অথচ তাঁর রূপগুণের কোন তুলনা ছিল না। ইসলামী প্রথা যাই হোক না কেন তিনি কাবা ও টুপীতে দেহ আচ্ছাদিত করে প্রজাদের সম্মুখে বার হোতেন। হাতীর পিঠে চড়ে তিনি যখন পথ চলতেন সবাই মুগ্ধ নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু ক্রীতদাসের দল যেখানে শাসনদণ্ড পরিচালনা করে সেখানে এই রূপগুণের মূল্য কানাকড়িও নয়। মুষ্টিমেয় কয়েকজন আমীর রাজিয়াকে সমর্থন করতেন—বাকি সকলে চালাতেন চক্রান্ত।

রাজিয়া যখন শিশু তখন গৌড়ের নূতন শাসক তুগ্রাল তুঘান খাঁ ছিলেন তাঁর পিতার প্রাসাদের সাকি-ই-খাস—সুলতানের নিজস্ব বর্তনবাহক। তাতে কাজ সন্তোষজনক হওয়ায় তাঁকে সর-দোয়াতদারের পদে উন্নীত করা হয়। কিন্তু সেই সময়ে আলতামাসের একটি মণিমুক্তা খচিত দোয়াত খোয়া যাওয়ায় তাঁকে চাস্‌নিগীর পদে নামিয়ে দিয়ে পাকশালায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে প্রভুর অনুকম্পা লাভ করে আস্তাবলের আমীর-ই-আখুন পদে নিযুক্ত হন।

বিহার থেকে এসে লখনৌতির মসনদ অধিকার করবার জন্য তুগ্রাল তুঘান খাঁ যদিও দিল্লীশ্বরের অনুমতির অপেক্ষা রাখেন নি সুলতান রাজিয়ার অভিষেকের পর তাঁর মতির পরিবর্তন হয়, এক দূতকে মূল্যবান উপঢৌকনসহ দিল্লী দরবারে পাঠিয়ে দেন। এই শুভেচ্ছাকে আনুগত্য প্রকাশ বলে মনে করে রাজিয়াও তাঁকে খিলাৎ ও রাজছত্র প্রদান করেন। কিন্তু পরে তিনি যখন শত্রু পরিবৃত হয়ে অসহায় অবস্থার মধ্যে পড়েন তুগ্রাল তাঁকে কোনরূপ সাহায্য পাঠান নি। বরং দিল্লীর অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে দূরে থেকে নিজের সৈন্যবল বৃদ্ধি করেন এবং রাজিয়ার পতনের পর সসৈন্যে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হন। তাঁর শেষ গন্তব্য দিল্লী ছিল কিনা তা বলা যায় না, কিন্তু তিনি যখন এলাহাবাদ পার হয়ে কারার সীমান্তে এসে উপনীত হয়েছেন তখন তাঁর শিবিরে খবর এল যে উড়িষ্যার গঙ্গা সম্রাট নরসিংহদেব গৌড় আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। পিছনে এই বিপদ দেখে আর অগ্রসর হওয়া অনুচিত বিবেচনা করে নূতন দিল্লীশ্বর মাসুদ শাহের প্রতি আনুগত্য জানিয়ে তুগ্রাল লখনৌতিতে ফিরে এলেন।

খাঁয়ের শত্রু খাঁ

তুগ্রাল তুঘান কোন অতিরঞ্জিত সংবাদ পান নি। তাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য সম্রাট নরসিংহদেব যে ভাবে সমরসজ্জা করেছিলেন তুর্কীদের বিরুদ্ধে কোন ভারতীয় নরপতি পূর্বে তা করেন নি। তিনি স্বরাজ্যে ফিরে এসে দেখেন, গঙ্গাবাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করে দ্রুতগতিতে লখনৌতির দিকে এগিয়ে আসছে। তাদের অগ্রগতি রোধ করবার জন্য তাঁর সৈন্যগণ সাধ্যমত চেষ্টা করেও বারবার পরাজিত হয়ে পিছু হটছে। শেষ পর্যন্ত শত্রু এসে যখন রাজধানী অবরোধ করল, তুগ্রাল তখন দিল্লীর নূতন সুলতান আলাউদ্দীন মাসুদ শাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দূত পাঠালেন। যদিও তুগ্রালের উপর মাসুদ শাহর কোন আস্থা ছিল না তবু গৌড় কাফেরদের অধিকারভুক্ত হোলে পরিণামে যে তাঁর পক্ষেও দিল্লীতে অবস্থান করা সংশয়জনক হয়ে উঠবে সে কথা বুঝে নিয়ে তিনি কারা-মানিকপুরের ক্ষত্রপ কারাকাস খাঁ ও অযোধ্যার ক্ষত্রপ তামার খাঁকে নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীসহ লখনৌতিতে যাবার জন্য আদেশ দিলেন। দুই খাঁর সংযুক্ত বাহিনী যখন গৌড়ে এসে উপনীত হোল গঙ্গাসৈন্যগণ তখন রাজধানী লখনৌতি অবরোধ করে বসে রয়েছে। নগরীর উপকণ্ঠে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছে। কিন্তু দুদিক থেকে দুটি নূতন তুর্কী ফৌজ আসায় যুদ্ধের ধারা বদলে যায়। গঙ্গা সেনাপতি যখন দেখলেন যে, তিনটি স্বতন্ত্র তুর্কী বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হোলে আরও সৈন্যের প্রয়োজন তখন সেই ত্রিমুখী অভিযান পরিহার করবার জন্য রাজধানীর উপর থেকে অবরোধ তুলে নিয়ে দূরে সরে গেলেন। কিন্তু তিন তুর্কী বাহিনীর তিনজন সেনাপতি কেউই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলেন না, বরং মালিক তামার খাঁ নিজেই লখনৌতি অবরোধ করে বসলেন। রক্ষক ভক্ষক হয়ে দেখা দিল!

অথচ এই তামার খাঁ পূর্ব জীবনে তুগ্রালের মতই ক্রীতদাস ছিলেন। নাখাসে তাঁর দাম তুগ্রালের চেয়ে বেশী ওঠে নি। তখন যুদ্ধের জন্য বাজার কত তেজী! তাতেই তাঁকে মাত্র ৫০ হাজার পিতল মুদ্রায় কিনে আলতামাস কখনও পাকশালায় মশলা বাটার কাজে, আবার কখনও বা প্রাসাদের মালপত্র বইবার কাজে নিযুক্ত করেন। ফৌজে যোগ দেবার সুযোগ আসে অনেক পরে। তুগ্রাল যখন আমীর-ই-আখুন ছিলেন তামার খাঁ তখন তাঁর অধীনে ঘোড়ার সহিসের কাজ করতেন, বাস করতেন আস্তাবলের

এক কোণে। সে দিনের কথা বিস্মৃত হয়ে তামার খাঁ তাঁকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হোলেন!

তুঘ্রাল তখনও গঙ্গা বাহিনীর আক্রমণের ধাক্কা সামলে উঠতে পারেন নি; তার উপর এই স্বজাতীয় প্রাক্তন ভৃত্যের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁকে দিশাহারা করে তুলল। প্রাণপণ লড়েও তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা শক্ত হয়ে উঠছে দেখে তিনি ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজের স্মরণাপন্ন হন। তাঁর মধ্যস্থতায় দুই খাঁয়ের মধ্যে যে সন্ধি সম্পাদিত হয় তার সর্তানুসারে তামার খাঁ বিহার ও লখনৌতির অধিকার পান, তুঘ্রাল সমস্ত নগদ অর্থ, মনিমুক্তা ও বেগমদের নিয়ে দিল্লী চলে যান। সেখানে দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন মাসুদ জানির কাছে আবেদন করে কোন ফল হোল না। তামার খাঁ যে কোন অন্যায় কাজ করেছেন একথা তিনি মেনে নিলেন না। তাঁর সামরিক বল যখন বেশী তখন মসনদ অবশ্যই তাঁর প্রাপ্য! তুঘ্রাল তাঁকে ঠেকাতে পারেন নি কেন?

আলাউদ্দীন মাসুদ জানির নিজের অবস্থাও তখন যথেষ্ট সংকটপূর্ণ। তাই তুঘ্রালের মত অকৃত্রিম বন্ধুকে নিরাশ না করে কয়েক দিন পরে অযোধ্যার মসনদ খেসারৎ দিলেন। কিন্তু সেখানে যাবার কিছু কাল পরেই ১২৪৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

একই দিনে লখনৌতিতে মালিক তামার খাঁও দেহ রক্ষা করেন!

মুঘিসুদ্দীন উজবক

তামার খাঁর মৃত্যুর পর আলতামাসের আর একজন ক্রীতদাস ইখতিয়ার-উদ্দীন উজবক সুকৌশলে লখনৌতির সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর পূর্ব রেকর্ড খুবই কৌতুহলোদ্দীপক। দিল্লীতে গৃহযুদ্ধের সময়ে তিনি কখনও রাজিয়া, কখনও রুকনুদ্দীন আবার কখনও বা মাসাউদের পক্ষ নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। যখন যার সূর্য্য বেশী কিরণ দিত তখন তিনি তার দিকে ঝুঁকে পড়তেন। এই ভাবে সুকৌশলে নিজের পথ পরিষ্কার করে উজবক আসেন লখনৌতিতে এবং তামার খাঁর মৃত্যুর পর এখানকার তখ্‌তে আরোহণ করেন।

বৎসর পাঁচেক পূর্বে উড়িষ্যার গঙ্গা সম্রাট নরসিংহদেবের সৈন্যগণ গৌড় নগরীর প্রবেশদ্বার থেকে ফিরে গেলেও রাঢ় এখনও তাদের অধিকারভুক্ত।

তাঁর জামাতা অপার-মন্দার থেকে সুরু করে গঙ্গানদী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগ শাসন করছিলেন। উভয় পক্ষে সীমান্ত সংঘর্ষ লেগেই ছিল। ১২৫৬ খৃষ্টাব্দে এই সংঘর্ষ সর্বাত্মক যুদ্ধে পরিণত হয়—তুর্কী ও গঙ্গা সৈন্যের রণ হুঙ্কারে সমগ্র রাঢ়ভূমি কেঁপে ওঠে। সেই মহাযুদ্ধের প্রথম দিকে মুঘিসুদ্দীন জয়লাভ করলেও শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়ে সাহায্য চেয়ে দিল্লীতে আবেদন পাঠান। তাতে কোন সাড়া পাওয়া না যাওয়ায় সুলতান মুঘিসুদ্দীন সম্মুখ সমর পরিহার করে তুর্কীদের প্রাচীন রণনীতিতে দ্রুতগামী অশ্বারোহী নিয়ে অরক্ষিত অঞ্চলগুলির উপর হামলা সুরু করেন। তাঁর আক্রমণে রাঢ়ের সর্বত্র বিভীষিকার সঞ্চার হয়। সম্মুখ সমরে শত্রুর হস্তীবাহিনী তাঁর অশ্বারোহীদের পর্য্যুদস্ত করতে পারত, কিন্তু এমনই অতর্কিতভাবে তিনি আক্রমণ চালাচ্ছিলেন যে তারা কোন যুদ্ধের সুযোগ পেল না। গঙ্গা সামন্ত পিছু হটতে লাগলেন, তাঁর রাজধানী মান্দারণ উজবকের অধীনে চলে গেল। নবদ্বীপের আর একবার পতন হোল।

দিল্লীতে আবেদন পাঠিয়ে কোন সাহায্য না পাওয়ায় উজবকের মনে যথেষ্ট অভিমান ছিল। পরে তাঁর কাছে খবর এল যে সেখানে পূর্বের গোলযোগ প্রশমিত হবার পরিবর্তে ঘনীভূত হয়ে উঠেছে। নূতন সুলতান নাসিরুদ্দীন আগে থেকেই বিধর্মী মোঙ্গলদের আক্রমণ আশঙ্কায় বিব্রত ছিলেন, এখন তাঁর বিধবা জননী মালিকা-ই-জাহান পুত্রের মতের বিরুদ্ধে কাতলাঘ খাঁ নামে এক বিক্ষুব্ধ সৈন্যাধ্যক্ষকে বিবাহ করে মহা সমস্যার সৃষ্টি করেছেন। জননী ও তাঁর নূতন স্বামী ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে দেখা দিয়েছেন। লখনৌতিতে বসে তুঘ্রিল বুঝলেন, এই সুযোগ। তিনি যখন মহাশক্তিশালী গঙ্গাবাহিনীকে হটিয়ে দিয়েছেন তখন তাঁকে আটকায় কে? পর বৎসর নিজের অধিকাংশ সৈন্য নিয়ে একেবারে অযোধ্যায় গিয়ে উপস্থিত হোলেন। সেখানে যতখানি প্রতিরোধ আশা করেছিলেন তা এল না, বীর দর্পে অযোধ্যায় প্রবেশ করে তিনি নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচার সুরু করলেন। এখন তিনি অযোধ্যা, বিহার ও লখনৌতি এই তিন রাজ্যের অধীশ্বর! তাঁর রাজধানী লখনৌতি থেকে রাজ্য তিনটি শাসিত হবে! লখনৌতি হয়ে উঠবে দিল্লীর সমান সমৃদ্ধশালী! একথা মনে করে মুঘিসুদ্দীনের মনে পুলক জাগল—রাজধানীতে ফিরে এসে তিন রাজ্যের প্রতীক হিসাবে সবুজ, কালো ও লাল এই তিন রঙের তিনটি ছত্র ধারণ করলেন।

সুলতান মুঘিসুদ্দীন উজবক এখন অযোধ্যা থেকে লখনৌতি পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের অধীশ্বর। এর পর দিল্লী তাঁর চাই। কিন্তু তার আগে পূর্ব দিকের নগণ্য রাজ্য কামরূপ অধিকার করে নেওয়া সমীচীন। বাধাও বিশেষ ছিল না, কারণ দক্ষিণে গঙ্গা সাম্রাজ্য থেকে মাঝে মাঝে আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সংবাদ আসছিল এবং দিল্লীতে সুলতান নাসিরুদ্দীনের বি-পিতা কাতলাঘ খাঁ অন্য দুই জন শক্তিশালী আমীরকে দলে টেনে নিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। অতএব মুঘিসুদ্দীন যদি কামরূপ আক্রমণ করেন কোন সীমান্ত থেকে বিপদ আসবার সম্ভাবনা ছিল না।

যে চিন্তা সেই কাজ। পর বৎসর বসন্তকালে সুলতান মুঘিসুদ্দীন তাঁর সৈন্য-বাহিনীসহ করতোয়া পার হয়ে কামরূপ রাজ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু তিনি সেখানকার হিন্দুদের যেরূপ দুর্বল বলে মনে করেছিলেন তারা সেরূপ ছিল না। অপূর্ব রণকৌশলে তাঁর সমস্ত বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে তারা তাঁকে বন্দী করে। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হবে।

শ্বশুর জামাইয়ের যুদ্ধ

কামরূপ কারাগারে সুলতান মুঘিসুদ্দীনের মৃত্যু হোলে লখনৌতির উজবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যথারীতি গৃহযুদ্ধ সুরু হয়। তার শেষ অধ্যায়ে দিল্লীশ্বর নাসিরুদ্দীনের বি-পিতা কাতলাঘ খাঁর জামাতা ইজুদ্দীন উজবক সবাইকে পরাজিত করে মসনদ অধিকার করে নেন। পরলোকগত মুঘিসুদ্দীন উজবকের সঙ্গে তাঁর সম্প্রদায়গত ঐক্য থাকলেও আত্মীয়তা ছিল না। তা সত্ত্বেও মুঘিসুদ্দীন পক্ষীয় কারও কাছ থেকে কোন প্রতিরোধ এল না। কিন্তু তাঁর শ্বশুর কাতলাঘ খাঁ জামাতার সাফল্যে খুসী হবার পরিবর্তে সসৈন্যে লখনৌতিতে এসে উপস্থিত হোলেন। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু ইজুদ্দীনের হস্তীবাহিনী যুদ্ধের ধারা বদলে দিলে পরাজিত শ্বশুর অযোধ্যায় ফিরে যান।

এই অভিজ্ঞতা থেকে ইজুদ্দীন বুঝে নেন যে স্বতন্ত্রতা তাঁর কাছে কাল হয়ে দেখা দিতে পারে, দিল্লীশ্বরকে হাতে রাখলে বহু অনর্থের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। বিশেষ করে দিল্লীশ্বর নাসিরুদ্দীন যখন কাতলাঘ খাঁর প্রতি একেবারেই বিরূপ। তাঁর শুভেচ্ছা লাভের আশায় ইজুদ্দীন দুইটি হস্তীসহ মূল্যবান

উপঢৌকন পাঠিয়ে আনুগত্য জানালেন। প্রতিদানে নাসিরুদ্দীন খুসী হয়ে তাঁকে খিলাৎ পাঠালেন। সেই থেকে ইজুদ্দীন মুদ্রায় নিজ নামের সঙ্গে নাসিরুদ্দীনের নামও খোদিত করেন।

বঙ্গ তখনও সেনবংশের অধিকারভুক্ত। তুর্কীদের অন্তহীন গৃহবিবাদ ও নিজেদের শক্তিশালী নৌবাহিনীর বলে বলীয়ান হয়ে সেনরাজগণ সেখানে নিজ বংশের দীপশিখা জ্বালিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু লখনৌতির কোন স্থলতানই তাঁদের ভোলেন নি—বঙ্গের উপর সবার লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। স্থলতান ইজুদ্দীন যখন দেখলেন যে দিল্লীর সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপিত হওয়ায় তাঁর সকল সীমান্ত নিষ্কণ্টক হয়েছে তখন সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে বঙ্গ জয়ের জন্য যাত্রা করেন। তাঁর ফৌজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে জলপথ ও স্থলপথ ধরে অগ্রসর হয়। সেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সেনরাজ যে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন তার বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ না থাকলেও মালিক ইজুদ্দীনের শত্রু গোকুলে বাড়ছিল।

কারা-মাণিকপুরের স্থলতান তাজুদ্দীন আর্সলান খাঁর বরাবরই লখনৌতির উপর লোভ ছিল। তিনি গুপ্তচর মারফৎ ইজুদ্দীনের সকল গতিবিধির সংবাদ রাখছিলেন। এক দিন যখন শুনলেন যে ইজুদ্দীন সমস্ত সৈন্য নিয়ে বঙ্গ জয়ের জন্য যাত্রা করেছেন তখন বুঝলেন এ স্থযোগ হারালে পরে অনুতাপ করতে হবে। শত্রুকে অতর্কিত আক্রমণের জন্য সকল সৈন্যকে রাজধানীতে আহ্বান করে তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন। সঠিক গন্তব্যস্থান যে কি তা অন্তরঙ্গদের কাছেও গোপন থাকল। তাঁর ফৌজ পূব দিকে না এসে কালিঞ্জরের পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে দেখে সবাই বুঝল যে ওই দুর্জয় দুর্গটি জয় করে তিনি তার প্রাকারের উপর ইসলামের পতাকা উড়িয়ে দেবেন। কিন্তু বেশ কিছু দূর অগ্রসর হবার পর আর্সলান খাঁ হঠাৎ গতিপথ পরিবর্তন করে অতি দ্রুতবেগে গৌড় সীমান্তে এসে উপনীত হোলেন।

ইজুদ্দীন তখন বঙ্গে। আর্সলান খাঁর আগমন বার্তা তাঁর শিবিরে পৌছালে তিনি বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। ঝোপের দুইটি পাখীর চেয়ে হাতের একটি পাখীর দাম অনেক বেশী! সেই পাখীটিকে বাঁচাবার জন্য স্থলতান ইজুদ্দীন বঙ্গ জয়ের পরিকল্পনা আপাততঃ স্থগিত রেখে সৈন্যদের নির্দেশ দিলেন লখনৌতির

দিকে ফেরবার জন্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছে দেখেন সব শেষ! মালিক তাজুদ্দীন আর্সলান খাঁ শুধু তাঁর রাজধানী ও রাজকোষ নয়, বেগম বাঁদীদের পর্য্যন্ত হস্তগত করেছেন। ইজুদ্দীন সর্বশক্তি দিয়ে লড়লেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত ও নিহত হোলেন।

তাজুদ্দীন আর্সলান খাঁ (১২৬০-৭৭)

তাজুদ্দীন আর্সলান খাঁ ছিলেন খিতার এক আমীরের পুত্র। কে যে তাঁকে পিতৃগৃহ থেকে বার করে নিয়ে এসেছিল তা জানা যায় না, কিন্তু এক দিন দেখা গেল যে তাঁকে নিয়ে বাজারে বেচাকেনা চলছে। হৃষ্টপুষ্ট খুবসুরৎ যুবক, তাই দাম বেশ চড়া। সেই দামে একের পর এক ক্রেতা তাঁকে কিনে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতে লাগল। এই ভাবে হাত বদল হোতে হোতে তিনি যখন দিল্লীতে এসে উপস্থিত হোলেন আলতামাস তখন সেখানকার অধীশ্বর। তিনি তাজুদ্দীনকে কিনে নিয়ে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করেন। সৈন্য বিভাগে কাজ করবার সময়ে বিশেষ কর্মদক্ষতা দেখিয়ে তাজুদ্দীন একটি জায়গীর পান ও পরে আরও বেশী করে আলতামাসের অনুগ্রহধন্য হয়ে কারার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। ভবিষ্যৎ জীবনে সেখান থেকে এসে কিভাবে গৌড় অধিকার করেন তা বর্ণনা করা হয়েছে।

লখনৌতি অধিকারের জন্য তাজুদ্দীন যেমন দিল্লীশ্বরের মতামতের অপেক্ষা রাখেন নি এখানকার তথ্‌তে আরোহণের পর তেমনি সেখান থেকে কোন সমর্থন চান নি। ইজুদ্দীনকে নিধন করে তিনি স্বাধীন সার্বভৌম সুলতান হিসাবে বিহার ও লখনৌতি শাসন করতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর মূল রাজ্য কারা-মাণিকপুর অন্যের অধিকারে চলে গেল। সে জন্য তিনি দুঃখিত হন নি, কারণ বিহার-গৌড়ের তুলনায় কারা-মাণিকপুর কতটুকু? ছয় বৎসর পরে ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে তাজুদ্দীন আর্সলানের মৃত্যু হোলে তাঁর পুত্র আর্সলান তাতার খাঁ নির্বিঘ্নে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করতে রাজী হন নি, কিন্তু নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর গিয়াসুদ্দীন বলবন যখন দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন তখন ৬৩টি হস্তীসহ বহু মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য জানান। প্রতিদানে তাতার খাঁর দূতগণ ইরাণ ও তুরাণের দূতদের সমান মর্য্যাদা ও খিলাৎ নিয়ে লখনৌতিতে ফিরে আসেন।

উভয় সুলতান এই ভাবে বাহ্যতঃ পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য মেনে নিলেও পূর্বাঞ্চলের উপর বলবনের যথেষ্ট লোভ ছিল। রাজ্যাভিষেকের পর দৃঢ় হস্তে বিরোধীদের নির্মূল করে দুই বৎসরের মধ্যে যখন তিনি সর্বত্র নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করছেন তখন এক দিন দেখা গেল যে লখনৌতির তরুণ সুলতান আর্সলান তাতার খাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং তাঁর স্বগোত্রীয় শের খাঁ এখানকার তখ্‌তে আরোহণ করেছেন। এই পট পরিবর্তনের পশ্চাতে বলবনের যে কতখানি হাত ছিল তা বলা যায় না, কিন্তু কিছু দিনের মধ্যে সবাই শুনল যে আমীর খাঁ নামে এক সর্দার শের খাঁকে অপসারিত করেছেন এবং তাঁকেও অপসারিত করে বলবন বিহার ও লখনৌতির উপর নিজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করছেন।

হত্যা-হানাহানি-বিভীষিকা

নবদ্বীপ পতনের পর থেকে প্রায় আশি বৎসর সময় অতীত হয়ে গেল, কিন্তু জাতির জীবনে শান্তি এল না। মধ্য এশিয়া থেকে স্রোতের মত ক্রীতদাসের দল এসে গৌড়ে হানাহানি করেছে, চক্রান্ত চালিয়েছে, একে অন্যকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছে ; কিন্তু শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে কেউ পারে নি। বখতিয়ার খিলজী এসে লক্ষ্মণসেনকে দূরীভূত করেছিলেন, কিন্তু তার ফলে কোন স্থায়ী রাজবংশের অভ্যুদয় হয় নি। তাঁর আততায়ী সে কাজ পারেন নি, তাঁর আততায়ী নয়, তাঁর আততায়ীও নয়। আশি বৎসরের মধ্যে আঠারো জন সুলতান লখনৌতির মসনদে আরোহণ করলেন, কিন্তু রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন স্থায়িত্ব এল না। তাঁদের কাছ থেকে জনসাধারণ কিছু পেল না, বরং শাসকদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তাদের জীবন বিষাদময় হয়ে উঠল ।

সে যুগে আধুনিক গণতন্ত্র অজ্ঞাত থাকলেও জনমতের মূল্য এখনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। বিক্ষুব্ধ জনমতের কাছে মাথা নীচু করে গৌড়, তথা বিশ্ব ইতিহাসের, এক মহা শক্তিমান শাসক বল্লালসেন দশ বৎসর পূর্বে স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। জীমূতবাহনের যুগান্তকারী আইনগ্রন্থ দায়ভাগ, কবিক্ষ্মাপতি ধোয়ার কাব্যলহরী পবনদূত ও জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলী গীতগোবিন্দের সৃষ্টি বল্লাল যুগে। তুর্কীরা যখন গৌড়ভূমিতে চক্রান্ত চালাচ্ছিল জয়দেব তখন ইহলোকে। এই উজ্জ্বল যুগে যে সব ভ্রান্ত আদর্শবাদী আশা করেছিল যে সেন

বংশের অবসান ঘটলে বহিরাগত তুর্কীরা দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনবে তাদের মন গৌড় পতনের পর হতাশায় ভরে ওঠে। তাদের নেতা পাণ্ডুয়াবাসী গোপ কালু ঘোষ তার পূর্বে বৃদ্ধ বয়সে দেহরক্ষা করেছিলেন। জীবন সায়াহ্নে নিজ কৃতকর্মের ফল দেখে তাঁর মন অনুশোচনায় ভরে উঠেছিল, কিন্তু প্রতিকারের পথ তখন আর নেই!

1 Minhaj-us-Siraj *Tabakat-i-Nasiri, Tabakat XX—5, 6,7, XXI-1* ও *II*

চতুর্থ অধ্যায়

ক্ষণপ্রভার রশ্মিরেখা

গৌড়েশ্বর অমর রহে!

বখতিয়ার খিলজীর আকস্মিক আগমনে সেন বংশ রাজধানী ছেড়ে চলে গেলেও বিলুপ্ত হয় নি। তুর্কীরা যখন লক্ষ্মণাবতীতে বসে নিজেদের মধ্যে হানাহানি চালাচ্ছিল তখন তাঁরা নূতন রাজধানী বিক্রমপুরে বসে সমস্ত বঙ্গের উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করছিলেন। এমনি ভাবে চলে অর্দ্ধ শতাব্দী। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তুর্কীরা তাঁদের রাজ্যচ্যুত করতে পারে নি; পূর্ব ভারতে নবদ্বীপ জয় তাদের শেষ জয়।

যুদ্ধ না করেও যে অনেক সময় যুদ্ধে জেতা যায় তার প্রমাণ দিয়েছিলেন লক্ষ্মণসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ বিশ্বরূপসেন। দিল্লী-আজমীরে পৃথ্বিরাজ, কনৌজে জয়চন্দ্র ও মগধে গোবিন্দপাল সর্বশক্তি দিয়ে তুর্কীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও শেষ পর্য্যন্ত ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে মিলিয়ে গেলে বিশ্বরূপসেন তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝে নেন যে প্রধানতঃ পদাতিক দিয়ে গঠিত তাঁর সৈন্যবাহিনী যদি বা তুর্কী অশ্বারোহীদের পরাভূত করে যুদ্ধ সেখানে শেষ হবে না। দিল্লী থেকে কুতবুদ্দীন আসবেন, তাতেও না কুলালে গজনী থেকে আসবেন স্বয়ং মহম্মদ ঘোরী। তাঁদের সঙ্গে আসবে দলে দলে তুর্কী অশ্বারোহী, আর আসবে দিল্লী-কনৌজ-মগধ থেকে অধিকার করা বিপুল পরিমাণ সমর সম্ভার। সেই সম্মিলিত বাহিনীর চাপে সেনবাহিনী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে, বিজয়ী তুর্কীরা তারপর বিনা বাধায় বঙ্গ-বরেন্দ্রসহ সমগ্র গৌড়রাজ্য অধিকার করে একেবারে ত্রিপুরা সীমান্তে গিয়ে উপনীত হবে।

স্থলসৈন্যে দুর্বল হোলেও সেনরাজ ছিলেন নৌশক্তিতে অজেয়। শুধু

ঘোর সাম্রাজ্যে নয় সমগ্র এশিয়া মহাদেশে তাঁদের নৌবাহিনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এমন কোন শক্তি ছিল না। তারই বলে বলীয়ান বিশ্বরূপসেন রাতারাতি সমগ্র রাজধানী সরিয়ে নিয়ে চলে গেলেন বঙ্গে। নবদ্বীপে বখতিয়ারের কাছে সে খবর পৌছালে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। তারপর বিনা প্রতিরোধে লক্ষ্মণাবতীতে প্রবেশ করে দেখেন যে নগরী জনশূন্য। প্রাসাদ হর্ম বিপণি সবই আছে, কিন্তু জনমানবের চিহ্নমাত্র কোথাও নেই। পথে লোক নেই, দোকানে ক্রেতা নেই, মন্দিরে পুরোহিত নেই। বাজার শূন্য, বিপণি শূন্য, বিদ্যালয় শূন্য—সবই শূন্য। রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে দেখেন মর্মর নির্মিত বড় বড় প্রকোষ্ঠ, মণিমুক্তাখচিত আসবাবপত্র—কিন্তু সবই পরিত্যক্ত। একজন পরিচারিকার সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত কোথাও মিলল না। লক্ষ্মণাবতীকে রক্ষা করছে দুর্ভেদ্য দুর্গ একডালা, কিন্তু তার দুয়ার আপনিই খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করে বখতিয়ার দেখলেন, সেখানে কোন সৈনিক নেই—সমরোপকরণও নেই। তাঁর সিপাহীরা কত লুঠের আশা নিয়ে এই সমৃদ্ধিশালী নগরীতে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু তার কণামাত্রও মিলল না।

বখতিয়ারের মনে ভয় হোল। যে নৌবহরের বলে বলীয়ান হয়ে সেনরাজ এই অসাধ্যসাধন করেছেন তার সম্মুখীন হবার মত শক্তি তাঁর কোথায়? অশ্বারোহী দিয়ে সেন শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা সামলে নিয়ে তাদের নৌবহর যদি ফিরে এসে লখনৌতির উপর পাণ্টা আক্রমণ সুরু করে কি দিয়ে তিনি তার প্রতিরোধ করবেন? সেন বাহিনীর এখন সুবিধা অনেক। সমস্ত অঞ্চলকে তারা অন্তরঙ্গভাবে জানে; জনসাধারণ তাদের সহায়; অসামরিক অধিবাসীদের রক্ষার কোন দায়িত্ব নেই। কোন পঞ্চমবাহিনী পিছন থেকে তাদের সমরায়োজন স্যাবোটেজ করবে না। এত সুবিধা সত্ত্বেও তারা যদি ব্যর্থকাম হয়ে পশ্চাদপসারণ করতে চায় নিজস্ব নৌবহর সব সময় হাতের কাছে প্রস্তুত থাকবে। বখতিয়ার কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। পরাজিতের আতঙ্ক বিজয়ী বীরের মনকে অভিভূত করে তুলল।

সেন শক্তির সম্ভাব্য প্রত্যাক্রমণ পরিহার করবার জন্য বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতী ত্যাগ করে চল্লিশ মাইল উত্তরে নগণ্য সহর দেবীকোটে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানেও বিশেষ সুবিধা হোল না। একটি তীর নিক্ষেপ

না করেও তিনি নবদ্বীপ-লক্ষ্মণাবতী জয় করেছেন বটে, কিন্তু গৌড় রাজ্যের চার-পঞ্চমাংশের উপর নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। সেন নৌবহর অটুট থাকতে কোন দিন পারবেনও না। বঙ্গ এখনও লক্ষ্মণসেনের অধীন, রাঢ়ের সামন্ত নরপতিগণ উড়িষ্যার গঙ্গা সম্রাট অনঙ্গভীমদেবের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। বরেন্দ্রের অর্দ্ধাংশের উপরেও তিনি নিজ অধিকার প্রসারিত করতে পারেন নি। তারও ওপারে কামরূপ মহাশক্তিশালী রাজ্য। তাই লক্ষ্মণাবতীর পতন সত্ত্বেও চারিদিকে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা চলছে, মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজছে, লোকে রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রা করে ধ্বনি তুলছে—গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেন অমর রহে!

অপরাজেয় বঙ্গ

নবদ্বীপ ত্যাগের দুই বৎসর পরে লক্ষ্মণসেন পরলোক গমন করলে তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও মাধবসেন দীর্ঘকাল ধরে বঙ্গ শাসন করেন। কে কত দিন রাজত্ব করেছিলেন তার কোন লিখিত বিবরণ না থাকলেও সমগ্র বঙ্গের উপর যে তাঁদের শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল তার বহু প্রমাণ আছে। তাঁদের হাত থেকে এক সূচাগ্র পরিমাণ ভূমিও তুর্কীরা অধিকার করতে পারে নি। পৃথ্বিরাজ জয়চাঁদ গোবিন্দপালের দুর্ভাগ্য সেন বংশকে ভুগতে হয় নি। সেই সময়ে লেখা হরিমিশ্রের কারিকা থেকে জানা যায় যে সেনরাজ লক্ষ্মণাবতী ছেড়ে চলে গেলে সেখানকার উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা তাঁদের সঙ্গ নেয়, রাঢ় থেকে দলে দলে বর্ণ হিন্দু চলে যায় বঙ্গে। কিন্তু তুর্কী আক্রমণের আশঙ্কা তাদের মনে সদা জাগরূক ছিল, মহারাজ কেশবসেন সব সময়ে যবন ভয়ে ভীত থাকতেন।

গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজ খিলজী (১২১১-২৭) তখ্‌তে আরোহণ করে দেখেন যে শক্তিশালী নৌবাহিনী না থাকলে সেন শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যাবে না। আবার তাদের কাছ থেকে কোন আক্রমণ এলে তার সম্মুখীন হবার জন্যও নৌবহর চাই। এই নদীবহুল দেশে ঘোড়সওয়ার দিয়ে যদি বা ছয় মাস যুদ্ধ চালান সম্ভব হয় বাকি ছয় মাস নৌবহর ও পাইক অপরিহার্য্য। তাঁর উদ্যোগে তুর্কীদের প্রথম নৌবহর তৈরী শুরু হোল এবং সে কাজ সম্পন্ন হোলে তিনি দেবীকোট থেকে লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী সরিয়ে আনলেন। যথারীতি হিন্দু মন্দির ও

বৌদ্ধ বিহার ভেঙ্গে মসজিদ ও মিনার তৈরী করা হোল, সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়ীগুলিতে বাস করতে লাগলেন তুর্কী আমীররা। পরিত্যক্ত লক্ষ্মণাবতী আবার নূতন জীবন লাভ করল।

কয়েক বৎসর ধরে সমরায়োজন চালাবার পর ১২২৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গিয়াসুদ্দীন বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ বঙ্গে অভিযান সুরু করেন। মাঠঘাট তখন শুষ্ক, নদীর জল নেমে গেছে। তাই তাঁর ফৌজ দুভাগে বিভক্ত হয়ে স্থলপথ ও জলপথে অগ্রসর হোতে লাগল। মাধবসেন তখন গৌড়েশ্বর। গিয়াসুদ্দীনের সম্মুখীন হবার জন্য তাঁর সৈন্যরা এগিয়ে এল, উভয় পক্ষে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধও হোল। কিন্তু এক দিন তুর্কী শিবিরে খবর পৌছাল যে দিল্লীশ্বরের পুত্র নাসিরুদ্দীন সসৈন্যে লখনৌতির দিকে এগিয়ে আসছেন। গিয়াসুদ্দীন হতবাক! বঙ্গ জয়ে কাজ নেই, নিজ রাজ্য রক্ষা করতে পারলে তিনি খোদাকে মোবারকবাদ জানাবেন। কিন্তু লখনৌতিতে ফিরে এসে শোনেন যে শত্রু তাঁর পূর্বেই সেখানে এসে পৌছেছে, রাজধানী তাদের হস্তগত। সকল শক্তি দিয়ে তিনি যুদ্ধ করলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হোলেন।

গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজ রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করলেও একের পর এক যে সব সুলতান লখনৌতির তখ্‌তে আরোহণ করেন তাদের সবার লক্ষ্য ছিল বঙ্গ। সুযোগ পেলেই তাঁরা সেখানে অভিযান চালাতেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে সে সব কাহিনী লিপিবদ্ধ করবার জন্য মিনহাজ-উস-সিরাজের মত কোন প্রতিভাবান ঐতিহাসিক তুর্কী পক্ষে ছিলেন না, হিন্দুদের মধ্যে ইতিহাস লেখার প্রথা লোপ পেয়েছিল। এমন কি কারিকা, করচা, স্মৃতি প্রভৃতি থেকে কোন উপাদান সংগ্রহের উপায় নেই। তবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত যে বঙ্গে তুর্কী অধিকার প্রসারিত হয় নি এরূপ অনুমানের অনুকূলে যথেষ্ট উপকরণ আছে।

গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে ১২৮১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর গিয়াসুদ্দীন বলবন যখন তুগ্রাল তুঘান খাঁকে ধরবার জন্য সসৈন্যে লখনৌতিতে আসেন তখন তিনি সাহায্যের জন্য সুবর্ণগ্রামরাজ দনুজমর্দনদেবের কাছে দূত পাঠান। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দনুজমর্দনদেব সেন বংশের সন্তান। এরূপ অনুমান যদি সত্য নাও হয় বঙ্গের উপরে যে তখনও তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় নি এই ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বলবন বিদ্রোহী এই তুঘ্রাল তুঘান যখন লখনৌতির মসনদে অধিষ্ঠিত (১২৬৮-৮১) সেই সময়ে ত্রিপুরা রাজবংশের জনৈক কুমার রত্ন-ফা তাঁর অগ্রজদের সঙ্গে কলহ করে সাহায্যের জন্য গৌড়ে আসেন। তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে তুঘ্রাল তুঘান খাঁ সর্ব প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর নৌবহর পদ্মা ও মেঘনা নদী ধরে ত্রিপুরার দিকে অগ্রসর হয়। সমসাময়িক সেনরাজের নাম জানা না গেলেও তিনি যে তুঘ্রালকে বাধা দিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে বাধা চূর্ণ করে তুঘ্রালের নৌবহর ত্রিপুরার দিকে এগিয়ে যায়, পদ্মার উভয় পার্শ্বে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

নবদ্বীপ পতনের পর দীর্ঘ ৮০ বৎসর পরে বঙ্গে তুর্কীদের এই প্রথম অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও ওই রাজ্য তখনও অজেয় থাকে।

নবদ্বীপের প্রতিশোধ

বঙ্গের মত রাঢ়ও সহজে তুর্কীদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নি। লক্ষণ-সেনের নিষ্ক্রমণের পর এই রাজ্যের অধিবাসীগণের মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বটে কিন্তু ভেঙে পড়ে নি। প্রথম আঘাতের ধাক্কা সামলে নিয়ে এখানকার নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিগণ তন্ত্রাচার্য্যদের আহ্বানে কালিকাক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল কালীঘাটে মিলিত হন এবং তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণের জন্য এক পরিকল্পনা তৈরী করেন। বখতিয়ার তখন সেখানে মুষ্টিমেয় সৈন্য রেখে মূল বাহিনীসহ লক্ষণাবতী ও সেখান থেকে দেবীকোটে চলে গেছেন। সেই কারণে নবদ্বীপ পুনরুদ্ধার করতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি। নগররক্ষী তুর্কীরা পরাজিত হয়ে উত্তর দিকে চলে যায়।

এর পর শত্রু যদি ওই নগরী পুনরুদ্ধারের জন্য ফিরে আসে তাহোলে একক শক্তিতে তার সম্মুখীন হওয়া সম্ভব হবে না বুঝে রাঢ়ের নরপতিগণ উড়িষ্যার গঙ্গাসম্রাট অনঙ্গভীমদেবের স্মরণাপন্ন হন। উত্তরে সুবর্ণরেখা থেকে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাঁর সাম্রাজ্যের উপর তুর্কীদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য অনঙ্গভীমদেব তখন নিজ সীমন্তে দুর্গশ্রেণী নির্মাণ করছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। রাঢ়ী সামন্তদের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখিয়ে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন, তাঁর

সেনাপতি বিষ্ণুর নেতৃত্বাধীনে উভয় পক্ষের একটি যুক্ত ফ্রণ্ট গঠিত হয়। কয়েক বৎসর ধরে তুর্কী অভিযান ঠেকিয়ে রেখে সেই সম্মিলিত বাহিনী ১২১৪ খৃষ্টাব্দে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

গঙ্গা-রাঢ় বাহিনীর প্রচণ্ড আঘাতে তুর্কীদের সীমান্ত ঘাঁটিগুলির একে একে পতন হয়। তাদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দুর্গ বীরভূম জেলার লখনোর হস্তচ্যুত হোলে সকল তুর্কী সৈনিকের মনোবল এমনভাবে ভেঙে পড়ে যে অফিসারদের পক্ষে তাদের সংঘবদ্ধ করা অসম্ভব হয়। তখন তাদের পশ্চাতে উলেমারা এসে আবির্ভূত হন ও ইসলামের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য জেহাদ ঘোষণার ফর্মান দেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজ সেই ধর্মযুদ্ধের নেতৃত্ব করতে এসে দেখেন যে শত্রুব্যূহ দুর্ভেদ্য। অসংখ্য সৈন্যের জীবন বলি দিয়ে তিনি লখনোর উদ্ধার করলেন বটে কিন্তু যুদ্ধ প্রচণ্ডভাবে চলতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ অবসন্ন হয়ে নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে গেলে সেই অধ্যায়ের শেষ হয়।

তারপর ২৯ বৎসর ধরে চলে দুই শক্তির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সীমান্ত সংঘর্ষ। তার শেষে ১২৪২ খৃষ্টাব্দের শরৎকালে সম্মিলিত গঙ্গা-রাঢ় বাহিনী তুর্কীদের বিরুদ্ধে সর্বব্যাপী সংগ্রাম সুরু করে। তুঘ্রাল তুঘান খাঁ তখন লখনৌতির অধীশ্বর। শত্রুর অগ্রগতি রোধের জন্য তিনি সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যান, কিন্তু সকল প্রতিরোধ চূর্ণ করে হিন্দু সৈন্যরা শক্তিশালী নাগর দুর্গ অধিকার করে। ভীত সন্ত্রস্ত তুঘ্রাল তুঘান সম্ভাব্য সকল স্থান থেকে নূতন নূতন সৈন্য ও সমরোপকরণ আমদানী করেন, সম্রাট নরসিংহদেবও অভিযাত্রী বাহিনীর কাছে ক্রমাগত সৈন্য পাঠান। এই ভাবে দেড় বৎসর ধরে যুদ্ধ চলবার পর হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষগণ রণনীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। শত্রুকে স্বনির্বাচিত ভূমিতে টেনে এনে যুদ্ধ করবার জন্য তাঁরা বীরভূমের সমতলভূমি ত্যাগ করে সুশৃঙ্খলভাবে পিছু হঠতে থাকেন। নাগর দুর্গও পরিত্যক্ত হয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র সৈন্যবাহিনী পক্ষ কালের মধ্যে সোনামুখির কাছে কাটাসিন দুর্গে এসে আশ্রয় নেয়। এইখানে অভিনীত হয় ভারতের সমর ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়।

দিনটি ছিল শনিবার, এপ্রিল ১৬, ১২৪৪ খৃষ্টাব্দ। বিশাল তুর্কী বাহিনী পূর্ব দিন থেকে কাটাসিন দুর্গ অবরোধ করে বসে রয়েছে। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা দুর্গের উপর আক্রমণ সুরু করবে। পূর্ব সূচী অনুযায়ী যুদ্ধ সুরু হোল, দুর্গাভ্যন্তর থেকে হিন্দু তীরন্দাজরা যথারীতি শত্রুর উপর তীর বর্ষণ করতে লাগল। তারই মধ্যে এগিয়ে গিয়ে তুর্কীরা দ্বিপ্রহর নাগাদ দুইটি পরিখা ও কয়েকটি রণহস্তী অধিকার করে নিল। সন্ধ্যার পূর্বেই যে তারা দুর্গদ্বারে গিয়ে পৌছাবে সে বিষয়ে তাদের সৈন্যাধ্যক্ষদের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না। কিন্তু সকাল থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরে যুদ্ধ করে সৈন্যরা এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাদের একটু বিশ্রামের প্রয়োজন। যেটুকু সাফল্য তারা অর্জন করেছে তাতে যুদ্ধ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ রাখলে ক্ষতিও নেই। এইরূপ চিন্তা করে তুর্কী সৈন্যাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ রেজিমেণ্টকে আদেশ দিলেন, তারা যেন দুর্গরক্ষীদের নাগালের বাইরে গিয়ে আহারাদি শেষ করে নেয়।

আদেশ পেয়ে রৌদ্রক্লিষ্ট সৈনিকরা পোষাক পরিচ্ছদ আল্গা করে রান্না-খাওয়ায় মন দিল। তাদের নায়করা নিজ নিজ তাঁবুতে গিয়ে পানাহার করতে লাগলেন। যুদ্ধের কথা ভুলে গিয়ে সবাই এই ভাবে আরাম সুখ উপভোগ করছে এমন সময়ে ছোট একদল হিন্দু সৈন্য এসে হস্তীগুলিকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল। তারা ছিল অস্ত্রসজ্জিত ও সুসম্বদ্ধ, পক্ষান্তরে তুর্কীরা নিরস্ত্র ও নায়কবিচ্ছিন্ন। সেই কারণে কেউ তাদের বাধা দিল না—সেরূপ কোন আদেশ অফিসারদের কাছ থেকে এল না। কিন্তু কাহিনীর এখানে শেষ নয়। নিমেষ মধ্যে পাশের জঙ্গল থেকে ২০০ পদাতিক ও ৫০ জন অশ্বারোহী ঝড়ের মত বেরিয়ে এসে তুর্কীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। যে হিন্দু সৈনিকরা সুদূর নাগর থেকে পিছু হঠতে হঠতে কাটাসিন দুর্গে এসে আশ্রয় নিয়েছিল তারা যে এভাবে নূতন করে হামলা সুরু করবে এমন কথা তুর্কীরা কল্পনাও করতে পারে নি। এরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। তাই সবাই আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়ল। তৈরী খাবার পড়ে রইল—প্রাণ বাঁচাবার জন্য সকলে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটাছুটি সুরু করল।

ঠিক এমনি পলায়ন হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষরা চেয়েছিলেন। এর জন্যই তাঁরা শত্রুকে নাগর থেকে কাটাসিনে টেনে এনেছিলেন। তাঁদের এই অপূর্ব রণনীতির

ফলে আড়াই শ' সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে পঁয়ষট্টি হাজার তুর্কী ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে সুরু করল। কাহিনীটি আরব্যোপন্যাসের মত অলীক বলে মনে হোলেও মিথ্যা নয়। রাঢ়ের পবিত্র ভূমিতে এই ঘটনা এক দিন ঘটেছিল। উড়িষ্যার বীর যোদ্ধাদের সঙ্গে রাঢ়ীরাও সেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। সে যুগের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ নিজে তুর্কী শিবিরে অবস্থান করে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

তুর্কীরা দিশাহারা হয়ে ছুটতে সুরু করলে সকল হিন্দু সৈন্য দুর্গাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে এল। এখন তারা আড়াই শ' নয়—কয়েক হাজার। সবাই আপাদ-মস্তক অস্ত্রসজ্জিত। সবাই সংঘবদ্ধ। তাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভীতিবিহ্বল তুর্কীরা লখনৌতির পথ ধরে পালাতে সুরু করল। তাদের হাজার হাজার ঘোড়া ও প্রভূত পরিমাণ রণসম্ভার পিছনে পড়ে রইল—প্রাণ বাঁচান সবার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু পথ নিষ্কণ্টক নয়। পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষগণ রাস্তার দুই পাশে বহু ছদ্মবেশী সৈনিক লুকিয়ে রেখেছিলেন। তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে পলায়নপর তুর্কীদের উপর আঘাত হানতে লাগল। তুর্কীরা তপ্ত কটাহ থেকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর পড়ল। তাদের পিছন থেকে তাড়া করছে কাটাসিনের দুর্গরক্ষীগণ, আবার পলায়ন পথের দুই পাশ থেকে আঘাত হানছে লুক্কায়িত সৈনিকরা। এই তো দোজখ! এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব নয়। এমনি আঘাত খেতে খেতে তুর্কীরা যখন লখনোর দুর্গে ফিরে এল তখন তাদের মূল বাহিনীর সিকি অংশও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু বিশ্রাম সেখানেও মিলল না—হিন্দুরা দুর্গটি অধিকার করে আবার তাদের পথে বার করে দিল।

নবদ্বীপের প্রতিশোধ এই দিন নেওয়া হয়েছিল। নবদ্বীপ ছিল অরক্ষিত ধর্মনগরী, বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের মুষ্টিমেয় দেহরক্ষী ব্যতীত অন্য কোন সৈনিক সেখানে ছিল না। কিন্তু কাটাসিনের প্রান্তরে আপাদ-মস্তক অস্ত্রসজ্জিত পঁয়ষট্টি হাজার তুর্কী সৈন্য জীবন মরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। তাদের পরিচালিত করেছিলেন স্বয়ং সুলতান তুগ্রাল তুঘান খাঁ। প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁর বিশাল বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মুষ্টিমেয় হিন্দুসৈন্য তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। মুসলমান ঐতিহাসিকরা স্বধর্মীয়দের পরাজয় সহজে স্বীকার করেন না, কিন্তু

মিনহাজ-উস-সিরাজ লিখে গেছেন যে কাটাসিনের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় ঘটে এবং বহু পবিত্র যোদ্ধা শহীদ হয়।

তুর্কী রাজধানী অবরোধ

বীরভূম জেলার লখনোর থেকে তুর্কী রাজধানী লখনৌতির দূরত্ব বেশী নয়। হিন্দু পক্ষের পূর্ব অগ্রগতি অব্যাহত থাকলে কয়েক দিনের মধ্যে তারা সেখানে পৌঁছাতে পারত। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাদের সাময়িকভাবে যুদ্ধ বন্ধ রাখতে হয়; সুলতান তুগ্রাল তুঘান নূতন করে ব্যূহ বিন্যাসের সুযোগ পান। তার ফলে হিন্দুদের অগ্রগতি রুদ্ধ হোলেও তাদের বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণ সুরু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। দুই বৎসর ধরে উভয় পক্ষে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চলতে থাকে। তাতে শেষ জয় হয় হিন্দুদের, তারা তুর্কীদের পিছু ঠেলতে ঠেলতে লখনৌতির প্রবেশদ্বার পর্য্যন্ত চলে আসে। ১২৪৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ওই নগরীর অবরোধ ঘোষণা করা হয়। সুলতান তুগ্রাল তুঘান খাঁ নিজ প্রাসাদে বন্দী হন।

দিল্লীতে তখন সুলতান রাজিয়ার রাজত্বের অবসান হয়েছে, আলাউদ্দীন মাসুদ মসনদে অধিষ্ঠিত। তাঁর কাছ থেকে সাহায্য লাভের আশায় তুগ্রাল দুইজন দ্রুতগামী অশ্বারোহীকে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়, আলাউদ্দীন মাসুদের নির্দেশে অযোধ্যা থেকে মালিক তামার খাঁ সসৈন্যে লখনৌতিতে চলে আসেন। তাঁর আগমনে তুগ্রালী তুর্কীদের মনে আশা জাগে, হিন্দু সৈন্যাধ্যক্ষগণ প্রমাদ গণেন। তাঁরা যেভাবে ব্যূহ বিন্যাস করেছিলেন অবরুদ্ধ তুর্কী রাজধানী কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁদের অধিকারে চলে আসত। কিন্তু তামার খাঁর সম্মুখীন হবার জন্য নূতনতর বাহিনীর প্রয়োজন। তা যখন হাতের কাছে নেই তখন যুদ্ধ চালালে সম্মুখ থেকে তুগ্রাল তুঘান খাঁ ও পিছন থেকে তামার খাঁর সৈন্যরা তাঁদের অবস্থা বিপজ্জনক করে তুলবে। সেই সম্ভাবনা পরিহার করবার জন্য তাঁরা অবরোধ তুলে নিয়ে নিজ সীমান্তের দিকে সরে যান।

এই পশ্চাদপসরণ সত্ত্বেও তুর্কীরা তাঁদের প্রত্যাক্রমণ করতে সাহস পায় নি। অজয়ের দক্ষিণদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ গঙ্গা-রাঢ় বাহিনীর দৃঢ় অধিকারে থেকে যায়। এক বিষাদময় যুগে এরূপ উজ্জ্বল সাফল্যের জন্য যা কিছু গৌরব তা গঙ্গা সম্রাট

নরসিংহদেবের প্রাপ্য। তাঁর সামরিক শক্তি ও অপূর্ব নেতৃত্বের জন্য তুর্কীদের এভাবে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হয়। কিন্তু রাঢ়ীদের অবদানও কম নয়। নদীয়া ও সপ্তগ্রামের অধিপতিরা নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে গঙ্গা সৈন্যদের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিলেন। সম্রাট নরসিংহদেব এই যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক হোলেও রাঢ়ীরা এতে কম গৌরবময় ভূমিকা অভিনয় করে নি।

সুলতান মুঘিসুদ্দীনের জীবন্ত কবর

মুঘিসুদ্দীন উজবক যখন লখনৌতির সুলতান সেই সময়ে গঙ্গা বাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে তুর্কীরা রূপনারায়ণ নদী পর্যন্ত ভূভাগ অধিকার করে নেয়। তার পর উজবক ক্ষিপ্রগতিতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে অযোধ্যা অধিকার করেন। এখন তিনি তিনটি রিয়াসৎ—লখনৌতি, বিহার ও অযোধ্যার অধীশ্বর। দিল্লী তাঁর চাই, কিন্তু তার পূর্বে পূব দিকের তুচ্ছ হিন্দুরাজ্যগুলি অধিকার করা ভাল। সেখানে কোচ, মেচ, বোদো প্রভৃতি কয়েকজন পার্বত্য জাতীয় নরপতি বিচ্ছিন্ন কামরূপের উপর রাজত্ব করছিলেন। এই বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে সম্প্রীতি বিশেষ ছিল না, কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণের সময়ে তাঁরা সংঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতেন।

সুলতান মুঘিসুদ্দীনের রাজ্যের তুলনায় কামরূপ নিতান্তই ক্ষুদ্র—তায় বিচ্ছিন্ন। সেই কারণে ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি নিজের বিরাট বাহিনী নিয়ে পূর্ব দিকে রওনা হোলেন তখন কারও মনে সন্দেহ থাকল না যে সমগ্র কামরূপ তাঁর অধিকারভুক্ত হবে। সুরু থেকে তার লক্ষণও দেখা গেল। এখনকার জলপাইগুড়ি জেলার কোন স্থানে নিজ রাজ্যের সীমান্ত পার হয়ে যখন তিনি কামরূপে প্রবেশ করলেন তখন কেউ তাঁকে বাধা দিল না, যাত্রাপথে কোথাও কোন প্রতিরোধ এল না। একজন সৈন্যেরও জীবন বলি না দিয়ে তিনি কামরূপ রাজধানীতে প্রবেশ করলেন। হিন্দুর রাজধানী—অতএব মন্দিরে মন্দিরে প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লুকানো রয়েছে। মুঘিসুদ্দীনের সৈন্যগণ সারা দিন ধরে মন্দিরগুলি ধ্বংস ও মূর্তিগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করল। নানা স্থানে মাটির নীচে পোতা প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণও তাদের হস্তগত হোল। সমগ্র রাজধানী ইসলামের আস্তানায় পরিণত হয়েছে মনে করে তারা আত্মপ্রসাদ উপভোগ করতে লাগল।

বিনা যুদ্ধে যখন কামরূপ অধিকার করা গেছে তখন আরও পূব দিকে এগিয়ে

গিয়ে আসাম জয় করা কিছু শক্ত হবে না। সেখানকার তথ্য সংগ্রহের জন্য মুঘিসুদ্দীন যে সব গুপ্তচর পাঠালেন তারা সংবাদ নিয়ে এল যে সুখা-ফা (১২২৮-৬৮) আসামে এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছেন—প্রভূত পরিমাণ ধনসম্পদ তাঁর রাজকোষে জমা হয়ে রয়েছে। ওই রাজ্য জয় করলে কুবেরের ঐশ্বর্য্য সুলতানের হস্তগত হবে। এই সংবাদে উৎসাহিত হয়ে মুঘিসুদ্দীন দ্বিগুণ উদ্যমে অভিযানের পরিকল্পনা তৈরী করতে লাগলেন। তাঁর মূল রাজ্য লখনৌতি, বিহার ও অযোধ্যার শাসনকার্য্য কামরূপ থেকে পরিচালিত হোতে লাগল।

সুলতান মুঘিসুদ্দীন মরুভূমির মরীচিকাকে মিষ্ট জলের প্রস্রবণ বলে ভুল করেছিলেন। কামরূপরাজ নিজ রাজধানী ছেড়ে চলে গেলেও আত্মসমর্পণ করেন নি; তাঁর সৈন্যবাহিনী অটুট ছিল। তার উপর গ্রামাঞ্চল থেকে দলে দলে নওজোয়ান এসে সেই বাহিনীকে সম্প্রসারিত করছিল। দুর্গম পার্বত্যাঞ্চলে দিন-রাত ধরে তাদের শিক্ষা দিয়ে তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য তৈরী করা হচ্ছিল। সেই সঙ্গে বহু সৈনিক বণিকের ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করে সমস্ত খাদ্যশস্য দূরদুরান্তরে সরিয়ে ফেলছিল। যুদ্ধ না করেও সমগ্র কামরূপ জয় করে তুর্কীরা এতই আত্মপ্রসাদ উপভোগ করছিল যে এ ধরণের কোন প্রতিরোধ যে আসতে পারে এমন কথা তারা স্বপ্নেও ভাবে নি। তাদের চক্ষুর সম্মুখে গাড়ী গাড়ী শস্য অন্যত্র অপসারিত হতে লাগল—তারা তা দেখেও দেখল না। তার ফলে কিছু দিন পরে তুর্কী শিবিরে খাদ্যাভাব দেখা দিল; খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য সুলতান মুঘিসুদ্দীন গ্রামাঞ্চলে লোক পাঠালেন। কিন্তু কোথায় খাদ্য? তন্নতন্ন করে অন্বেষণ করেও তারা একদিনের খোরাক যোগাড় করতে পারল না। এদিকে বর্ষা নেমেছে, মুষলধারে বারি বর্ষণের ফলে পথঘাট জলে জলময় হয়ে উঠেছে। তুর্কীদের জীবন বিড়ম্বনাময় হয়ে উঠল। তারা ক্ষুধার খাবার পায় না—আবার পথে বার হতেও পারে না।

কামরূপরাজ ঠিক এমনি দিনের অপেক্ষায় বসেছিলেন। তুর্কীদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছে দেখে তিনি পার্বত্য নিবাস থেকে নেমে এলেন, রাজধানীর সকল প্রবেশ পথে তাঁর সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়াল। তুর্কীরাও যুদ্ধ চায়। কিন্তু খালি পেটে যুদ্ধ করে কি ভাবে? অসহায় মুঘিসুদ্দীন তাঁবু গুটিয়ে দেবীকোটের দিকে রওনা হবার আদেশ দিলেন।

বখতিয়ার খিলজী তিব্বত থেকে শ'খানেক হতাবশিষ্ট সৈন্য নিয়ে দেবীকোটে ফিরেছিলেন, কিন্তু মুঘিসুদ্দীনের পক্ষে তাও সম্ভব হোল না। ক্ষুধার জ্বালায় তাঁর সৈন্যরা অবসন্ন হয়ে পড়ছে দেখে তিনি জনৈক হিন্দু প্রদর্শিত এক সংক্ষিপ্ত পথ ধরে লখনৌতির দিকে রওনা হোলেন। তুয়ার্সের সেই পথের উপর দিয়ে এগোতে লাগল তাঁর অর্দ্ধ লক্ষ সৈনিক। কিন্তু বেশ কিছু দূর যাবার পর তিনি দেখেন, একেবারে মৃত্যু বিবরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা এক উন্মুক্ত স্থানে কামরূপ বাহিনী পরিপূর্ণ রণসাজে সজ্জিত হয়ে তাঁর সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করছে। সকল পাহাড়ের শীর্ষভাগেও তারা ব্যূহ বিন্যাস করেছে। হয় আত্মসমর্পণ করো, নতুবা নিপাত যাও। সুলতান মুঘিসুদ্দীন যুদ্ধ করবার জন্য সৈন্যদের প্রতি আদেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের পাহাড় ও ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে তাদের উপর শিলাবৃষ্টির মত তীর বর্ষণ সুরু হোল। কিন্তু তারা নিরূপায়! শত্রু তাদের দৃষ্টির অগোচরে কোন অদৃশ্য স্থান থেকে আঘাত হানছে, অথচ তারা প্রত্যাঘাত করতে পারছে না। তাদের শরাঘাতে অধিকাংশ তুর্কী সৈন্য নিহত হোল, বাকি সকলে আহত হয়ে রণক্ষেত্রে পড়ে রইল। সুলতান মুঘিসুদ্দীন তাঁর সুসজ্জিত রণহস্তীর পিঠে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন, কিন্তু তিনিও শেষ পর্য্যন্ত আহত ও বন্দী হোলেন।

বন্দী অবস্থায় তাঁকে কারাগারে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হোল। কিন্তু আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় তিনি মৃত্যুর দিকে এগোতে লাগলেন। তাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত হোলে শেষ ইচ্ছা জানতে চাওয়ায় তিনি পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনা প্রকাশ করেন। বন্দী পুত্র পাশের কক্ষেই ছিল। সেখান থেকে তাঁকে সুলতানের কাছে আনা হোলে তিনি তার মুখের উপর মুখ রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১ নগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব, সেনরাজগণের বংশ পরিচয়

2. Minhaj-us-Siraj *Tabakat-i-Nasiri*, *Tabakat XXI*

3. Ghulam Husain Salim *Riyaz-us-Salatin, trans, Abdus Salam,* *P. 84-85*

পঞ্চম অধ্যায়

নিদ্রিত প্রতিবেশী

মুঘিস্থদ্দীন উজবক ছিলেন প্রথম তুর্কী যুগের সব চেয়ে শক্তিমান স্থলতান। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে অযোধ্যা থেকে পূর্বে পদ্মা নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি কামরূপে পরাজিত হওয়ায় তুর্কীদের অপরাজেয়তার খ্যাতি ধুলিসাৎ হয়ে যায়। তাঁর মত শক্তিশালী স্থলতান যদি ক্ষুদ্র কামরূপে গিয়ে পরাজিত হন তা হোলে ভারতের সর্বত্র যে সব পরাক্রান্ত হিন্দু রাজ্য রয়েছে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন কি করে? কামরূপের ওপারে আসাম। সেখানে স্থখা-ফা একই সময়ে যে অহম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ভবিষ্যৎকালে কি তুর্কী কি মোগল কোন মুসলমান শক্তি তাকে পদানত করতে পারে নি। প্রতাপ সিংহ যখন আসামের অধীশ্বর তখন জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের নির্দেশে মোগল ফৌজ বারবার ওই রাজ্য আক্রমণ করে, কিন্তু প্রতিবারই শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ঔরঙ্গজেবের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি মীর জুমলা বিশাল অভিযাত্রী বাহিনী নিয়ে আসাম থেকে রিক্ত হস্তে ফিরে আসেন। ত্রিপুরায়ও তুর্কীরা কোন দিন স্থবিধা করতে পারে নি। সেখানকার রাজপুত্র রত্ন-ফা গৌড়েশ্বর তুগ্রাল তুঘানের সাহায্য নিয়ে পিতৃ রাজ্যের উপর নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করলেও তিন শতাব্দী পরে হোসেন শাহ্‌র পূর্বে গৌড়ের কোন স্থলতান ওই রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস পান নি। বরং বঙ্গ তুর্কীদের অধিকারভুক্ত হোলে বিক্ষুব্ধ ত্রিপুরী সৈন্যগণ মাঝে মাঝে সেখানে এসে লুঠতরাজ চালায়। হোসেন শাহ্ চার চার বার ওই রাজ্য আক্রমণ করে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। বন্দর চট্টগ্রাম তুর্কী, ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

উড়িষ্যার কথা কি বলব? সমগ্র পূর্ব ভারতে এই একটি রাজ্য শুধু যে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত করেছিল তা নয়, বারবার তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ চালিয়েছে। উড়িষ্যার উত্তর সীমান্তে গঙ্গা বাহিনী কি ভাবে তুর্কীদের পিছনে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে তাদের রাজধানী লখনৌতি পর্য্যন্ত চলে এসেছিল সে কথা পূর্বে বলেছি। তার পরও তুর্কীদের সঙ্গে উড়িষ্যার বহু বার যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু আক্রমণকারীরা কোন দিনই সুবিধা করতে পারে নি।

সেই দুর্য্যোগের দিনে শত্রুর সম্মুখীন হবার জন্য সমস্ত গঙ্গা সাম্রাজ্যকে এক সামরিক শিবিরে পরিণত করা হয়। সম্রাটের নির্দেশে সকল স্বাস্থ্যবান যুবক সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করে যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত থাকত। সে সময়ে উড়িষ্যার সর্বত্র যে দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী নির্মাণ করা হয়েছিল বিস্তীর্ণ তুর্কী সাম্রাজ্যের কোথাও তার তুলনা ছিল না। এরূপ ১১৯টি দুর্গের বিবরণ আবুল ফজল আলামি তাঁর আইন-ই-আকবরীতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এখনকার মেদিনীপুর ও বালেশ্বরের অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত জলেশ্বর জেলায় ৩১টি দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে উত্তরের দুর্গ তমলুক ছিল প্রস্তর নির্মিত, মেদিনীপুরের ২টি দুর্গ ইষ্টক নির্মিত হোলেও ছিল দুর্ভেদ্য।

উড়িষ্যার ওপারে দারসমুদ্রের হয়শালা রাজগণ সমগ্র দাক্ষিণাত্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। মহম্মদ ঘোরী ও বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণের সময়ে হয়শালারাজ বীর বল্লাল (১১৭৩-১২২০) সমগ্র মহীশূর এবং অন্ধ্র ও তামিল-নাদের বৃহদাংশের উপর রাজত্ব করছিলেন। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে মালাবার উপকূল ও দক্ষিণে মাদুরা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর সৈন্য বাহিনীর ভয়ে প্রতিবেশীরা সশঙ্কিত থাকত।

রাজস্থানের সকল রাজ্যই ছিল স্বাধীন। এখানকার বিভিন্ন নরপতির পরাক্রমের কথা স্মরণ করে তুর্কীরা তাদের রাজ্যগুলি আক্রমণ করতে সাহস পেত না। পৃথ্বিরাজের কাছ থেকে অধিকার করা আজমীঢ় এই প্রান্তে হয়ে থাকে তাদের শেষ সীমান্ত। প্রায় এক শতাব্দী পরে আলাউদ্দীন খিলজী (১২৯৬-১৩১৬) চিতোর ধ্বংস করলেও সমগ্র মেবার অজেয় থেকে যায়। তাঁর বিজয়-বাহিনী দক্ষিণে দেবগিরি ও পশ্চিমে গুজরাট পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল বটে, কিন্তু

তা একেবারেই সাময়িক। বিজিত রাজ্যগুলির সর্বত্র তুর্কীদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান হয়।

তুর্কী অধিকারের অভ্যন্তরভাগেও কোন দিন শান্তি ছিল না। তাদের প্রথম আগমনের সময়ে প্রায় কোন দুর্গাধ্যক্ষই বিনা যুদ্ধে নিজ দুর্গ তাদের হাতে তুলে দেন নি। রনথম্ভোর, গোয়ালিয়ার, রোহ্‌টাস প্রভৃতি দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি জয় করবার জন্য অসংখ্য তুর্কীর জীবন বলি দিতে হয়েছিল। কাংড়ার ন্যায় কতকগুলি দুর্গ তারা কোন দিনই জয় করতে পারে নি। তুর্কী অধিকারের ভিতর সেগুলি স্বাধীন দ্বীপের মত বিরাজ করত।

বিক্ষিপ্তভাবে হোলেও ভিতর থেকে সামরিক প্রতিরোধ বড় কম হয় নি। হিন্দু ক্ষৌরকারপুত্র তিলকের কর্মতৎপরতার ফলে সুলতান মামুদের বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়, তিলক মামুদপুত্র মাসুদের ছিন্ন মস্তক তাঁর অগ্রজের কাছে মধ্য এশিয়ার মার্ভ নগরীতে পাঠিয়ে দেন। দিল্লী বিজয়ী মহম্মদ ঘোরীর আততায়ী ছিলেন গক্কড় সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু। মিন্‌হাজ বলেন, সুলতান রাজিয়া ও তাঁর সদ্য বিবাহিত স্বামী মালিক আলতুনিয়াকে হত্যা করেছিল বিধর্মী হিন্দু (১২৪০, অক্টোবর)।

দেশময় যে সব শক্তিশালী রাজ্য ছিল সেগুলি একত্রিত হোলে তুর্কী সাম্রাজ্য বালির বাঁধের মত ভেঙে পড়ত। কিন্তু কেউ তাদের সংঘবদ্ধ করবার চেষ্টা করে নি—বিদেশীদের বিরুদ্ধে কোন যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত হয় নি। গোড়ার দিকে সে দায়িত্ব ছিল মুখ্যতঃ গৌড়েশ্বর বিশ্বরূপসেন ও তাঁর ভ্রাতা মাধবসেনের ; কারণ, তাঁরা রাজধানী ছেড়ে চলে গেলেও তাঁদের সামরিক বল অটুট ছিল। রাজ্যেরও অধিকাংশ অক্ষুন্ন ছিল। সমগ্র দেশের স্বাধীনতার জন্য না হোলেও নিজেদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তুর্কী বিরোধী শক্তিগুলিকে সংঘবদ্ধ করলে তাঁরা লাভবান হোতেন। কিন্তু সেরূপ কোন উদ্যম না দেখানর ফলে এক দিন যখন সেনবংশের উপর শেষ আঘাত এল তখন তাঁরা বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গেলেন !

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইসলামের দুষমন চেঙ্গিজ খাঁ

মোঙ্গলিয়ায় বিস্ফোরণ

ইসলামের পতাকা হস্তে তুর্কীরা যখন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিরুদ্ধে জেহাদ চালাচ্ছিল সেই সময়টি ছিল মুসলমানদের সুদীর্ঘ ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটময় সময়। মোঙ্গলিয়ার তাতারগণ তখন হঠাৎ প্রাণচঞ্চল হয়, তাদের রণদামামার আওয়াজে এশিয়া ও ইওরোপের আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। বখতিয়ার খিলজী যখন তিব্বত অভিযানের জন্য তৈরী হচ্ছিলেন সেই সময়ে কৃষ্ণ তাতারদের নেতা তমুরচি সমগ্র মোঙ্গলিয়া জয় শেষ করে নূতনতর অভিযানের পরিকল্পনা তৈরী করছিলেন। মোঙ্গলদের বরাহ বৎসরে (১১৫৫) দুলুন-বোলদাঘ জেলায় উনন নদীর তীরে তমুরচির জন্ম হয়। তাঁর পিতা ইয়াসুকা বাহাদুর ছিলেন কৃষ্ণ তাতারদের তাইমুখ শাখার সর্দার। বৌদ্ধ শামানপন্থী এই তাতারগণ প্রতিবেশী খৃষ্টান করাইত ও অন্যান্য কৃষ্ণ তাতার অপেক্ষা সর্ব বিষয়ে উন্নত ছিল। তাদের সংঘবদ্ধ করে ইয়াসুকা বাহাদুর সকল কৃষ্ণ তাতারকে নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনেন। কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে এই কর্তৃত্বের অবসান হয় এবং বালক তমুরচি তাঁর জননী উলন-কুজিনের কাছে মানুষ হন। জননীর প্রেরণা তাঁকে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

লেখাপড়া তিনি জানতেন না—কোন তাতারই জানত না। কিন্তু রণবিদ্যা ভাল করে আয়ত্ত করে পিতার মত আর একবার কৃষ্ণ তাতারদের সংঘবদ্ধ করবার জন্য উদ্যোগী হন। তাতে বাদ সাধলেন তাঁর অগ্রা—মাতার দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত পুত্র—জামুকা। উলন-কুজিন বহু চেষ্টা করলেন জামুকাকে নিরস্ত করবার জন্য, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। অগত্যা যুদ্ধক্ষেত্রে তাকে

পরাজিত করে তমুরচি শুধু কৃষ্ণ তাতাদের নয়, সমগ্র পূর্ব মোঙ্গলিয়ার অধীশ্বর হয়ে বসেন। তারপর পশ্চিম মোঙ্গলিয়া জয় শেষ করে তিনি সকল উপজাতির সর্দারদের এক কুরুলতাই আহ্বান করেন। সেখানে সকলে তাঁকে একবাক্যে কঙ্গন বলে স্বীকার করে এবং শামানপন্থীদের উচ্চতম পুরোহিত কর্তৃক তিনি চেঙ্গিজ খাঁ বা দ্যুলকপুত্র উপাধিতে ভূষিত হন। তখন তাঁর বয়স ৫১ বৎসর।

তারপর থেকে সুরু হয় বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর দিগ্বিজয়। মোঙ্গলিয়ার পূর্ব প্রান্তে তেঙ্গুত ও শিয়া রাজ্য চেঙ্গিজের অশ্বারোহীদের প্রচণ্ড আঘাতে তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। তার ওপারে উত্তর চীনের কিন সাম্রাজ্য। দীর্ঘ অবরোধের পর সেখানকার রাজধানী পিকিং চেঙ্গিজের হস্তগত হয় এবং সদ্য আবিষ্কৃত বারুদের প্রস্তুত ও ব্যবহার প্রণালী তিনি শিখে নেন। সে সময়ে দক্ষিণ চীনের সুং রাজগণ তাঁকে সাহায্য করলেও তাঁর উত্তরপুরুষরা তাঁদের রেহাই দেন নি, তাঁরা সুং শক্তিকে পরাজিত করে সমগ্র চীন সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসেন। উত্তরে মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়া এবং দক্ষিণে তিব্বতেও চেঙ্গিজের অধিকার প্রসারিত হয়। শেষোক্ত দেশে নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করবার পরিবর্তে তিনি সেখানকার প্রধান বৌদ্ধ আচার্য্যের হাতে রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করে তাঁকে উপাধি দেন দালাই লামা—সমুদ্রের ন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন বৌদ্ধ শ্রমণ।

ইসলামের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

খোয়ারজিম শাহ আলাউদ্দীন মহম্মদ তখন মধ্য-এশিয়ার অধীশ্বর। কয়েক বৎসর পূর্বে দিল্লী বিজয়ী মহম্মদ ঘোরীকে পরাজিত করে তিনি ঘোর সাম্রাজ্যের উত্তরার্দ্ধ অধিকার করে নিয়েছিলেন। তার পর ইরাণ ও ইরাকের কতকাংশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁর রাজ্য উত্তরে সিরদরিয়া থেকে দক্ষিণে তাইগ্রিস নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁকে আঘাত করবার ইচ্ছা চেঙ্গিজের ছিল না, কিন্তু তিনি দু' দুবার তাঁর দূতকে নিহত করায় সুপ্ত সিংহ জেগে ওঠে। মোঙ্গলদের স্বর্ণবাহিনী তাঁর সাম্রাজ্য আক্রমণ করলে তিনি তাদের প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়ে পিছু হটতে থাকেন। তাঁর রাজধানী সমরখন্দ চেঙ্গিজের হস্তগত হয়, মোঙ্গল সৈন্যরা অসংখ্য মুসলমান অধিবাসীকে আমুদরিয়া নদীর জলে ডুবিয়ে মারে।

অসহায় আলাউদ্দীন মহম্মদ গজনীতে চলে এলে মোঙ্গলরা সেখানেও তাঁর অনুসরণ করে। এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের শেষ অধ্যায়ে আলাউদ্দীন মহম্মদের মৃত্যু হোলে তাঁর পুত্র জালালুদ্দীন মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান, কিন্তু তিনিও পিছু হটতে হটতে ১২১৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর কাছাকাছি এসে সুলতান সামসুদ্দীন আলতামাসের কাছে সাময়িক আশ্রয় ভিক্ষা করে দূত পাঠান। কাফের বিতাড়িত স্বধর্মীয়কে সাহায্য দানের পরিবর্তে আলতামাস সেই দূতকে হত্যা করে আশ্রয়প্রার্থী সুলতানকে জানান, দিল্লীর আবহাওয়া তাঁর স্বাস্থ্যের অনুকূল হবে না—তিনি যেন অন্য কোথাও গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

অন্য সীমান্তেও চেঙ্গিজ খাঁ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। ১২২১ খৃষ্টাব্দে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ওকতাই খাঁ গজনী অধিকার করে সকল অধিবাসীকে হত্যা করেন। নগরীর বাড়ীগুলিকে তিনি এমনভাবে ভেঙ্গে ফেলেন যে এক শ' বৎসর পরে পরিব্রাজক ইব্‌ন বতুতা সেখানে গিয়ে ধ্বংসস্তূপ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন নি। সেই ধ্বংসের ফলে সুলতান মামুদের রাজধানীর অবস্থান সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা কোন দিন সম্ভব হয় নি। অসংখ্য মসজিদ, মিনার ও মাদ্রাসাকে ভেঙ্গে মোঙ্গলগণ ধূলিসাৎ করে দেয়। ইরাকের তাইগ্রিস উপত্যকায় যে প্রাচীন সেচ প্রণালী ছিল তা বিধ্বস্ত করে এক শস্যশ্যামলা জনপদকে ঊষর মরুতে পরিণত করে।

স্বয়ং খলিফাকে পর্য্যন্ত তারা রেহাই দেয় নি। হালাকু খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গল সৈন্যগণ ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বাগদাদ অধিকার করে খলিফা আল-মুস্তাসিন বিল্লাকে সপরিবারে হত্যা করে। তারপর আরও অগ্রসর হয়ে দামাস্কাস জয়ের পর মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করে খৃষ্টানদের হাতে সমর্পণের পরিকল্পনা হালাকুর ছিল, কিন্তু মোঙ্গলিয়ায় কঙ্গনের মৃত্যু হওয়ায় তাঁকে সেখানে চলে যেতে হয়।

সুলতান রাজিয়ার মৃত্যুর পর ১২৪০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বহরম শাহ্ যখন দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন সেই সময়ে মোঙ্গলরা আবার ভারতে এসে আবির্ভূত হয়। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ তখন দিল্লীতে উপস্থিত। তিনি বলেন: বিধর্মী মোঙ্গলদের এক সৈন্যবাহিনী খোরাসান ও গজনী থেকে রওনা হয়ে লাহোরের তোরণদ্বারে এসে উপস্থিত হয়। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ নিরর্থক বুঝে

নগররক্ষী কারাকাস খাঁ রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সকল সৈন্যসহ দিল্লীর দিকে রওনা হন। শত্রু কিছু দূর তাঁর অনুসরণ করে বটে, কিন্তু তিনি শেষ পর্য্যন্ত নিরাপদে গন্তব্যস্থানে উপনীত হন। সেই ঘৃণ্য মোঙ্গল কাফেরগণ ৬৩৯ হিজিরাব্দের ১৮ই জুমাদা-ই-আখির, সোমবার (১২৪৮, ডিসেম্বর) লাহোর অধিকার করে সকল মুসলমানকে হত্যা করে।

এই ভীষণ সংবাদ দিল্লীতে পৌছালে ভীতসন্ত্রস্ত সুলতান বহরম শাহ্ মিনহাজকে অনুরোধ করেন তিনি যেন আল্লার কাছে প্রার্থনা জানান। একটি সৈন্যদলও লাহোরের দিকে পাঠান হয়, কিন্তু শতদ্রু তীরে পৌছে সুলতানের উজীর মোঙ্গলদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার পরিবর্তে তুর্কীদের চিরন্তন স্বভাব অনুযায়ী নিজ প্রভুকে অপসারণের জন্য চক্রান্ত সুরু করেন। তাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে মোঙ্গলরা নির্বিবাদে দিল্লীতে আসতে পারত, কিন্তু হিন্দুস্থান তাদের বিজয় তালিকার বাইরে ছিল বলে লাহোর ছেড়ে স্বদেশের দিকে রওনা দেয়।

চেঙ্গিজের ধর্মমত

খাঁ কথাটি তখন মুসলমান পদবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। চেঙ্গিজ খাঁ মুসলমান ছিলেন না। স্বদেশে প্রচলিত শামান মতে তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। মিনহাজ-উস-সিরাজসহ সমসাময়িক সকল মুসলমান লেখক শামানদের পৌত্তলিক এবং চেঙ্গিজ ও তাঁর স্বর্ণবাহিনীকে 'ঈশ্বরের অভিশাপ', 'পাপাশয়' 'রক্ত পিপাসু কাফের' বলে উল্লেখ করেছেন বটে কিন্তু শামান শব্দটি আসলে বৌদ্ধ শ্রমন শব্দের অপভ্রংশ। শামানগণ মহাযানপন্থী বৌদ্ধদের একটি শাখা ব্যতীত আর কিছুই নয়। মহাযানপন্থীরা শূন্যবাদী—শামানরাও তাই। অনন্ত ব্যোমের উপাসনা করা ছিল তাদের ধর্মীয় রীতি। তাদের মন্দিরে শোভা পেত বুদ্ধের এক রূপ—নাগাই। আজও সোভিয়েট রুশিয়ায় কালমুক নামে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়টি আছে তারা শূন্য ব্যোমের উপাসনা করে। এই কালমুকগণ মোঙ্গলদের একটি শাখা—রুশিয়ায় একমাত্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা অন্যান্য সম্প্রদায়ের সংস্পর্শ পরিহার করে নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে—আজও করে।

চেঙ্গিজ খাঁর সময়ে তিব্বতে প্রচলিত বৌদ্ধ মতের সঙ্গে শামান মতের যথেষ্ট

সাদৃশ্য ছিল। তিব্বতী বৌদ্ধ যতিদের চেঙ্গিজ সম্যক শ্রদ্ধা করতেন। দালাই লামা পদটি তাঁর সৃষ্টি। তিব্বত জয় করলেও ওই ধর্মরাজ্যে তিনি নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন নি। তাঁর গুরু চ্যাং-স্থন ছিলেন চীনের এক শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য লোককে হত্যা করলেও এই গুরুকে তিনি দেবতার মত ভক্তি করতেন।

শামান মতে অটল আস্থা থাকলেও অন্য ধর্মমতের প্রতি চেঙ্গিজ অশ্রদ্ধা দেখাতেন না। নিজ বিচারবুদ্ধির ভিত্তিতে জাতিকে পরিচালনার জন্য যে মূল্যবান ইয়াসাগুলি তিনি প্রচলিত করেন তার মধ্যে ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার কোন স্থান ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁর অভ্যুদয়ের ফলে বৌদ্ধ ধর্ম দীর্ঘ পাঁচ শত বৎসর পরে মধ্য-এশিয়ায় নূতন জীবন লাভ করে। সেই কারণে বৌদ্ধদের চক্ষে তিনি বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি

সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিকগণ চেঙ্গিজকে জঘন্য মুসলমান বিদ্বেষী রক্তপিপাসু শয়তান রূপে চিত্রিত করলেও স্বদেশীয়দের চক্ষে তিনি ছিলেন নররূপী দেবতা। মার্কো পোলো তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যে দীর্ঘ ২৬ বৎসর অবস্থান করে লিখে গেছেন যে সংশয়াতীত সততা, প্রগাঢ় প্রজ্ঞা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও অনন্যসাধারণ শৌর্য্যে চেঙ্গিজের কোন তুলনা ছিল না। এরূপ ন্যায়নিষ্ঠা ও মাধুর্য্যময় ব্যবহার দিয়ে তিনি রাজ্য শাসন সুরু করেন যে প্রজাসাধারণ তাঁকে শুধু শাসকরূপে মান্য করত না—দেবতারূপে শ্রদ্ধা করত। তাঁর বহুমুখী গুণের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লে বিচ্ছিন্ন তাতার সম্প্রদায়গুলি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেয়।

সব মুসলমান ঐতিহাসিক যে কৃষ্ণ মসীতে চেঙ্গিজের চরিত্র অঙ্কিত করেছেন তা নয়। ঐতিহাসিক আলাউদ্দীন আতা-মালিক জুভাইনি তাঁর 'পৃথিবী বিজয়ীর কাহিনী' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে লিখেছেন যে চেঙ্গিজ খাঁ ধর্মমত নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামাতেন না, ধর্মান্ধতা তাঁর মধ্যে আদৌ ছিল না। এক ধর্ম অন্যের অপেক্ষা উন্নততর মনে করা তাঁর অভ্যাস ছিল না। সকল ধর্মের সাধুদের প্রতি সমান সম্মান দেখাতেন। পৌত্তলিক বৌদ্ধদের প্রতি তাঁর যতখানি অনুরাগ ছিল

মুসলমান ও খৃষ্টানদের প্রতিও ততখানি ছিল। তাঁর ইয়াসাগুলিতে সকল ধর্মের প্রতি সমান মর্য্যাদা দানের নির্দেশ আছে। পুত্র-পৌত্রদের নিজ নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মমত গ্রহণের অধিকার তিনি দিয়েছিলেন।

চেঙ্গিজ শুধু দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, আইন রচয়িতা, জাতিসংগঠক ও গণতন্ত্রী। তাঁর রচিত ইয়াসাগুলি পড়লে বোঝা যায় এই নিরক্ষর নায়কের কাছ থেকে কী দুর্দম প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মোঙ্গল কৃষকগণ রুদ্রমূর্তিতে সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপের বুকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর ইয়াসাগুলি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করায় মোঙ্গলদের মধ্যে সকল প্রকার সামাজিক বৈষম্যের অবসান হয়—বড় বড় জেনারেলরা যে মর্য্যাদা পেতেন সাধারণ সৈনিকও তাই পায়। আতা-মালিক বলেন : তিনি সকল প্রকার আড়ম্বর বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে মোঙ্গল নায়করা জনসাধারণের জীবনযাত্রায় অতিরিক্ত নির্লিপ্ততা দেখান না; আবার কাউকে দূরে সরিয়েও রাখেন না। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কোন লোক কোন পদবী ধারণ করেন না। কেবলমাত্র সম্রাট সিংহাসনে আরোহণের পরে 'খাঁ' বলে পরিচিত হন, কিন্তু তাঁর পুত্র বা ভ্রাতাগণ ভূমিষ্ঠ হবার সময়ে যে নাম পেয়েছিলেন সেই নামে আজীবন অভিহিত হন।

উদ্বাস্তুদের নবজীবন লাভ

মোঙ্গলদের এই বিরাট অভ্যুত্থানের ফলে তুর্কীস্থান থেকে দলে দলে মুসলমান ভীতসন্ত্রস্ত মনে আশ্রয়ের সন্ধানে বিভিন্ন দেশে চলে যায়। যারা পশ্চিমে গিয়েছিল তারা ইরাণ ও আর্মেনিয়া পার হয়ে এশিয়া মাইনরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সেখান থেকে এই অটোমান তুর্কীগণ দার্দেনেলিস প্রণালী অতিক্রম করে গ্রীস, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়ায় লুঠতরাজ চালায়। তাদের অত্যাচারে সমগ্র বলকান উপদ্বীপ বিধ্বস্ত হয়। ধীরে ধীরে তারা খৃষ্টানদের কোণঠাসা করে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য স্থাপন করে। দুই শতাব্দী পরে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে অটোমান সুলতান মহম্মদ ইউরোপের দিক থেকে আক্রমণ চালিয়ে কনস্ট্যান্টিনোপল নগরী অধিকার করে নিলে পূর্ব্ব-রোমান সাম্রাজ্যের আয়ু শেষ হয়ে যায়।

মোঙ্গল বিতাড়িত এই অটোমান তুর্কীদের অন্য কয়েকটি দল ভারতে আসে। বলকান উপদ্বীপে তাদের স্বগোত্রীয়গণ যেরূপ ত্রাসের সঞ্চার করেছিল নানা

কারণে এ দেশে তা সম্ভব হয় নি, কিন্তু তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে বখতিয়ার খিলজীর সহকর্মী আলী মর্দান খিলজী কি ভাবে দিল্লীতে কুতুবউদ্দীন আইবেকের মনে ভীতির সঞ্চার করেছিলেন সে কথা পূর্বে বলেছি। তাদের বলে বলীয়ান হয়ে হৃতসর্বস্ব আলী মর্দান লখনৌতিতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

গৌড়ের দ্বারপ্রান্তে চেঙ্গিজ বাহিনী

দেখতে দেখতে পূর্ব দিকে প্রশান্ত মহাসাগর থেকে পশ্চিমে পোলাণ্ড ও দামাস্কাস পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল অঞ্চলের উপর মোঙ্গলদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোল। এই দিগ্বিজয়ের পিছনে ছিল অপূর্ব নেতৃত্ব ও অনন্যসাধারণ সামরিক পরিকল্পনা। গিবন বলেন, কোন দেশ আক্রমণের পূর্বে মোঙ্গলরা সেখানে কর্মনিপুণ গুপ্তচর পাঠাত এবং তাদের রিপোর্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে তারপর আক্রমণ সুরু করত। চেঙ্গিজের প্রধান মন্ত্রী চ্যাং-ফেঙের নির্দেশে ভারতবর্ষকে তাঁর অভিযান তালিকার বাইরে রাখা হয়েছিল বলে এই দেশ তাঁর দুর্দ্ধর্ষ ফৌজের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়, কিন্তু সীমান্ত অঞ্চলে যে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ আসত না তা নয়। খোয়ারজিম শাহ্‌র অনুসরণ করে মোঙ্গলরা সর্বপ্রথমে ভারতের সিন্ধু নদীর তীরে আসে। তারপরও মাঝে মাঝে এসে এদেশে আবির্ভূত হোলেও কোন অঞ্চল জয় করে নি।

তুগ্রাল তুঘান খাঁ যখন গৌড়ের অধীশ্বর সেই সময়ে ১২৪৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কিছু সংখ্যক মোঙ্গল যোদ্ধা লখনৌতির উপকণ্ঠে এসে আবির্ভূত হয়। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজ তখন ওই নগরীতে উপস্থিত। তাঁর বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ তবকাত-ই-নাসিরীতে তিনি লিখেছেন : ৬৪২ হিজিরাব্দে শাওয়াল মাসে (১২৪৫, মার্চ) চেঙ্গিজ খাঁর কাফেরগণ লখনৌতির নগরদ্বারে এসে উপস্থিত হয়। তারা কেন এবং কোন পথ দিয়ে এসেছিল এবং কেনই বা রিক্ত হস্তে ফিরে গেল একথা সেই যশস্বী ঐতিহাসিক লেখেন নি। সেই কারণে ইতিহাসের একখানি লুপ্ত পৃষ্ঠা চির দিনের মত লোপ পেয়েছে।

কহ্লনের রাজতরঙ্গিণীর পর তবকাত-ই-নাসিরীর মত সুসম্পূর্ণ ইতিহাস গ্রন্থ সে যুগে প্রকাশিত হয় নি। এরূপ একখানি অমূল্য গ্রন্থে এই বিরাট শূন্যতা উত্তরকালে সকল দেশের সকল ঐতিহাসিককে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ করেছে। আলোচ্য

সময়ে গঙ্গা সম্রাট নরসিংহদেবের সৈন্যবাহিনী লখনৌতির দিকে এগিয়ে আসছিল। গুপ্তচর মুখে এই সংবাদ পাঞ্জাব বা অন্য কোথাও মোঙ্গল শিবিরে পৌঁছালে গঙ্গা বাহিনীকে প্রেরণা যোগাবার জন্য চেঙ্গিজ কি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এক রেজিমেণ্ট সৈন্য লখনৌতিতে পাঠিয়েছিলেন? আবার এমনও হতে পারে যে সম্রাট নরসিংহদেব মোঙ্গলদের কাছে সাহায্য চাওয়ায় বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ সেই রেজিমেণ্ট লখনৌতিতে এসেছিল। সঠিক করে কিছুই বলা যায় না।

চেঙ্গিজের স্বর্ণবাহিনীর গতিরোধ করবার মত শক্তি তুর্কীদের ছিল না—কোন পার্থিব শক্তির ছিল না। বিরাট হিমবাহের মত দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে তারা সব কিছুকে সমভূমিতে পরিণত করত। ভারতের সদ্য প্রতিষ্ঠিত তুর্কী রাজ্যগুলি ভীতবিহ্বল নেত্রে এই মহা ঝঞ্ঝাকে নিরীক্ষণ করল, হিংস্র ব্যাঘ্রকে সম্মুখে দেখে মেষশিশু যে ভাবে কাঁপতে থাকে তারা তেমনি ভাবে কাঁপতে লাগল, কিন্তু কোন ভারতীয় নরপতি তাদের এই বিপদের সুযোগ গ্রহণ করলেন না। গৌড়েশ্বর কেশবসেন তাঁর নদীবেষ্টিত নূতন রাজধানীতে বসে মোঙ্গল বিস্ফোরণের কথা শুনলেন, কিন্তু এ থেকে লাভবান হবার জন্য কোন আগ্রহ দেখালেন না। তার ফলে তুর্কীদের পিতৃভূমি মোঙ্গলদের কবলে চলে গেলেও মূলহীন তরু গৌড়ের উর্বর মাটিতে ফলে ফুলে বেড়ে উঠতে লাগল!

1. N. Edmonstone N. B. *History of Jengiz Khan, translated from French by M. Petis de la Croise, p. 6*
2. Muhammad bin Ahmed al Nessa *Sirat-i-Jalaluddin Mankburni, p. 410-13*
3. Wells H. G. *History of the World, 213*
4. Minhaj-us-Siraj *Tabakat-i-Nasiri, Tabakat XXI-5*
5. Alauddin Ata-Malik Juvaini, *History of the World Conqueror, trans. by A. Boyle, p. 25*
7. Conze E. *Budhism, its essence and development, p. 75*
8. *Travels of Marco Folo, Marsden's trans, p. 86*
9. Gibbon E. *Decline and Fall of Roman Empire Vol. II, p. 213*

সপ্তম অধ্যায়

বঙ্গের উপর ব্রহ্ম অধিকার

বর্মী-মোঙ্গল যুদ্ধ

গৌড়ে এই বিশৃঙ্খলার সময়ে ব্রহ্মরাজ যে বঙ্গের উপর নিজ অধিকার প্রসারিত করেছিলেন মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পোলো লিখছেন: ১২৭২ খৃষ্টাব্দে কুবলাই খাঁ বোচাং ও কারাজান রাজ্য রক্ষার জন্য একটি সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে দেন। রাজ্য, ঐশ্বর্য্য ও প্রজাসংখ্যায় সমৃদ্ধ মিয়েন* ও বাংলার অধীশ্বর যখন শুনলেন যে একটি তাতার ফৌজ বোচাংএ এসে পৌঁছেছে তখন তাদের আক্রমণ করবার জন্য উত্তর দিকে অগ্রসর হোলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে বৃহৎ সৈন্যবাহিনী সন্নিবেশিত করেন তাতে বারো থেকে ষোলজন পর্য্যন্ত সৈন্য বহনে সক্ষম বহু হস্তী ছিল। সেই হস্তীযূথ সমন্বিত অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীসহ তিনি বোচাংএর পথে রওনা হোলেন। কুবলাই খাঁর ফৌজ তখন সেই রাজ্যে অবস্থান করছিল।

কুবলাইয়ের সেনাপতি নেসতারদিন যখন শুনলেন যে মিয়েনরাজ তাঁর বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন তখন তিনি মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন, কারণ মিয়েন বাহিনীতে যেক্ষেত্রে হস্তীযূথ ছাড়া ১৪ হাজার সৈনিক ছিল তিনি সেক্ষেত্রে নেতৃত্ব করছিলেন পদাতিক ও অশ্বারোহী মিলিয়ে ১২ হাজার সৈনিকের। কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন নি, অফিসারদের এই বলে উৎসাহ দিতে লাগলেন যে মিয়েন ও বাংলার সৈনিকরা কাঁচা মাল দিয়ে তৈরী, যুদ্ধবিদ্যায় একেবারেই অনভিজ্ঞ; পক্ষান্তরে মোঙ্গল ফৌজের নাম শুনলে বিশ্ববাসীর মনে হৃৎকম্পের সৃষ্টি হয়।

*মিয়েন—ব্রহ্মদেশ

শত্রু ফৌজ যখন শুনল যে তাতারগণ পাহাড় থেকে অবতরণ করে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সমভূমিতে এসে আবির্ভূত হয়েছে তখন এগিয়ে এসে তাদের এক মাইলের ভিতর শিবির সন্নিবেশিত করল। তাদের সম্মুখে প্রশস্ত প্রান্তর, পশ্চাতে গভীর অরণ্য। এক দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ সুরু হোলে তাতারদের অশ্বগুলি শত্রুর হস্তীযূথ দেখে রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতি সৈন্যাধ্যক্ষ নেসতারদিন অশ্বারোহীদের প্রতি আদেশ দিলেন তারা যেন নিজ নিজ বাহন থেকে অবতরণ করে সেগুলিকে পিছনের জঙ্গলে পাঠিয়ে দেয়। যথা আজ্ঞা তথা কাজ! কয়েকজন সৈনিক ঘোড়াগুলিকে গভীর জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে গাছের ডালে বেঁধে ফেলল, সেগুলির পিঠে আরূঢ় সৈনিকরা মাটিতে নেমে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে যুদ্ধ চালাতে লাগল।

হস্তী বাহিনী নিয়ে মিয়েন ও বাংলারাজ যে সুবিধা পাচ্ছিলেন শেষ পর্য্যন্ত তা থাকল না। তাতারদের শরাঘাতে জর্জরিত হয়ে হস্তীগুলি পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত স্বপক্ষীয় সৈনিকদের উপর গিয়ে পড়ায় শত্রুব্যূহে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল; মাহুতরা সাধ্যমত চেষ্টা করেও সেগুলিকে সংযত করতে পারল না। তাই দেখে তাতাররা তাদের অশ্বগুলিকে জঙ্গল থেকে বাইরে এনে নূতন উদ্যমে যুদ্ধ সুরু করল। শৃঙ্খলা পুরাপুরি অক্ষুণ্ণ রেখে তাদের অশ্বারোহীরা পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধরত সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দিলে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের গতি পাল্টে গেল।

রাজার সৈনিকদের ভিতর শৌর্য্যের কোন অভাব ছিল না। কিন্তু তারা তাতারদের জঙ্গল থেকে আরও দূরে যাবার সময় না দেওয়ায় তাদের পক্ষে ঘোড়াগুলি লুকিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। তার উপর ধনুর্বিদ্যায় তাতাররা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। উভয় পক্ষের তীর নিঃশেষ হবার পর সৈনিকরা মুক্ত তরবারি ও লৌহদণ্ড দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল; মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এই ভাবে যুদ্ধ চলবার পর শেষ পর্য্যন্ত তাতাররা জয়ী হোল। কুবলাই খাঁ মিয়েন ও বাংলার অধীশ্বর হয়ে বসলেন।

সেই থেকে তাঁর সৈন্যবাহিনীতে হাতীর ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে!

মার্কো পোলো যে মিয়েন ও বাংলার অধীশ্বরকে কুবলাই খাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বলে বর্ণনা করেছেন তিনি অনিরুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত পাগান রাজবংশের একাদশ নরপতি নরাথিপতি। কুবলাই খাঁর মত তিনিও ছিলেন বৌদ্ধ, কিন্তু ধর্মের প্রতি

নিষ্ঠা অপেক্ষা আড়ম্বরের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল বেশী। কুবলাই যখন গুরু ফাগ সপাকে তিব্বত থেকে পিকিংএ এনে নানাভাবে সম্মান দেখাচ্ছিলেন তিনি তখন বিপুল অর্থব্যয়ে মিংগালাজেদি প্যাগোডা নির্মাণ করে উৎসর্গলিপিতে নিজেকে ৩ কোটী ৬০ লক্ষ সৈনিকের অধিনায়ক বলে অভিহিত করছিলেন !

হল রচিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস থেকে জানা যায় যে কুবলাই খাঁ যখন চীনের সুং সাম্রাজ্য জয় সম্পন্ন করবার পর পার্শ্ববর্তী দেশগুলির আনুগত্য দাবী করে দূত পাঠাচ্ছিলেন ব্রহ্মে তখন অনিরুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত পাগান রাজবংশের একাদশ নরপতি নরাথিপতি তারোকপারামিন রাজত্ব করছিলেন। কুবলাই খাঁর নির্দেশে তাঁর ইউনানের ক্ষত্রপের কাছ থেকে এক দূত পাগানে এসে রাজা নরাথিপতির কাছে নিজ খাঁয়ের জন্য সম্মান-দক্ষিণা দাবী করলে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করতে অস্বীকার করেন। সংবাদটি যথারীতি পিকিংএ কুবলাইয়ের কাছে পৌছালে তিনি আপাততঃ নিরস্ত থাকলেও দুই বৎসর পরে স্বহস্তলিখিত পত্রসহ এক বিশেষ দূতকে পাগানে পাঠিয়ে দেন। এবার রাজা নরাথিপতি দূতকে সাক্ষাৎ দানে সম্মত হন, কিন্তু তিনি দরবার কক্ষে প্রবেশ করে সিংহাসনের সম্মুখে নতজানু না হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড দেন। রাজা নরাথিপতি যদি এখানে ক্ষান্ত হোতেন তা হোলে মোঙ্গল রোষ হয় তো তাঁর উপর তখন পতিত হোত না। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন যে ইউনান ও ব্রহ্মের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র রাজ্য কাউংগি মোঙ্গলদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে তখন তার শাস্তি বিধানের জন্য সসৈন্যে উত্তর দিকে এগিয়ে গেলেন। এই কাউংগি মার্কো পোলো বর্ণিত কারাজান রাজ্য।

এক আশ্রিত রাজ্য আক্রান্ত হবার সংবাদে কুবলাই খাঁ নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। তাঁর আদেশে ইউনান প্রদেশের তালি বিভাগের শাসক নেসতারদিন কি ভাবে ভাসাংগিয়ানের যুদ্ধে ব্রহ্ম ও বাংলার অধীশ্বরকে পরাজিত করেছিলেন মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে সে কথা বলা হয়েছে। পোলো নিজে সে সময়ে কুবলাই খাঁর সাম্রাজ্যে উপস্থিত ছিলেন বলে কাহিনীটিকে অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর মধ্যে যে গৌড় ইতিহাসের একটি অলিখিত পৃষ্ঠা লুক্কায়িত রয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বাংলা—কোন বাংলা ?

পোলো তাঁর দীর্ঘ রিপোর্টে কুবলাই খাঁর প্রতিপক্ষকে মিয়েন বা ব্রহ্মদেশ ও বাংলার অধীশ্বর বলে উল্লেখ করে বলেছেন যে তাঁর প্রজাসংখ্যা প্রভূত এবং রাজ্য ও ধনসম্পদ অপরিসীম। বাংলা সম্বন্ধে এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে তিনি বলছেন যে এই জনপদটি এখনও কুবলাইয়ের অধিকারে আসে নি ; রাজা শক্তিশালী বলে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তাঁর সৈন্য বাহিনীকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। এখানকার লোকেরা পৌত্তলিক। তারা মাংস, দুধ ও ভাত খেয়ে জীবন ধারণ করে। চাউল এখানে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তুলাও জন্মায় এবং ব্যবসা বাণিজ্য বেশ ব্যাপকভাবে চলে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মসলা, আদা, চিনি প্রভৃতি কেনার জন্য বণিকরা এখানে আসে। এখান থেকে তারা খোজাও কেনে ; খোজা এখানে যথেষ্ট পাওয়া যায়। সম্ভ্রান্ত লোকেরা নিজেদের মেয়েদের পাহারা দেবার জন্য সেই খোজাগুলিকে কেনবার জন্য আগ্রহী। বণিকরা তাদের অন্য দেশে চালান দিয়ে যথেষ্ট মুনাফা অর্জন করে।

তিন শতাব্দী পরে আবুল ফজল সুবা বাংলার বিভাগগুলির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে সরকার সিলেট খোজা সংগ্রহের প্রধান কেন্দ্র। এই সূত্র ধরে মনে হয় যে ব্রহ্মরাজ শ্রীহট্টের উপর নিজ অধিকার প্রসারিত করেছিলেন বলে মার্কো পোলো তাঁকে মিয়েন ও বাংলার অধীশ্বর বলে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক গবেষণার অবকাশ রয়েছে।

1. *Traveets of Marco Polo, Marsdien's trans., p. 202, 208*
2. Hall D.G.E. *History of South-east Asia, p. 145–46*

অষ্টম অধ্যায়

গৌড়ে বলবন

মুঘিসুদ্দীন তুঘ্রাল

অর্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক সময় কেটে গেল। ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন বলবন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করে সমগ্র তুর্কী ভারতের উপর নিজ অধিকার প্রসারিত করবার জন্য যত্নবান হয়ে দেখেন যে বাধা দুর্লজ্ঘ্য। তাঁর অভিষেকের দুই বৎসর পরে লখনৌতির তরুণ সুলতান আর্সলান তাতার খাঁব মৃত্যু হোলে শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে প্রথানুযায়ী যে কলহ বেধে যায় সেই সময়ে বলবন সুকৌশলে নিজ মনোনীত আমিন খাঁকে এখানকার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব একজনের হাতে অর্পণ করলে পাছে তিনি শক্তির অপব্যবহার করেন সেই ভয়ে সুচতুর বলবন দিল্লী থেকে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর মুঘিসুদ্দীন তুঘ্রালকে আমিন খাঁর নায়েব নিযুক্ত করে পাঠান (১২৬৮)।

পূর্ব জীবনে তুঘ্রাল ছিলেন বলবনের ক্রীতদাস। বখতিয়ার খিলজীর সময় থেকে গৌড়ে যে ক্রীতদাস যুগের সূত্রপাত হয় তিনি তার শেষ জ্যোতিষ্ক। শৈশবে বলবন তাঁকে ন্যায্য মূল্যে কিনে নিয়ে প্রথমে প্রাসাদের পরিচারক ও পরে সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করেন। সেখানে কর্ম্মদক্ষতায় প্রভুর মনোরঞ্জন করে তিনি দরবারে স্থান পান। সেই সময়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজে নৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়ায় তাঁর উপর বলবনের যথেষ্ট আস্থা জন্মায়, লখনৌতির মত সমস্যাবহুল প্রদেশে নিজ অধিকার ভালভাবে কায়েম করতে হোলে এইরূপ বিশ্বাসী লোকের প্রয়োজন বোধ করে তাঁকে আমিন খাঁর নায়েব নিযুক্ত করেন।

নূতন ব্যবস্থায় কিছু দিন বেশ সুশৃঙ্খলভাবে কাজ চললেও তুঘ্রাল ধীরে ধীরে আমিন খাঁকে কোণঠাসা করে নিজে সর্বময় অধীশ্বর হয়ে বসেন। আমিনের

নিষেধ সত্ত্বেও তিনি মাঝে মাঝে পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজ্যগুলিতে লুঠতরাজ চালাতেন। তাতে আমিন খাঁ অসন্তুষ্ট হোতেন বটে কিন্তু বলবন খুসী—এমনি করিৎকর্মা লোকই তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দূত যখন লখনৌতিতে এসে লুঠের ভাগ দাবী করল তুঘ্রাল তখন নিজ মূর্তিতে দেখা দিলেন। দূত রিক্তহস্তে দিল্লীতে ফিরে গেলেও বলবন নিরুপায়, কারণ মোঙ্গলগণ তখন পাঞ্জাবে হামলা চালাচ্ছিল। তাদের ভয়ে তাঁকে সদা সন্ত্রস্ত থাকতে হোত।

ত্রিপুরার সাহায্যে তুঘ্রাল

সেই সময়ে ত্রিপুরার সিংহাসন নিয়ে রাজকুমার রত্ন-ফা ও তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে মনোমালিন্য চলছিল। রত্ন-ফা যখন দেখলেন যে নিজ শক্তিতে সিংহাসনে আরোহণ করা সম্ভব নয় তখন লখনৌতিতে এসে তুঘ্রালের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এত বড় সুযোগ কোন তুর্কী সুলতান কোন দিন পান নি; তাই রত্ন-ফাকে পেয়ে তুঘ্রাল মহা খুসী। তাঁকে সমাদরে গ্রহণ করে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। তাঁর সামরিক সাহায্য নিয়ে রত্ন-ফা ভ্রাতাদের পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সম্বন্ধে ত্রিপুরার ইতিহাস রাজমালা বলেন :—

কত দিনে গৌড়ে গেল নৃপতি নন্দন।
পুত্র স্নেহ করে গৌড়েশ্বর মহাজন॥
সভাতে সম্মান বহু পায় দিনে দিনে।
গৌড়েশ্বর সব কথা জিজ্ঞাসে আপনে॥

তাহা শুনি কহিলেক নৃপতি নন্দন।
গৌড়রাজ্যে দুঃখ নাহি অন্নের কারণ॥
পিতারে ভ্রাতৃকে দিল ভাগ করি রাজ।
আমাকে পাঠাইয়া দিল তোমার সমাজ॥
তব কৃপা হইলে সর্ব কার্য্য সিদ্ধ হবে।
গৌড়েশ্বর জিজ্ঞাসিল কি কর্ম করিবে॥

অনেক কটক দিব নিবা তোমা সঙ্গে।
আপন রাজ্যেতে যাইয়া রাজা হও রঙ্গে ॥
অনুমতি পাইলেক নৃপতি তনয়।
গৌড়াধিপ সৈন্য তাকে দিল অতিশয় ॥
রত্ন-ফা চলিল নিজ রাজ্য লইবারে।
কত দিনে আসিলেক জামির খাঁর গড়ে ॥
গড় জিনি রাঙামাটি ছাড়াইয়া লইল।
ডাঙর-ফার সৈন্য সব পর্বতেতে গেল ॥
আর রাজপুত্র সভে ভঙ্গ দিল তায়।
গৌড় সৈন্য তার পাছে খেদাইয়া যায় ॥
থানাং-বি পর্বতে রাজা ডাঙর-ফা মরিল।
আর যত রাজপুত্র লড়াইয়া ধরিল ॥
ভঙ্গ দিতে যে যে স্থানে যে কর্ম করিল।
সেই স্থানেব নাম তার সেমতে রাখিল ॥
... ...
সব ভ্রাতৃ জিনিয়া পাইল রাজ্যস্থান।
পুনর্বার গেল গৌড়েশ্বর বিদ্যমান ॥
বহুতর হস্তী নিল অতি বৃহত্তর।
দেখিয়া সন্তুষ্ট হইল গৌড়ের ঈশ্বর ॥
রত্ন-ফা নাম তার পিতারে রাখিয়াছিল।
রত্ন-মাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বর দিল ॥
...তদবধি মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরেশে।
বিদায় লইয়া রাজা চলিলেক দেশে ॥

এই কাহিনী থেকে দেখা যায় যে তুগ্রাল খাঁর কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে রত্ন-ফা পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য তিনি গৌড়ে ফিরে এসে তুগ্রালকে কয়েকটি হস্তী ও কিছু মূল্যবান মণিমাণিক্য উপহার দেওয়ায় তিনি রত্ন-ফাকে মাণিক্য উপাধি প্রদান করেন। সেই থেকে ত্রিপুরার রাজবংশ ফা উপাধি ত্যাগ করে মাণিক্য উপাধি ব্যবহার করছে।

তুঘ্রালের কাছ থেকে সামরিক সাহায্য নিয়ে রস্ত-ফার যতখানি লাভ হয়েছিল তার চেয়ে বেশী হয়েছিল তুর্কীদের। দীর্ঘ দিনের ব্যর্থতার পর এই প্রথম তারা বঙ্গে অনুপ্রবেশ করবার সুযোগ পায়। পদ্মা ও মেঘনা নদীর উভয় তীরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তুঘ্রাল খাঁ নারকিলা নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। এখানে আক্রমণের ঘাঁটি স্থাপন করে সমগ্র বঙ্গের উপর অভিযান চালাবার পরিকল্পনা তাঁর ছিল, কিন্তু দিল্লী থেকে উদ্বেগজনক সংবাদ আসায় আপাতত নিরস্ত হন।

বলবনের পীড়া

সে সময়ে পাঞ্জাবে আবার নূতন করে মোঙ্গল আক্রমণ সুরু হওয়ায় বলবনী সৈন্যগণ সেখানে তাঁবু ফেলে অপেক্ষা করছিল। অথচ তাদের সর্বাধিনায়ক সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বেশ কয়েক দিন তাঁকে বাইরে আসতে না দেখে দিল্লীতে রঙবেরঙের গুজব রটতে লাগল। রঙের উপর রঙ লেগে সে গুজব যখন লখনৌতিতে এসে পৌঁছাল তখন সবাই জানল যে সুলতান বলবন এন্তেকাল করেছেন, মসনদ নিয়ে দিল্লীতে নিয়ম মাফিক লড়াই সুরু হয়ে গেছে। সেখান থেকে কথাটা নারকিলায় তুঘ্রালের কানে গেল। তিনি দেখলেন মহা সুযোগ—আমিন খাঁকে হটিয়ে লখনৌতির একচ্ছত্র অধীশ্বর হয়ে বসলেন।

দিল্লীতে বলবনের পীড়া গুরুতর হোলেও সত্যিই তিনি মরেন নি। বৈদ্যরা তাঁকে মরতে দেয় নি। লখনৌতিতে তুঘ্রালের ধৃষ্টতার কথা যখন তাঁর কানে পৌঁছাল তখন তিনি আরোগ্যের পথে। তবু বাহ্যতঃ কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ না করে দূত মারফত তুঘ্রালকে লিখে পাঠালেন যে তিনি রোগমুক্ত হয়েছেন, সেজন্য যেন যথোচিত উৎসব পালন করা হয়। কিন্তু কে উৎসব করবে? সুলতান মুঘিসুদ্দীন নাম নিয়ে তুঘ্রাল তখন নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচার সুরু করেছেন! বলবনের পত্র তিনি টুকরা টুকরা করে ছিঁড়ে ফেললেন।

নফরের এতদূর স্পর্ধা? দূতের মুখে সব কথা শুনে বলবন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। যে ক্রীতদাসকে এই সেদিন তিনি আস্তাকুঁড় থেকে কুড়িয়ে এনে মালিকের মর্য্যাদায় বসিয়েছেন সে আজ তাঁকে উপেক্ষা করবার স্পর্দ্ধা দেখায়?

বলবন আহার নিদ্রা ত্যাগ করলেন—যত দিন না তুঘ্রাল জাহান্নামে যায় তত দিন বিশ্রাম নেবেন না বলে সবাইকে জানিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর অধিকাংশ সৈন্য তখন মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে আবদ্ধ থাকায় নিজে সরাসরি কিছু না করে বিভিন্ন স্থান থেকে অধীনস্থ মালিকদের দিল্লীতে ডেকে পাঠালেন।

তাঁরা সবাই সুলতানের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বলবন তুঘ্রাল নিধনের দায়িত্ব দিলেন অযোধ্যার মালিক আবেগ তেগিনের উপর। ১২৭৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তেগিন বলবনী সৈন্যদের নিয়ে লখনৌতির দিকে রওনা হয়ে গেলেন। তুঘ্রাল অপ্রস্তুত ছিলেন না, আবেগ তেগিনের সম্মুখীন হবার জন্য সসৈন্যে পশ্চিম দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সরযূ নদী পার হয়ে ত্রিহুতের পথ ধরে তিনি যখন তুঘ্রালের রাজ্যসীমায় এসে উপস্থিত হয়েছেন তখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বাহিনীর মধ্যে সাক্ষাৎ হোল। কিন্তু সরাসরি যুদ্ধ করবার পরিবর্তে তারা তাঁবু খাটিয়ে চুপচাপ বসে রইল; কেউ কাউকে আঘাত করল না। এই ভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সময় অতীত হয়ে গেল, কিন্তু যুদ্ধের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এই স্নায়ুযুদ্ধে তুঘ্রাল বাহ্যতঃ নিশ্চেষ্ট থাকলেও শত্রু শিবিরে তাঁর যে সব পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের সঙ্গে গোপন চক্রান্ত চালাচ্ছিলেন। সেই ভদ্রলোকদের মধ্যস্থতায় ঊর্দ্ধতন অফিসারদের ভাল রকম উৎকোচ প্রদান করে তিনি এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে যুদ্ধের সময়ে তাঁরা সবাই তুঘ্রালের নির্দেশ মত চলবেন।

এইভাবে শত্রু শিবিরের উপর নিজ প্রভাব ভাল ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পর তুঘ্রাল তুঘান এক দিন আক্রমণ সুরু করলেন। তাঁর আয়োজন ব্যর্থ হয় নি—যে সব অফিসারকে তিনি খুসী করেছিলেন তাঁরা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করায় যুদ্ধের সময়ে অধিকাংশ বলবনী সৈন্য নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দিন শেষে আবেগ তেগিন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে দিল্লীর দিকে রওনা হোলেন। পথ কিন্তু সুগম ছিল না। হিন্দুরা তাঁর বহু সৈন্যকে হত্যা করে, বহু সৈন্য সেই দুর্দৈব পরিহার করবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে এসে তুঘানের সঙ্গে যোগ দেয়।

আবেগ তেগিনের এই অযোগ্যতার জন্য সুলতান বলবন তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে মালিক তুরমতির অধীনে বৃহত্তর এক সৈন্য বাহিনী তুঘ্রালের বিরুদ্ধে

পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মালিক তুরমতির অদৃষ্ট আবেগ তেগিন অপেক্ষা কিছু ভাল ছিল না। তাঁর কোন অফিসারকে হাত করবার সুযোগ অবশ্য তুগ্রাল পান নি, কিন্তু তাঁকে সম্মুখ যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে সবাইকে বিস্মিত করেন। এমনই অতর্কিতে তিনি মালিক তুরমতিকে আক্রমণ করেছিলেন যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাবার সময়ে তাঁর সৈন্যরা রসদ বা সমরসম্ভার কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাবার সুযোগ পায় নি। সব কিছুই তুগ্রালের হস্তগত হয়। প্রথম যুদ্ধে তিনি পেয়েছিলেন সৈনিক, এবার পেলেন সমর সম্ভার।

পর বৎসর বলবন আরও বৃহত্তর এক বাহিনী সংগঠিত করে মালিক সিহাবুদ্দীন বাহাদুরের নেতৃত্বে তুগ্রালের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। এই নূতন সেনাপতি পূর্বে কয়েকটি রণক্ষেত্রে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন বলে তাঁর উপর বলবনের যথেষ্ট আস্থা ছিল। তিনিও দিল্লী থেকে রওনা হবার পূর্বে সর্বসমক্ষে প্রভুর কাছে প্রতিষ্ঠা করেন যে তুগ্রাল যতই শক্তিমান হোক না কেন তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে প্রভুর কাছে নিয়ে আসবেন। এত দম্ভ কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত শূন্যে মিলিয়ে গেল। লখনৌতি সীমান্ত পার হয়ে সিহাবুদ্দীন বাহাদুর দেখেন যে শত্রুকে তিনি পূর্বে যতখানি দুর্বল মনে করেছিলেন সে তা নয়। প্রথম দিনের যুদ্ধেই তুগ্রাল তাঁর বিরাট বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেন, সব কিছু পিছনে ফেলে তিনি ত্রস্তব্যস্তে দিল্লীর দিকে পালিয়ে যান। বলবন হতবাক! প্রতিজ্ঞা পালনে অক্ষমতার জন্য তিনি সিহাবুদ্দীন বাহাদুরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমীর ওমরাহদের প্রচ্ছন্ন বিক্ষোভ লক্ষ্য করে শেষ পর্য্যন্ত নিরস্ত হন।

লুকোচুরি খেলা

এর পর সুলতান বলবনের পক্ষে নিজে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা তখন প্রশমিত হয়েছে বলে অন্তরায়ও বিশেষ ছিল না। কিন্তু অতি সংগোপনে এগোতে হবে, সেই গিদ্ধড় যেন ঘুণাক্ষরেও দিল্লী ফৌজের গতিবিধি জানতে না পারে। নিজের পরিকল্পনা নিজের মনে লুকিয়ে রেখে বলবন সৈন্যাধ্যক্ষদের বললেন, গুপ্তচররা যে সব সংবাদ আনছে তা থেকে মনে হয় যে মোঙ্গলরা আবার আসবে, তাদের সম্মুখীন

হবার জন্য বিরাট আকারে সমরসজ্জা করতে হবে। তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশে পূর্ণ এক বৎসর ধরে প্রস্তুতি চলবার পর তিনি এক দিন গেলেন উত্তর দিকে সামান ও সানামের জঙ্গলে হরিণ শিকার করতে। সেখানে তাঁর হেড কোয়ার্টার স্থাপিত হয়ে পূর্ণোদ্যমে সমরসজ্জা চলতে লাগল। তাঁর অনুপস্থিতির সংবাদ পেয়ে মোঙ্গলরা যদি আবার ফিরে আসে তাদের প্রতিরোধ করবার দায়িত্ব দেওয়া হোল জ্যেষ্ঠ পুত্র মুলতানের শাসনকর্তা মহম্মদ সুলতানের উপর। দিল্লীর কোতোয়াল মালিক-উল-ওমরা পেলেন রাজধানী রক্ষার দায়িত্ব। অন্যান্য বিশ্বস্ত কর্মচারী ও আত্মীয়কে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে বলবন ১২৮৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পূর্ব দিকে রওনা হোলেন। তাঁর পশ্চাৎব্যূহ রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে চললেন কনিষ্ঠ পুত্র বোঘরা খাঁ।

বলবনের নির্দেশে প্রবীণ সৈনাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ ফৌজ নিয়ে অযোধ্যার কোন স্থানে অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা জানতেন, যে কোন মুহূর্তে মোঙ্গলরা এসে উত্তর সীমান্তে হাজির হোতে পারে ; সুলতানের কাছ থেকে ডাক এলেই তাঁদের সে দিকে যেতে হবে। সে জন্য সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন, এমন সময়ে একদিন সবিস্ময়ে দেখেন যে স্বয়ং বলবন তাঁদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি বললেন : মোঙ্গল আক্রমণের আশঙ্কা আপাততঃ প্রশমিত হয়েছে বটে কিন্তু লখনৌতিতে তুঘ্রাল যে ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তাতে তাকে দমন না করলেই নয়! সে দায়িত্ব তোমাদের। সবাই সম্মতি দিলে তিন লক্ষ সৈন্যের সেই বিরাট বাহিনী লখনৌতির দিকে রওনা হোল।

বলবনী ফৌজের অগ্রগতির কথা তুঘ্রালের কানে যেতে তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না। দিল্লীতে তাঁর যে সব গুপ্তচর ছিল তাদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত খবর পাচ্ছিলেন যে মোঙ্গলদের আসন্ন আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সুলতান বলবন বিরাটভাবে সমরসজ্জা করছেন। এই সেদিনও তিনি খবর পেলেন, বলবন সামান ও সানামে গেছেন হরিণ শিকার করতে। শিকার যে আসলে তিনি এ কথা ঘুণাক্ষরেও তাঁর মনে ওঠে নি। হতোদ্যম হোলে চলবে না! সকল সৈন্যবাহিনীসহ তিনি নদীপথ ধরে পশ্চিম দিকে রওনা হোলেন। সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে পৌছে দেখেন যে বলবনী ফৌজের অগ্রবাহিনী সেখানে এসে পৌচেছে ; তাদের পিছনে আসছেন বোঘরা খাঁ। সেই বিরাট বাহিনীর সঙ্গে

সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লে যে গুঁড়ো হয়ে যেতে হবে একথা বুঝে নিয়ে তুঘ্রাল আপাততঃ আত্মগোপন করে থাকা বিজ্ঞোচিত কাজ বলে মনে করলেন। নিজ ফৌজ অটুট রেখে সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকা ছাড়া আর কোন পথও তো খোলা নেই। বলবন যতই শক্তিমান হোন তাঁর পিছনে কত দিন ঘুরবেন? দিল্লী সাম্রাজ্যের সর্বত্র অশান্তি চলছে, তার উপর মোঙ্গলরা যে কোন সময়ে এসে হাজির হোতে পারে। কোনও না কোন কারণে কাল হোক বা পরশু হোক বলবনকে দিল্লী ফিরতেই হবে। যে মুষ্টিমেয় সৈন্য তিনি লখনৌতিতে রেখে যাবেন তাদের খতম করা কিছু শক্ত হবে না।

বলবনকে আক্রমণের সুযোগ না দিয়ে তুঘ্রাল নিজ বাহিনীসহ লখনৌতির দিকে পশ্চাদপসরণ করতে লাগলেন। সুলতান বলবন তাঁর অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে তাল রাখতে পারলেন না। তার উপর পথে বর্ষা নামায় তাঁর গতি মন্থরতর হয়ে গেল। সেই সুযোগে তুঘ্রাল লখনৌতিতে ফিরে এসে সমস্ত সৈন্য, সমরসম্ভার, রাজকোষ, বেগম প্রভৃতি নিয়ে জাজনগরের দিকে চলে গেলেন। পিছনে পড়ে রইল শাসকশূন্য রাজধানী গৌড়। বলবনী ফৌজ যখন সেখানে এসে পৌছাল তুঘ্রাল তখন বীরভূমের এক রুক্ষ প্রান্তরে বসে পর দিনের কর্মসূচী তৈরী করছিলেন!

বিনাযুদ্ধে গৌড় অধিকার করা গেলেও বলবন খুসী হোলেন না। তুঘ্রাল কই? কোথায় সেই বেয়াদপ নফর? চলমান দরবার কক্ষে সকল সভাসদের সামনে তিনি ঘোষণা করলেনঃ আমার অর্দ্ধেক শক্তি তুঘ্রালের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেছি, কিন্তু সে আমার নাগালের বাইরে। চারি দিকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোথায় পালাবে? যদি পাখী হয়ে আকাশে উড়ে যায় সেখানে গিয়ে তাকে ধরব, যদি মাছ হয়ে দরিয়ার তলায় ডুব দেয় সেখানেও ধরব। তার ও তার দলবলের রক্ত না দেখা পর্য্যন্ত দিল্লীতে ফিরব না—দিল্লীর নামও নেব না।

বিজিত গৌড় নগরীর দায়িত্ব ঐতিহাসিক আল-বারুনির মাতামহ সিপাহ-সালার হিসামুদ্দীনের উপর অর্পণ করে বলবন চললেন তুঘ্রালকে ধরতে। সেই বিরাট ফৌজ তাঁর সঙ্গে চলল। কিন্তু কোথায় তুঘ্রাল? বলবনী সৈন্যরা তাঁর কাছে পৌছাবার পূর্বেই তিনি হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যান। গুপ্তচররা চারিদিকে

তন্ন তন্ন করে অন্বেষণ করে, কিন্তু তাঁর সঠিক অবস্থান কেউ আনতে পারে না। আজ তিনি রাঢ়ের জাজনগরে, কাল পদ্মাতীরে নারকিলায়। এই লুকোচুরি খেলা দেখে বলবন বুঝে নিলেন, তুঘ্রালকে সম্মুখ সমরে টেনে আনা সহজ হবে না। তাই সৈন্যবাহিনীকে কয়েকটি দলে ভাগ করে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তারা কেউই তুঘ্রালের সন্ধান পায় না। সবাই বলে, তুঘ্রাল যাদু জানে—যাদুমন্ত্রবলে সবার চক্ষে ধুলো দিয়ে হাজার হাজার সৈন্যসহ হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে যায়।

রাজা দনুজমর্দনদেব

এক বিশ্বস্ত গুপ্তচর এক দিন খবর আনল যে তুঘ্রাল নিজে পালিয়ে বেড়ালেও পরিবার পরিজন ও ধনরত্ন নারকিলা দুর্গে লুকিয়ে রেখেছে। বলবন ভাবলেন, দুর্গ অধিকার করা কিছু শক্ত হবে না, কিন্তু তাতে তুঘ্রালকে ধরা যাবে কি? সেই গিদ্‌ধড় নিশ্চয়ই এমন ব্যবস্থা করে রেখেছে যে দুর্গ হাতছাড়া হবার পূবে সব কিছু নিয়ে পদ্মানদীর পথ ধরে অন্য কোথায় চলে যাবে। তাই দুর্গ দখলের পূর্বে সে পথ বন্ধ করা চাই। কিন্তু বঙ্গেশ্বর দনুজমর্দনদেবের সহযোগিতা ব্যতীত তা সম্ভব নয়, কারণ পদ্মা তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে বহে চলেছে। তুঘ্রালকে ধরতে এসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবে।

কে এই রাজা দনুজমর্দনদেব? বলবনের অভিযান প্রসঙ্গে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁর নামোল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু বিশদ পরিচয় দেন নি। আধুনিক কালের কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা যে তিনি গৌড়ের সেনরাজগণের বংশধর—তাঁর পূর্বসূরীরা নবদ্বীপ পতনের পর থেকে বঙ্গ শাসন করছিলেন। তিনি যেই হোন বঙ্গ যে তাঁর শাসনাধীন ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হয় তো তিনি ব্রহ্মরাজের সামন্তরূপে রাজ্য শাসন করছিলেন। পূর্ব অধ্যায়ে তাঁর ইঙ্গিত রয়েছে। তিনি যেই হোন সুলতান বলবনের দূত সাহায্য লাভের জন্য তার রাজধানী সুবর্ণগ্রামে এলে তিনি তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। কিছু দিন পূর্বে তুঘ্রালের সৈন্যগণ তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে ত্রিপুরায় গিয়েছিল এবং নারকিলায় একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল বলে তাঁরও সেই

সুলতানের বিরুদ্ধে অভিযোগের যথেষ্ট কারণ ছিল। সুলতান বলবন যদি না আসতেন তা হোলে তুঘ্রাল হয় তো এত দিনে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করত। দূতকে তিনি জানালেন যে বলবনের শত্রু তাঁরও শত্রু, সেই কারণে তিনি সর্ব শক্তি দিয়ে দিল্লীশ্বরকে সাহায্য করবেন। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার জন্য সুলতান যদি তাঁকে আহ্বান জানান তিনি সানন্দে তাঁর দরবারে যাবেন। কিন্তু একটি সর্তে—তাঁকে স্বাধীন নরপতির মর্যাদা দিতে হবে, সুলতান মসনদ থেকে উঠে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবেন।

দূতের কাছে সব বিবরণ শুনে বলবন খুসী হোলেন, কিন্তু এক কাফের রাজা তাঁর দরবারে এলে আমীর ওমরাহদের সামনে মসনদ ছেড়ে ওঠার প্রস্তাব তিনি বরদাস্ত করতে পারলেন না। অথচ এই সৌজন্যের প্রতিশ্রুতি না দিলে রাজা দনুজমর্দন আসবেন না, তুঘ্রালের নিষ্ক্রমণ পথও বন্ধ হবে না। বলবনকে এই উভয় সমস্যার হাত থেকে বাঁচালেন বরবক বেকতুর। তিনি সুলতানের কাছে এসে একান্তে বললেন যে এমন ব্যবস্থা করা যেতে পারে যাতে দনুজমর্দনের পার্শ্বচররা বুঝবেন যে তাঁদের রাজাকে মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে, আবার দরবারে উপস্থিত আমীররা বুঝবেন যে তাঁদের সুলতান কাফেরের কাছে মাথা নোয়ান নি।

মালিক বেকতুরের এই প্রস্তাব বলবন মেনে নিলে কয়েক দিন পরে রাজা দনুজমর্দনদেব তাঁর দরবারে প্রবেশ করা মাত্র তিনি মসনদ ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে একটি বাজ পাখীকে ছেড়ে দিলেন অন্য ছোট একটি পাখীকে ধরে আনবার জন্য। ঠিক সেই সময়ে রাজা দনুজমর্দন সপারিষদ দরবার কক্ষে এসে পৌছানয় মালিক বেকতুর তাঁকে সুলতানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সমাগত সভাসদরা দেখলেন যে তাঁদের সুলতান দরবারে বসে পাখী শিকার করছেন, দনুজমর্দন-দেবের পার্শ্বচররা দেখলেন যে তাঁদের রাজা দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে রাজোচিত মর্য্যাদা পাচ্ছেন। আসল ব্যাপার অবশ্য সবাই মনে মনে বুঝলেন!

তারপর উভয় নরপতির ইঙ্গিতে সভাসদরা কক্ষান্তরে চলে গেলে তাঁদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে গোপন পরামর্শের পর এক আহাদনামা সম্পাদিত হোল। তাতে সুলতান বলবন রাজা দনুজমর্দনকে স্বাধীন নরপতি বলে মেনে নিলেন এবং তিনি প্রতিদানে উভয়ের সাধারণ শত্রু তুঘ্রালকে ধরবার জন্য

সর্ব শক্তি নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সেই বেইমান যদি রাজা দনুজমর্দন-দেবের অধিকারের মধ্যে জলে বা স্থলে কোন গোপন আশ্রয়স্থল রচনা করে, অথবা জলপথ ধরে কোথাও চলে যায়, অথবা সমুদ্রের তলায় গিয়ে আত্মগোপন করে তা হোলে রাজা দনুজমর্দনকে সে জন্য বলবনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তখন সুলতান প্রয়োজন বোধ করলে তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবেন। আহাদ-নামাটির অর্থ এই দাড়াল যে বলবনী সৈন্যরা নারকিলা দুর্গ আক্রমণ করলে তুঘ্রাল যাতে পদ্মা নদী ধরে তাঁর মিত্র রাজ্য ত্রিপুরায় পালিয়ে যেতে না পারেন সেজন্য রাজা দনুজমর্দনদেবকে নিজ রাজ্যের সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্য মোতায়েন রাখতে হবে।

তুঘ্রালের মত ধুরন্ধর ব্যক্তিকে এ ভাবে ঘায়েল করা যায় না। গুপ্তচরের মুখ দিয়ে এই সন্ধির কথা তাঁর কানে পৌছালে তিনি সবার চক্ষে ধূলা দিয়ে নারকিলা দুর্গের সৈন্যসামন্ত, বেগমবাঁদী, রাজকোষ প্রভৃতি নিয়ে এক গুপ্ত পথ ধরে চলে এলেন রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে ১৪০ মাইল দূরে। বলবন নারকিলায় পৌছে দেখেন, দুর্গ একেবারে শূন্য। তাঁর সন্দেহ হোল যে রাজা দনুজমর্দন সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে তুঘ্রালকে গোপনে সাহায্য দিয়েছেন। দুষমন যদি তুঘ্রাল না হোত তা হোলে তিনি দনুজমর্দনের রাজ্য সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করতেন। কিন্তু বহু লোককে জিজ্ঞাসা করে যখন বুঝলেন যে সে পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে যায় নি তখন শান্ত হোলেন।

নারকীয় নিষ্ঠুরতা

কোথায় গেল তুঘ্রাল? তাঁকে ধরবার জন্য সুলতান বলবন এক দিন নয়, এক মাস নয়, তিন তিন বৎসর ধরে ইকলিম-ই-লখনৌতি তোলপাড় করছেন, অথচ তাঁর ধরাছোঁয়া পান নি। প্রতিনিয়ত তিনি শুনছেন যে তুঘ্রাল আছে, কিন্তু কোথায় আছে তার হদিস কেউ দেয় নি। তাঁর সৈন্যরা গৌড়ের অন্দরে কন্দরে অন্বেষণ চালিয়েছে, কিন্তু সবাই তুঘ্রালের জিনকে দেখেছে—তুঘ্রালকে দেখে নি। তিন লক্ষ সৈন্য সেই দুষমনের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য সদা প্রস্তুত, অথচ তিন বৎসরের মধ্যে একটি তীর নিক্ষেপের সুযোগ কেউ পায় নি। মানসিক উদ্বেগে বলবন অধীর হয়ে উঠলেন, তুঘ্রাল তাঁর জাগরণের চিন্তা, নিদ্রায় স্বপ্ন হয়ে

দাঁড়াল। শেষ পর্য্যন্ত কি তাঁকে শূন্য হাতে দিল্লীতে ফিরে যেতে হবে? এমনি আশা নিরাশার মধ্যে তাঁর মন যখন দোদুল্যমান সেই সময়ে এক দিন এক অপ্রত্যাশিত স্থানে তুঘ্রালের সাক্ষাৎ মিলল।

সে দিন মালিক বরবক বেকতুরের রেজিমেণ্ট প্রথানুযায়ী মূল ঘাঁটি থেকে ক্রোশ দশেক দূরে তুঘ্রালী ফৌজের অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে এমন সময়ে দেখে যে কয়েকজন ব্যাপারী পণ্যদ্রব্য নিয়ে পথ চলছে। যাকেই তারা এমনিভাবে পথ চলতে দেখত তাকে তুঘ্রাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করত। এই ব্যাপারীদের জিজ্ঞাসা করে যা জানা গেল তাতে মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তারা তরবারির আঘাতে দুজনের শিরচ্ছেদ করল। বাকী ব্যাপারীরা হতবাক—ভয়ে কারও মুখ দিয়ে কথা বেরোল না। তাদের জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ। চুপ করে থাকলে বলবনের সিপাহীরা মাথা নেবে, মুখ খুললে নেবে তুঘ্রালের সিপাহী! শ্যাম ও কুল দুই রক্ষা করার জন্য তাদের একজন নিঃশব্দে পূব দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলে সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করে বেকতুরের সিপাহীরা আধ ক্রোশ পথ এগিয়ে গিয়ে দেখে যে তুঘ্রাল খাঁ সেখানে সসৈন্যে অবস্থান করছেন। তখন দ্বিপ্রহর, তাই তাঁর সৈন্যরা আহার প্রস্তুতে ব্যস্ত। অদূরে হস্তীরা বৃংহন করছে, নিরর্গল অশ্বগুলি করছে হ্রেষারব। তাদের তুলনায় বেকতুরের ফৌজ সংখ্যায় নগণ্য হোলেও আবিষ্কারের আনন্দে তারা কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সরাসরি শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তুঘ্রাল ভাবলেন, সেই মুষ্টিমেয় সৈন্যের পিছনে নিশ্চয় সমগ্র বলবনী ফৌজ আসছে। সে ক্ষেত্রে য পলায়তে স জীবতে! নদী পার হয়ে আত্মরক্ষা করবার জন্য তিনি জলে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু একজন বলবনী সৈন্য তাঁকে শরবিদ্ধ করল এবং আর একজন শিরচ্ছেদ করে জীবনলীলা সাঙ্গ করে দিল।

তুঘ্রালকে জীবিত ধরতে না পারায় সুলতান বলবন কিছুটা মনঃক্ষুণ্ণ হোলেও তাঁর ছিন্নমস্তক দেখে আনন্দ কম পান নি। সেই দুষমনের সকল অনুচরকে বন্দী করে লখনৌতিতে নিয়ে এসে তিনি নারকীয় শাস্তির আয়োজন করলেন। হোক তারা যুদ্ধবন্দী, তবু এমন শাস্তি দিতে হবে যে তাদের শেষ পরিণতির কথা স্মরণ করে ভবিষ্যতে কেউ বিরোধী দলে যোগ দেবে না। তাঁর আদেশে গৌড় নগরীর প্রধান বাজারের পাশে এক মাইল দীর্ঘ পথের উভয় দিকে অসংখ্য

ফাঁসিকাষ্ঠ তৈরী করে হাজার হাজার যুদ্ধবন্দীকে তাতে লটকে দেওয়া হোল। তুঘ্রালের পুত্র, জামাতা, উজীর, সুঘালদার, সর-লস্কর, জানদার, শিলাহ্দার প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ক্রূরতম দৈহিক নির্য্যাতনের পর তাদের এক এক করে তোলা হোল বিশেষভাবে নির্মিত শূলের উপর। হাজার হাজার দর্শকের সম্মুখে সবাইকে শূলবিদ্ধ করে হত্যা করা হোল। নারীদেরও বাদ দেওয়া হয় নি। তুঘ্রাল ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির বেগমদের হয় হত্যা নতুবা বন্দী করে দিল্লীতে চালান দেওয়া হোল। ফকির কলমুর ছিলেন তুঘ্রাল খাঁর মুরশিদ। এই গুরুকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকেও ধরে এনে শতাধিক অনুচরসহ শূলবিদ্ধ করা হোল।

যে সব বন্দী দিল্লী অঞ্চলের অধিবাসী তাদের জন্যও সুলতান একই বিধান দিলেন। তবে গৌড়ে তাদের জীবনাবসান হোলে দিল্লীবাসীরা কোন শিক্ষা পাবে না ভেবে তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দিল্লীতে পাঠিয়ে সকলকে নিজ নিজ পরিবার পরিজনের সম্মুখে হয় ফাঁসিতে লটকে নয় শূলবিদ্ধ করে হত্যা করা হোল।

বোঘরা খাঁর প্রতি উপদেশ

তুঘ্রাল নিধনের পর সুলতান বলবন পুত্র বোঘরা খাঁকে নাসিরুদ্দীন অর্থাৎ ধর্মরক্ষক উপাধি দিয়ে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। রাজা দনুজমর্দনের প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছিল বলে তাঁর হাত থেকে বঙ্গ অধিকারের ইচ্ছা তাঁর ছিল। কিন্তু তিন বৎসর দিল্লী থেকে দূরে থাকায় তা সম্ভব হোল না; সে কাজের দায়িত্ব পুত্রের উপর অর্পণ করে সমগ্র গৌড় রাজ্য ইকলিম-ই-লখনৌতি, ইকলিম-ই-সাতগাঁও ও আরসা-ই-বাংলা এই তিনটি প্রদেশে বিভক্ত করলেন। ন্যস্ত দায়িত্ব হয় তো বোঘরা পালন করবে, কিন্তু তাকেই বা বিশ্বাস কি? হোক সে পুত্র, এই বালঘাকপুরে ইমানদার বলতে কেউ নেই। তাই তাঁকে নিম্নলিখিত আট দফা উপদেশ দিয়ে সুলতান বলবন দিল্লীর দিকে রওনা হোলেন (১২৮২)—

১। দিল্লীর সুলতান আত্মীয় হোন বা অনাত্মীয় হোন তাঁকে নিজের প্রধান বলে মানবে, তাঁর অনুজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করবে না।

২। সেই সুলতান লখনৌতিতে এলে রাজধানী ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে—তিনি বিদায় নিলে তবে ফিরে আসবে।

৩। রাজস্ব আদায় ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে। চাপ অত্যাধিক হোলে প্রজাসাধারণ বিদ্রোহপ্রবণ হয়ে উঠবে, আবার লঘু হোলে সরকারের ক্ষতি হবে।

৪। কর্মচারীরা যাতে সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারে সে দিকে লক্ষ্য রাখবে। তাদের এমন বেতন দেওয়া উচিত যাতে তারা অর্থাভাবে কষ্ট না পায়।

৫। যে সব আমীর বুদ্ধিমান ও হিতৈষী তাঁদের মতামতের যথোচিত মূল্য দেবে। রাজকীয় আদেশ জারী করবার সময়ে প্রবৃত্তিবশে পরিচালিত হবে না। ন্যায় বিগর্হিত কোন কাজ করবে না।

৬। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পদমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করবে। সাধারণ প্রজার অবস্থা যাতে স্বচ্ছল থাকে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে। কোন কাজে অসাবধানতা বা শ্লথতা দেখাবে না।

৭। দুষমনের অভাব নেই। কোন লোক যদি এই সব উপদেশের বিরুদ্ধে কাজ করতে বলে তাকে দুষমন বলে মনে করবে। তার কথায় কান দেবে না।

৮। যে সব মহাপুরুষ কাম ও লোভ জয় করে জগদীশ্বরের কাছে মনপ্রাণ সমর্পণ করেছেন তাঁদের আশ্রয়ে বাস করা বিশেষ কর্তব্য বলে মনে করবে। মহাপুরুষের আশ্রয় সিকান্দার শাহ্‌র প্রাচীর অপেক্ষাও দৃঢ়তর বলে জানবে।

উপদেশ দিলেও বোঘরা সেগুলি পালন করবে বলে বলবন বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁর এই সন্দেহ যে অমূলক নয় তা প্রতিপন্ন হোতে বেশী সময় লাগল না। বঙ্গজয় দূরের কথা নিজ রাজ্য শাসন করবার মত সময়ও নাসিরুদ্দীন বোঘরা খাঁ পেতেন না। পিতা যে দুজন প্রবীণ কর্মচারীকে তাঁর সাহায্যের জন্য রেখে গিয়েছিলেন তাঁদের উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি স্ফূর্তিতে দিন কাটাতে লাগলেন। বাছাবাছা চাটুকার নিয়ে বসল তাঁর রাজসভা—সুন্দরী তরুণীরা শোভা পেল প্রমোদকুঞ্জে। বাকি সময় কাটল মৃগয়ায়।

এইভাবে লখনৌতির নির্ঝঞ্ঝাট আবহাওয়ায় নাসিরুদ্দীন বোঘরা খাঁর দিন ভালই কাটছিল—কিন্তু এত সুখ বুঝি তাঁর সয় না! এক দিন দিল্লী থেকে

খবর এল যে বিধর্মী মোঙ্গলরা লাহোর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ মহম্মদ সুলতান ধরাশায়ী হয়েছেন (১২৮৭, ফেব্রুয়ারী ১০)। তুগ্রাল নিধনের উল্লাসের পর এই নিদারুণ বিপর্য্যয় সংবাদ সুলতান বলবনকে দিশাহারা করে দিয়েছে—পুত্রশোকে তিনি ভেঙে পড়েছেন। কখন কি হয় তা বলা যায় না! তাই লখনৌতি থেকে বোঘরা খাঁকে দিল্লীতে এনে বলবন আমীরদের সামনে ঘোষণা করলেন যে তাঁর দিন ফুরিয়ে এসেছে—তিনি এন্তেকাল ফর্মালে নাসিরুদ্দীন বোঘরা খাঁ যেন দিল্লীর তখ্‌তে আরোহণ করেন। এখন বোঘরা খাঁর লখনৌতিতে ফেরবার দরকার নেই, একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী সেখানে গিয়ে তাঁর নায়েব হিসাবে শাসনকার্য্য পরিচালনা করুক।

নাসিরুদ্দীন বোঘরা খাঁর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। দিল্লীর তখ্‌তে বসবার অর্থ বিশাল সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নেওয়া। তাতে দিনরাত খাটতে হবে, গোমরামুখো অফিসারদের নিয়ে দফ্‌তর দেখতে হবে, সিপাহ্‌-শালারদের সঙ্গে লড়াইয়ের শলাপরামর্শ করতে হবে। এত কাজ করবার পর স্ফূর্তির সময় মিলবে কি করে? কাজ নেই দিল্লীর তখ্‌তে—লখনৌতির প্রমোদকুঞ্জ তার চেয়ে অনেক ভাল। সেখানে ফিরে আসবার জন্য বোঘরা খাঁ সর্ব প্রকারে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু পিতা শয্যাশায়ী হোলেও তাঁর চক্ষে ধুলা দেওয়া সহজ হোল না। কয়েক মাস ধরে প্রায় নজরবন্দী হয়ে কাটাবার পর শেষ পর্য্যন্ত তিনি এক দিন শিকার করবার নাম করে দলবলসহ লখনৌতিতে পালিয়ে এলেন। সেখানে আবার পূর্বের মত বিলাসের স্রোত বইতে লাগল।

বোঘরার পলায়নের সংবাদ বলবনের কাছে পৌঁছালে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। অমানুষিক নিষ্ঠুরতা দিয়ে যে সাম্রাজ্য তিনি গড়ে তুলেছেন মৃত্যুর পূর্বে তাকে কার হাতে তুলে দিয়ে যাবেন? বোঘরা তাঁর বুক ভেঙে দিয়ে গেল—আর কে আছে যে দায়িত্ব নেবে? বলবনের জীবনদীপ নিভে আসছিল, উপযুক্ত কোন উত্তরাধিকারীর দেখা না পেয়ে শেষ পর্য্যন্ত তরুণ পৌত্র কাইখসরুকে নিজের স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কাইখসরু ছিলেন বলবনের জ্যেষ্ঠ সন্তান মহম্মদ সুলতানের পুত্র। তাকে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন যতই যুক্তিসঙ্গত হোক না কেন উজীর নাজিমুদ্দীন তাঁকে সরিয়ে বোঘরা খাঁর অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র কাইকোবাদকে সিংহাসনে বসালেন।

সাম্রাজ্য কাইকোবাদের নামে চলতে লাগল, কিন্তু সকল ক্ষমতা আত্মসাৎ করে নিলেন এই উজীর। নূতন সুলতান রাজধানীতে থাকলে পাছে আমীর ওমরাহরা তাঁকে ঘিরে দল পাকায় সেই ভয়ে তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে কিলুখাড়িতে এক প্রমোদ প্রাসাদ নির্মাণ করে তাঁকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। প্রাসাদে বিলাস ব্যসনের অপর্য্যাপ্ত আয়োজন করা হোল—তরুণ সুলতান তার মধ্যে ডুবে গেলেন। কিন্তু কাউকে বিশ্বাস নেই—পাছে কেউ এই পরিকল্পনা বানচাল করে দেয় তাই উজীরের লোকজন সেই প্রাসাদের উপর প্রখর দৃষ্টি রাখতে লাগল।

পিতাপুত্রে যুদ্ধের প্রস্তুতি

উজীর বিরোধীরা যখন দেখল যে কাইকোবাদ কার্য্যতঃ নিজ প্রাসাদে বন্দী হয়ে পড়েছেন তখন তাঁরা লখনৌতিতে এসে সমস্ত ঘটনার উপর বেশ খানিকটা রং চাপিয়ে বোঘরা খাঁর সম্মুখে উপস্থাপিত করল। বোঘরা খাঁ নিজে যাই হোন পুত্রের এই দশা শুনে তাঁর স্বপ্নবিলাস ভেঙে গেল, নিজ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে পুত্রের কাছে এক উপদেশ লিপি পাঠালেন। কিন্তু সে লিপির কোন জবাব এল না বা দিল্লীর অবস্থার যে কিছু পরিবর্তন হয়েছে তার কোন ইঙ্গিতও পাওয়া গেল না। উৎকণ্ঠিতপ্রাণ বোঘরা খাঁ দেখলেন যে নিজে দিল্লীতে যাওয়া ছাড়া কাইকোবাদকে বাঁচাবার আর কোন উপায় নেই। কিন্তু পথ তো আগের মত নিষ্কণ্টক নয়। এই সেদিন পিতার আহ্বানে যেরূপ স্বচ্ছন্দে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন এখন তা সম্ভব হবে না, তাঁকে নিরস্ত্র দেখলে উজীরপক্ষীয়গণ হত্যা বা গুম করবে। আশৈশব তুর্কীদের কূটনীতির মধ্যে লালিত পালিত হয়ে তিনি ভাল করে বুঝেছিলেন যে যুদ্ধ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথ নেই। পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ না করলে পুত্রকে বাঁচান একেবারেই অসম্ভব।

লখনৌতি থেকে নাসিরুদ্দীন বোঘরা খাঁ সসৈন্যে দিল্লীর দিকে আসছেন শুনে উজীর নাজিমুদ্দীনও সৈন্য সমাবেশের আদেশ দিলেন। সুলতান কাই-কোবাদকে পুরোভাগে রেখে দিল্লী ফৌজ পূব দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পিতা-পুত্রের যুদ্ধে অযোধ্যার মাটি সিক্ত হবে বলে সবাই ধরে নিল। কবি আমীর খসরু এই ঘটনা উপলক্ষ করে কিরাণ-উস-সালাতিন নামে যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে সরযু নদীর তীরে প্রতিদ্বন্দ্বী ফৌজ দুটি এসে

পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াল। উভয় ফৌজ প্রতিপক্ষের কাছ থেকে প্রথম আক্রমণের জন্য দিন গুণতে লাগল—যে কোন মুহূর্তে যুদ্ধ সুরু করবার আদেশ জারি হোতে পারে। কিন্তু তাদের সর্বাধিনায়কদ্বয় নিশ্চল। তাঁদের মনে কোন শান্তি নেই। এ কোন জিন তাঁদের এখানে টেনে এনেছে? পিতা পুত্রকে বা পুত্র পিতাকে যদি নিধন করে তাতে লাভ কার হবে? পিতা তো দিল্লীর মসনদ চান নি—এই তো সেদিন তিনি স্বেচ্ছায় সে মসনদ ত্যাগ করে লখনৌতিতে চলে এসেছেন। তবে আজ কেন এই রণসজ্জা? অপরিণত বয়স্ক হোলেও কাইকোবাদ উজীরের চক্রান্ত বুঝতে পেরে অনুতাপে দগ্ধ হোতে লাগলেন। এখনও সময় আছে—একবার একটি তীর নিক্ষিপ্ত হোলে আগুন আর নেভান যাবে না। সে আগুনে দিল্লী পুড়বে, লখনৌতি পুড়বে—সমস্ত বলবনী সাম্রাজ্য পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে যুদ্ধ বন্ধ করতে পারে একটি মাত্র লোক—সে কাইকোবাদের শিশু পুত্র কাইমূর। সৈন্যদের নিরস্ত রেখে কাইকোবাদ সেই শিশুকে পিতার তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলেন।

কে এ? পৌত্র? পোতা? পৌত্রের কচিমুখ দেখে বোঘরা খাঁর হৃদয় গলে গেল—তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বনের পর চুম্বনে ভরে দিলেন!

বিরাট দুইটি সৈন্যবাহিনী যা করতে পারত না সেই দুগ্ধপোষ্য শিশু তাই করল। সন্ধ্যার দিকে সুলতান কাইকোবাদ সভাসদ পরিবৃত হয়ে নদীতীরে নিজ তাঁবুতে বসে আছেন এমন সময়ে একখানি নৌকা এসে সামনের ঘাটে নোঙ্গর করল। দূর থেকে তিনি দেখলেন, নৌকার আরোহী আর কেউ নন—তাঁর পিতা বোঘরা খাঁ! কাইকোবাদ মসনদ ছেড়ে নগ্নপদে তাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন—তিনিও সাশ্রুনয়নে পুত্রকে আলিঙ্গন করলেন। দেবদূতগণ আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগল!

সুলতান কাইকোবাদ বললেন, তাঁর দিল্লীর মসনদে প্রয়োজন নেই—তিনি চান পিতার স্নেহ। সেই স্নেহের জন্য সব কিছু ত্যাগ করতে তিনি প্রস্তুত। পিতা যেন বলবনী সাম্রাজ্যের দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে ঠিক পথে পরিচালিত করেন। দিল্লীর মসনদ তাঁর নয়—তাঁর পিতার। কিন্তু পিতা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে স্বেচ্ছায় যে মসনদ তিনি ছেড়ে এসেছেন সেখানে আর ফিরে যাবেন

না। পুত্রকে মসনদে বসিয়ে অন্যান্য সভাসদদের সঙ্গে সারিবদ্ধ হয়ে তাঁর সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এই নাটকীয় মিলনের পর কাইকোবাদ দিল্লীর দিকে রওনা হোলেন—নাসিরুদ্দীন বোঘরা খাঁ চলে এলেন লখনৌতিতে। আসবার পূর্বে তিনি কাইকোবাদকে যে গোপন নির্দেশ দিয়েছিলেন তাই অনুসরণ করে কিছু দিন পরে উজীর নিজামুদ্দীনকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। কিন্তু কাইকোবাদের নিজের জীবনদীপও স্তিমিত হয়ে এসেছিল। বলবনের তিরোধানের পর থেকে খিলজী সর্দারগণ আবার মাথা তোলবার চেষ্টা করছিল—১২৯০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে তাদের নেতা জালালউদ্দীন খিলজী গোপনে কাইকোবাদ ও তাঁর শিশুপুত্র কাইমুরকে হত্যা করে মসনদ অধিকার করেন।

এই সংবাদ লখনৌতিতে বোঘরা খাঁর কাছে পৌঁছালে তিনি শোকে এমনই মুহ্যমান হয়ে পড়েন যে শেষ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পুত্র রুকনুদ্দীন কাইকাউসের অনুকূলে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন।

বলবনী বংশের অবসান

জালালউদ্দীন খিলজী বিশ্বাসঘাতকতা করে দিল্লী অধিকার করলেও তাঁর শত্রুর কোন অভাব ছিল না। সেই কারণে তিনি লখনৌতিতে নিজ অধিকার প্রসারিত করবার অবসর পান নি। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খিলজী বুন্দেল-খণ্ড, মালব, মেবার ও দেবগিরির বিরুদ্ধে সার্থক অভিযান চালান, কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে গৌড়ের উপর অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করেন নি। পরে যখন তিনি পিতৃব্যকে হত্যা করে মসনদ অধিকার করেন তখন চারিদিকে বিশৃঙ্খলা চলছে। সদ্য বিজিত রাজ্যগুলিতে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, উত্তর থেকে মোঙ্গলরা এসে দিল্লী সাম্রাজ্যের উপর মাঝে মাঝে হামলা করছে। খিলজীদের এই সব বিপত্তি রুকনুদ্দীন কাইকাউসকে দশ বৎসর ধরে স্বাধীনভাবে লখনৌতি শাসন করবার সুযোগ দেয়। গৌড় ও বিহার তাঁর দৃঢ় অধিকারে থাকে।

কি ভাবে যে তরুণ কাইকাউসের জীবনাবসান হয়েছিল সে কথা কোথাও লেখা না থাকলেও তাঁর মৃত্যুর পর দেখা গেল, লখনৌতির মসনদে অধিষ্ঠিত

হয়েছেন তাঁরই এক কর্মচারী সামসুদ্দীন ফিরোজ। তিনি শৈশবে ছিলেন গিয়াসুদ্দীন বলবনের ক্রীতদাস। লখনৌতিতে এসে আরামপ্রিয় নাসিরুদ্দীন বোঘরা খাঁকে কর্মদক্ষতায় খুশী করে উচ্চ পদ লাভ করেন। বোঘরা খাঁ যে সব কর্মচারীর হাতে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে স্ফূর্তিতে দিন কাটাতেন তিনি তাঁদের একজন। রুকনুদ্দীন কাইকাউসের সময়ে তিনি বিহারের শাসনকর্তা। দিল্লী থেকে খিলজীরা যদি লখনৌতির দিকে এগিয়ে আসে তাদের প্রতিরোধের প্রথম দায়িত্ব তাঁর উপর পড়বে বলে সুলতান কাইকাউস তাঁকে একটু বেশী রকম খাতির করতেন। কিন্তু এক দিন দেখা গেল যে সেই তরুণ সুলতান নিহত হয়েছেন এবং ফিরোজ শাহ নাম নিয়ে সামসুদ্দীন লখনৌতির সিংহাসনে আরোহণ করেছেন (১৩০১)।

এই ফিরোজ শাহ গৌড়ের সর্বশেষ ক্রীতদাস সুলতান।

বঙ্গে অভিযান

নবদ্বীপ পতনের পর এক শত বৎসর সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। দক্ষিণ রাঢ় তখনও স্বাধীন। সেখানে নিজ অধিকার প্রসারিত করবার জন্য ফিরোজ শাহ মুঙ্গের থেকে জিয়াউদ্দীন উলুঘ খাঁকে পাঠিয়ে দেন। কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধে জয়লাভ করলেও উলুঘ কোন স্থায়ী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। কিন্তু ফিরোজ শাহের পুত্র বাহাদুর শাহ রাজা দনুজমাধবকে পরাজিত করে বঙ্গ অধিকার করে নেন। লক্ষ্মণসেনের নিষ্ক্রমণের এক শতাব্দী পরে এই প্রথম বঙ্গের উপর তুর্কী অধিকার স্থায়ীভাবে প্রসারিত হয়। বৃদ্ধ দনুজমাধব দক্ষিণে সরে গিয়ে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের পত্তন করেন।

সামসুদ্দীন ফিরোজ শাহর দিন বেশ সুখে কাটছিল। দিল্লী থেকে আক্রমণের কোন সম্ভাবনা নেই, আবার প্রতিবেশী হিন্দু রাজগণ নানা সমস্যায় জর্জরিত। গৌড় থেকে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে তিনি নিজ নামে নামকরণ করলেন ফিরোজাবাদ। কিন্তু তাঁর শত্রু গোকুলে বাড়ছিল! তাঁর চার পুত্র পিতাকে অতিরিক্ত বেশী বাঁচতে দেখে অধৈর্য্য হয়ে গৌড়ের চার প্রান্তে বিদ্রোহবহ্নি জ্বালিয়ে দেয়। তাঁদের মধ্যে বঙ্গের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ ছিলেন করিৎকর্মা ব্যক্তি; পিতা ও ভ্রাতাদের যুদ্ধে পরাজিত করে তিনি

স্বাধীন হন। পরে ১৩২২ খৃষ্টাব্দে সুলতান ফিরোজের মৃত্যু হোলে অতি সহজে লখনৌতি অধিকার করেন।

গৌড়ের তখন চারিটি প্রদেশ—লখনৌতি, সোনারগাঁ, সাতগাঁ ও বিহার। প্রথম দুটিতে বাহাদুর শাহ নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করলেও শেষ দুটিতে তাঁর দুই ভাই রাজত্ব করছিলেন। তিনি সে দুটি অধিকার করবার আয়োজন করছেন শুনে এক ভাই নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম দিল্লীতে চলে গিয়ে সেখানকার নূতন সুলতান গিয়াসুদ্দীন তোগলকের সাহায্য প্রার্থনা করেন, প্রতিদানে বাহাদুরকে জীবিত ধরে আনবার প্রতিশ্রুতি দেন। ভ্রাতৃদ্রোহী এমন একটি রত্নকে সপক্ষে পেলে কে না খুসী হয়? তোগলক শাহ তাঁর সবচেয়ে শক্তিশালী ফৌজ দিয়ে সেনাপতি নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিমকে গৌড়ে পাঠিয়ে দেন।

বাহাদুর শাহের দুর্ভাগ্য

বাহাদুরের ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু। তবু তিনি লখনৌতির নগর প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে দিল্লী ফৌজের সঙ্গে লড়লেন, কিন্তু দ্বিতীয় দিন যুদ্ধের পর যখন বুঝলেন যে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তখন মুষ্টিমেয় সৈন্যসহ অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বঙ্গে পালিয়ে গেলেন। তোগলকী ফৌজ তাঁকে রেহাই দেয় নি—পিছু ধাওয়া করে শেষ পর্য্যন্ত মধুপুর জঙ্গলে গিয়ে তাঁর নাগাল পায়। সেখান থেকে বাহাদুর পালাতে পারতেন, কিন্তু তাঁর ঘোড়ার পা পাঁকে আটকে যাওয়ায় শত্রু তাঁকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে লখনৌতিতে নিয়ে আসে। নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিমের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হয়—দিল্লীশ্বর গিয়াসুদ্দীন তোগলক তাঁকে লখনৌতি এবং নিজ ফৌজের অধিনায়ক বহরম খাঁকে সাতগাঁ ও সোনারগাঁর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। বাহাদুরের গলায় দড়ি বেঁধে তাঁর কাছে দিল্লীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু গিয়াসুদ্দীন তোগলকের নিজের দিনও ফুরিয়ে এসেছিল। পুত্র মুশা খাঁ তাঁকে হত্যা করে মহম্মদ তোগলক নাম নিয়ে দিল্লীর মসনদে আরোহণ করেন (১৩২৫)। সঙ্গে সঙ্গে বাহাদুর শাহ মুক্তি পেয়ে সোনারগাঁয়ে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন। নাসিরদ্দীন ইব্রাহিম এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে আগের মত লখনৌতিতে স্বপদে বহাল থাকেন। তিনি নূতন সুলতানের প্রতি আনুগত্য

দেখালেও বৎসর খানেক পরে তাঁকে দিল্লীতে আহ্বান করে স্থকৌশলে অপসারিত করা হয়।

পিতৃহন্তা মহম্মদ তোগলকের যোগ্য সহকারী হয়ে গিয়াস্থদ্দীন বাহাদুর উভয়ের যৌথ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করতে লাগলেন। তাঁর এই আনুগত্যে মুগ্ধ হয়ে দিল্লীশ্বর তাঁকে পূর্বাঞ্চল জয়ের জন্য উৎসাহিত করেন। কিন্তু কয়লা ধুলেও ময়লা যায় না! বৎসর তিনেক পরে বাহাদুর যখন শুনলেন যে বড় রকমের এক বিদ্রোহ দমনের জন্য মহম্মদ তোগলক মুলতান গিয়েছেন তখন তাঁর মনে স্বাধীনতার স্পৃহা প্রবল হয়ে দেখা দেয়; স্বনামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচার স্থরু করেন। মহম্মদ তোগলক এরূপ সম্ভাবনার কথা আগে থেকে অনুমান করে বহরম খাঁকে বাহাদুরের নায়েব নিযুক্ত করেছিলেন। বহরম অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে বাহাদুরের বিদ্রোহ দমন করে তাঁকে বন্দী করেন। তাঁকে শুধু হত্যা করা হয় না মৃতদেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে তার ভিতর ঘাস পুরে মহম্মদ তোগলকের কাছে মুলতানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাই দেখে তোগলক শাহ্ মহা খুসী! জয়স্তম্ভের উপর সেটি কয়েক দিন রেখে দিয়ে সম্ভাব্য সকল বিদ্রোহীকে দেখাবার জন্য সাম্রাজ্যের বিভিন্ন রাজধানীতে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন!

ষাঁড়ের শত্রু বাঘের পেটে

বাহাদুরজয়ী বহরম খাঁকে সোনার গাঁর শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হোলেও কিছু দিন পরে দেখা গেল যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে এবং তার শিলাদার ফকরুদ্দীন সোনার গাঁ অধিকার করে বসেছেন। স্থলতান মহম্মদ তোগলক তখন দেবগিরির কাছাকাছি কোন জায়গায় যুদ্ধে ব্যস্ত থাকলেও তাঁকে দমন করবার জন্য আমীর কদর খাঁকে পাঠিয়ে দেন। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফকরুদ্দীন ব্রহ্মপুত্রের ওপারে এক জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নেন, কিন্তু গোপনে কদর খাঁর সৈন্যাধ্যক্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। এক দিন তাঁর কাছে খবর গেল যে কদর খাঁ রাজ্যের সব অঞ্চল থেকে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে সোনারগাঁ রাজকোষে জমা করছেন, খেমু বলেন বটে যে সমস্ত অর্থ দিল্লীতে পাঠাবেন, কিন্তু পাঠাবার নামও করেন না। ফকরুদ্দীন দেখলেন এই স্থযোগ, কদর খাঁর অর্থ গৃধ্নুতার জন্য তোগলকী সৈন্যদের মধ্যে যে বিক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। গুপ্তচর মারফৎ

তিনি নেতৃস্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষদের বলে পাঠালেন যে তারা যদি কদরকে সরিয়ে ফেলেন তা হোলে শুধু সেই সঞ্চিত অর্থ নয় আরও বহু অর্থ তাদের মধ্যে বেঁটে দেবেন। এ আর এমন কি কঠিন কাজ? টাকা পেলে সবই করা যায়। একদিন প্রত্যুষে দেখা গেল যে কদর খাঁ নিহত হয়েছেন এবং ফকরুদ্দীন রাজদণ্ড হাতে নিয়ে সোনারগাঁর রাস্তায় আবার চলাফেরা করছেন।

ফকরুদ্দীন ছিলেন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি—ফকির-দরবেশদের যথেষ্ট সম্মান দেখাতেন। নূতন করে তখ্‌তে আরোহণের পর এক ফরমান জারী করে তিনি রাজ্যের সর্বত্র এই আদেশ প্রচার করেন যে ফকির সেবার জন্য প্রতি গ্রাম থেকে নির্দ্ধারিত পরিমাণ অর্থ স্থানীয় রাজকোষে জমা দিতে হবে। সইদা নামে এক ফকিরকে তিনি এতই শ্রদ্ধা করতেন যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে সাতগাঁর শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ফকির হোলেও সইদার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কারও চেয়ে কম ছিল না। ঠিক বটে তিনি ফকরুদ্দীনের মুরশিদ; সেই কারণে প্রতিনিয়ত খোদার কাছে তাঁর জন্য দোয়া করেন। কিন্তু তা বোলে তো তিনি শাগরেদের নফর হয়ে থাকতে পারেন না। এক দিন সুযোগ বুঝে ফকরুদ্দীনের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করে তিনি সাতগাঁর স্বাধীন সুলতান হয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে যেখানে যত ফকির ছিল সবাই তাঁর রাজ্যে চলে এসে ইসলামের জয়ধ্বনি করতে লাগল! লখনৌতিতে ফকরুদ্দীনের কাছে এই সংবাদ পৌছালে তিনি উদ্ধতদিকে দমনের জন্য সোনারগাঁয়ে সৈন্য পাঠালেন। সইদার ফকিরবাহিনীও যুদ্ধক্ষেত্রে এসে হাজির হোল! কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত সিপাহীদের সামনে ফকির সৈন্যরা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে? ঘণ্টাখানেক যুদ্ধের পর সইদা পরাজিত ও বন্দী হোলে তাঁর ফকির ফৌজ ধরি কি মরি করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেল। ফকরুদ্দীনের আদেশে তাদের সবাইকে খুঁজে বার করে প্রকাশ্য রাজপথের উপর ফাঁসিকাষ্ঠে লটকানো হোল।

ইবন্ বতুতার কাহিনী

ফকরুদ্দীনের ইসলামপ্রীতির খবর পেয়ে এক কোরেশী সাধু তাঁর রাজ্যে আসেন ও গিয়াসপুরে শেখ নিজামুদ্দীন আউলিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর শ্রীহট্টে গিয়ে আস্তানা স্থাপন করেন। তাঁর প্রচারে প্রভাবিত হয়ে বহু

হিন্দু ইসলামে দীক্ষা নেওয়ায় তাঁর অনন্যসাধারণ শক্তির খবর দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সেই অসাধারণ শক্তিশালী শেখের দর্শন লাভের জন্য আফ্রিকান ভ্রমণকারী ইবন্ বতুতা ১৩৪৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে আসেন। তাঁর যাত্রাপথে কাইরো, বসরা, সিরাজ প্রভৃতি সমৃদ্ধশালী নগরী পড়ে, ইরাক, আফগানীস্থান, চীন প্রভৃতি দেশও তিনি ভ্রমণ করেছিলেন, কিন্তু কোথাও পণ্যদ্রব্য এত সুলভ দেখেন নি।

ইবন্ বতুতা তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে সে সময়ে প্রচলিত দিল্লী রতিতে পণ্যবস্তুর ওজন ও রৌপ্য দিনারে মূল্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এখনকার হিসাবে ১ দিল্লী রতি = ⅓মণ = ১২.৫ কিলো ও ১ দিনার = ৭ টাকা। এই হিসাবে সে সময়কার পণ্যদ্রব্যের নিম্নলিখিত মূল্য নির্দ্ধারণ করা যায়—

চাল	১ টাকায়	১⅓মণ
ধান	১ ,,	৪ ,,
গব্যঘৃত	১ ,,	১ সের ১০ ছটাক
গোলাপজল	১ ,,	২ সের
চিনি	১ ,,	১ সের ১০ ,,
মিহি কাপড়	১ ,,	১ গজ
ভেড়া	১টি	১ টাকা ১২ আনা
গাভী	১টি	২১ ..

যুবতী স্ত্রীলোক নিয়েও কেনাবেচা চলত। মূল্য নির্দ্ধারিত হোত দৈহিক সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি দিয়ে। এক দিন ইবন্ বতুতা দেখেন, এক ধনী ব্যক্তি ৭০ টাকা মূল্যে একটি সুন্দরী যুবতী ক্রয় করলেন। তিনিই বা ছাড়বেন কেন? প্রায় সমমূল্য দিয়ে অসুরা নামে এক সুন্দরী রক্ষিতা সংগ্রহ করেন।

নূতন রাজবংশের উদ্ভব

দিল্লীতে মহম্মদ তোগলক বহু মূল্যবান পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় ফকরুদ্দীনের মৌখিক আনুগত্য পেয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন। এই ভাবে দশ বৎসর সময় অতিবাহিত হবার পর সেই অর্দ্ধোন্মাদ সুলতানের কল্পনাবিলাসের জন্য সাম্রাজ্য যখন দুর্বল হয়ে পড়ে তখন সোনারগাঁয়ে ফকরুদ্দীনের ন্যায় লখনৌতিতে

আলাউদ্দীন মোবারক শাহ ও সাতগাঁয়ে ইলিয়াস শাহ দিল্লীর সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছেদ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। কিন্তু এই স্বাধীন রাজ্য তিনটির উদ্ভবের সময় থেকে সুরু হয় পরস্পরের মধ্যে কলহ। শেষ পর্যন্ত ১৩৪২ খৃষ্টাব্দে ইলিয়াস শাহ অতি সহজে আলাউদ্দীন মোবারককে পরাজিত করে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধীশ্বর হয়ে বসেন। তার পর থেকে সুরু হয় তাঁর অধীনে পশ্চিমবঙ্গ ও ফকরুদ্দীনের অধীনে পূর্ববঙ্গের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। দীর্ঘ পোনের বৎসর ধরে এই যুদ্ধ চলবার পর ইলিয়াস শাহ বিজয়ী হয়ে ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে সমগ্র গৌড়-বঙ্গের অধীশ্বর হয়ে বসেন।

সেন বংশের নিষ্ক্রমণের দেড় শতাব্দী পরে এই প্রথম একটি ধারাবাহিক রাজ বংশের অভ্যুদয় হয়।

1. বানেশ্বর ও শুক্রেশ্বর, রাজমালা পৃঃ ৬৩
2. Yahya bin Ahmed Sirhindi *Tarikh-i-Mubarak Shahi*, Eng. trans, K. K. Bose, p. 30
3. Ziauddin Barani *Tarikh-i-Firuz Shahi*, Eng. trans. Elliot, p. 83
4. Mahdi Hussain A. *Futuh-us-Salatin*, p. 183
5. Amir Khusru *Qiran-us-Salatin*, Cowel's trans. p. 183
6 Ibn Batuta, *Travels*, Eng. trans. Gibbs. p. 267

নবম অধ্যায়

ইলিয়াসশাহী বংশ

ইলিয়াস শাহর দিগ্বিজয়

দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের অমূল্য সব পরিকল্পনার জন্য জনসাধারণের দুর্দশা যখন চরমে উঠেছে সেই সময়ে সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ পূর্ব ভারতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তোগলক সুলতান অসহায়, কারণ তাঁর খামখেয়ালীর জন্য সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে, সাম্রাজ্য ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। এলাহাবাদ ও বাহ্‌রাইচের পূর্ব দিকে যে সব হিন্দু নরপতি ছিলেন তাঁরা দিল্লীর আনুগত্য ত্যাগ করে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছেন। তাঁদের দমন করতে এসে তোগলকী বাহিনী রিক্ত হস্তে ফিরে গেছে। এই সামন্ত বিদ্রোহের ফলে দিল্লীর সঙ্গে গৌড়ের সম্পর্ক আর একবার ছিন্ন হয় ও ইলিয়াস শাহ নিরুদ্বেগে আত্মপ্রসারের সুযোগ পান। তাঁর উত্তর-পশ্চিমে মিথিলার দুই অংশে তখন শক্তিসিংহ ও কামেশ্বর সিংহ রাজত্ব করছিলেন। একে তাঁদের রাজ্য ছোট তায় পরস্পরের মধ্যে তিক্ততা যথেষ্ট। সেই কারণে ইলিয়াস শাহ সহজে উভয় রাজ্য বশীভূত করে ১৩৪৬ খৃষ্টাব্দে নেপালের দিকে ধাবিত হন।

পাহাড় পর্বত অতিক্রম করে কোন সমতলবাসী সৈন্যবাহিনী যে তাদের দেশে প্রবেশ করবে এমন কথা কোন নেপালী কল্পনা করতে পারত না। নেপালাধীশ জয়রাজদেব বা তাঁর মন্ত্রী জয়স্থিতিবান ইলিয়াস শাহর আক্রমণের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই তিনি প্রায় বিনা বাধায় কাঠমাণ্ডু পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং স্বয়ম্ভুনাথ স্তূপ ও শাক্যমুনির পবিত্র মূর্তি ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করেন। কিন্তু অতর্কিত আক্রমণের ধাক্কা সামলে নেপালী সৈন্যরা যখন এসে তাঁর সম্মুখীন হয় তখন তিনি অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে স্বরাজ্যে পালিয়ে আসেন।

নেপালের এই অভিজ্ঞতায় উৎসাহিত হয়ে ইলিয়াস শাহ পর বৎসর চললেন উড়িষ্যায় ভাগ্য পরীক্ষা করতে। সেখানকার শাসকরাও তার অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরাই বরাবর তুর্কী রাজ্য আক্রমণ করেছেন, কোন তুর্কী ফৌজ এসে যে তাঁদের রাজ্যে প্রবেশ করবে এরূপ কথা কখনও ভাবেন নি। ইলিয়াস শাহর নিজের মনেও গঙ্গাসাম্রাজ্যের শক্তি সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। সবার চক্ষু ঝলসে দেবার জন্য তিনি বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন এবং রাজধানী ও রক্ষাদুর্গগুলি পাশ কাটিয়ে একেবারে চিলকা হ্রদের তীরে গিয়ে উপস্থিত হন। তাঁর সৈন্যরা পথের উভয় পার্শ্বে বহু মন্দির ধ্বংস করে। শেষ পর্য্যন্ত নেপালের মত এখানেও গঙ্গাবাহিনী এসে সম্মুখ সমরে আহ্বান করলে তারা পশ্চাদপসারণ সুরু করে, যেমন ত্রাস্ত গতিতে চিল্কা তীরে গিয়ে পৌছেছিল তেমনি ত্রাস্ত গতিতে গৌড়ে ফিরে আসে। কিছু লুণ্ঠিত মণিমাণিক্য ও চল্লিশটি হস্তী ছাড়া এই ব্যয়বহুল অভিযানে কোন লাভ হয় নি।

তোগলকী আক্রমণ

নেপাল ও উড়িষ্যার এক সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি অধিকার করতে না পারলেও ইলিয়াস শাহ উৎসাহের আতিশয্যে দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। আমার এই প্রভূত ধনসম্পদ, বিরাট সৈন্যবাহিনী ও দুর্ভেদ্য নৌবহর—এ নিয়ে আমি দিল্লী আক্রমণ করব না কেন? সেখানে গিয়ে শেখ-উল-ইসলাম হজরত নিজামুদ্দীনের দরবারে কুর্নিশ করলে আমাকে বাধা দেবে কে? লাহোর থেকে সোনারগাঁ পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করে আমার ফৌজ যাবে দক্ষিণে দৌলতাবাদে ও উত্তরে সমরখন্দ-বোখারায়। আমি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসব, সবাই আমাকে খলিফার মত মর্য্যাদা দেবে। ইলিয়াস শাহ যখন এইরূপ দিবাস্বপ্ন দেখছিলেন তখন দিল্লীর নূতন সুলতান ফিরোজ তোগলক বিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্যের সংহতি সাধনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। আয়োজন সম্পূর্ণ হোলে নব্বই হাজার অশ্বারোহী ও এক হাজার রণতরী সম্বলিত বিশাল বাহিনী নিয়ে তিনি ১৩৫৩ খৃষ্টাব্দে পূর্বাঞ্চল জয়ের জন্য দিল্লী থেকে রওনা হন। অযোধ্যার যে সব হিন্দু সামন্ত ইতিপূর্বে স্বাধীনতা অবলম্বন করেছিলেন তাঁরা

প্রতিরোধ নিরর্থক বুঝে সুলতান ফিরোজের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু আয়তন ও লোক সংখ্যায় ইলিয়াস শাহর রাজ্য তোগলকী সাম্রাজ্যের চেয়ে কিছু কম ছিল না; তিনি ভয় পাবেন কেন? সুলতান ফিরোজের সম্মুখীন হবার জন্য তিনি বিরাট বাহিনীসহ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হোলেন, অযোধ্যায় ঘর্ঘরা নদীর তীরে দিল্লী বাহিনীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হোল। কিন্তু যুদ্ধে কিছু সুবিধা হোল না। ইলিয়াস শাহ্ পরাজিত হয়ে পিছু হটতে থাকলে ফিরোজশাহী সৈন্যগণ তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে গৌড়ের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

মহানন্দা ও কালিন্দী নদীর সঙ্গমস্থল থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত ইলিয়াস শাহর রাজধানী ফিরোজাবাদ ছিল অরক্ষিত নগরী। সেখানে না ছিল কোন দুর্গ, না ছিল নদী পাহাড় প্রভৃতির স্বাভাবিক রক্ষা ব্যবস্থা। সেই কারণে রাজধানীর প্রবেশদ্বারে দিল্লী সৈন্যদের প্রতিরোধ করা অসম্ভব বিবেচনা করে তারা যখন কোশী নদী পার হবার জন্য পুল তৈরী করছিল সেই অবসরে সেখান থেকে ইলিয়াস শাহ্ সমস্ত রাজকোষ ও সৈন্যসামন্ত লখনৌতির রক্ষাদুর্গ একডালায় অপসারিত করেন। সেই মহাদুর্গে সৈন্যবাহিনী ছাড়া আমীর ওমরাহ-দের পরিবারবর্গেরও স্থান হয়। এই অপসারণ কার্য্য যখন সম্পন্ন হয়েছে তখন দিল্লী বাহিনী ফিরোজাবাদে এসে দেখে সব শূন্য—সব একডালায় চলে গেছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে বল্লালসেন নির্মিত একডালা দুর্গকে বিভিন্ন তুর্কী সুলতান যথেষ্ট সম্প্রসারিত করেছিলেন। ষাট ফুট প্রশস্ত পর পর দুইটি পরিখা দিয়ে ঘেরা সেই বিশাল দুর্গ অধিকারের জন্য ফিরোজ শাহ্ প্রাণপাত চেষ্টা করলেন, উভয় পক্ষের নিক্ষিপ্ত শরে প্রতি দিন অসংখ্য সৈন্য হতাহত হোতে লাগল। কিন্তু দিল্লী সৈন্যরা পরিখা পার হোতে পারে না, লখনৌতি সৈন্যরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসে না। এই ভাবে মাসের পর মাস চলবার পর একডালার ভাপসা গরম ও মশার কামড়ে দিল্লী ফৌজ অস্থির হয়ে পড়ল। তার উপর ছিল দীর্ঘকালব্যাপী আত্মীয় বিচ্ছেদজনিত চিত্তচাঞ্চল্য। সৈন্যদের এই অস্থিরতা লক্ষ্য করে সুলতান ফিরোজ তাঁবু গুটোবার আদেশ দিলেন। তার আয়োজনও চলতে লাগল। সে খবর ইলিয়াস শাহর কাছে গোপন থাকল না, কিন্তু কয়েকজন কালান্দারী ফকির তাঁর কাছে গিয়ে কারণ ব্যাখ্যা করে বলল যে নিজ সৈন্যদের মধ্যে

আসন্ন বিদ্রোহ পরিহার করবার জন্য সুলতান ফিরোজ দিল্লী ফিরে যাচ্ছেন।

ফকিরদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে দিল্লী সৈন্যরা যখন চলে যাচ্ছিল ইলিয়াস শাহ তখন তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে দুর্গের বাইরে এসে শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন সুরু করেন। তা দেখে ফিরোজ শাহ পলায়নের ভান করে সাত ক্রোশ দূরে এক খালের ওপারে গিয়ে থমকে দাঁড়ালে ইলিয়াস শাহ সেখানে তাঁকে আক্রমণের উদ্যোগ করেন। উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে এইরূপ রণক্ষেত্র সুলতান ফিরোজ চেয়েছিলেন ; প্রতিদ্বন্দ্বীকে এখানে টেনে আনবার জন্যই তিনি কালান্দারী ফকির-দের একডালায় পাঠিয়েছিলেন। তাঁর ব্যূহ অটুট ও সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত ছিল। ইলিয়াস শাহ দেখলেন যে দুর্গের ভিতর থেকে যুদ্ধ করায় যে সুযোগ সুবিধা তিনি এত দিন ভোগ করছিলেন তার কিছুই এখানে নেই। তবু তিনি যুদ্ধ করলেন, তাঁর পাইকরা জীবন তুচ্ছ করে শত্রুর অশ্বারোহীদের আক্রমণ করতে লাগল। সেই লোমহর্ষক সংগ্রামে উভয় পক্ষে হাজার হাজার সৈন্য হতাহত হোল, উভয় সুলতান অশ্বপৃষ্ঠে ঘুরে সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। আবার উভয়ে মাঝে মাঝে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে আল্লার কাছে প্রার্থনা জানালেন। এই ভাবে সারা দিন ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলবার পর দেখা গেল যে ইলিয়াস শাহর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে একডালার দিকে পালিয়ে যাচ্ছে, তাদের সুলতানের রাজচ্ছত্র ফিরোজ শাহর মাথায় শোভা পাচ্ছে।

পলায়নপর ইলিয়াসশাহী সৈন্যরা একডালায় ফিরে এলে সেই মহাদুর্গের তোরণদ্বার আবার বন্ধ হয়ে গেল। এখন তাদের সংখ্যা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে, অফিসারদের অনেকেই পরলোকে। তাদের পিছনে ধাওয়া করে ফিরোজ শাহও মহা উৎসাহে ফিরে এলেন—তাঁর অগ্রগামী বাহিনী একটি পরিখা পারও হোল। তাই দেখে দুর্গের ভিতরে যে সব খানদানি পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল, শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য সবাই ইলিয়াস শাহর উপর চাপ দিতে লাগল। পরের দিন যা হোক কিছু করবার আশ্বাস দিয়ে তিনি সবাইকে নিজ নিজ কক্ষে ফিরবার জন্য নির্দেশ দিলেন।

নিদারুণ উদ্বেগের মধ্যে সবার রাত কাটল। মুহুর্মুহুঃ গুজব উঠতে লাগল যে ফিরোজশাহী সৈন্যরা এখনই নূতন করে আক্রমণ সুরু করবে। তাদেরও একই

ভয়, অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কায় মনে কোন স্বস্তি নেই। এইরূপ আশা নিরাশার মধ্যে রাত কাটাবার পর প্রভাতে শয্যাত্যাগ করে সুলতান ফিরোজ সবিস্ময়ে দেখলেন যে পরিখার ওপারে দুর্গ প্রাকারের উপর দাড়িয়ে বহু মুসলমান রমণী নিজেদের বোরখা খুলে মুক্তকেশে করজোড়ে স্বামীপুত্রের জীবন ভিক্ষা চাইছে। এই থেকে দুর্গরক্ষীদের দুর্বলতা ভাল করে প্রতিভাত হোলেও তিনি থমকে দাড়ালেন। পূর্ব দিনের যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন বটে কিন্তু তাঁর ক্ষয়ক্ষতি বড় কম হয় নি। তাঁর অসংখ্য সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, বাকি সৈন্যরা রণক্লান্ত। তাদের দ্বারা দুর্গদ্বার খোলান সহজ হবে না। তাই মুসলমান নারীর ক্রন্দনে সুলতান ফিরোজের হৃদয় গলে গেল, তিনি সৈন্য-দের আদেশ দিলেন: অবরোধ তুলে নিয়ে দিল্লীর দিকে রওনা হও। পূর্ব দিনের যুদ্ধে যে ৭৭টি হস্তী তাঁর হস্তগত হয়েছিল সেগুলি তাঁর সঙ্গে চলল।

আখি সিরাজউদ্দীন ও শেখ বিয়াবনী

ইলিয়াস শাহ ছিলেন ভাঙরা—ভাঙখোর। সকাল সন্ধ্যায় ভাং খেতেন বলে জনসাধারণ তাঁকে এই নামে ডাকত। নেশাখোর হোলেও সাধুফকিরদের তিনি যথেষ্ট সম্মান করতেন। তাঁর সময়ে দিল্লী থেকে পীরের পীর আখি সিরাজউদ্দীন ওসমান গৌড়ে এসে আস্তানা স্থাপন করেন। তাঁর মুরশিদ নিজামুদ্দীন আউলিয়া তাঁকে হিন্দুস্থানের দর্পণ বলতেন। এই মুরশিদের আদেশে তিনি গৌড়ে এসে বিভিন্ন সুলতানের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য ও সম্মান লাভ করেন।

শেখ বিয়াবনী পাণ্ডুয়ার উপকণ্ঠে এক জঙ্গলে বাস করতেন। তাঁর প্রতিও হাজি ইলিয়াসের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। দিল্লী সৈন্যরা যখন একডালা দুর্গ অবরোধ করে রয়েছে তখন সেই সাধুর মৃত্যু হয়েছে শুনে তিনি ফকিরের ছদ্মবেশ পরে দুর্গের বাইরে চলে আসেন এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সকল ব্যবস্থা করেন। প্রবাদ এই যে, সে সময়ে তিনি ফিরোজ শাহর শিবিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপও করে-ছিলেন। কিন্তু দিল্লীশ্বর তাঁকে এক সামান্য ফকির ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারেন নি।

কামরূপ অভিযান

ফিরোজ শাহর প্রস্থানের পর দেখা গেল যে প্রতিটি জল ও স্থল যুদ্ধে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও ইলিয়াস শাহর রাজ্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এমন কি দিল্লীশ্বর তাঁর বিজিত অঞ্চলগুলিতেও নিজের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। তা সত্ত্বেও যুদ্ধশেষে ইলিয়াস শাহ বুঝে নেন যে দিল্লীর সঙ্গে বিবাদ চালালে শেষ পর্যন্ত কিছু লাভ হবে না। তাই পূর্ব তিক্ততার কথা ভুলে গিয়ে এক দূতকে মূল্যবান উপঢৌকনসহ দিল্লীতে ফিরোজ শাহর দরবারে পাঠিয়ে দেন। সুলতান ফিরোজ এই আনুগত্যে খুসী হয়ে দূতের মুখে অনুরোধ পাঠান যেন তাঁকে কয়েকটি হস্তী প্রদান করা হয়। সে অনুরোধ রক্ষা করে পর বৎসর ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে হাজী ইলিয়াস পুনরায় দিল্লীতে উপঢৌকন পাঠালে ফিরোজ শাহ প্রতিদানে কয়েকটি তুর্কী ও আরবী ঘোড়া ও কিছু খোরাসানি মেওয়া তাঁকে উপহার দেন। এইভাবে দুই সুলতান পরোক্ষে পরস্পরের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন।

ইলিয়াস শাহ যখন বুঝলেন যে দিল্লী থেকে আর কোন বিপদ আসবে না তখন তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে চললেন পূর্ব দিকে --কামরূপে। শতাব্দীকাল পূর্বে গিয়াসুদ্দীন ইউয়াজ ঐ রাজ্য জয় করতে গিয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হবার পর থেকে কোন তুর্কী সুলতান সে দিকে পা বাড়াবার সাহস করেন নি। কিন্তু ইলিয়াস শাহর কথা স্বতন্ত্র। তিনি যখন নেপাল ও উড়িষ্যা আক্রমণ করে বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিলেন তখন কামরূপ তো একেবারেই তুচ্ছ। তাঁর সুবিধাও ছিল অনেক। গুপ্তচরদের কাছ থেকে রিপোর্ট আসছিল যে পূর্ব দিক থেকে অহমরা এসে মাঝে মাঝে ওই অঞ্চলে আক্রমণ চালাচ্ছে বলে সেখানকার সৈন্যবাহিনী পূর্ব সীমান্তে আবদ্ধ রয়েছে। পশ্চিম সীমান্ত প্রায় রক্ষীশূন্য। তাই তিনি হঠাৎ ওই রাজ্য আক্রমণ করলে রাজা ইন্দ্রনারায়ণ তাঁর গতিরোধ করতে অসমর্থ হন। সমগ্র কামরূপ জয় সম্ভব হয় নি বটে কিন্তু এখনকার ময়মনসিংহ জেলার অধিকাংশ অঞ্চল ইলিয়াস শাহর অধিকারভুক্ত হয়।

সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-৮৯)

সুলতান সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করলে তাঁর

জ্যেষ্ঠ পুত্র সিকান্দার শাহ মসনদে আরোহণ করেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করার জন্য অভিষেকের পরে তিনি পাঁচটি হস্তী ও নানাবিধ খিলাৎসহ এক দূতকে দিল্লী দরবারে পাঠিয়ে দেন। সুলতান ফিরোজ তা গ্রহণ করলেও খুসী হন নি। ইলিয়াস শাহকে বারবার যুদ্ধে পরাজিত করা সত্ত্বেও সমগ্র গৌড় যে তাঁর সাম্রাজ্যের বাইরে রয়েছে এ কথা তিনি কোন দিন ভোলেন নি। এখন তাঁর সম্মুখে এক মহা সুযোগ এসেছে। যে ফকরুদ্দীনকে সবংশে নিধন করে ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁ দখল করেছিলেন তাঁর জামাতা জাফর খাঁ দিল্লীতে চলে এসে সুলতান ফিরোজের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁকে বার্ষিক চার লক্ষ টাকা বেতনে গৌড়ের নায়েব-উজীর নিযুক্ত করে সুলতান ফিরোজ সিকান্দার শাহর কাছে চরমপত্র পাঠালেন : হয় দিল্লীর আধিপত্য মেনে নাও, নয় নিপাত যাও। দিনের পর দিন চলে গেল; কিন্তু পত্রের কোন জবাব এল না—কোন জবাব চানও নি ফিরোজ শাহ। সিকান্দারকে দমনের জন্য তিনি ৮০ হাজার অশ্বারোহী ও ৪৭০ হস্তী সমন্বিত এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে গৌড়ে চলে এলেন।

পূর্ব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। পিতৃ রণনীতি অনুসরণ করে সিকান্দার শাহ নিজ সীমান্তে আক্রমণকারীদের বাধা দিলেন না—বিনা যুদ্ধে রাজধানী তাদের হাতে তুলে দিলেন। ঠিক পূর্বের মত সমগ্র সৈন্যবাহিনী ও রাজকোষ তার পূর্বে একডালা দুর্গে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল; সুলতান ও সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের পরিবারবর্গও সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। উভয় পক্ষের সেই মহাযুদ্ধ একডালার চারপাশে আবর্তিত হতে লাগল। দিনের পর দিন আক্রমণকারীরা দুর্গের উপর আঘাত হানে, কিন্তু কোথাও বিন্দুমাত্র ফাটল ধরাতে পারে না। একদিন এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় যুদ্ধের এক কৌতুকব্যঞ্জক ধারা সংযোজিত হয়। সিকান্দারের নামাঙ্কিত একটি গম্বুজ তাঁরই লোকজনের ভারে ভেঙ্গে পড়ায় দুর্গ প্রাকারের এক অংশে একটি ফাটল বেরিয়ে পড়লে দূর থেকে তা দেখে সুলতান ফিরোজ তাজ্জব বনে যান। এ কি? এইভাবে কি সিকান্দার শাহ তাঁর সৈন্যদের ভিতরে টেনে নিয়ে গিয়ে পরে পিষে মারবার চক্রান্ত করেছেন? ও ফাঁদে পা দেওয়া হবে না। তিনি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পূর্বে কিছু সৈন্য উৎসাহের আতিশয্যে সেই ফাটলের ভিতর

দিয়ে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করবার চেষ্টা করল। কিন্তু তারা বেশী দূর এগোবার পূর্বে তিনি সবাইকে ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর হিসাবের ভুলে সুযোগটির সদ্ব্যবহার করা হোল না।

দিনের পর দিন মাসের পর মাস এমনি অলসভাবে সৈন্যদের দিন কেটে যেতে লাগল। এরূপ যুদ্ধে কোন আনন্দ পাওয়া যায় না। তাই উভয় পক্ষ একটি সম্মানজনক সমঝোতার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছে এমন সময়ে মধ্যস্থতার জন্য এগিয়ে এলেন সুলতান ফিরোজের দলভুক্ত এক তীক্ষ্ণধী বাঙালী অফিসার। তিনি ছিলেন ও পক্ষে, অথচ তাঁর দুই পুত্র সিকান্দার শাহের পক্ষে যুদ্ধ করছিল। কতকটা পুত্রদের মুখ চেয়ে, আবার কতকটা শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে তিনি বারবার উভয় শিবিরে যাতায়াত করতে লাগলেন। তাঁর দৌত্যালির ফলে শেষ পর্য্যন্ত এক দিন বিবদমান সুলতানদ্বয়ের মধ্যে একটি সম্মানজনক সন্ধি স্থাপিত হোল। পরস্পরের মধ্যে খিলাৎ আদানপ্রদানের পর সুলতান ফিরোজ নিজ রাজধানীর দিকে ফিরে গেলেন, সিকান্দার শাহও দুর্গ থেকে বেরিয়ে এলেন। খানদানি ব্যক্তিরা নিজ নিজ জায়গীরে গিয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম সুরু করলেন। তার পর দীর্ঘ কাল ধরে কোন দিল্লী সুলতান গৌড়ের উপর আধিপত্য দাবী করেন নি।

আদিনা মসজিদ

এর পর কোন সীমান্ত থেকে বিপদের আশঙ্কা না থাকায় সিকান্দার শাহ ইসলামের সেবায় মনপ্রাণ সঁপে দেন। এক দিকে তিনি মোল্লা-মৌলবীদের দরাজ হস্তে সাহায্য করতেন, আবার অন্য দিকে রাজ্যের নানা স্থানে মসজিদ, মিনার ও দরগা নির্মাণ করে নিজের শিল্পানুরাগের পরিচয় দেন। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ তাঁর শিল্পানুরাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই মসজিদের নির্মাণকার্য্য ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে সুরু হয়ে ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চলে। মসজিদশিল্পে সারা ভারতে এর কোন তুলনা নেই। অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত দামাস্কাসের মহামসজিদের সমতুল্য এই মসজিদ উত্তর-দক্ষিণে ৫০৭ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৮৫ ফুট দীর্ঘ। এখন পরিত্যক্ত হোলেও এক সময়ে হাজার হাজার ধার্মিক ব্যক্তি এখানে সমবেত হয়ে আল্লার কাছে প্রার্থনা করতেন। যাতে রাজধানীর সকল নমাজী

এক জায়গায় জমায়েত হয় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে সিকান্দার শাহ এই বিরাট মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন।

পার্শী ব্রাউন বলেন, সীমাহীন খিলানে ঘেরা এই মসজিদের ভিতরকার চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে দর্শক যদি চারি দিকে নিরীক্ষণ করেন তা হোলে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়বেন; তাঁর মনে হবে যে মুসলমানের প্রার্থনাগৃহে না এসে কোন পুরাযুগীয় নগরীর সার্বজনীন মিলনক্ষেত্রে এসে সমবেত হয়েছেন। হাজার হাজার নমাজীর স্থান সংকুলানের জন্য এটি নির্মিত হোলেও কোথাও স্কেলের অসাম্য নেই; এর বাদশাহী আভিজাত্য দর্শকদের দৃষ্টি এড়ায় না। অন্যান্য মসজিদের তুলনায় আদিনা এমন কিছু সুষমামণ্ডিত না হোলেও এর নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে।

এই বিরাট মসজিদ নির্মাণের জন্য যথারীতি হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস করে মালমশলা সংগৃহীত হয়েছিল। রাজমহল পাহাড় এমন কিছু দূরে নয়, কিন্তু সেখান থেকে পাথর আনবার আয়াসটুকুও সুলতান সিকান্দার করেন নি; কাছাকাছি কোন মন্দির ভেঙে সেগুলি সংগ্রহের নির্দেশ দেন। ভাঙা মন্দিরের গায়ে যে সব মূর্তি খোদিত ছিল সেগুলি তুলে দিয়ে পাথর চৌরস করবার পরিবর্তে মূর্তিসহ সেই পাথর উল্টা করে বসিয়ে মসজিদের দেওয়াল গাঁথা হয়। পার্শী ব্রাউনের মতে এই একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য লক্ষ্মণাবতীর সর্বোৎকৃষ্ট হর্মরাজি ধ্বংস করা হয়েছিল! এর মিনারগুলি যে বৌদ্ধস্তূপ থেকে এনে বসান হয়েছে তার চিহ্ন এখনও বিদ্যমান রয়েছে। স্তম্ভগুলিও তাই—হিন্দু মন্দিরের স্তম্ভ। এমন কি বাদশাহ-তখতের দরজা পর্য্যন্ত এক হিন্দু মন্দিরের দরজা।

আদিনা মসজিদ ছাড়া আখি সিরাজউদ্দীনের কবরের উপর একটি দরগা ও মসজিদও সিকান্দার শাহ নির্মাণ করেন। গৌড় নগরীর প্রবেশদ্বারে যে কোতয়ালী দরজার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে সেটিও তাঁর কীর্তি। গৌড়ের তুর্কী সুলতানদের মধ্যে হর্ম নির্মাণে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন।

পিতা-পুত্রে যুদ্ধ

চতুর্দশ শতাব্দীর এই গৌড়েশ্বর সিকান্দার শাহের সঙ্গে পরবর্তী কালের দিল্লীশ্বর সাহজাহানের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উভয়ে ছিলেন শিল্পানুরাগী ও

পুত্রবৎসল, আবার উভয়েই পুত্রদের উৎপীড়নের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাজমহল নির্মাণের পর সাজাহান যেমন দেখেন যে তাঁর চার পুত্র পরস্পরের সঙ্গে ও পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সুরু করেছেন আদিনা মসজিদ নির্মাণের পর সিকান্দার শাহও তেমনি দেখেন যে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গিয়াসুদ্দীন তাঁর বিরুদ্ধে সসৈন্যে এগিয়ে আসছে। অথচ এই পুত্রকে তিনি কতই না স্নেহ করতেন! তাঁর প্রধানা বেগমের একমাত্র সন্তান গিয়াসুদ্দীন ছিলেন তাঁর চক্ষের মণি। এই পুত্রের বহু সদ্‌গুণের জন্য তাঁর গর্বের অন্ত ছিল না। রূপেগুণে অন্যান্য বেগমদের ষোল পুত্রের কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। সেই কারণে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গিয়াসুদ্দীনকে সোনারগাঁর ক্ষত্রপ নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে দেখা গেল যে তাঁর উচ্চাকাঙ্খা প্রবল, পিতাকে দূরীভূত করে মসনদ অধিকার করা তাঁর মনের অভিলাষ!

সুলতান সিকান্দার অনেক সদুপদেশ দিয়ে পুত্রকে পত্র লিখলেন: তুমি আমার জ্যেষ্ঠ ও যোগ্যতম সন্তান, আমি পরলোক গমন করলে সমগ্র রাজ্য তোমার। আর কিছু দিন অপেক্ষা করো, তখ্‌তে তুমিই বসবে। কিন্তু কোন ফল হোল না। পিতা বৃদ্ধ হোলেও যে আরও ৫০ বৎসর বাঁচবেন না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তিনি নিজে তত দিন নাও বাঁচতে পারেন, বাঁচলেও বৃদ্ধ অথর্ব হয়ে রাজ্যসুখে লাভ কি? মসনদ তাঁর এখনই চাই এবং তা অধিকারের জন্য সসৈন্যে রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন।

সিকান্দার শাহও প্রস্তুত ছিলেন। পাণ্ডুয়ার অদূরে সোনারকোট নামক স্থানে উভয় সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাৎ হোল। পিতা শেষ চেষ্টা করলেন: গিয়াসুদ্দীন এখনও নিরস্ত হও। এ রাজ্য তোমার—কেন তুমি যুদ্ধ করতে এসেছ? যদি চাও এখনই তোমার মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে আমি মক্কায় চলে যাব। কিন্তু কে শোনে সে কথা? গিয়াসুদ্দীন সৈন্যদের প্রতি হুকুম দিলেন: লড়াই সুরু করো।

পিতাপুত্রে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। পুত্র সেই যুদ্ধের উদ্যোক্তা হোলেও বিবেক তাঁকে একেবারে ত্যাগ করে নি। পিতা নিজে সৈন্য চালনা করছেন শুনে সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতি আদেশ দিলেন, তাঁর দেহ লক্ষ্য করে যেন কোন অস্ত্র নিক্ষেপ করা না হয়। পিতার রাজ্য তিনি অবশ্যই চান, কিন্তু পিতৃহন্তা হবার

কলঙ্ক নেবেন না। সৈন্যরা সেই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল, কিন্তু অপরাহ্নকালে এক অজ্ঞাত সৈনিকের নিক্ষিপ্ত বর্শা কেমন করে সুলতান সিকান্দার শাহর বক্ষ ভেদ করে চলে যাওয়ায় তিনি হতচৈতন্য হয়ে হস্তীপৃষ্ঠ থেকে মাটিতে পড়ে গেলেন। গিয়াসুদ্দীনের কাছে সে সংবাদ পৌছালে তিনি মুমূর্ষু পিতার কাছে এসে মার্জনা চাইলেন, পিতার মস্তক নিজের কোলের উপর রেখে শুশ্রূষা করতে লাগলেন। কিন্তু সুলতান সিকান্দারের সময় হয়ে এসেছিল, পুত্রকে আশীর্বাদ করে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

সেই সঙ্গে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হোল!

গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ

পিতৃবাহিনীর পরাজয়ের পর ষোলজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতার চক্ষু উৎপাটিত করে গিয়াসুদ্দীন তখ্‌তে আরোহণ করেন। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ন্যায় তাঁকে ইলিয়াসশাহী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি বলা যায়। তাঁর মধ্যে ঔরঙ্গজেবের কর্মদক্ষতা ছিল, কিন্তু ধর্মান্ধতা ছিল না। তিনি ভাল করে বুঝেছিলেন যে দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ তোগলক বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেলেও আবার দ্বিগুণ সৈন্য নিয়ে গৌড়ে আসতে পারেন। সেই সম্ভাবনার সম্মুখীন হবার জন্য তিনি যে শুধু নিজ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত সুরক্ষিত করেন তা নয় জৌনপুরের সুলতান খাজা জাহানের সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হন। উভয় মিত্র মাঝে মাঝে পরস্পরকে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাতেন।

একবার গিয়াসুদ্দীনের কাছে খবর এল যে কামরূপরাজ জনৈক অহম বিদ্রোহীকে আশ্রয় দেওয়ায় ওই রাজ্যের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য চলছে; উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন। এই কলহের সুযোগ নেবার জন্য তিনি নিজ সৈন্য-বাহিনীসহ কামরূপ চলে যান, তুর্কী সৈন্য পঙ্গপালের মত ওই রাজ্য ছেয়ে ফেলে। কিন্তু তাঁর হিসাবে একটি বড় রকমের ভুল হয়েছিল। হিন্দু নরপতিদ্বয়কে তিনি যতখানি কলহপরায়ণ মনে করেছিলেন আসলে তাঁরা তা ছিলেন না। গিয়াসুদ্দীনের আগমন সংবাদে তাঁরা রাতারাতি সকল বিবাদ মিটিয়ে ফেলে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের সৃষ্টি করেন। যে সব সৈনিক পরস্পরকে নিধন করবার জন্য মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল তারা হয়ে পড়ে পরম

মিত্র। এই ঐক্যের সম্মুখে স্থির থাকা গিয়াসুদ্দীনের পক্ষে সম্ভব হয় নি, পরাজিত হয়ে স্বরাজ্যে ফিরে আসেন।

চীনরাজের সঙ্গে মৈত্রী

নিতান্ত দৈবক্রমে চীনের জনৈক নরপতি ইউং-পোর সঙ্গে সুলতান গিয়াসুদ্দীনের মৈত্রীবন্ধন স্থাপিত হয়। চেঙ্গিসের পুত্র কুবলাই খাঁ প্রতিষ্ঠিত ইউয়ান সাম্রাজ্যের এক সামন্ত ইউং-পোকে সিংহাসনচ্যুত করবার জন্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হুই-তি চক্রান্ত চালাচ্ছিলেন। সেই চক্রান্তের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে হুই-তি শঙ্কাব্যাকুল চিত্তে দেশ ছেড়ে কোথায় চলে যান। কিন্তু শত্রুর শেষ রাখতে নেই—সে আবার এসে কখন কি বিপদ ঘটাবে তা বলা যায় না! বহু অন্বেষণের পর রাজা ইউং-পো খবর পেলেন যে হুই-তি সীমান্তরক্ষীদের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করে পাশ্চাত্ত্য দেশে চলে গেছেন। কোথায় গেছে সেই দুষমন? মধ্য-এশিয়ার পথ যখন সঙ্কট সমাকুল হয়ে পড়েছে তখন সে পথে না গিয়ে তীর্থযাত্রীর জাহাজে উঠে ভারতে যাওয়া সম্ভব। ওই পাশ্চাত্ত্য দেশে যেমন তীর্থযাত্রীরা যায় ভেকধারী বদমায়েসও তো তেমনি কম যায় না! পাতালে গেলেও তাকে খুঁজে বার করতে হবে। সেই উদ্দেশ্য নিয়ে রাজা ইউং-পো কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে সমুদ্রপথে ভারতে পাঠিয়ে দেন। এই চীনা মিশন ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে যখন গৌড়ে আসে গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ তখন এখানকার সুলতান। তাদের দোভাষী মা-হুয়ান গৌড় রাজধানীতে যে সব অভিনব জিনিষ দেখেন তার এক কৌতুকোদ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। সুলতান গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গেও বোধ হয় এই চীনা মিশনের পরিচয় হয়েছিল, কারণ তিন বৎসর পরে ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নিজ দূতকে মূল্যবান উপঢৌকনসহ চীনরাজের দরবারে পাঠিয়ে দেন। তারও ছয় বৎসর পরে পরবর্তী সুলতান সৈফুদ্দীন হামজা শাহ একটি জিরাফসহ নানাবিধ উপহার দ্রব্য চীনরাজের কাছে পাঠান। তাঁর দূতের পরিচয়পত্র সোনার পাতে লেখা ছিল।

মা-হুয়ানের বিবরণ

মা-হুয়ান গৌড়ের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখে গেছেন তাতে দেখা যায় যে শাসকশ্রেণী তাঁদের দেহ শালোয়ার-কামিজ, মস্তক পাগড়ী ও পদযুগল

ছুঁচালো পাদুকায় আবৃত করতেন। ধনী ও দরিদ্রদের জন্য তাঁতীরা বিভিন্ন রকমের বস্ত্র তৈরী করত। অতি সূক্ষ্ম পি-চি কাপড় লম্বায় ১৯ হাত, চওড়ায় ২ হাত; ঠাস বুননের হলদে কাপড় লম্বায় ১৭ হাত ও চওড়ায় ২½ হাত। পাগড়ীর জন্য ২০ হাত লম্বা, ২ হাত চওড়া যে হিং-পে-তুং কাপড় তৈরী হোত তার চাহিদা ছিল খুব বেশী। এগুলি সব ধনীদের মিহি কাপড়। সাধারণ লোক ব্যবহার করত সা-তু-আর এবং মো-হেই-মোলে কাপড়। রেশমী কাপড়ও যথেষ্ট তৈরী হোত। গুটি পোকার চাষ ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন রকমের রেশমী রুমাল, জরীর টুপি, কারুকার্য্যখচিত মৃৎপাত্র, ইস্পাতের তৈরী ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি মা-হুয়ানের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

মা-হুয়ান লিখেছেন, এ দেশের লোকরা চা খায় না, বাড়ীতে অতিথি এলে পানসুপারি দিয়ে আপ্যায়িত করে। নারিকেল ও চাউলে প্রস্তুত তাড়ি ও কাজাং প্রকাশ্য বাজারে বিক্রয় হয়। হোটেল ও মিঠাইয়ের দোকানে নানা প্রকারের সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায়। যে সব সমুদ্রগামী জাহাজে করে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলে সেগুলি এখানকার বন্দরে তৈরী হয়। বড় বড় লেনদেন রৌপ্যমুদ্রায় ও খুচরা বেচাকেনা কড়ি দিয়ে চলে।

বিচিত্র রকমের আমোদ প্রমোদের কথাও চীনা ভ্রমণকারী লিখে গেছেন। এক শ্রেণীর গায়ক গলায় হার ও হাতে তাগাবালা পরে বাজনা বাজায়; আর এক শ্রেণী ধনীগৃহে মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে গান গেয়ে গৃহস্বামীর চিত্ত বিনোদন করে। পালোয়ান ও কুস্তীগীররা রাস্তায় রাস্তায় কসরৎ দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে; তাতে তাদের দিন ভালই কাটে। এক দিন মা-হুয়ান দেখেন, এক পালোয়ান পথের পাশে পোষা বাঘের সঙ্গে লড়াই করছে, আর তাই দেখবার জন্য বহু লোক এসে ভীড় করেছে। বাঘটাকে রাগাবার জন্য পালোয়ান বার বার ঘুসি ও চড় মারতে থাকায় সে যখন ক্রুদ্ধ হয়ে প্রভুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল তখন সুরু হোল উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বাঘ অবসন্ন হয়ে পড়লেও পালোয়ান তাকে ছাড়ল না। জনতা ভীতিবিহ্বল চিত্তে দেখল যে সেই হিংস্র জন্তুর মুখবিবরে হাত ঢুকিয়ে সে সোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে!

গিয়াসুদ্দীনের ন্যায়নিষ্ঠা

সুলতান গিয়াসুদ্দীন যে ভাবেই সিংহাসনে আরোহণ করুন না কেন পরবর্তী জীবনে সুশাসক হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এক দিন তিনি প্রথামত তীর ছোঁড়া অভ্যাস করছিলেন, কিন্তু কেমন করে একটি তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে একান্তে দণ্ডায়মান একটি বালককে বিদ্ধ করে চলে যায়। যথোচিত চিকিৎসা সত্ত্বেও বালকের জীবন রক্ষা না পাওয়ায় তার বিধবা জননী গৌড়ের কাজী উল-কাজ্জা—কাজীর কাজী—শাহ সিরাজউদ্দীনের কাছে গিয়ে পুত্রহন্তার বিচার দাবী করেন। সেই আবেদন পেয়ে কাজী প্রাথমিক তদন্তের পর জানতে পারেন যে অপরাধী আর কেউ নয়—স্বয়ং গৌড়েশ্বর গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ!

শাহ সিরাজউদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক প্রকৃতির লোক। কাউকে খাতির করে চলতেন না। যে অপরাধের জন্য অন্যকে মৃত্যুদণ্ড দিতেন সুলতানের বেলায় অন্য ব্যবস্থা করতে তাঁর মন সায় দিল না। হোন অপরাধী স্বয়ং গৌড়েশ্বর, অপরাধের বিচার তাঁকে করতেই হবে। সে জন্য তাঁর সম্মুখে হাজির হবার জন্য সমন লিখে তিনি এক পেয়াদাকে সুলতান মঞ্জিলে পাঠিয়ে দিলেন। পেয়াদা সেখানে গিয়ে অতি কৌশলে সেই সমন গিয়াসুদ্দীনের সম্মুখে উপস্থাপিত করলে তিনি তা পড়ে ক্রুদ্ধ হবার পরিবর্তে জানিয়ে দিলেন যে নির্দ্ধারিত সময়ে কাজীর সম্মুখে উপস্থিত হবেন।

বিচারের দিন পোষাকের নীচে একখানি তরবারি লুকিয়ে রেখে সুলতান গিয়াসুদ্দীন বিচারসভায় এলেন। কাজী সিরাজউদ্দীন তাঁকে অপরাধ বুঝিয়ে দিয়ে বললেন যে বালকের হত্যা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হোলে তাঁর দণ্ড হোত মৃত্যু; কিন্তু তিনি যখন নিজের অজ্ঞাতসারে অপরাধ করেছেন তখন লঘু দণ্ড আশা করতে পারেন। গিয়াসুদ্দীন সে কথা মেনে নিয়ে হাসিমুখে দণ্ড গ্রহণ করে কাজীকে জানালেন যে তিনি যদি বিধবার আবেদন উপেক্ষা করতেন তা হোলে এখানেই তাঁর শিরচ্ছেদ করা হোত; সে জন্য তিনি এনেছেন এই তরবারি। সুলতান গিয়াসুদ্দীন পোষাকের নীচ থেকে তরবারিটি বার করে কাজীর সম্মুখে রাখলেন।

সাহিত্যানুরাগী গিয়াসুদ্দীন

সুলতান গিয়াসুদ্দীনের যে সব বেগম ছিল তাদের মধ্যে সারো, গুল ও

লালা এই তিনজনকে তিনি একটু বেশী ভালবাসতেন। একবার তিনি গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হয়ে তাঁদের উপর আদেশ দেন যে, তাঁর মৃত্যু হোলে তাঁরা যেন মৃতদেহ গোলাপজলে ধৌত করেন। সে আদেশ শিরোধার্য্য করে তিন বেগম শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সুলতান কিন্তু মরলেন না; ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে বেগম তিনজনকে সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন। কিন্তু তাঁরা যে আসলে সুলতানের মৃতদেহ ধৌত করবার জন্য বসেছিলেন অন্যান্য পুরবাসীরা তা ভোলে নি; তাঁদের তিনজনকে সবাই গুসসালি অর্থাৎ শবধৌতকারিনী বলে উপহাস করতে লাগল!

গিয়াসুদ্দীনের কানে এই খবর পৌছালে তিনি বেগমত্রয়ের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করবার জন্য একটি গজল লিখতে বসেন। অবসর সময়ে গজল লেখা তাঁর অভ্যাস ছিল। কিন্তু কয়েক পংক্তি লেখবার পর শেষের দিকে ছন্দ মিলল না। দিনের পর দিন ধরে চেষ্টা চলল, কিন্তু উপযুক্ত শব্দ তিনি খুঁজে পেলেন না। নিরুপায় সুলতান তখন এক দূত মারফৎ সেই অসম্পূর্ণ গজলটি ইরাণে কবি হাফিজের কাছে পাঠিয়ে দেন। প্রত্যুত্তরে হাফিজ নীচের কবিতাটি রচনা করে দূতের হাতে সমর্পণ করেন—

দেশের সেরা হিন্দুস্থান
সে দেশের সব বুলবুলি
ইরাণের এই মিছরি মধু
পানের তরে দিনগুলি
গুণছে জানি, তাদের বুকে
কতই দুঃখ কতই আশা
তুচ্ছ আমার গজল যেন
তাদের মুখে দেয় ভাষা।
সেই দেশের এক মহান রাজা
গিয়াসুদ্দীন দরবারে
হাফিজ তাহার সেলাম পাঠায়,
—আর কি আছে সংসারে ?

বহু দোষ সত্ত্বেও গিয়াসুদ্দীনকে একজন আদর্শ নরপতি বলা চলে। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি যেটুকু চেষ্টা করেছিলেন সে সময়কার আর কোন সুলতান তা করেন নি। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁকেও শেষ পর্য্যন্ত ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে গুপ্তঘাতকের ছুরিতে প্রাণ হারাতে হয়।

1 Abul Fazl Allami, *Ain-i-Akbari, ii, Jarret's trans*, *p. 147-49*
2 Ghulam Hussain Salim, *Riyaz-us-Salatin, p. 110-12, 114-15*
3 Abid Ali Khan, *Memoirs of Gaur and Pandua, p. 29*
4 Churchill W. S., *Second World War, ii. p. 79*

দশম অধ্যায়

হিন্দুরাজত্বের পুনরভ্যুদয়

রাজা দনুজমর্দনদেব

আততায়ীর ছুরিকাঘাতে স্থলতান গিয়াস্থদ্দীনের জীবনাবসান হোলে আমীর ও সৈন্যাধ্যক্ষরা তাঁর পুত্র সৈফুদ্দীন হামজা শাহকে মসনদে অভিষিক্ত করেন (১৪০৯)। কিছু দিন পরে প্রতিপক্ষের চক্রান্তের ফলে তিনি রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেন ও তাঁর বালক পুত্র দ্বিতীয় সামস্থদ্দীন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু চক্রান্তের সেখানে শেষ হয় নি। তার ফলে তিন বৎসর সাত মাস পাঁচ দিন রাজত্বের পর তিনিও আততায়ীর ছুরিকাঘাতে ধরাশায়ী হোলে তাঁর পিতার এক হিন্দু আমীর রাজা গণেশ গৌড় রাজ্যের শাসনকর্তা হয়ে বসেন।

গণেশের পূর্ব জীবন সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে তিনি ছিলেন বর্তমান দিনাজপুর জেলার ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের যে শাখা থেকে ভাদুড়ী গাঞীর উদ্ভব হয়েছে তিনি তার অন্তর্ভূক্ত। বিপুল ঐশ্বর্য্য ও অতুল প্রতিপত্তির জন্য লখনৌতি দরবারে তাঁর বিশেষ মর্য্যাদা ছিল। তাঁর কর্মদক্ষতার পরিচয় পেয়ে স্থলতান গিয়াস্থদ্দীন তাঁকে রাজস্ব ও শাসন বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। গিয়াস্থদ্দীনের মৃত্যুর পর শাসকশ্রেণীর মধ্যে যখন তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব স্থরু হয় তার শেষ অধ্যায়ে তিনি গৌড় রাজ্যের কর্ণধার হয়ে বসেন। রাজশক্তি আত্মসাতের ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কিন্তু নরসিংহ নাড়িয়াল নামে এক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের পরামর্শে শেষ পর্য্যন্ত তুর্কীদের অপসারিত করে হিন্দু রাজত্ব পুনঃপ্রবর্তনের জন্য যত্নবান হন। এ সম্বন্ধে অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থে লিখিত আছে—

সেই নরসিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ীয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হইল রাজা॥

রাজা গণেশের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ব ভারতে তুর্কী শাসনের অবসান হয়। উত্তরে কামরূপে তখন পরাক্রান্ত খেন বংশের অভ্যুদয় হয়েছে; তার পূর্ব দিকে আসাম শক্তিশালী অহম রাজগণের অধীন। মণিপুর, কাছাড় ও ত্রিপুরা পূর্বে স্বাধীন ছিল—তখনও তাই। দক্ষিণে উড়িষ্যা প্রবল শক্তি। তাদের সবার সঙ্গে সমান্তরালভাবে গৌড়ে হিন্দুশাসন পুনঃপ্রবর্তন হওয়ায় পূর্ব ভারতের মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন ঘটে। বহু দিন পরে মুক্তির আস্বাদ পেয়ে জনসাধারণ নূতন জীবনের স্পন্দন অনুভব করে।

মুসলমানদের বিরোধিতা

তখনও গৌড়ের প্রায় সকল অধিবাসী হিন্দু। অথচ শাসক সম্প্রদায় তাদের ধর্মমতকে কোন মর্যাদা দিত না। তারা মন্দির ভাঙত, বিহার ধ্বংস করত, গ্রাম ও নগরের নাম বদলে ইসলামী নামে নামকরণ করত। আরও নানাভাবে হিন্দুদের উপর উৎপীড়ন চালাত। জনসাধারণের ধনৈশ্বর্য্য, ঘরবাড়ী, মানমর্য্যাদা সবই তাদের ভোগের জন্য নিয়োজিত হোত। তাদের উৎপীড়নে আবালবৃদ্ধবণিতা সবাই অস্থির হয়ে উঠেছিল। দনুজমর্দনদেব নাম নিয়ে রাজা গণেশ সিংহাসনে আরোহণ করে এই সব অবিচারের প্রতিকারের জন্য যত্নবান হোলেন, বহুদিন পরে হিন্দুরা শাসনব্যবস্থায় তাদের ন্যায্য স্থান ফিরে পেল। রাজকার্য্যে ফার্সীর স্থানে সংস্কৃতের ব্যবহার সুরু হোল, হিজিরাব্দের স্থানে শকাব্দের। মুদ্রায় চণ্ডীচরণাশ্রিত রাজা দনুজমর্দনদেব এই নাম ক্ষোদিত করে রাজা গণেশ তাঁর রাজত্ব সুরু করলেন। জনসাধারণের মনে নূতন আশা জাগল, মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল, সবার মুখে হাসি ফুটল।

এই শাসক পরিবর্তনে মুসলমান জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হোলেও দুঃখিত হয় নি। কারণ, তাদের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ ছিল বহিরাগত, বাকি সবাই ধর্মান্তরিত

হিন্দু। তাদের পিতৃপিতামহগণ অল্প দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বলে হিন্দু সমাজের সঙ্গে আত্মীয়তার সূত্র তখনও পুরাপুরি ছিন্ন হয় নি। কিন্তু মৌলবী মোল্লাদের কথা স্বতন্ত্র। ইসলামী রিয়াসতের খতম হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে তারা দনুজমর্দনদেবের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সুরু করে। মনের উত্তাপ প্রবল হোলে তা মনে চেপে রাখা যায় না, কোন না কোন ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে তাই হোল। এক দিন এই চক্রান্তকারীদের একজন শেখ বদরুদ্দীন ইসলাম রাজসভায় এসে প্রথা মাফিক রাজার সম্মুখে কুর্নিশ না করে সোজাসুজি আসন গ্রহণ করলেন। সেজন্য কৈফিয়ৎ চাইলে সর্বসমক্ষে রাজাকে গালাগালি দিয়ে স্থানত্যাগে উদ্যোগী হোলেন। কোন মুসলমান সুলতানের সামনে এরূপ অশোভন আচরণ করলে তৎক্ষণাৎ তাকে শূলে চড়ান হোত, কিন্তু রাজা দনুজমর্দনদেব তেমন কিছু করবার পরিবর্তে শেখকে মৃদু ভৎসনা করে আত্ম সংশোধনের উপদেশ দিলেন।

আর এক দিন কোন কারণে শেখ বদরুদ্দীনকে রাজসভায় আহ্বান করা হোলে তিনি সভাকক্ষে প্রবেশের সময়ে প্রথানুযায়ী মস্তক অবনত তো করলেন না, বরং সঙ্কীর্ণ দরজার ভিতর দিয়ে কক্ষাভ্যন্তরে পদযুগল আগে প্রবেশ করিয়ে মস্তক পশ্চাদ্দিকে হেলিয়ে দিলেন। ঔদ্ধত্যের এখানে শেষ নয়। দরবারে প্রবেশ করেও শেখ রাজার সম্মুখে নতজানু হবার কোন লক্ষণ দেখালেন না। এরূপ ধৃষ্টতা কোন নরপতির পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়—রাজা দনুজমর্দনদেবও করেন নি। রাজদ্রোহিতার অপরাধে শেখের মৃত্যুদণ্ড দেন। আরও কয়েকজন উলেমাকে একই অপরাধের জন্য নদীতে ডুবিয়ে মারবার আদেশ দেওয়া হয়।

এই বিদ্রোহীদের নেতা নুর-কুত-আলম দেখলেন যে রাজাকে অসম্মান করে গাত্রদাহ কতকটা প্রশমিত হচ্ছে বটে কিন্তু লাভ কিছু হচ্ছে না। এভাবে ইসলামী রিয়াসতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। দনুজমর্দনদেবের অপসারণ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। সেই পথে বিপন্ন ইসলামকে বাঁচাবার জন্য তিনি জৌনপুর-সুলতান ইব্রাহিম সরকির কাছে আহ্বান জানালেন যেন তিনি সসৈন্যে গৌড়ে এসে ঘৃণ্য কাফেরকে ধ্বংস করেন।

ইব্রাহিম সরকির গৌড় আক্রমণ

স্বধর্মে নিষ্ঠা থাকুক বা না থাকুক ইব্রাহিম সরকি দেখলেন যে গৌড়ে নিজ অধিকার প্রসারের এরূপ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। একে দনুজমর্দনের সৈন্যবাহিনীতে মুসলমানরা সংখ্যাবহুল তায় নুর-কুত-আলমের দল পিছন থেকে নানাভাবে সাহায্য দেবে। তাই সেই পীরের কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে সুলতান ইব্রাহিম তাঁর সমস্ত বাহিনীসহ পূর্বদিকে রওনা হোলেন। সমুদ্র তরঙ্গের মত তাঁর সৈন্যগণ গৌড়রাজ্যে প্রবেশ করে ফিরোজপুরের অদূরে শিবির সন্নিবেশিত করল। এই সংবাদ রাজা দনুজমর্দনদেবের কাছে পৌছালে তিনি প্রমাদ গণলেন। তুর্কীদের গৃহবিবাদের সুযোগে তিনি গৌড়ের অধীশ্বর হয়ে বসলেও নিজে কখনও রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন নি। কোচ, মেচ, ভোটিয়া প্রভৃতি পার্বত্য উপজাতি দিয়ে গঠিত তাঁর নিজস্ব বাহিনী তুর্কীদেরই মত দুর্দ্ধর্ষ বটে কিন্তু একেবারেই সংখ্যাল্প। ইলিয়াসশাহী সৈন্যরা অবশ্য তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু মুসলমান অফিসারদের উপর নির্ভর করা চলে না। যে সব হিন্দু জমিদারকে তিনি সামন্তের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছেন তাঁদের সৈন্যবল কতটুকু? যুদ্ধের সময়ে তারা যে কে কোথায় থাকবে তা বলা যায় না!

বিদেশী আক্রমণের সময়ে সব দেশই অনুরূপ বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়, কিন্তু দৃঢ়চেতা শাসকগণ সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ফ্রান্স ও ফ্ল্যাণ্ডার্সের রণক্ষেত্রে বৃটিশ বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে মহাবীর উইনষ্টন চার্চিল হতোদ্যম না হয়ে দেশবাসীকে আশার বাণী শুনিয়েছিলেম: ভয় নেই, বৃটেন মরবে না। আমরা লড়ব; মাঠে লড়ব—ঘাটে লড়ব—প্রান্তরে লড়ব—সমুদ্রসৈকতে লড়ব—সাগরবক্ষে লড়ব—উপনিবেশে গিয়ে লড়ব। রক্তপিপাসু জার্মান হুণরা যতদিন না ধরাবক্ষ থেকে বিদায় নেয় ততদিন তাদের উপর আঘাত হানব। চার্চিলের এই অভয়বাণী সেদিন হৃতসর্বস্ব বৃটিশ জাতিকে সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখিয়েছিল। এরূপ অদম্য মনোবল রাজা দনুজমর্দনদেব দেখাতে পারেন নি। নিজ সৈন্য-বাহিনীকে তিনি অগ্রসর হবার আদেশ দিলেন না, প্রতিবেশী হিন্দু রাজাদের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠালেন না। দেখালেন না আত্মরক্ষার কোন প্রয়াস। যে নুর-কুত-আলম জৌনপুর-সুলতানকে আহ্বান জানিয়েছিলেন

গৌড় আক্রমণের জন্য তাঁরই স্মরণাপন্ন হয়ে আসন্ন বিপদ থেকে ত্রাণ করবার জন্য আবেদন জানালেন। পীর যেন নিজগুণে তাঁর গোস্তাকি মাফ করেন, জৌনপুর সৈন্যদের হাত থেকে তাঁকে বাঁচান!

এ সব ফাজলামির মধ্যে নুর-কুত-আলম নেই। তাঁরই আহ্বানে জৌনপুর সুলতান এক কাফের রাজ্য আক্রমণ করেছেন, আর তাঁকে ফিরে যাবার কথা বলবেন তিনি? তিনি যখন খলিফা নন তখন জেহাদ ঘোষণা করবার অধিকার তাঁর অবশ্য নেই, কিন্তু ইব্রাহিম সরকির আক্রমণ তো জেহাদের সামিল। সে ক্ষেত্রে মুসলমান হয়ে এই ধর্মযুদ্ধে তিনি বাধা দেন কি ভাবে? তবে হ্যাঁ, রাজা দনুজমর্দনদেব যদি ইসলাম কবুল করেন তা হোলে জৌনপুর সুলতানের যুদ্ধ করবার আর কোন অধিকার থাকবে না। রাজা গণেশ তাতেও রাজী। গেলই বা ধর্ম, রাজ্য তো রক্ষা পাবে! তাঁর বংশধররা পুরুষানুক্রমে সেই রাজ্য ভোগ করবে। এই তো হিন্দু সমাজ, তাঁর বিপদে কেউ এসে পাশে দাঁড়াল না। এই তো হিন্দু ধর্ম, তাঁর রাণীর আকুল আহ্বানে কোন দেবতা সাড়া দিলেন না। এ ধর্ম আঁকড়ে থাকবার চেয়ে ইসলামে দীক্ষা নেওয়া অনেক ভাল।

দনুজমর্দনদেবের এই চিন্তাধারার কথা শুনে অন্তঃপুরে তাঁর মহিষী ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠলেন। তাঁর আহারনিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল। ঠাকুর! এ কি করলে তুমি? কেন আমার স্বামীর এমন মতিচ্ছন্ন হোল? ধর্মের চেয়ে রাজ্য বড়? তোমাকে যদি ত্যাগ করতে হয় তা হোলে কি হবে আমার রাজ্যে? কি হবে ঐশ্বর্য্যে? ঠাকুর! তুমি আমাকে পথের ভিখারী করে দাও, কিন্তু আমার স্বামীকে ধর্মত্যাগী কোরো না। অন্তিম সময়ে যেন দুজনে তোমার নাম নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে পারি। রাজা গণেশ মহিষীকে অনেক বোঝালেন, কিন্তু তাঁর এক কথা। মহারাজ যদি ধর্মত্যাগের কথা মুখে আনেন তা হোলে তিনি মা গঙ্গার কোলে আশ্রয় নেবেন।

দনুজমর্দনদেবের উভয়সঙ্কট! জৌনপুর বাহিনী লখনৌতির দিকে এগিয়ে আসছে, এদিকে প্রাসাদে রাণী অভুক্তা। রাজ্য ছেড়ে চলে যাবার কথা ওঠে না; ওসব মেয়েলি ভাবপ্রবণতার মধ্যে তিনি নেই। অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্য্যন্ত পীরের কাছে গিয়ে প্রস্তাব করলেন যে তিনি পুত্র জিৎমল বা যদুর

অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করবেন, আর যদু ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমানী প্রথায় রাজ্য চালাবে। অতি উত্তম প্রস্তাব, বললেন পীর, এতে তাঁর পূর্ণ সমর্থন আছে। গণেশ হোক আর যদু হোক যে ইসলাম কবুল করবে তাকে তিনি গৌড়ের সুলতান বলে মেনে নেবেন। তাঁর সম্মতিক্রমে দ্বাদশ বর্ষীয় যদু ইসলামে দীক্ষা নিয়ে মসনদে আরোহণ করল। তাঁর নূতন নাম হোল শেখ জালালউদ্দীন।

জালালউদ্দীনের অনুকূলে রাজা গণেশ সিংহাসন ত্যাগ করলে নুর-কুত-আলম এক সাগ্‌রেদকে ইব্রাহিম সরকির কাছে পাঠিয়ে স্বরাজ্যে ফিরে যাবার জন্য নির্দেশ দিলেন। প্রত্যুত্তরে সুলতান ইব্রাহিম বললেন, যদি ফিরে যেতেই হবে তা হোলে এত দূরে আসা কেন? ইসলামের জন্য তাঁর মাথাব্যথা নেই, কিন্তু গৌড তাঁর চাই। সে কথা শুনে পীর নিজে তাঁর তাঁবুতে গিয়ে অনেক বোঝালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। শূন্য হাতে ফিরে যেতে জৌনপুর সুলতান রাজী নন। আশাহত পীর তখন ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হেনে তাঁকে অভিশাপ দিলেন: নিপাত যাও!

পীরের অভিশাপ আগে থেকেই ফলছিল। ইব্রাহিম সরকি তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে পূর্ব দিকে রওনা হয়েছেন শুনে সরকিদের চিরশত্রু দিল্লীর সৈয়দগণ কর্মতৎপর হয়ে ওঠে। অযোধ্যা ও ত্রিহুত থেকে বহু সরকিবিরোধী এসে তাদের পতাকাতলে সমবেত হয়। এমনটি যে ঘটবে সুলতান ইব্রাহিম আগে তা অনুমান করেন নি, তাই সংবাদবাহকের কাছে খবর পেয়ে তাজ্জব বনে যান। তিনি ইসলামের জন্য জানমাল কবুল করেছেন, আর এক ইসলামী রাজ্য এসে পিছন থেকে তাঁকে ছুরি মারছে? গৌড়ের যা অবস্থা তাতে এখানে নিজের ঝাণ্ডা ওড়ান কিছু কঠিন হবে না, কিন্তু নিজ রাজ্য জৌনপুর হাতছাড়া হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেখানে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে তারপর সৈয়দরা যে গৌড়ের দিকে এগিয়ে আসবে না এমন কথা কে বলতে পারে? তাঁর রাজ্য, ধনসম্পদ, বেগমবাঁদী সব সেই দুষমনরা অধিকার করে নেবে, আর তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াবেন! বনের পাখী ধরবার জন্য হাতের পাখী ছেড়ে দেবার অর্থ হয় না। সুলতান ইব্রাহিম নিজ রাজ্যের দিকে রওনা হোলেন।

গোবর গণেশ!

শত্রুর এই বিপদের সম্ভাবনা রাজা দনুজমর্দনদেবের কাছে অজানা থাকবার কথা নয়। তিনি এক বিশাল জনপদের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন, গুপ্তচররা তাঁর কাছে এ খবর আনবে না? সুলতান ইব্রাহিম সরকি যখন সসৈন্যে এসে তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করছিলেন তখন সেই বিষবৃক্ষের মূল যে পশ্চিম থেকে সৈয়দরা এসে উৎপাটিত করবার উদ্যোগ করছিল এই খবরটুকু জানা না থাকায় তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। নিজ সৈন্য-বাহিনীর আনুগত্যে তাঁর সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু রাজ্যের সকল অধিবাসীর শুভেচ্ছা ও সমর্থন যে তাঁর প্রতি ছিল একথা তো তিনি জানতেন। তাদের বল বড় বল। প্রতিবেশী হিন্দুরাজ্যগুলির শক্তি জৌনপুরের চেয়ে কিছু কম ছিল না। তাঁর কাছ থেকে আহ্বান পেলে অনেকেই সাহায্য পাঠাত। কিন্তু এই সোজা পথ গ্রহণ না করে তিনি পীরের স্মরণাপন্ন হোলেন! তাতে রাজ্য রক্ষা পেলেও তাঁর মর্য্যাদা ধূলায় মিশিয়ে গেল।

জৌনপুর বাহিনী চলে গেলে দনুজমর্দনদেব পুত্রকে অপসারিত করে পুনরায় নিজে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ব্রাহ্মণ—দেবী চণ্ডীর সেবক। সেই কারণে তাঁর পুত্র বেশী দিন ধর্মত্যাগী হয়ে থাকতে পারে না। তাকে শুদ্ধি করে নেবার জন্য তিনি স্বর্ণধেনু যজ্ঞের আয়োজন করলেন। পুরোহিতরা শাস্ত্রানুযায়ী যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জলিত করলে বালক জালালউদ্দীনকে প্রবেশ করান হোল এক সুবর্ণনির্মিত ধেনুর গর্ভে। বাইরে হোম ও বেদপাঠ চলতে লাগল। অহোরাত্র সেই স্বর্ণধেনুর গর্ভে অবস্থানের পর এক শুভ মুহূর্তে জালালউদ্দীন যখন সেখান থেকে বেরিয়ে এল তখন সে রাজা গণেশের ম্লেচ্ছ পুত্র নয়—মন্ত্রপূতঃ গোমাতার ব্রাহ্মণ সন্তান শ্রীযদুসেন!

এই ভাবে যদুর পুনর্জন্ম হোলেও সমাজ তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। রাজাদেশ সত্ত্বেও কোন ব্রাহ্মণ তার স্পৃষ্ট অন্ন ভোজন করল না, কেউ তাকে সমাজে স্থান দিল না। সবাই তার সঙ্গ পরিহার করে চলতে লাগল। মহারাজ দনুজমর্দন সবাইকে কত বোঝালেন, সমাজের যারা শীর্ষস্থানীয় তাদের ব্রহ্মোত্তর দিলেন, কিন্তু সমাজ নড়ল না। আড়ালে সবাই তাঁকে উপহাস করে বলতে লাগল—গোবর গণেশ!

সুলতান জালালউদ্দীন

দনুজমর্দনদেব যত দিন জীবিত ছিলেন যদুর জীবন তত দিন ছিল বিষাদময়। হিন্দু সমাজে তাঁর স্থান হয় নি, আবার মুসলমানদের সঙ্গে মেশবার সুযোগও পেতেন না। পিতার কঠোর শাসনে এক সীমাবদ্ধ স্থানের বাইরে কোথাও যাবার উপায় ছিল না। সেই পিতা যখন স্বর্গারোহণ করলেন তখন তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে হয়ে বসলেন গৌড়-বঙ্গের ভাগ্যবিধাতা। হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর পুঞ্জীভূত অভিমান আগ্নেয়গিরির স্ফুলিঙ্গের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পুনরায় ইসলামে দীক্ষা নিয়ে সমাজের উপর তিনি যে ভাবে উৎপীড়ন স্থরু করলেন কোন তুর্কী সুলতান কখনও তা করেন নি। তাঁরা ভাঙ্গতেন মন্দির, জালালউদ্দীন ভাঙ্গতে লাগলেন সমাজ। যে সব ব্রাহ্মণ তাঁর পিতার স্বর্ণধেনু যজ্ঞে দান গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন চলল। তারা সব বায়ুরোগগ্রস্ত শয়তান—হয় ইসলামে দীক্ষা নিয়ে গোমাংস ভক্ষণ করুক, নয় জাহান্নমে যাক। অসংখ্য হিন্দুকে তিনি জোর করে ধর্মান্তরিত করলেন, তাঁর অত্যাচারে হিন্দু প্রজাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। ধর্ম রক্ষার জন্য বহু নবনারী গোপনে বিভিন্ন হিন্দু রাজ্যে পালিয়ে গেল।

সামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ গৌড় বা লক্ষণাবতী থেকে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে ফিরোজাবাদ নাম দিয়েছিলেন। কিন্তু গৌড় নগরীর ঐতিহ্য ফিরোজাবাদের কোথায়? এত দিনের চেষ্টায়ও সেখানে একটি ভাল শহর গড়ে উঠল না। এই ভুল সংশোধনের জন্য জালালউদ্দীন লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানী ফিরিয়ে এনে পূর্ব নাম বহাল করলেন। গৌড় আবার গৌড় হোল! তাঁর আদেশে সেখানে একটি বৃহৎ মসজিদ ও একটি সরাইখানা নির্মিত হোল। পাণ্ডুয়া ছাড়লেও যাতে ওই নগরী জনশূন্য হয়ে না যায় তার ব্যবস্থাও তিনি করলেন। সেখানকার বিখ্যাত একলাখা মসজিদ তাঁরই কীর্তি। তিনি ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করলে তাঁকে সেখানে কবর দেওয়া হয়।

জালালউদ্দীনের পর তাঁর পুত্র সামসুদ্দীন আহম্মদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম সরকি তখনও জীবিত। সামসুদ্দীনের পিতামহ রাজা গণেশের সময়ে তিনি গৌড়ে এসে দিল্লীর সৈয়দদের ভয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন; সৈয়দরা তাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিল।

এখন তাঁর পশ্চিম সীমান্ত আপদশূন্য—সব সীমান্তই নিরাপদ। তার উপর গুপ্তচর মুখে খবর পেলেন যে সামসুদ্দীন শুধু অপ্রাপ্তবয়স্ক নয়—দুর্বলচেতা। রাজধানীতে তাঁর বিরোধীর সংখ্যা বড় কম নয়। এবার কোন পীরের কাছ থেকে আহ্বান না এলেও নিজ শক্তিতে গৌড় জয় করা কিছু শক্ত হবে না।

ইব্রাহিম সরকির এই অভিসন্ধির কথা গুপ্তচর মুখে জানতে পেরে সামসুদ্দীন আহম্মদ তৈমুর লংএর পৌত্র সাহ্-রুখের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে হিরাট নগরীতে দূত পাঠিয়ে লিখলেন ঃ আপনার পিতামহ তৈমুর লঙ্ ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে হিন্দুস্থানে এসে পানিপথের যুদ্ধে দিল্লীর সুলতান মামুদ তোগলকের সমস্ত সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করেন। তোগলকদের অত্যাচার থেকে জনগণকে বাঁচাবার জন্য তিনি দিল্লীকে শ্মশানে পরিণত করেছিলেন। সে কথা এ দেশের আপামর জনসাধারণ আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে। এখন জৌনপুর সুলতান ঠিক তেমনি অত্যাচারী হয়ে উঠেছেন; বিনা কারণে তিনি আমার রাজ্য অধিকার করতে আসছেন। আপনি ছাড়া আর কেউ তাঁকে সংযত করতে পারবে না। এই বিপদের দিনে আপনার কৃপাদৃষ্টি পেলে চির দিন কৃতজ্ঞ থাকব।

গৌড়েশ্বর সামসুদ্দীনের আবেদনে সাহ্-রুখের হৃদয় গলে গেল। পিতামহের বীরত্ব কাহিনী সম্বন্ধে তাঁর মনে যে গর্ব রয়েছে এক অজ্ঞাত দেশের সুলতান যে তার অংশভাগী এ কথা জেনে তিনি পুলক বোধ করলেন। তাঁর বিপদে সর্বপ্রকার সাহায্য দিতেই হবে। তাই এক দ্রুতগামী দূতকে জৌনপুরে পাঠিয়ে ইব্রাহিম সরকিকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, যদি গৌড় আক্রান্ত হয় তা হোলে তাঁর ফৌজ গিয়ে জৌনপুর অধিকার করবে। বৃদ্ধ ইব্রাহিম সরকি প্রমাদ গণলেন—সাহ্-রুখের সৈন্যদের সম্মুখীন হবার মত শক্তি তাঁর নেই। তাই বিহারের কিছু অংশ অধিকার করে তিনি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন।

সাহ্-রুখের সাহায্যে পশ্চিম সীমান্তের আক্রমণ বন্ধ করলেও পূর্ব সীমান্তে ত্রিপুরার হাত থেকে সামসুদ্দীন আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। ওই হিন্দু রাজ্যের সৈন্যগণ মাঝে মাঝে এসে তাঁর অধিকারের মধ্যে হামলা চালায় ও শেষ পর্য্যন্ত বেশ কিছুটা অংশ অধিকার করে নেয়। একই শৈথিল্য প্রাসাদাভ্যন্তরে দেখা

দিয়েছিল। তার ফলে তাঁর দুজন ক্রীতদাস নাসির খাঁ ও সাদি খাঁ এক দিন সুযোগ বুঝে প্রভুর বুকে ছুরি বসিয়ে তাঁকে সমন সদনে পাঠিয়ে দেয় (১৪৪৫)।

সেই সঙ্গে গণেশ বংশের অবসান হয়।

1 Sinha S. N. *History of Tirhut*, *p. 85*
2 Regmi D. R. *Ancient and Medieval Nepal, p. 151-53*
3 Shams-i-Siraj Afif *Tarikh-i-Firuz Shahi. Elliot trans. p. 36*
4 *Social History of Kamrup, Vol. I, p. 251*
5 Percy Brown *Indian Architecture (Islamic Period), p.39-40*

একাদশ অধ্যায়

আবার ইলিয়াসশাহী বংশ

নাসিরুদ্দীন মামুদ—১ (১৪৪২-৫৯)

সামসুদ্দীন আহম্মদের আততায়ীদ্বয় যথারীতি সুলতান পরিবারের সকলকে হত্যা করলে মসনদের দাবীদার কেউ রইল না বটে কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড কলহ সুরু হয়ে গেল। নাসির খাঁ বলল : সামসুদ্দীনকে আমি মেরেছি, অতএব মসনদ আমার। কি আমার মরদ রে! বলল সাদি খাঁ, আগেভাগে এগিয়ে যাবার হিম্মত ছিল তোমার? আমি যদি ভরসা করে সামনে না যেতুম তুমি এগোতে? তুমি সুলতানকে খতম করেছ বটে, কিন্তু প্রথম ছোরা তো আমি বসিয়েছিলাম; ইমানদার লোক হোলে তুমি সে কথা অবশ্যই মানবে। কে কার কথা শোনে! তারই এক ফাঁকে নাসির খাঁ সাদির বুকে ছোরা বসিয়ে দিয়ে দরবারে গিয়ে ঘোষণা করলেন: সুলতান সামসুদ্দীন এন্তেকাল ফরমেছেন, গৌড়-বঙ্গের অধীশ্বর এখন আমি। কি ভাবে যে কি হোল সমাগত আমীরগণ সে কথা ঠিক মত অনুধাবন করতে পারলেন না, কিন্তু যা হবার তা হয়ে গেছে ভেবে সবাই নতজানু হয়ে তাঁকে সুলতান বলে কুর্নিশ করলেন। এই পর্য্যন্ত! এক সপ্তাহ পরে দেখা গেল যে নাসিরও আর ইহজগতে নেই, সামসুদ্দীনের আমলে তিনি যে পালঙ্ক ঝাড়পোঁছ করতেন সুলতানী লাভের পর সেই পালঙ্কে যখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন তখন কে একজন তাঁর বুকে ছোরা বসিয়ে হত্যা করেছে!

আততায়ীর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না, আবার গণেশবংশীয় কেউ তখন জীবিত নেই। আমীরদের মধ্যে সকলেই মসনদের দাবীদার—আবার দাবীদার কেউ নন! এই বিশৃঙ্খলা দূর করবার জন্য তাঁরা নিজেদের মধ্যে বহু শলাপরামর্শ

করে শেষ পর্য্যন্ত ইলিয়াস শাহর বংশধর মামুদকে মসনদে অভিষিক্ত করবার সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু মামুদ এখন কোথায়? পদস্থ রাজপুরুষরা তাঁর অন্বেষণে বেরিয়ে এক নিভৃত গ্রামে গিয়ে দেখেন যে তিনি জমিতে হল কর্ষণ করছেন। পূর্বপুরুষের রাজ্য ফিরে পাবার কোন আশা নেই বুঝে জীবিকার জন্য কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। রাজপুরুষদের মুখে সকল বৃত্তান্ত শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তিনি রাজধানীতে এসে নাসিরুদ্দীন আবুল মুজাফর মামুদ নাম নিয়ে মসনদে আরোহণ করলেন।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে যে রাজ্য নাসিরুদ্দীন মামুদ পেয়ে গেলেন তার সকল সীমান্ত তখন আপদশূন্য। জৌনপুরের সরকিদের বরাবর গৌড়ের উপর লোভ থাকলেও এখন লোদীরা দিল্লী অধিকার করে তাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। আত্মরক্ষা যাদের বড় সমস্যা তারা ভিন্ন রাজ্যে অভিযান চালাবে কেমন করে? এই নিরাপত্তা বোধের জন্য নাসিরুদ্দীন মামুদ অতি সহজে রাজ্যের সর্বত্র নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন। সুন্দরবন অঞ্চলে কয়েকজন সামন্ত নরপতি প্রায়-স্বাধীনভাবে রাজত্ব করছিলেন; তাঁদের দমন করা হোল। বহু দিন পরে দেশে শান্তির হাওয়া বইতে থাকায় জনসাধারণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

দক্ষিণে গঙ্গা সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্ত এত দিন দামোদর নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ওই সাম্রাজ্যের পূর্বের সে বৈভব না থাকলেও সম্রাট কপিলেন্দ্রদেবের (১৪৫৬-৭৭) মানসিক দৃঢ়তা যথেষ্ট। তাঁর নির্দেশে গঙ্গা বাহিনী নাসিরুদ্দীন মামুদের রাজ্য আক্রমণ করে বেশ কিছু দূর এগিয়ে আসে; তুর্কীরা পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসারণ করলে কপিলেন্দ্রদেব ভাগীরথী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করে গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন।

এর কিছু দিন পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কামরূপের পশ্চিমার্দ্ধে বর্তমান জলপাইগুড়ি-কুচবিহার-রঙ্গপুর অঞ্চলে পরাক্রান্ত কামতা রাজ্যের অভ্যুদয় হয়ে পরবর্তী সুলতান রুকনুদ্দীন বরবককে ভাবিয়ে তোলে। অচিহ্নিত সীমান্ত অতিক্রম করে কামতা সৈন্যগণ ঘন ঘন তাঁর রাজ্য আক্রমণ করলে সেই কাফেরদের শাস্তি দানের জন্য তিনি সেনাপতি ইসমাইল গাজীকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। পূর্বতন তুর্কী আক্রমণকারীরা তবু কামরূপের অভ্যন্তরে কিছু দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু ইসমাইল গাজী তাও পারলেন না। দিনাজপুর জেলার মাহি

নামক স্থানে উভয়পক্ষে যে যুদ্ধ হয় তাতে তাঁর সৈন্যবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তিনি কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে নিজ ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। এই কাহিনীর লেখক পীর সাত্তারি বলেন, যুদ্ধে পরাজিত হয়েও ইসমাইল গাজী শেষ পর্য্যন্ত জয়লাভ করেছিলেন এই হিসাবে যে তাঁর ধর্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হয়ে কামতেশ্বর তাঁর কাছে ইসলামে দীক্ষা নেন। সাত্তারি বলেন: এই তো আসল জয়! কোন রাজ্য অধিকার করবার চেয়ে তার অধীশ্বরকে ইসলামে দীক্ষা দেওয়ার মূল্য অনেক বেশী। কিন্তু পীর সাত্তারির এই কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। কারণ, ইসমাইল গাজীর পরাজয় সংবাদ গৌড়ে পৌছালে স্থলতান রুকনুদ্দীন তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কামতা সীমান্তের অদূরে কাঁটাতুয়ার নামক স্থানে তাঁর ফাঁসি হয়।

বাংলা ভাষার পূর্ণতা লাভ

ফিরিস্তা বলেন, ইলিয়াসশাহী বংশের এই ধারার তৃতীয় স্থলতান বরবক শাহর সময়ে আবিসিনিয়া থেকে দলে দলে হাবসী ক্রীতদাস গৌড়ে আসে। স্থলতান বরবক আট হাজার হাবসীকে রাজ সরকারে ও সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী দেন। তাঁর কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়ে সেই ক্রীতদাসের দল ধীরে ধীরে রাষ্ট্রের প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করে এবং দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে বসে।

বাংলা ভাষার যে রূপ এখন আমরা দেখছি তা প্রথম পূর্ণতা লাভ করে এই যুগে। বাংলা সাহিত্যের এই সময়ে জন্ম হয়। যে শিশু এত দিন প্রাকৃতের জঠরমধ্যে অবস্থান করছিল কবি মালাধর বস্থর উদ্যোগে তা স্থতিকাগার থেকে বেরিয়ে আসে। বিশদ আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়ে করা হবে। মালাধরের সাহিত্য সাধনার পিছনে যে গৌড়েশ্বর বরবক শাহর প্রেরণা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল সে কথা তিনি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। বরবকের আদি পুরুষ ইলিয়াস শাহ যে কোথা থেকে এসে তাঁর বংশের বীজ গৌড়ের মাটিতে রোপণ করেছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যায় না, কিন্তু তাঁর পিতামহ নাসিরুদ্দীন মামুদের সময়ে দেখা গেল যে অঙ্কুরটি পুরাপুরি গৌড়ীয় মহীরুহে পরিণত হয়েছে। কোনরূপ বৈদেশিকতার চিহ্নমাত্র তার মধ্যে নেই। মালাধরের গুণমুগ্ধ স্থলতান বরবক তাঁকে রাজসম্মানে ভূষিত করেন।

কবির নিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলায় কুলীনগ্রামে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের নিবন্ধে তিনি লিখেছেন যে ১৩৯৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে সেই কাব্যগ্রন্থের রচনা স্থরু হয়। তাঁর প্রতিভাকে স্বীকৃতি দানের জন্য গৌড়েশ্বর বরবক শাহ তাঁকে গুণরাজ খাঁ এবং তাঁর পুত্রকে সত্যরাজ খাঁ উপাধি দেন। পুত্রকে কেন যে উপাধি দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক কারণ জানা না গেলেও অনুমান হয় যে তিনি পিতার যোগ্য পুত্র ছিলেন; পিতার ন্যায় তাঁরও কিছু সাহিত্যসৃষ্টি ছিল। উপাধি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে স্থলতান বরবক কবিকে রাজশক্তি ব্যবহারের অধিকারও দিয়েছিলেন। তাঁর দস্তখত সমন্বিত ছাড়পত্র দেখাতে না পারলে কোন ব্যক্তিকে গৌড় সীমান্ত পার হয়ে উড়িষ্যায় প্রবেশ করতে দেওয়া হত না। কিছু জায়গীরও বোধ হয় তিনি পেয়েছিলেন।

রক্ষকের ভক্ষকরূপে আত্মপ্রকাশ

রুকনুদ্দীন বরবক শাহ ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করলে তার পুত্র সামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর সাত বৎসরব্যাপী রাজত্ব সম্বন্ধে এইটুকু জানা যায় যে এই স্থপণ্ডিত ধর্মভীরু স্থলতানের আদেশে গৌড়-বঙ্গের সর্বত্র মদ্যপান নিষিদ্ধ হয়। অল্প বয়সে তাঁর যে কি ভাবে মৃত্যু হোল সে কথা কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। তাঁর বালকপুত্র সিকান্দার মসনদে আরোহণের তিন দিন পরেই সিংহাসন থেকে অপসারিত হন। কারণ, তিনি ছিলেন উন্মাদ—রাজ্য শাসনের অযোগ্য। সেই জন্য আমীর ওমরাহরা তাঁকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর পিতৃব্য হোসেনকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

জালালউদ্দীন ফাত নাম নিয়ে হোসেন গৌড়ের শাসনদণ্ড পরিচালনা করতে থাকেন। তিনি বুদ্ধিমান শাসক হোলেও জ্যেষ্ঠাগ্রজ রুকনুদ্দীন বরবক যে হাবসীদের মাথায় তুলেছিলেন তার ফল তাঁকে ভুগতে হয়। রুকনুদ্দীনের পক্ষে হাবসীরা ছিল অপরিহার্য্য—তারা না থাকলে তিনি বিরোধীদের সংযত করতে পারতেন না। কিন্তু তাদের প্রভাব বাড়তে বাড়তে জালালউদ্দীন ফাতের সময়ে অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে তাঁর নিরাপত্তা পুরাপুরি নির্ভর করত সেই বিদেশীদের দাক্ষিণ্যের উপর। সর্বত্র তাদের অবাধ গতি ছিল—রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত ছিল তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন। বীর দর্পে তারা রাজধানীর সর্বত্র ঘুরে

বেড়াত, কাউকে গ্রাহ্য করত না। তাদের দমন করবার জন্য ফাত শাহ্ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন; যারা অবাধ্য তাদের শাস্তি দেওয়া হয়, যারা রাজভক্ত তারা পায় উৎসাহ। শেষোক্তদের মধ্যে মালিক আন্দিল বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন। এই ভাবে জালালউদ্দীন ফাত যখন সুকৌশলে হাবসী প্রভাব হ্রাস করবার আয়োজন করছিলেন সেই সময়ে এক দিন রাত্রে তাদের অন্যতম নায়ক খোজা বারিক তাঁকে হত্যা করে।

1. Firishta *Gulshan-i-Ibrahimi, Briggs' trans., p. 579*
2. Banerjee R. D. *History of Orissa, p. 289-99, 301-2*
3. Habibullah A. B. M. *Later Iliyas Sahis and Abyssinians in History of Bengal, p. 136*

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের অভ্যুদয়

বীজ ভাষা সংস্কৃতর পরিচয়

দেশের মাটিতে ভাষার জন্ম। মানুষের অলক্ষ্যে জলবায়ুসহ সে মাটি নিয়ত পরিবর্তিত হয়—সে ভাষাও। প্রতি ভাষা থেকে কত শব্দ অহরহ লোপ পাচ্ছে, আবার কত নূতন নূতন শব্দ এসে স্থান করে নিচ্ছে। প্রকাশ ভঙ্গিরও বদল হচ্ছে। কোথা থেকে আসে এই শব্দসম্ভার বা কেমন করে পুরাতন শব্দগুলি অচল হয় এই প্রশ্নের জবাব কেউ দিতে পারে না। বৈয়াকরণরা এ নিয়ে মাথা ঘামান, কিন্তু তরঙ্গের গতি রোধ করবার সাধ্য তাঁদের নেই। নূতন মৌলিক শব্দ সৃষ্টির সাধ্যও নেই। তারা আপনিই সৃষ্ট হয়।

সর্ব দেশে সর্ব কালে এই চলমান ভাষা ফলেফুলে বিকশিত হয় সাহিত্যের ভিতর দিয়ে। প্রাচীন ভারতের অধিবাসীরা সংস্কৃতে কথা বলত, তাই ওই ভাষায় রচিত হয়েছিল তাদের, তথা বিশ্বের, প্রথম গ্রন্থ বেদ। চার খণ্ডে সমাপ্ত বিরাট গ্রন্থ—ভাষা আদিযুগীয় সংস্কৃত। কয়েক শতাব্দী পরে উপনিষদের যুগে এসে দেখি সংস্কৃতর রূপ ঈষৎ বদলেছে, ঋষিদের চিন্তাধারা হয়েছে গভীরতর। বিশ্বপ্রকৃতির বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁরা বলছেন: সূর্য্য সেখানে কিরণ দেয় না, চন্দ্র-তারকা অগ্নি-বিদ্যুৎও কিরণ দেয় না; তিনি আলোক বিকীরণ করলে তবে তারা আলোকিত হয়। সেই অমর ব্রহ্ম তোমার সম্মুখে পশ্চাতে দক্ষিণে বামে বিদ্যমান রয়েছেন—

> ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ।
> তমেব ভান্তিমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি॥

(মুণ্ডকোপনিষদ-১১)

উপনিষদের দর্শন চার হাজার বৎসর পরে জার্মানীতে পৌঁছে Schegel ও Schopenhaurসহ সমগ্র বিদগ্ধ সমাজের জীবনদর্শন বদলে দেয়। সেখান থেকে এই মহাগ্রন্থ ইংল্যাণ্ডে গিয়ে Carlyle, Coleridge, Shelley, Wordsworth প্রভৃতি মনীষীদের চিন্তাধারা প্রভাবিত করে; আমেরিকায় গিয়ে Emerson, Thoreauসহ বহু চিন্তানায়ককে নূতন আলোক দেয়। এইভাবে উপনিষদ সারা বিশ্বকে আলোকিত করলেও তার ভাষা জার্মান বা ইংরাজী নয়—আদিযুগীয় সংস্কৃত। সে যুগের নরনারীরা যে ভাষাতে কথা বলত উপনিষদের ঋষিরা সেই ভাষাতেই সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন।

যাঁরা বলেন যে সংস্কৃত কোন দিন কথ্য ভাষা ছিল না তাঁরা একেবারেই ভ্রান্ত। এই ভাষায় যদি বৈদিক যুগের জনসাধারণ নিজেদের ভাবের আদান প্রদান না করত তাহোলে এর ভিতর দিয়ে সেই মহান সাহিত্যের বিকাশ সম্ভব হোত না। কল্পনায় গড়া শব্দ ও empirical ব্যাকরণ দিয়ে একখানি গ্রন্থ তো দূরের কথা একটি ছোট বাক্য রচনাও সম্ভব নয়। যদি তেমন কোন শক্তিধর থাকেন তাঁর স্থান হবে ভগবানের পার্শ্বে। তিনি শূন্যে অট্টালিকা নির্মাণ করে তাতে সুখে বাস করতে পারবেন!

সংস্কৃতের প্রভাব সীমান্তের ওপারেও ছড়িয়ে পড়েছিল বলে পার্শীদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তার গাথাগুলিতে বৈদিকযুগীয় সংস্কৃত ও বৈদিক আচারের এত প্রাধান্য। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বৈদিক সংস্কৃতের রূপ বদলায়, কারণ আর্য্যদের কথ্য ভাষাও বদলে যায়। তাই বেদোত্তর যুগে রচিত কপিলের সাংখ্যদর্শনের ভাষা কিছুটা স্বতন্ত্র—রামায়ণ-মহাভারতের ভাষা আরও স্বতন্ত্র। সে যুগে রচিত ভাগবদ্গীতার সংস্কৃত বেশ সরল ও সহজবোধ্য। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন: ধর্মের যখন গ্লানি হয়, অধর্ম মাথা তুলে দাঁড়ায়, তখন সাধুদের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতদের বিনাশ করে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি পৃথিবীতে আবির্ভূত হই --

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৪ | ৭-৮

মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যে স্মৃতিগ্রন্থগুলি

রচনা করেছেন সেগুলির ভাষা গুরুগম্ভীর। বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যোতিষের ভাষাও তাই। জনসাধারণের জন্য লিখিত পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গল্পগুলির ভাষা সাবলীল। সেই সব গল্প পরে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে কত নূতন নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। Aesop's Fablesএর গল্পগুলি এই দুই পুস্তক থেকে গৃহীত, তবে ইওরোপে পৌছে জন্তুগুলির অবয়ব বদলেছে। ভারতের শিয়াল হয়েছে গ্রীসের খ্যাকশিয়াল! কথাসরিৎসাগরের প্লটগুলি সর্ব দেশের সাহিতের পুষ্টি জুগিয়েছে। সেক্সপিয়ার তাঁর ভেনিসের বণিককে নিজ প্রতিদ্বন্দ্বী আন্টোনিওর বুক থেকে এক পাউণ্ড মাংসের সন্ধান দিয়েছেন শিবি রাজার উপাখ্যান থেকে।

নন্দ যুগে এসে সংস্কৃতর রূপ আরও বদলায়, কারণ তখন লোকের কথ্য ভাষা বদলে নূতন রূপ নিয়েছে। তাই পাণিনিকে তাঁর অষ্টাধ্যায়ী রচনায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। এই যুগে রাজনীতি নিয়ে লিখিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের ভাষা বলিষ্ঠ, আবার জনসাধারণকে জ্ঞানদানের জন্য একই লেখক যে নীতিসার রচনা করেছেন তার ভাষা কত সরল। নীতিসারে তিনি বলছেন: যে দেশে লোকে তোমাকে সম্মান করে না, যেখানে বৃত্তির অভাব, বন্ধু বলতে কেউ নেই বা কৃষ্টিবান লোক নিয়ে যেখানকার সমাজ গঠিত নয় সে দেশ তুমি অবশ্যই পরিত্যাগ করবে—

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানো ন বৃত্তির্ন চ বান্ধবঃ।
ন চ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ॥

প্রাকৃতের উদ্ভব

নন্দ যুগ থেকে মৌর্য্যযুগের ব্যবধান খুব বেশী নয়, কিন্তু এই যুগে পৌছে আমরা জানতে পারি যে রাজসভায় ও বিদগ্ধ সমাজে সংস্কৃতর আগের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকলেও মগধের জনসাধারণের কথ্য ভাষা বহু পূর্বে, শিশুনাগ রাজাদের সময়ে, পালিতে পরিণত হয়েছে। পালি জনগণের প্রকৃত—তাই প্রাকৃত ভাষা সংস্কৃতের মত classical ভাষায় ধর্মাচার্য্যদের চলে না বলে তাঁরা জনসাধারণকে সেই প্রাকৃতে ধর্মকথা শোনাতেন। • শ্রীবুদ্ধের মহাপ্রয়াণের পর শিষ্যমণ্ডলী তাঁর বাণীগুলি সংগ্রহ করে যে ত্রিপিটক রচনা করেন তার ভাষা পালি। ধম্মপদে

বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের সম্বোধন করে বলছেন: কিসের হাসি? কি আনন্দ এই জগত যখন নিয়ত পুড়ে যাচ্ছে? অন্ধকারে আচ্ছন্ন থেকে প্রদীপের সন্ধান করবে না? জ্ঞানাভাবে গৃহকারকের সন্ধানে আমি বহু জন্ম অতিক্রম করেছি; পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ দুঃখ। কিন্তু, গৃহকারক! এইবার তুমি ধৃত হয়েছ, আর তুমি গৃহ নির্মাণ করতে পারবে না। তোমার পাশুর্কাসমূহ ভগ্ন ও গৃহকূট বিদীর্ণ হয়েছে। আমার চিত্ত নির্বাণগত, তৃষ্ণা ক্ষয়প্রাপ্ত—

কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পজ্জলিতে সতি।
অন্ধকারেন ওনদ্ধা পদীপং ন গবেস্সথ ॥ ১১।১
অনেক জাতিসংসারং সংধাবিস্সং অনিব্বিসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং ॥ ১১।৮
গহকারক দিট্ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং তহ্নানং খয়মজ্ঝগা ॥ ১১।৯

দুই শতাব্দী পরেও পালি সজীব ভাষা—অশোকের শিলালিপিগুলি পালিতে লিখিত। কিন্তু তারও দুই শত বৎসর পরে কংসপাত্রের আঘাতে মৃৎপাত্রে ফাটল ধরল—পালিকে কোণঠাসা করে সংস্কৃত আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। কনিষ্কের উদ্যোগে যে তৃতীয় বৌদ্ধ-সঙ্গীতির অধিবেশন হয় তাতে নাগার্জ্জুনের নেতৃত্বে মহাযানপন্থীরা পালি ছেড়ে সংস্কৃত গ্রহণ করে। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত সুললিত সংস্কৃতে রচিত হয়। সদ্ধর্মপুণ্ডরীকাক্ষ, ললিতবিস্তার প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির ভাষাও সংস্কৃত। মহাযানপন্থীরা কনিষ্কের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করায় বিশাল কুষাণ সাম্রাজ্যের সর্বত্র ওই মত প্রচারের সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যও ছড়িয়ে পড়ে।

এইভাবে সংস্কৃতর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় বটে কিন্তু তার রূপ যে প্রতিনিয়ত বদলাচ্ছে বিভিন্ন সময়ে রচিত গ্রন্থগুলি পাঠ করলে তা বোঝা যায়। গুপ্তযুগে সংস্কৃতর প্রাণশক্তি সারা বিশ্বকে উদ্ভাসিত করে, কিন্তু তার রূপ বৈদিক যুগের ভাষা থেকে স্বতন্ত্র। শুদ্রকের মৃচ্ছকটিক বা কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র, অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ প্রভৃতি নাটকের ভিতর সে যুগের কথ্য ভাষারও কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে রচিত ভবভূতির উত্তররামচরিত বা শ্রীহর্ষের রত্নাবলীর ভাষাও যথেষ্ট স্বতন্ত্র। তারও পরে দ্বাদশ

শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব তাঁর কোমলকান্ত পদাবলীতে সারা ভারতে এক নূতন মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করেন, কিন্তু তার মধ্যে সংস্কৃতর সঙ্গে অনাগত বাংলা ভাষার পদধ্বনি শোনা যায়। মহাকবি বলছেনঃ ওগো সুন্দরী! যমুনার তীরে ধীর সমীরণ বইছে, আর তার মাঝে সচকিত নয়নে তোমার পথ চেয়ে বসে আছেন বনমালী—

ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।
পীনপয়োধর পরিসরমর্দ্দন চঞ্চল করযুগশালী ॥ ৫-৯
পতিত পতত্রে বিগলিত পত্রে শঙ্কিতভবদুপযানম।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম ॥ ৫-১১

আলোচ্য সময়ে রচিত কালিকাপুরাণের মধ্যেও এইরূপ বাংলাঘেঁষা সংস্কৃতর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

পণ্ডিতগণের দেশত্যাগ

গীতগোবিন্দ প্রকাশের কিছু কাল পরে তুর্কীরা আর্য্যাবর্তের তিনটি রাজ্য অধিকার করে নিলে যে সব পণ্ডিত তাঁদের সভা অলঙ্কৃত করতেন তাঁদের অনেকেই স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে চলে যান। লক্ষ্মণসেনের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস অন্য রাজ্যে গিয়ে 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রকাশ করেন। অনুরূপ আরও বহু গ্রন্থ সে সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে প্রকাশিত হয়। তুর্কী-ভারতে যখন মামলুকদের তাণ্ডব চলছিল স্বাধীন রাজ্যগুলিতে তখন কৃষ্টি সাধনার বন্যা বইছিল। হয়সালারাজ দ্বিতীয় বীর বল্লালের সময়ে ১২০৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় ধর্মঘোষের 'শতপদিকা'। একই বৎসরে জীবদত্তসূরী তাঁর 'বিবেকবিলাস' প্রকাশ করেন। ত্রিবাঙ্কুরাধিপতি ইরামন কেরল বর্মনের সভাপণ্ডিত সোমেশ্বরের 'কীর্তিকৌমুদী' প্রকাশিত হয় তার তিন বৎসর পরে ১২৩৯ খৃষ্টাব্দে। ১২১১ খৃষ্টাব্দে মালবে অর্জুনবর্মণ অমরু-শতকের টীকা 'রসিকমঞ্জরী' লিখে যশস্বী হন। তার পাঁচ বৎসর পরে অজিতদেবসূরী 'যোগসিদ্ধি' রচনা করেন; গ্রন্থখানি লুপ্ত হোলেও বিভিন্ন পুস্তকে তার যে উদ্ধৃতি রয়েছে তা থেকে গ্রন্থকারের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। একই সময়ে প্রকাশিত জীবদত্তের 'বিবেক-বিলাস' একখানি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ। জীনদেবসূরীর শিষ্য

অভয়দেবসূরীর 'জয়ন্তবিলাস' এই সময়ে প্রকাশিত হয়। অনুরূপ মূল্যবান গ্রন্থ আরও আছে।

লেখকরা সবাই যে শরণার্থী ছিলেন তা নয়। তবে একই সময়ে এরূপ সাহিত্যস্রোত প্রবাহিত হওয়ায় অনুমান করা যায় যে তুর্কী অধিকারের মধ্যে প্রতিভা বিকাশের সুযোগ লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে বহু মনীষী বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যে চলে যান। পণ্ডিতদের এই দেশত্যাগ তার পরেও অব্যাহত গতিতে চলে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম মিথিলায় শিক্ষা সমাপনের পর উড়িষ্যায় গিয়ে রাজা কপিলেন্দ্রদেবের সভা অলঙ্কৃত করেন।

গৌড়ী ভাষা

বুদ্ধদেবের সময় মগধে সংস্কৃত যে পালিতে পরিণত হয়েছিল সে কথা পূর্বে বলেছি। গৌড়ের জনসাধারণ তখন কোন ভাষায় কথা বলত তা জানবার কোন উপায় নেই। তার হাজার বৎসর পরে পাল যুগে যে ভাষাটি এখানে প্রচলিত ছিল তার কিছু কিছু নমুনা এখনও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু রাজশক্তি সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষাকে আমল দিত না বলে সেই বিশাল মহীরুহ হাজার শাখা বিস্তার করে উদ্যানকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে ক্ষুদ্রতর বৃক্ষগুলি অঙ্কুরোদগমের সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে যাচ্ছিল। মহীরুহ সুমিষ্ট ফল প্রদান করে সত্য, কিন্তু লতাগুল্মের স্ফুরণ না হোলে ওষধি প্রস্তুত হবে কেমন করে? ধর্মাচায্যগণ কোন ভাষা দিয়ে আপামর জনসাধারণের ক্ষতের উপর তাঁদের মতবাদের প্রলেপ দেবেন? রাজশক্তির ঔদাসিন্য সত্ত্বেও তাঁদের উদ্যোগে বিভিন্ন অঞ্চলের কথ্য ভাষাগুলি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে ওঠে। অনুরূপ ৩৪টি ভাষা দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্যমান ছিল। প্রায় সব কয়টি সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হোলেও তাদের নিজস্ব রূপ ছিল। গৌড়ের পালরাজগণ নিজেরা বৌদ্ধ হয়েও যখন সংস্কৃতে রাজকার্য্য পরিচালিত করছিলেন ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে পালিকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছিলেন তখন রামাই পণ্ডিত প্রভৃতি ধর্মাচার্য্যগণ জনসাধারণের মধ্যে শ্রীবুদ্ধের মহিমা প্রচার করছিলেন প্রচলিত গৌড়ী ভাষায়। রামাই পণ্ডিতের লেখা থেকে সেই ভাষার নমুনা দেওয়া হোল—

বন্ন স্থন্নী করতার সভ স্থন্নী অবতার
সব্ব স্থন্নী মধ্যে আরোহণ।
চরণে উদয় ভানু কোটী চন্দ্র যিনি তনু
ধবল আসন নিরঞ্জন॥

রামাই পণ্ডিতের শতাধিক বৎসর পরে বজ্রযানপন্থী বৌদ্ধরা যে সব ডাক পুরুষের বচন রচনা করেন তাও গৌড়ী ভাষায় লিখিত। যথা

(১) আদি অন্ত ভুজণী।
ইষ্ট দেবতা পূজসি॥
মরনর জদি ডর বাসসি।
অসম্ভব কভু না খাওসি॥

(২) ভাষা বোল পাতে লেখি।
বাটা হুবো বোল কটি সাখি॥
মধ্যস্থ জনে সমাধে নিয়াঅ।
বোলে ডাক রত সুখ পাঅ॥
মধ্যস্থ জবে হেমাতি বুঝে।
বোলে ডাক নরকে পইচে।

এই গৌড়ী ভাষার উদ্ভব যে কখন হয়েছিল তা বলা যায় না, তবে দ্বাদশ শতাব্দীতে গুর্জররাজের সভাপণ্ডিত হেমচন্দ্র ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে যে পুস্তক রচনা করেন তাতে দেখা যায় যে সে সময়ে গৌড়ে গৌড়ী ও বঙ্গে প্রাচ্য ভাষা নামে দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীতেও যে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি সে কথা কবি আমীর খসরু তাঁর কিরানা সালাতিন নামক পুস্তকে এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলছেন: আমার জন্ম হিন্দে।......বর্তমান সময়ে এ দেশের প্রতি প্রদেশে একটি করে ভাষা আছে যা তার নিজস্ব ও কারও কাছে ধার করা নয়। সিন্ধি, লাহোরী, কাশ্মীরী, ডোগরী, তেলেঙ্গী, গুজরাটী, মেবারী, গৌড়ী, বাংলা—এই সব হিন্দের বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে গৌড়ী ভাষা তখনও লোপ পায় নি এবং বঙ্গের প্রাচ্য ভাষা বাংলা নামে অভিহিত হচ্ছে।

পূর্বোল্লিখিত গৌড়ী ভাষা বিবর্তিত হোতে হোতে এক সময়ে বাংলায় রূপান্তরিত হয়। সেই শুভক্ষণটি যে কবে এসেছিল বা মহাকাশের কোন গ্রহ যে তখন কোন স্থানে অবস্থান করছিল তা কেউ বলতে পারে না। তবে ভাষাটি যখন সূতিকাগৃহে সেই সময়কার অল্পস্বল্প যে সব লেখা এখনও বিদ্যমান রয়েছে তাতে দেখা যায় যে মহাবৌদ্ধ রামাই পণ্ডিতের যুগ চলে গিয়ে লুইপাদ, সবরিপাদ, ভুষুকপাদ প্রভৃতি সিদ্ধাচার্য্যরা বৌদ্ধদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে নিজেদের মতবাদ প্রচারের জন্য যে সব ছড়া রচনা করছেন তাতে বাংলার ছোঁয়াচ রয়েছে। একটি ছড়ায় ভুষুকপাদ বলছেন: কার কাছে, কি ভাবে আছ? শিকারীরা এসে সব দিক থেকে তোমাকে ঘিরে ফেলেছে। জান না, হরিণ আপন মাংসের জন্য সকলের বৈরী হয়? ভুষুকপাদের দশাও তাই, ব্যাধেরা ক্ষণকালের জন্য তাকে ছাড়ে না—

কাহেরে ঘিনি মেলি অচ্ছ কিস।
ভেঢ়িল হাঁক পড়অ চৌদিশ॥
আপনা মাংসে হরিণা বৈরী।
ক্ষণহ ন ছাড়অ ভুষুক অহেরী॥

মালাধর বসু

সাহিত্য হিসাবে সিদ্ধাচার্য্যদের এই ছড়াগুলির মূল্য বিশেষ নেই, কিন্তু এর ভিতর দিয়ে বাংলা ভাষার ক্রমবিকাশের ধারা জানতে পারা যায়। হিন্দী সাহিত্যের প্রথম কাব্যগ্রন্থ চাঁদকবি রচিত পৃথ্বিরাজ রাসোএর ভাষা যতখানি হিন্দী সিদ্ধাচার্য্যদের এই ছড়াগুলি তার চেয়ে কম বাংলা নয়। এই সিদ্ধাচার্য্যগণকে বাংলা সাহিত্যের পুরোধা বলা যেতে পারে। এঁদের লেখা বিবর্তিত হোতে হোতে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে রূপ নেয় তাই দিয়ে বর্দ্ধমান জেলায় কুলীনগ্রাম নিবাসী কবি মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয় নামে যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন তাকে বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ বলা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে কবি লিখেছেন—

কেহ বলে পরাইমু পীত বসন।
চরণে নূপুর দিমু বলে কোহ্ন জন॥

কেহ বলে বনমালা গাঁথি দিমু গলে।
মণিময় হার দিমু কোহ্ন সখি বলে॥
কটিতে কঙ্কন দিমু বলে কোহ্ন জন।
কেহ বলে পরাইমু অমূল্য রতন॥
শীতল বাতাস করিমু অঙ্গ জুড়ায়।
কেহ বলে সুগন্ধি চন্দন দিমু গায়॥
কেহ বলে চূড়া বানাইমু নানা ফুলে।
মকর কুন্তল পরাইমু শ্রুতিমূলে॥
কেহ বলে রসিক সুজন বড় কাল।
কর্পূর তামুল সনে জোগাইব পান॥

মালাধর বসু বাংলা সাহিত্যের Chaucer (১৩৪০-১৪০০)। চসারকে দিয়ে যেমন ইংরাজী সাহিত্যের উন্মেষ হয়েছিল মালাধরকে দিয়ে তেমনি বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ হয়। উভয় কবি পরস্পরের সমসাময়িক। চসারের Canterbury Tales ইংরাজী ভাষার প্রথম সুসম্পূর্ণ গ্রন্থ, মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও বাংলা সাহিত্যের প্রথম সুসম্পূর্ণ গ্রন্থ। Canterbury Tales-এর উপাদানগুলি যেমন বিভিন্ন বিদেশী গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে, মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ও তেমনি ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্রের রূপ অবলম্বনে রচিত। চসারের পূর্বে যেমন Beowolf প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন কবিতা ইংল্যাণ্ডে প্রচলিত ছিল মালাধরের পূর্বেও যে গৌড়ে বহু বিচ্ছিন্ন কবিতার অস্তিত্ব ছিল তা আমরা পূর্বে দেখেছি। Beowolf এর ভাষা প্রাক্-ইংরাজী যুগীয় Anglo-Saxon ভাষা, মালাধরের পূর্বে রচিত ছড়াগুলির ভাষাও প্রাক্-বাংলা যুগীয় গৌড়ী ভাষা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কামতা-কুচবিহার

পূর্বের এক অধ্যায়ে বলেছি যে নবদ্বীপ পতনের ৬৩ বৎসর পরে সুলতান মুঘিসুদ্দীন উজবক কামরূপ জয় করতে গিয়ে শোচনীয়রূপে পরাজিত হন। পরবর্তী সত্তর বৎসর ধরে এই অঞ্চলের ঘটনাস্রোত অন্ধকারের আবরণে আচ্ছাদিত। সে আবরণ যখন অপসারিত হয় তখন দেখা গেল যে কামরূপের অস্তিত্ব লোপ পেয়ে একটি নূতন রাজ্য কামতার অভ্যুদয় হয়েছে। রাজা দুর্লভ-নারায়ণকে দিয়ে এই রাজ্যের কাহিনী সুরু। অহমরাজের সঙ্গে যুদ্ধে দুর্লভ নারায়ণ পরাজিত হোলেও তাঁর রাজ্য অটুট থাকে, নিজের এক কন্যাকে বিজয়ী শত্রুর সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তিনি সন্ধি স্থাপন করেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে দেখা গেল যে দুর্লভনারায়ণের বংশকে অপসারিত করে পরাক্রান্ত খেন বংশ কামতার শাসনদণ্ড অধিকার করেছে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা নীলধ্বজ ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। শৈশবে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সামান্য কাজ করলেও বুদ্ধির প্রখরতা ও রণদক্ষতায় যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসেন। তারপর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি একে একে জয় করে কামতেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। পূর্বে সঙ্কোশ ও পশ্চিমে করতোয়া নদী বেষ্টিত এখনকার জলপাইগুড়ি, কুচবিহার ও রংপুরের কতকাংশ অর্থাৎ প্রাচীন কামরূপের পশ্চিমার্দ্ধ নিয়ে এই রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল।

রাজা নীলধ্বজ শুধু প্রতিভাবান যোদ্ধা ছিলেন না, সুশাসক হিসাবেও উচ্চ আসন দাবী করতে পারেন। মিথিলা ও রাঢ় থেকে বহু গুণী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে স্বরাজ্যে এনে তিনি প্রজাদের সাংস্কৃতিক জীবন এবং শাসনযন্ত্রের উৎকর্ষ সাধন করেন। তাঁর রাজধানী কামতাপুর এক ঐশ্বর্য্যশালী নগরীতে পরিণত হয়।

আসাম বুরঞ্জী পাঠে জানা যায় যে পরিখাবেষ্টিত এই নগরীর পরিসীমা ছিল উনিশ মাইল। ভারেলী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কামতাপুরের ধ্বংসাবশেষ দেখে বুচানন হ্যামিল্টন লিখে গেছেন, এক সময়ে যে এটি একটি জনাকীর্ণ সহর ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বর্মী ও চীনা রাজধানীগুলির মত এখানে রাজার প্রাসাদ ঠিক নগরীর মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল।

কামতা রাজ্য যখন উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে তখন সুরু হয় সেখান থেকে তুর্কী অধিকৃত লখনৌতির বিরুদ্ধে অভিযান। রুকনুদ্দীন ববরকের সময়ে কামতা বাহিনী তুর্কী সীমান্ত ভেদ করে ক্ষিপ্রগতিতে রাজধানী গৌড়ের দিকে এগিয়ে আসে। সীমান্তরক্ষীগণ তাদের বাধা দিয়ে ব্যর্থকাম হওয়ায় দিনাজপুর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ কামতেশ্বরের অধিকারভুক্ত হয়। আর কিছু দূর এলে গৌড়। কিন্তু রুকনুদ্দীনের ফৌজ তাদের অগ্রগতি রোধ করে।

নীলাম্বর যখন কামতার অধীশ্বর তখন এই রাজ্যের আয়তন পূবে বড়নদী এবং পশ্চিমে করতোয়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। পশ্চিমপ্রান্তীয় অঞ্চলগুলি অধিকার করবার জন্য তাঁকে লখনৌতির তুর্কী সুলতানদের বিরুদ্ধে একাধিকবার সার্থক সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। নিজ অধিকারকে সুরক্ষিত করবার জন্য তিনি কয়েকটি শক্তিশালী দুর্গ ও বহু রাজপথ নির্মাণ করেন। সেই রাজপথ-গুলির মধ্যে কয়েকটি আজও বিদ্যমান রয়েছে। তাঁর তৈরী কামতাপুর-ঘোড়াঘাট সড়ক ধরে আজও লোক কুচবিহার থেকে রংপুর ও বগুড়ায় যাতায়াত করে। তাঁর শক্তি দেখে কোন বহিঃশত্রুর সাহস হয় নি যে কামতার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

বিপদ কিন্তু এল গৃহাভ্যন্তর থেকে। রাজা নীলাম্বরের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী শচিপাত্রের সঙ্গে রাজপরিবারের যথেষ্ট অন্তরঙ্গতা থাকায় তাঁর তরুণ পুত্র অহরহ প্রাসাদে যাতায়াত করত। কিন্তু অন্যের মত সে নির্লিপ্ত ছিল না। রাজমহিষীর ভুবনমোহিনী রূপ তাকে আকৃষ্ট করে—উন্মাদ করে দেয়। এই সংবাদ রাজার গোচরে এলে এক দিন তিনি সেই যুবককে হাতেনাতে ধরে ফেলে বধ করবার আদেশ দেন।

রাজা নীলাম্বর যদি সেখানে নিরস্ত হোতেন তাহোলে হয় তো দোষের কিছু হোত না। কিন্তু নিহত মন্ত্রীপুত্রের মাংসে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে তিনি তার

পিতাকে খেতে দেন। পরে এক সময়ে এই বীভৎসতার কথা জানতে পেরে ক্রুদ্ধ মন্ত্রী গঙ্গাস্নানের অছিলায় কামতা ছেড়ে চলে আসেন হোসেন শাহর রাজধানী গৌড়ে। তাঁর প্ররোচনায় মুসলমান সৈন্যগণ কামতা আক্রমণ করে এবং অতি সহজে রাজধানী কামতাপুর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। কিন্তু দীর্ঘ অবরোধের পরও যখন ওই নগরী অধিকার করা গেল না তখন ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে রাজা নীলাম্বরকে বন্দী ও রাজধানী ধ্বংস করে।

কামতাবাসীরা কিন্তু কাপুরুষ ছিল না। যে মনোবল থাকলে মানুষ সকল দুর্য্যোগের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাদের তা ছিল। কামতাপুর ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে তারা সম্মিলিতভাবে অস্ত্র ধারণ করে এবং বিশ্ব-সিংহ নামক এক যোদ্ধার নেতৃত্বে তুর্কীদের স্বরাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেয়।

কামতার ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে ওঠে নূতন রাজ্য কুচবিহার।

চতুর্দশ অধ্যায়

হাবসী যুগ

হাবসী ক্রীতদাসদের পরিচয়

তুর্কীদের আর্য্যাবর্ত জয়ের কিছু দিন পর থেকে মধ্য-এশিয়ার ক্রীতদাস বাজারে মন্দা দেখা দেয়। মহম্মদ ঘোরী থেকে স্থরু করে প্রথম দিকের সকল তুর্কী স্থলতান নাখাসে নাখাসে এজেন্ট পাঠিয়ে উচ্চ মূল্যে ক্রীতদাস ক্রয় করায় সে সময়ে বাজার বেশ তেজী হয়ে উঠেছিল। দৈহিক শক্তি ও শারীরিক সৌন্দর্য্যের মানদণ্ডে তাদের মূল্য নির্দ্ধারিত হোত। ভারতে এসে তাদের অনেকে বিভিন্ন রণক্ষেত্রে কৃতিত্ব দেখানর যথেষ্ট স্থযোগ স্থবিধা পায়, নিজেরাই এক একজন ক্রেতা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তার পরই মোঙ্গল অভ্যুত্থান হওয়ায় এই বাজারে ভীষণ আলোড়ন দেখা দেয়। মোঙ্গলরা যুদ্ধক্ষেত্রে অসংখ্য লোককে হত্যা করলেও দাস ব্যবসাকে স্থনজরে দেখত না; তাদের অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলিতে এই ব্যবসা নিষিদ্ধ হয়। অথচ শুধু ভারতের তুর্কী রাজ্যগুলিতে নয় পশ্চিম এশিয়ায় তাদের স্বগোত্রীয় শেলজুক তুর্কীগণ যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল সেখানেও ক্রীতদাসের চাহিদা তখন যথেষ্ট। তার পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেনীয়রা আমেরিকায় যে সব কলোনী স্থাপন করে সেগুলির উন্নয়নের জন্যও বহু ক্রীতদাসের প্রয়োজন হয়। চাহিদা প্রচুর, অথচ যোগান অল্প। তাই এই পণ্য ব্যবসায়ীরা আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ও আরবে গিয়ে ক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে। আবিসিনিয়া ক্রীতদাস সংগ্রহের এক প্রধান বাজার হয়ে দাঁড়ায়। সেখানকার পণ্যের বড় ক্রেতা ছিলেন গৌড়ের স্থলতানগণ। স্থলতান রুকমুদ্দীন বরবক শাহ আবিসিনিয়া থেকে আট হাজার হাবসী ক্রীতদাসকে এনে স্বতন্ত্র এক সৈন্য-বাহিনী গঠন করেন। বিপদে আপদে এই ক্রীতদাসবাহিনী যে তাঁর পাশে

দাঁড়াবে এ বিশ্বাস সেই সুলতানের ছিল ; কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল যে তাদেরই একজন খোজা বারিক তাঁর বংশধরকে হত্যা করে মসনদ অধিকার করে নিচ্ছে।

সুলতান শাহাজাদা

প্রথানুযায়ী পাঁচ হাজার পাইক সৈন্য রাত্রিকালে গৌড় প্রাসাদে পাহারা দিত। নিজ নিজ অফিসারদের নির্দেশে ঢাল-তরবারি হস্তে সারারাত প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করা ছিল তাদের রীতি। প্রভাতে সুলতান এসে অলিন্দে দাঁড়ালে তাঁকে কুর্ণিশ করে তারা নিজ নিজ ডেরায় ফিরে যেত। কিন্তু ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে এক দিন প্রভাতে সেই প্রহরীগণ সবিস্ময়ে দেখল যে পূর্ব দিনের সুলতান জালালউদ্দীন ফাত শাহ অলিন্দে আসেন নি, তাঁর পোষাকে দেহ আবৃত করে তাদেরই অধিনায়ক খোজা বারিক সেখানে দাঁড়িয়ে মৃদু হাস্য করছে। প্রকৃত ঘটনা বুঝতে কারও অসুবিধা হোল না, কিন্তু নূতন সুলতানের বিরুদ্ধে কথা বলতেও কেউ সাহস পেল না।

সুলতান শাহাজাদা নাম নিয়ে খোজা বারিক গৌড়ের অধীশ্বর হয়ে বসলে লখনৌতিতে যত হাবসী ছিল সবাই আনন্দে নৃত্য করে উঠল। তুচ্ছ ক্রীতদাস হয়ে যেভাবে তিনি মসনদ অধিকার করেছেন তাতে বহু লোক যে তাঁর বিরুদ্ধে যাবে সে কথা বুঝতে শাহাজাদার অসুবিধা হয় নি। বিরোধীদের হাত করবার জন্য তিনি রাজকোষের সমস্ত অর্থ দরাজ হস্তে বিতরণ করতে লাগলেন। চাটুকাররা তা গ্রহণ করল, কিন্তু বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। এই বিরোধীদের প্রধান ছিলেন শাহাজাদারই স্বজাতীয় মালিক আন্দিল।

ফাত শাহর হত্যার সময়ে মালিক আন্দিল কোন দূরবর্তী অঞ্চলে বাস করছিলেন। পাছে তিনি সেখানে বসে চক্রান্ত চালান এই ভয়ে সুলতান শাহাজাদা তাঁকে রাজধানীতে এনে কারারুদ্ধ বা হত্যার চেষ্টা করেন। সে কথা বুঝতে পেরে মালিক আন্দিল সর্বদা সৈন্য পরিবৃত হয়ে বাস করতেন এবং এরূপভাবে দেহরক্ষীসহ দরবারে যেতেন যে সুলতান শাহাজাদা তাঁর কোন অনিষ্ট করবার সুযোগ পেতেন না। শেষ পর্য্যন্ত তিনি যখন বুঝলেন যে এভাবে মালিক আন্দিলের মত প্রভাবশালী ব্যক্তিকে জব্দ করা যাবে না তখন তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। তিনি আশ্বাস দেন

যে মালিক আন্দিলের কোন অনিষ্ট করবেন না ; প্রতিদানে মালিক আন্দিল কোরাণ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেন যে শাহাজাদা মসনদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তাঁর প্রতি যথোচিত মর্য্যাদা দেখাবেন—কোন প্রকার অনিষ্ট সাধনে বিরত থাকবেন।

এই প্রতিজ্ঞার অথ শাহাজাদা এই বুঝলেন যে তিনি যত দিন সুলতান থাকবেন তত দিন আর যেই তাঁর অনিষ্ট করুক মালিক আন্দিল করবেন না, কিন্তু আন্দিলের কাছে অর্থ ভিন্ন রূপ। এক দিন রাত্রিকালে প্রাসাদে নাচগানের পর সুলতান শাহাজাদা যখন মদ্যপানে অচৈতন্য হয়ে পড়েছেন তখন তাঁকে খতম করবার জন্য আন্দিল গোপন পথ ধরে সেখানে প্রবেশ করেন। নাচ-গান শেষ করে সবাই যে যার বাড়ী চলে গেছে, শুধু সুলতান মসনদের উপর শুয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে মালিক আন্দিল একান্তে অপেক্ষা করে বসে রইলেন, কারণ প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী সুলতান মসনদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন তিনি তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেন না! বেশ কিছুক্ষণ পরে সুলতান যখন মসনদ থেকে নেমে এলেন তখন আন্দিলের আর কোন নৈতিক দায়িত্ব রইল না, সোজা তাঁর বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেন। আঘাত গুরুতর হোলেও শাহাজাদার তাতে মৃত্যু হয় নি, মৃত্যুর ভাণ করে মেঝের উপর পড়ে রইলেন। অদূরে ছিল আন্দিলের এক সহচর, প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পেরে সে দ্বিতীয় আঘাতে শাহাজাদার ইহলীলা সাঙ্গ করে দেয়।

সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ (১৪৮৬-৯০)

শাহাজাদা নিধনের পর মালিক আন্দিল তাঁর নিহত প্রভু ফাত শাহর শিশুপুত্রকে মসনদে বসাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আবহাওয়া তখন এতই বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল যে সেই শিশুর পক্ষে বেশী দিন স্বপদে সমাসীন থাকা সম্ভব হবে এমন কথা তার বিধবা জননী মনে করেন নি। তাঁর অনুরোধে সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ নাম নিয়ে মালিক আন্দিল মসনদে আরোহণ করেন। তিনি হাবসী হোলেও পূর্ববর্তী চারজন হাবসী সুলতানের মত নীচমনা ছিলেন না। ফাত শাহর সময়ে তিনি যোদ্ধা হিসাবে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন, এখন সুশাসক হিসাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে লাগলেন। তাঁর বদান্যতার কোন

সীমা ছিল না। প্রার্থীদের তিনি এরূপ মুক্তহস্তে দান করতেন যে খাজাঞ্চীদের মনে মাঝে মাঝে আশঙ্কা জাগত যে শেষ পর্যন্ত রাজকোষ নিঃশেষ হয়ে যাবে। এই দানশীলতায় সকলেই মুগ্ধ হয়।

গৌড় নগরীর ফিরোজ মিনার এই হাবসী ফিরোজের অক্ষয় কীর্তি। ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত এই মিনারের উচ্চতা ৮৪ ফুট। পাচতল বিশিষ্ট সৌধটির নীচের তিন তলা বারো পহল এবং উপরের দুই তলা গোল। এর গড়নের কাজে চকমকি টালির ব্যবহার যথেষ্ট করা হয়েছিল।

কদম রসুলও সৈফুদ্দীন ফিরোজ শাহ নির্মাণ করেন। প্রথানুযায়ী পূর্বতন কোন হিন্দু মন্দির ভেঙে এর মালমশলা সংগ্রহ করা হয়েছিল।

নাসিরুদ্দীন মামুদ-২ (১৪৯০-৯১)

তিন বৎসর রাজত্বের পর গুপ্তঘাতকের ছুরিকাঘাতে সৈফুদ্দীন ফিরোজের জীবনাবসান হোলে তাঁর পুত্র নাসিরুদ্দীন মামুদ-২ মসনদে আরোহণ করেন। তিনি তখন নাবালক বলে তাঁর গৃহশিক্ষক হাব্‌স খাঁ রিজেণ্ট নিযুক্ত হন। কিন্তু তাঁকে সুকৌশলে সরিয়ে দিয়ে সিদি বদর দেওয়ানা নামে আর একজন হাবসী সর্দার বালকের রিজেন্সীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

সিদি বদরের উচ্চাকাঙ্খা ছিল, রিজেণ্টের পদ গ্রহণ তাঁর মসনদে আরোহণ করবার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। এই লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি প্রাসাদ-প্রহরীদের সঙ্গে চক্রান্ত সুরু করেন এবং এক দিন সুযোগ বুঝে তাঁর রক্ষণাধীন বালককে শমন সদনে পাঠিয়ে দেন। গভীর রাত্রে এমনই গোপনে কাজটি হাসিল করেছিলেন যে বাইরের কেউ তা ঘুণাক্ষরে জানতে পারে নি। কিন্তু পরের দিন সকালে সভাসদরা যথারীতি দরবারে এসে সবিস্ময়ে দেখে যে সুলতানের পোষাক পরে সিদি বদর মসনদে বসে রয়েছেন। কানাঘুষায় সব ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ল, কিন্তু কি আর করবার আছে? সবাই বলে উঠল, সুলতান সিদি বদর কি জয়!

গণ-বিপ্লব

কিন্তু তিনি এখন সিদি বদর দেওয়ানা নন—সুলতান সামসুদ্দীন মুজাফর।

তাঁর অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব সন্ত্রাস রাজত্বের সূত্রপাত হয়। পুত্রসম এক বালককে হত্যা করে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ায় যে বহু লোক তাঁর নিধন চাইবে এ তো জানা কথা। সেই বিরোধীদের ঠাণ্ডা করবার জন্য তিনি শাসন ও সৈন্য বিভাগ ঢেলে সাজান। সর্বত্র সুরু হয় বিভীষিকার রাজত্ব। নূতন সুলতানের আদেশে হাবসী সিপাহীরা সকল সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের বাড়ীতে প্রবেশ করে বিনা কারণে শক্তিমান যুবকদের হত্যা করে। এ বিষয়ে হাবসী-অহাবসী বা হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ করা হয় নি। মুজাফরের সৈন্যরা যাকেই বিরোধী বলে সন্দেহ করত বিনা দ্বিধায় তাকে শমন সদনে পাঠিয়ে দিত।

একদিকে এই বীভৎসতা এবং অন্যদিকে অর্থগৃধ্নুতা ছিল সামসুদ্দীন মুজাফরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। প্রধান খাজাঞ্চীকে মাঝে মাঝে প্রাসাদে আহ্বান করে তিনি সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি এত বড রাজ্যের অধীশ্বর, অথচ তাঁর সম্পদ এত অল্প ? জবাবে খাজাঞ্চী জানালেন : আয় কম অথচ ব্যয় বেশী, টাকা জমবে কি ভাবে ? সুলতান মুজাফর বুঝলেন, কথাটা ঠিক ; এই ত্রুটী সংশোধনের জন্য একদিকে রাজস্বের হার বাড়িয়ে দিলেন, আবার অন্যদিকে শাসন ও সৈন্য বিভাগের বেতন হ্রাস করলেন। তাতে রাজকোষ বেশ ফুলেফেঁপে উঠলেও রাজপুরুষদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিল ; শাসনযন্ত্র বিকল হবার উপক্রম হোল।

কেবল একটি বিভাগে বেতন বাড়ান হয়েছিল—সে তাঁর স্বজাতীয় হাবসী সৈন্যদের। হাবসী রাজত্ব কায়েম হয়েছে ভেবে সেই গর্বস্ফীত সৈনিকরা বেপরোয়াভাবে লোকের উপর অত্যাচার সুরু করে—মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তারা শশকের মত ভীরু হোলেও সহ্যের একটা সীমা আছে—দিকে দিকে গণবিদ্রোহ দেখা দেয়। পরবর্তীকালের ফরাসী বিদ্রোহের সঙ্গে এই বিদ্রোহের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল, কিন্তু তা পূর্ণতা লাভ করবার পূর্বে সামসুদ্দীন মুজাফরের উজীর বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়ে তাঁর অবস্থা শোচনীয় করে তোলেন।

গ্রামাঞ্চল থেকে বিদ্রোহীরা পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে দলে দলে রাজধানীর দিকে এগিয়ে এলে হাবসী সৈন্যরা তাদের পথরোধ করে দাঁড়ায়। রাজধানীর প্রবেশ

পথে বিভিন্ন রণাঙ্গণে উভয় পক্ষের তুমুল সংগ্রাম চলে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সরকারী বাহিনী পরাজিত হোতে হোতে লখনৌতির প্রাচীরাভ্যন্তরে এসে আশ্রয় নেয়, সুলতান সামসুদ্দীন মুজাফর নিজ প্রাসাদে অবরুদ্ধ হন। এইভাবে চার মাস ধরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে রাজকীয় সৈন্যদের যুদ্ধ চলবার পর উজীর সৈয়দ হোসেন এক দিন রাত্রে সুলতানের দেহরক্ষী পাইকদের সহায়তায় তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ করেন।

সেই সঙ্গে হাবসী যুগের উপর যবনিকাপাত হয়।

1 Ghulam Hussain Salim *Riyaz-us-Salatin. trans Abdus Salam. p. 137*
2 Abid Ali Khan *Memoirs of Gaur ant Pandua, p. 32*

পঞ্চদশ অধ্যায়

হোসেনশাহী বংশ

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯)

হাবসী মুজাফরের আততায়ী হোসেন শাহ ছিলেন আরব ভাগ্যান্বেষী সৈয়দ আসরাফের পুত্র। অনেক আশা আকাঙ্খা নিয়ে আসরফ এদেশে এসেছিলেন, কিন্তু কোথাও কিছু সুবিধা না হওয়ায় তাঁর জীবন খুব দুঃখে কাটে। আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য পুত্র হোসেনকে মুর্শিদাবাদ জেলার একআনি চাঁদপাড়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণ গৃহস্থের বাড়ীতে রাখালের কাজে নিযুক্ত করেন। সহৃদয় ব্রাহ্মণ দেখেন যে বালক দরিদ্র হোলেও বুদ্ধিমান, তাই তাকে অবসর সময়ে লেখাপড়া শেখান ও সে বয়ঃপ্রাপ্ত হোলে স্থানীয় কাজীর সহায়তায় রাজ সরকারে একটি ছোটখাট চাকুরী জোগাড় করে দেন। এইভাবে আত্মোন্নতির সুযোগ পেয়ে হোসেন কর্মদক্ষতার গুণে শেষ পর্য্যন্ত উজীরের পদ লাভ করেন। কিন্তু উজীর তিনি নামে, আসল রাজ্য চালাত হাবসীরা। মুজাফর হাবসীর সময়ে যখন তাদের বিরুদ্ধে চারিদিকে গণবিদ্রোহ দেখা দেয় তখন এক দিন সবার অলক্ষ্যে প্রভুকে হত্যা করে তিনি মসনদ আত্মসাৎ করেন।

সে যুগের মানদণ্ডেও হোসেন শাহ যথেষ্ট গর্হিত কাজ করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ না করলে হাবসী বিভীষিকা দূর হোত কিনা সন্দেহ। তাঁর ক্ষমতালাভে ক্ষিপ্ত হয়ে হাবসীরা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ চালাতে থাকে; জনজীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। তাদের কঠোর হস্তে দমন করে হোসেন ১২ হাজার হাবসী সৈন্যকে হত্যা করেন এবং বাকী হাবসীদের জাহাজে তুলে স্বদেশ আবিসিনিয়ায় পাঠিয়ে দেন।

প্রাসাদরক্ষী পাইকরা এদেশীয় হোলেও তাদের উপর হোসেন শাহের আস্থা

ছিল না। তারা নাচত, গাইত, স্ফূর্তিতে দিন কাটাত। কোনরূপ কর্মদক্ষতা ছিল না, আবার ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করবার আগ্রহও ছিল না। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে তাদের চক্ষের সামনে হাবসী শাহাজাদা প্রাসাদে প্রবেশ করে সুলতান ফাত শাহকে হত্যা করে; আবার তাদের অনেকের জ্ঞাতসারেই হোসেন স্বয়ং সামসুদ্দীন মুজাফরকে অপসারিত করেন। এই সব অকর্মন্য সিপাহীদের দিয়ে কিছু কাজ হবে না বুঝে তিনি রক্ষীবাহিনীর বিলোপ সাধন করে সকল সৈন্যকে নিজ নিজ গ্রামে পাঠিয়ে দেন।

দিল্লীর সঙ্গে বিরোধ

এতদিন দিল্লীর লোদী ও জৌনপুরের সরকিরা পরস্পরের সঙ্গে কলহে লিপ্ত ছিল বলে গৌড়ের পশ্চিম সীমান্ত থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা ছিল না। কিন্তু ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর সিকান্দার লোদী জৌনপুর অধিকার করায় গৌড়ের সমূহ বিপদ দেখা দেয়। লোদীদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য হোসেন শাহ পশ্চিম সীমান্তে বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করেন। একজন মিত্রও মিলে যায়। রাজ্যচ্যুত জৌনপুররাজ হোসেন সরকি তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এক পত্র পাঠান। তিনি সানন্দে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাঁর বসবাসের জন্য ভাগলপুরের অদূরে এক সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে দেন। তাঁর ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত জায়গীরও দেওয়া হয়।

আলাউদ্দীন হোসেনের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। জৌনপুরে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার পর থেকে দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদী তাঁর রাজ্য আক্রমণ করবার জন্য চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে বহু সমস্যা থাকায় সেই অভিযান কয়েক বৎসরের জন্য বিলম্বিত হয়ে যায়। শেষ পর্য্যন্ত এক দিন তিনি পূর্ব দিকে যাত্রা করলে হোসেন শাহ তাঁর সম্মুখীন হবার জন্য নিজ পুত্র দানিয়েলকে তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। পাটনার অদূরে বাঢ় গ্রামে উভয় সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাৎ হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাপতিদ্বয় উন্মুক্ত প্রান্তরে তাঁবু ফেলে প্রথম আঘাত হানবার জন্য উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করছেন এমন সময়ে এক দিন লোদী শিবির থেকে দূত এসে দানিয়েলকে জানাল যে সুলতান ইব্রাহিম যুদ্ধ চান না—সন্ধির প্রত্যাশী। এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব সকলকে বিস্মিত

করলেও ইব্রাহিম লোদীর গত্যন্তর ছিল না। কারণ, তিনি যখন হোসেনী সৈন্যদের সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন সেই সময়ে খবর আসে যে বাবরের নেতৃত্বে মোগলরা লাহোরে এসে উপস্থিত হয়েছে। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী তাদের বাধা দেওয়া দূরের কথা গোপনে আহ্বান জানিয়েছেন। পাঞ্জাব যদি বাবরের অধিকারে চলে যায় তাহোলে দিল্লীর প্রবেশদ্বার তো আপনিই উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সেই বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য সুলতান ইব্রাহিম সকল সৈন্যসহ দিল্লীর দিকে রওনা হোলেন। দানিয়েলও গৌড়ে ফিরে এলেন।

কামতা অভিযান

এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বে কামতারাজ নীলাম্বরের প্রধানমন্ত্রী শচিপাত্র হোসেন শাহর দরবারে এসে উপস্থিত হন। রাজা নীলাম্বর তাঁর পুত্রকে হত্যা করায় তিনি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বদ্ধপরিকর। ইতিপূর্বে বিভিন্ন তুর্কী সুলতান কামরূপ-কামতা জয়ের জন্য বারবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু এরূপ সুযোগ কেউই পান নি। বিক্ষুব্ধ মন্ত্রীর কাছ থেকে কামতা রাজ্যের বহু আভ্যন্তরীণ সংবাদ জানতে পেরে হোসেন শাহ এক সৈন্যবাহিনীকে কামতায় পাঠিয়ে দেন। তারা রাজধানী কামতাপুর পর্যন্ত অগ্রসর হয়, কিন্তু দীর্ঘ অবরোধের পরও ওই নগরী অধিকার করতে সক্ষম না হওয়ায় বিশ্বাসঘাতকতা-পূর্বক রাজা নীলাম্বরকে বন্দী ও কামতাপুর ধ্বংস করে।

কামতার সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে হোসেন শাহ আসাম জয়ের জন্য আর একটি অভিযাত্রীবাহিনী সংগঠিত করেন। তাদের অকস্মাৎ আগমনে অহমরাজ নিজ রাজধানী ও সৈন্যবাহিনীকে পার্বত্য অঞ্চলে অপসারিত করেছেন দেখে হোসেনশাহী সৈন্যগণ আনন্দে উৎফুল্ল হয়। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী তাদের উপর বিরূপ ছিলেন। বর্ষা নামবার সঙ্গে সঙ্গে রাস্তাঘাট দুর্গম হয়ে উঠলে অহম-বাহিনী পাহাড় থেকে নেমে এসে তাদের উপর এরূপ প্রচণ্ড আঘাত হানে যে চব্বিশ হাজার পদাতিক ও কয়েক হাজার অশ্বারোহী ও নৌসৈন্যের মধ্যে মাত্র কয়েকজন প্রাণ নিয়ে দেশে ফিরতে পেরেছিল। অহমরা প্রায় সমস্ত অভিযাত্রী বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

উড়িষ্যায় বিপর্য্যয়

আসামে ব্যর্থতার জন্য হোসেন শাহর মনে যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল তা পূরণ করবার জন্য তিনি চারদিকে দৃষ্টি ফেরাচ্ছেন এমন সময়ে গুপ্তচরমুখে খবর এল যে উড়িষ্যার সীমান্ত অরক্ষিত রয়েছে—রাজা প্রতাপরুদ্র দূরদেশে অবস্থান করায় বহিরাক্রমণ প্রতিরোধ করবার মত কোন সৈন্যাধ্যক্ষ রাজধানীতে নেই। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবার জন্য তিনি ১৪০৯ খৃষ্টাব্দে এক সৈন্যবাহিনী উড়িষ্যায় পাঠিয়ে দেন। পথে কোন প্রতিরোধ না থাকায় তারা পুরী পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে সেখানকার মহামন্দির ভাঙবার উদ্যোগ করছে এমন সময়ে খবর এল যে উড়িষ্যা বাহিনী ওই ধর্মনগরীর অদূরে এসে উপনীত হয়েছে। তাদের সংখ্যা ও শক্তির কথা শুনে হোসেনশাহী সৈন্যগণ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অন্য পথ ধরে গৌড়ের দিকে রওনা দেয়।

উড়িষ্যা তখনও এক দুর্দ্ধর্ষ শক্তি। শত্রু পালিয়ে গেছে বলে আত্মপ্রসাদ উপভোগ করবার মত নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্র ছিলেন না। তাঁর সৈন্যগণ হোসেনশাহী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে শেষ পর্য্যন্ত সীমান্তদুর্গ মান্দারণে এসে উপস্থিত হয়। ওই দুর্গ অধিকারের জন্য উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলে। উড়িষ্যা বাহিনী মাসের পর মাস ধরে দুর্গ অবরোধ করে থাকলেও শেষ পর্য্যন্ত সেনাপতি গোবিন্দ বিদ্যাধরের নিবু'দ্ধিতার জন্য অবরোধ তুলে নেওয়ায় গড়-মান্দারণ উভয় রাজ্যের অলিখিত সীমান্ত বলে স্বীকৃত হয়।

প্রথম ত্রিপুরা যুদ্ধ

সে সময়ে ত্রিপুরা ছিল এক পরাক্রান্ত রাজ্য। সেখানকার সৈন্যরা তুর্কী অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে এসে মাঝে মাঝে লুঠতরাজ চালাত—একবার সোনারগাঁ পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছিল। আলোচ্য সময়ের কিছু পূর্বে আরাকানরাজ মেং-সো-সোয়ান ব্রহ্মরাজ কতৃক সিংহাসনচ্যুত হোলে রাজা ধর্মমাণিক্যের আদেশে ত্রিপুরী সৈন্যগণ গিয়ে তাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে আরাকান ও ত্রিপুরার মধ্যে মনোমালিন্য লেগেই থাকত। হোসেন শাহর সৈন্যগণ ওই অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে পূর্বতন দুই দাবীদারকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করলে বন্দরটি অধিকারের জন্য তিন শক্তির মধ্যে তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়।

ত্রিপুরী সেনাপতি রায় চাইচাগ ছিলেন অনন্যসাধারণ প্রতিভাবান সমরনায়ক। নিজ সৈন্যবাহিনীকে দুইভাগে বিভক্ত করে তিনি একদিকে আরাকান ও অন্যদিকে হোসেন শাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তার সৈন্যরা সংখ্যাল্প হোলেও উভয় ফ্রণ্টে অপূর্ব্ব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে। এইভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হবার পর সেনাপতি চাইচাগ উভয় শত্রুকে পরাভূত করে চট্টগ্রামের উপর ত্রিপুরেশ্বরের আধিপত্য দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। হোসেনশাহী সৈন্যরা নিজ সীমান্তের এপারে ফিরে আসে।

দ্বিতীয় ত্রিপুরা যুদ্ধ

এই পরাজয়ের পর হোসেন শাহ তার বিচক্ষণ সেনাপতি গৌর মল্লিকের অধীনে বৃহত্তর এক সৈন্যবাহিনীকে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দেন। তারা কুমিল্লার কাছাকাছি কোনও এক স্থানে পৌছালে ত্রিপুরী বাহিনী এসে তাদের সম্মুখীন হয়, কিন্তু পরাজিত হয়ে সোনামোতিয়া দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেয়। বিজয়োৎফুল্ল গৌর মল্লিক মেহেরকুল দুর্গ অধিকার করে রাজধানী রাঙামাটির দিকে অগ্রসর হন। তিনি জানতেন না তাঁকে ধরবার জন্য রায় চাইচাগ কি ফাঁদ পেতেছিলেন।

গৌর মল্লিক যখন সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে শুষ্ক গোমতী নদী পার হচ্ছিলেন শত্রুপক্ষীয় একজন সৈনিকও সেখানে উপস্থিত ছিল না। কেবল ধীবররা নদীর বেলাভূমিতে শামুক বা কাঁকড়ার অন্বেষণ করে ফিরছিল, রাখালরা তীরের উপর গরু চরাচ্ছিল। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। কিন্তু তা বেশীক্ষণ থাকল না। হাজার হাজার হোসেনশাহী সৈনিক শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মার্চ করতে করতে যখন বালুকাময় নদীর প্রায় মধ্যস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছে সেই সময়ে ধীবর ও রাখালরা হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল—একে অন্যের কাছে ইঙ্গিতে কি বার্তা পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাইল খানেক উত্তরে নদীর বাঁধ ভেঙে গিয়ে অবরুদ্ধ জলরাশি গর্জন করতে করতে হোসেনশাহী সৈন্যদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তারা ভীতিবিহ্বল নেত্রে সেই উত্তাল তরঙ্গ দেখল, কিন্তু পরিত্রাণের কোন পথ তখন উন্মুক্ত নেই। হাজার হাজার সৈনিককে ভাসিয়ে নিয়ে সেই প্রলয়বারি সমুদ্রের দিকে চলে গেল। সেনাপতি গৌর মল্লিক যখন আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলেন তখন দেখেন, যে গোমতীকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তিনি শুষ্ক দেখেছিলেন

তার কানায় কানায় জল ভরে উঠেছে, সেই জলের তলায় তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিমজ্জিত হয়েছে। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন তীরে উঠতে পেরেছিল তাদের নিয়ে তিনি চণ্ডীগড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু সেখানেও বিশ্রাম মিলল না, রাত্রিশেষে ত্রিপুরী সৈন্যরা তাঁর শিবিরে প্রবেশ করে সব কিছু ছারখার করে দিয়ে গেল।

হতাবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে গৌর মল্লিক গৌড়ের পথে রওনা হোলেন।

তৃতীয় ত্রিপুরা যুদ্ধ

হোসেন শাহর কাছে এই দুঃসংবাদ পৌছালে তিনি আরও বৃহত্তর এক সৈন্যবাহিনীসহ হাতিয়ান খাঁকে ত্রিপুরায় পাঠালেন। গৌর মল্লিকের তুলনায় হাতিয়ান খাঁ এমন কিছু কীর্তিমান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর সৈনিকরাও তো মাঝে মাঝে অসাধ্য সাধন করে। অনেক উৎসাহ দিয়ে, অনেক আশার কথা শুনিয়ে হোসেন শাহ হাতিয়ানকে বিদায় দিলেন। তিনিও প্রতিজ্ঞা করে গেলেন যে সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্য জয় করে সুলতানের কাছে উপহার দেবেন—ত্রিপুরা গৌড়ের এক অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবে। পূর্ব দু'বারের পরাজয়ের কথা স্মরণ করে সব দিক থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা হোল, অর্দ্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা উড়িয়ে হাতিয়ান খাঁ ত্রিপুরার দিকে রওনা হোলেন।

এবারেও ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। সেনাপতি রায় চাইচাগ যখন শুনলেন যে শত্রু আবার ত্রিপুরার দিকে এগিয়ে আসছে তখন তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের সম্মুখীন হবার জন্য অগ্রসর হোলেন। কুমিল্লার নিকট কোনও স্থানে হাতিয়ান খাঁর সৈন্যদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হোল। কয়েকদিন প্রতীক্ষার পর এক দিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রায় চাইচাগ হাতিয়ান খাঁকে আক্রমণ করলেন, কিন্তু সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতার জন্য সন্ধ্যার দিকে পশ্চাদ-পসারণ সুরু করেন। হয়তো বা এই ছিল তাঁর ষ্ট্র্যাটেজি। এইভাবে যখন তিনি শত্রুকে পিছনে টেনে আনছিলেন তখন রাত্রির অন্ধকারে পৃথিবী ঢেকে গেছে; সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হাতিয়ান খাঁর সৈন্যরা তাঁকে তাড়া করে চলেছে এবং তিনিও পালাচ্ছেন। সাফল্যের উৎসাহে বিজয়ী সেনাপতির খেয়াল হয় নি যে তিনি শুষ্ক গোমতীর বালুকারাশির উপর দিয়ে এগোচ্ছেন। কিছুক্ষণ পরে

দেখা গেল যে রায় চাইচাগের সৈন্যরা ত্রস্তপদে নদীর তীরে উঠে যাচ্ছে এবং দব থেকে অবরুদ্ধ জলরাশি গর্জন করতে করতে এগিয়ে আসছে। ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। আসন্ন মৃত্যু পরিহার করে হাতিয়ান খাঁ কোনক্রমে পালিয়ে গিয়ে স্বগনিয়া দুর্গে আশ্রয় নিলেন, কিন্তু তাঁর হাজার হাজার সৈন্য গোমতীর জলের তলায় ডুবে গেল। যারা নদীবক্ষে আসে নি এবং যারা নদী পার হয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল চক্ষের সামনে সহকর্মীদের এই শোচনীয় পরিণতি দেখে তারা এতই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে অস্ত্র ধারণের শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছিল। ত্রিপুরী সৈন্যগণ অতি সহজে তাদের বন্দী করে নিজ দুর্গে নিয়ে গেলে রাজা ধনমাণিক্যের আদেশে সবাইকে চতুর্দশ দেবতার সম্মুখে বলি দেওয়া হয়।

চতুর্থ ত্রিপুরা যুদ্ধ

এইভাবে বারবার পরাজয়ের ফলে হোসেন শাহের মনে নিদারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। বিশাল এক রাজ্যের অধীশ্বর তিনি, অথচ ক্ষুদ্র ত্রিপুরাকে বশীভূত করতে না পারায় তাঁর মর্য্যাদা যে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল সে কথা বুঝে নিয়ে আরও এক বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করে ত্রিপুরায় পাঠিয়ে দেন। নূতন সেনাপতি পূর্ব দু'বারের অভিজ্ঞতা থেকে কুমিল্লার পথ পরিহার করে অন্য এক পথ ধরে ত্রিপুরা রাজধানীর দিকে অগ্রসর হন। কৈলারগড়ের এক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে তাঁর শিবির স্থাপিত হয়। সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হবার জন্য রাজা ধনমাণিক্য সকল সীমান্ত থেকে সৈন্যদের সেখানে নিয়ে আসেন, কিন্তু তারা শত্রুকে প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়। হোসেনশাহী সৈন্যরা ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলগুলি অধিকার করে ত্রিপুরেশ্বরকে পার্বত্য প্রদেশে কোণঠাসা করে দেয়; কুমিল্লা ও সন্নিহিত অঞ্চলগুলি তাঁর হস্তচ্যুত হয়।

গৌড় ও ত্রিপুরার এই জীবনমরণ সংগ্রামের সময়ে আরাকানী সৈন্যরা এসে চট্টগ্রাম থেকে ত্রিপুরী সৈন্যদের হটিয়ে দিয়ে বন্দরটি অধিকার করে নেয়। সে অধিকার অবশ্য বেশী দিন স্থায়ী হয় নি, পরাগল খাঁর অধীনে হোসেন শাহ একটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে মগদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন। বিজয়ী পরাগল নিযুক্ত হন ওই নগরীর শাসক।

বঙ্গাব্দের প্রবর্তন

ত্রিপুরা যুদ্ধের পর হোসেন শাহকে আর কোন বড় রকমের যুদ্ধে লিপ্ত হোতে না হওয়ায় তিনি নিজের কর্মশক্তি প্রজাদের মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করেন। ভারতের সকল অঞ্চলের ন্যায় গৌড়েও তখন শকাব্দ প্রচলিত ছিল। জনসাধারণ এই অব্দের হিসাব ধরে নিজেদের কাজ কর্ম চালাত, কিন্তু শাসনকার্যে চলত ইসলামী হিজিরাব্দ। হজরত মহম্মদ কোরেশদের উপদ্রব থেকে আত্মরক্ষার জন্য ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই সন্ধ্যাগমের পর যখন মক্কা ছেড়ে মদিনায় চলে যান সেই থেকে এই অব্দের প্রবর্তন হয়। গৌড়ে এসে তুর্কীরা সেই অব্দ প্রচলিত করবার পর থেকে জনসাধারণ তা মেনে নিলেও এর চান্দ্রমাস অনুধাবন করতে পারত না। তার ফলে রাজকার্যে হিজিরাব্দ ও জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে শকাব্দ ধরে কাজ চলত। এরূপ দ্বৈত ব্যবস্থায় যথেষ্ট সমস্যার সৃষ্টি হোলেও সুলতানরা হিজিরাব্দ ছাড়েন নি, প্রজারাও শকাব্দ ভোলে নি।

হোসেন শাহ দেখলেন যে সন তারিখের জটিলতার ফলে বহু সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে, সমাধান কিছুই হচ্ছে না। তাই তিনি উজীর গোপীনাথ বসু, মুকুন্দ দাস, স্মার্ত রঘুনন্দন প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটি নূতন অব্দের প্রবর্তন করেন। এই অব্দটিও পয়গম্বরের হিজিরার দিন থেকে সুরু; কিন্তু ইসলামী চান্দ্রমাসের পরিবর্তে ভারতীয় সৌরমাস ধরে এব বৎসর গণনা করা হয়। সৌর বৎসর হয় ৩৬৫ দিনে, পক্ষান্তরে চান্দ্রমাস ৩৫৫ দিনে। সূক্ষ্মভাবে হিসাব করে উভয় বৎসরের পার্থক্য দাঁড়ায় ১০ দিন ২১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট। এইভাবে বঙ্গাব্দ প্রবর্তনের সময় জ্যোতির্বিদরা হিসাব করে দেখেন যে হিজিরাব্দের সঙ্গে এই অব্দের ব্যবধান ৯ বৎসর। এখন ব্যবধান আরও বেশী। আজ পুস্তকের এই অংশ মুদ্রণের দিন হিজিরাব্দের ১৩৮৮ সাল ২৪শে মহরম মাস, বঙ্গাব্দের ১৩৭৫ সাল ১০ই বৈশাখ মাস।

মহামতি হোসেন শাহ

হোসেন শাহ ছিলেন আরব পিতার বাঙালী পুত্র। গৌড়ের মাটিতে তাঁর জন্ম এবং গৌড়কে তিনি যেভাবে আপনার করে নিয়েছিলেন পূর্বের কোন সুলতান তা করেন নি। বখ্‌তিয়ারের সময় থেকে যাঁরা এই রাজ্যের শাসনদণ্ড

পরিচালনা করেছিলেন তাঁরা শাসক ও শাসিতের মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রেখে চলতেন। হোসেন শাহর সময় অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়, তিনি প্রজাদের আশাআকাঙ্খার প্রতি যথেষ্ট মর্য্যাদা দেন। তাই মুঙ্গের থেকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাঁর রাজ্যে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নি। তিনি নিজে ধর্ম্মনিষ্ঠ হোলেও অধিকাংশ মুসলমান স্থলতানের মত পরমতসহিষ্ণু ছিলেন না।[1] মুসলমান ফকিরদের ন্যায় হিন্দু সাধুরাও তাঁর কাছে যথেষ্ট সমাদর পেত।

তাঁর সময় থেকে হিন্দুরা রাজসরকারে সর্বোচ্চ পদে নিযুক্ত হয়। পূর্বেও অধিকাংশ সরকারী কাজ তাদের করতলগত ছিল সত্য, কিন্তু তাদের নির্দেশ দেবার জন্য উপরে একজন করে মুসলমান অফিসার বসে থাকতেন। হোসেন শাহ বিভাগীয় অধ্যক্ষ, এমন কি প্রধান মন্ত্রীত্বের পদে, হিন্দুদের নিযুক্ত করেছিলেন। উজীর গোপীনাথ বস্থর কর্মদক্ষতায় শাসনযন্ত্রে যথেষ্ট উৎকর্ষতা সাধিত হয়। গোপীনাথ রাজস্ব বিভাগকে এমনভাবে ঢেলে সাজিয়েছিলেন যে তার ফলে রাজস্ব আদায় শুধু যে সুশৃঙ্খলিত হয় তা নয় যথেষ্ট বৃদ্ধিও পায়। কেশব ছত্রী ছিলেন স্থলতানের দেহরক্ষী বাহিনীর অধ্যক্ষ ; ইতিপূর্বে কোনও হিন্দুকে এরূপ দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয় নি। দুই ভ্রাতা রূপ ও সনাতন ছিলেন দবির-ই-খাস— স্থলতানের নিজস্ব বিভাগের সর্বাধিনায়ক। বৈদ্য মুকুন্দ দাস ছিলেন তাঁর নিজস্ব চিকিৎসক। প্রাসাদের কারও অসুখ হোলে এই চিকিৎসকের ডাক পড়ত। টাকশালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কায়স্থ অনুপের উপর। বিভিন্ন মানের মুদ্রা তাঁর নির্দেশে প্রস্তুত হোত।

পরবর্তী কালে সপ্তদশ শতাব্দীতে দিল্লীতে বাদশাহ আকবর যা করেন দুই শতাব্দী পূর্বে পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড়ে হোসেন শাহ তাই করেছিলেন। গৌড়ের চারিদিকে উড়িষ্যা, নেপাল, কামতা ও ত্রিপুরার ন্যায় শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য রয়েছে জেনেও তিনি বহু হিন্দুকে সৈন্য বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন। দ্বিতীয় ত্রিপুরা যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন হিন্দু গৌর মল্লিক। অন্যান্য বিভাগেও বহু হিন্দু দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হয়ে হোসেন শাহর রাজ্যের সংহতি সাধন করেন।

হোসেনী যুগ

এরূপ এক মহানুভব নরপতির সুশাসনের গুণে গৌড় ধনধান্যে পূর্ণ হয়—অবরুদ্ধ জলরাশি নদীর দুই কূল প্লাবিত করে। সেনশক্তির নিষ্ক্রমণের পর থেকে এই রাজ্যের উপর যে অমানিশা নেমে এসেছিল হোসেন শাহর সময়ে তার অবসান হয়। যে প্রতিভা শাসনযন্ত্রের চাপে রুদ্ধশ্বাস হয়ে মরতে বসেছিল তাতে নূতন জীবনের ছোঁয়াচ লেগে দিকে দিকে প্রসার লাভ করে।

হাবসী সুলতানদের উৎপীড়নের জন্য নবদ্বীপ জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। হোসেন শাহর অভ্যুত্থানের ফলে সেখানে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়—আবির্ভূত হন গৌড় ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম ধর্মপ্রচারক শ্রীচৈতন্য। তাঁর কর্মজীবন উড়িষ্যায় কাটলেও জন্মভূমি গৌড়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। রাজপুরুষরা হোসেন শাহকে ভুল বুঝে একবার তাঁকে অতি সংগোপনে গৌড় থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি সেই মহাপুরুষের প্রতি কোনরূপ বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন না। তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য যে সব ভক্ত জগন্নাথক্ষেত্রে যেত তিনি কোন দিন তাদের যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করেন নি।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন হোসেনী যুগের আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এ দেশে প্রথম আগমনের পর থেকে তুর্কীরা হিন্দুসমাজের উপর বিরামহীন আঘাত হেনে যে ফাটলের সৃষ্টি করে তাতে জনসাধারণ নিজেদের সমাজব্যবস্থায় আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল। সেই মুমূর্ষু সমাজে নূতন করে প্রাণের সঞ্চার করেন এই রঘুনন্দন। পূর্ববর্তী সুলতানদের মত হোসেন শাহ যদি হিন্দুবিরোধী হোতেন তা হোলে রঘুনন্দনের প্রতিভাবিকাশ সম্ভব হোত কিনা তা বলা শক্ত। তিনি নিজেই একটি যুগ বলে পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে।

সুলতান বরবক শাহর আমলে ১৪৭৩ শকাব্দে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় দিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে প্রথম বিকাশ সুরু হয়েছিল এই সময়ে তা পূর্ণতা লাভ করে বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গল, যশোরাজ খাঁর পদাবলী প্রভৃতি গ্রন্থের ভিতর দিয়ে। চণ্ডীদাস এই যুগের উজ্জ্বলতম রত্ন। চট্টগ্রাম অধিকারের পর ছুটি খাঁ নামক যে সৈন্যাধ্যক্ষকে হোসেন শাহ সেখানকার শাসক নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন তিনি কবি পরমেশ্বরকে মহাভারতের বঙ্গানুবাদের জন্য প্রবুদ্ধ করেন। এই যে সব অসাধারণ প্রতিভার একত্র সমন্বয় তুর্কীদের আগমনের পর থেকে

কোন দিন তা সম্ভব হয় নি। হাবসী বিদ্রোহের পর হোসেন শাহর মত মহানুভব সুলতান গৌড়ের দায়িত্ব না নিলে এই প্রতিভাগুলি হয় তো লোকচক্ষুর অন্তরালে শুকিয়ে যেত। তিনি প্রজাদের ভালবাসতেন, প্রজারাও তাঁকে ভালবাসত। তিনি যে বিদেশী সে কথা ভুলে গিয়ে তারা গায়—

নৃপতি হোসেন শাহ হও মহামতি।
পঞ্চম গৌড়ে যাঁর পরম সুখ্যাতি॥
অস্ত্রে সুপণ্ডিত আর মহিমা অপার।
কলিকালে হরি হৈব কৃষ্ণ অবতার॥
নৃপতি হোসেন শাহ গৌড় ঈশ্বর।
তান হক সেনাপতি হউন্ত নশ্বর॥

1 Buchanon Hamilton F. *Eastern India*, *p. 448*
২ কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চৈতন্য চরিতামৃত, পৃ: ৩১০
৩ বৃন্দাবন দাস, চৈতন্য ভাগবত
৪ পদ্মনাথ গোঁহাই বড়ুয়া, আসামর বুরঞ্জী, পৃ: ৩১, ৫২
5 Gait E. A. *History of Assam*, *p. 43*
৬ বানেশ্বর ও শুক্রেশ্বর, রাজমালা, পৃ: ৪৪, ৪৭, ৫২
7 Hamidullah *Ahalis-ul-Khwanin*, *p. 17*

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন

তুর্কীদের প্রথম আগমনের পর থেকে হিন্দু ধর্মের উপর যে আঘাত স্থরু হয় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। শাসকদের নিজেদের মধ্যে কলহের কোন অন্ত ছিল না সত্য কিন্তু দু একজন স্থলতান বাদে তাঁরা কেউ প্রজাসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের উপর মর্য্যাদা দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করতেন না। এই অবহেলার প্রতিক্রিয়া তাদের উপর ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয়, নিজেদের সংস্কৃতির উপর সবার আস্থা শিথিল হয়। হাবসী স্থলতানদের উৎপীড়ন যখন তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে তখন একদিকে যেমন সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে অন্যদিকে তেমনি সমাজকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার জন্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এগিয়ে আসেন। এই যুগসন্ধিক্ষণে ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্ম হয় আচার্য্য রঘুনন্দনের।

রঘুনন্দনের পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্য ছিলেন নবদ্বীপের এক প্রতিষ্ঠাবান স্মার্ত্ত পণ্ডিত। তাঁর টোলেই পুত্রের শিক্ষা জীবনের সূত্রপাত হয়— নিজের ছাঁচে বালককে গড়ে তোলবার জন্য তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন। শৈশব থেকে পুত্র পিতাকে নিরাশ করেন নি ; তিনি ছিলেন যেমন শান্ত তেমনি অধ্যয়নশীল। পিতার টোলে ব্যাকরণ, অভিধান, কাব্যাদি অধ্যয়নের ফলে তিনি সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ছোট ছোট কবিতা রচনা করে পিতা ও সহাধ্যয়ীদের যথেষ্ট আনন্দ দিতেন।

বিবাহের পর রঘুনন্দন বিখ্যাত স্মৃতিবিদ শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির চতুষ্পাঠীতে স্মৃতিগ্রন্থের অধ্যয়ন স্থরু করেন। এই সময়টি ছিল নবদ্বীপের এক গৌরবময় যুগ। কাণভট্ট শিরোমণি প্রমুখ পণ্ডিতগণ নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রভাবে

মিথিলার গর্ব খব করে পণ্ডিত সমাজের সামনে নবদ্বীপের প্রাধান্য স্থাপন করছিলেন। হাবসীদের অত্যাচারে বহু পণ্ডিত নবদ্বীপ ছেড়ে উড়িষ্যায় চলে গেলেও নবদ্বীপের জ্যোতি তাতে ম্লান হয় নি। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সমস্ত গৌড় যখন অস্ত্র ধারণ করেছে সে সময়েও নবদ্বীপ ধ্যানমগ্ন যোগীর মত জ্ঞানের সাধনা করে যাচ্ছিল। সেই বিদ্রোহের শেষে রঘুনন্দন বুঝলেন যে দীর্ঘকালের ম্লেচ্ছ সংস্পর্শে যে সমাজবন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে শুধু সশস্ত্র বিদ্রোহে তার পুনঃ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। শাস্ত্র নির্দেশিত বিধিগুলির উপর সমাজকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে ভাঙ্গন বন্ধ হবে না।

কিন্তু সে দিক দিয়েও বাধার অন্ত ছিল না। নানা মুনির নানা মত। জনসাধারণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হোলে সকল মতের সামঞ্জস্য বিধান একেবারে গোড়ার কথা। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে রঘুনন্দন সুরু করেন স্মৃতিগ্রন্থ সমূহের সংকলন। দীর্ঘ ২৫ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ২৮ খণ্ডে সম্পূর্ণ তাঁর স্মৃতিতত্ত্বগুলি একে একে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলিতে হিন্দুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবতীয় কর্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। শুধু শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে নয়, মিথিলা, কাশী প্রভৃতি কৃষ্টিকেন্দ্রগুলি ভ্রমণ করে স্থানীয় প্রতিষ্ঠাবান স্মার্ত্তদের সঙ্গে মতের বিনিময়ের পর তিনি নিজ মত স্থাপন করেন। তাঁর গ্রন্থ পাঠে প্রচলিত আচার ব্যবহারের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে দেখে বহু পণ্ডিত বিরোধিতা সুরু করেন। কিন্তু শান্তচেতা রঘুনন্দন যুক্তির দ্বারা এমনভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন যে বিরোধীরা শেষ পর্য্যন্ত তাঁর মত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। তাঁদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারে জয়লাভ করবার পর তাঁর মত চারিদিকে প্রচারিত হয়—সর্বত্র পণ্ডিতসমাজ তার ভিত্তিতে সমাজকে পুনর্গঠনের বিধান দেন।

উত্তরাধিকার ব্যবস্থা সম্বন্ধে জীমূতবাহনেব 'দায়ভাগ' সমাজ জীবনে যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল সামাজিক আচার সম্বন্ধে রঘুনন্দনের স্মৃতিগুলি ঠিক তাই করে। বাংলার হিন্দুসমাজে এখন যে সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা পুরাপুরি স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের সৃষ্টি। পূর্বে অন্যান্য অঞ্চলের ব্রাহ্মণদের মত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদের সিদ্ধ চাউল, মৎস্য-মাংস ও মশুর ডাল ভক্ষণ নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু আচার্য্য রঘুনন্দন যখন দেখলেন যে এই নিষেধ অমান্য করে বহু লোক গোপনে সেগুলি আহার করছে তখন তিনি প্রকাশ্যে আহারের বিধান দেন। সেই

থেকে সকল শ্রেণীর গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে আমিষ আহারের প্রথা শাস্ত্রসম্মত বলে গণ্য হয়।

'উদ্বাহতত্ত্বে' রঘুনন্দন বলছেন, পিতার নিজেই কন্যাদান সম্পন্ন করা কর্তব্য। কোন কারণে তিনি অসমর্থ হোলে তাঁর অনুমতি নিয়ে অগ্রজ সম্প্রদান করতে পারেন। এই দুজনের পর মাতামহ, মাতুল, সকুল্য এবং বান্ধব যথাক্রমে কন্যাদানের অধিকারী। এদের সকলের অভাবে মাতা কন্যাদান করতে পারেন। কিন্তু দাতা প্রকৃতিস্থ হওয়া চাই। অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কন্যা-দানের অধিকার নাই।

বিবাহের পর কন্যার উপর তাহার পতির সম্পূর্ণ স্বামীত্ব স্থাপিত হয় এবং পিতার স্বামীত্ব লোপ পায়। সুতরাং কন্যার বিবাহের পর পতির গোত্রানুসারে সকল কার্য্য পালন করা বিধি। তাঁর মৃত্যুর পরও পতির গোত্রানু-সারে পিণ্ডদানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

বিবাহোক্ত মাস—অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ। অন্য সকল মাসে দোষস্থিতি আছে। কিন্তু এই নিষিদ্ধ মাসগুলিরও প্রতিপোষক দেখা যায়। অপর দেশের রাজা কর্তৃক স্বদেশ আক্রান্ত হোলে, দেশের অভ্যন্তরে রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দিলে, পিতামাতার প্রাণসংশয় হোলে অথবা কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স অতিক্রান্ত হোলে বিবাহের বিহিত মাসের জন্য অপেক্ষা করবে না—

রাজগ্রস্তে তথা যুদ্ধে পিতৃণাং প্রাণসংশয়ে।
অতিপ্রৌঢ়া চ যা কন্যা নানুকুল্যং প্রতীক্ষতে॥
অতিবৃদ্ধা চ যা কন্যা কুলধর্মবিরোধিনী।
অবিশুদ্ধাপি চ যা দেয়া গ্রহলগ্নবলেন তু॥
গ্রহশুদ্ধিসর্বশুদ্ধিং শুদ্ধিং মাসায়নর্ত্তু দিবসানাম্।
অর্বাক্ দশবর্ষেভ্যো মুনয়ঃ কথয়ন্তি কন্যায়াম্॥

'আহ্নিকতত্ত্বে' রঘুনন্দন বিধান দিয়েছেন, সূর্য্যোদয়ের এক প্রহর পূর্বে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করে মনে মনে স্মরণ করবে: তয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি। তার পর মুখ প্রক্ষালনের পর মস্তক আবরণ-পূর্বক সূচিদেশে মলমূত্র ত্যাগ করবে। বাসগৃহের নৈঋত কোণে বাণ নিক্ষেপ স্থানে অর্থাৎ দেড় শ' হাতের বাইরে পূরীষ উৎসর্গ করা বিধি। অধোশৌচে

দক্ষিণ হস্ত ব্যবহার করবে না। মুখ পর্য্যুসিত থাকলে মানুষ একেবারে অপ্রযত হয়; সেই কারণে সর্বপ্রযত্নে দন্তকাষ্ঠ ভক্ষণ করবে। কণ্টক বৃক্ষজ দন্তকাষ্ঠ পুণ্যময়, ক্ষীরবৃক্ষজ দন্তকাষ্ঠ যশস্বী। মধ্যাহ্নস্নান কালে যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে তার পিতৃগণের সঙ্গে দেবগণও নিরাশ হয়ে ফিরে যান।

দন্তধাবনের পর সংক্ষেপে প্রাতঃস্নান সেরে সন্ধ্যা করবে। অরুণকিরণব্যাপ্ত পূর্ব দিকে মুখ রেখে স্নান করবে।……

ভোজন পর্বে মহাস্মার্ত বলছেন, অতিথিকে ভোজন না করিয়ে যে ব্যক্তি আহার্য্য গ্রহণ করে সে কেবল পাপ ভক্ষণ করে। রোগী, দুঃখী, গর্ভিণী, বৃদ্ধ ও বালক—এদের ভোজন করবার পর গৃহস্থ নিজে ভোজন করবে। পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের অভুক্ত রেখে ভোজন করলেও পাপ ভক্ষণ করা হয় এবং পরকালে শ্লেষ্মা ভোজন করতে হয়। স্নান না করে ভোজন করলে মল ভোজন, জল পান না করে ভোজন করলে পুঁজরক্ত ভোজন এবং অসঙ্কতান্ন ভোজনে মূত্র ভোজন করা হয়।… প্রথমে দ্রব দ্রব্য, মধ্যে কঠিন দ্রব্য এবং শেষেও দ্রব দ্রব্য ভোজন করবে। অতিরিক্ত শাক, অধিকতর মূল এবং অত্যন্ত অম্ল দ্রব্য ভোজন বর্জন করবে।

শূদ্রাদি ভোজন দ্বারা অপরিষ্কৃত পাত্রে, তাম্র পাত্রে, মলযুক্ত পাত্রে, পলাশ পাত্রে ও পদ্ম পাত্রে গৃহী ভোজন করবে না। অর্ক পাত্রে, পত্রের পৃষ্ঠে, লৌহ পাত্রে, তাম্র পাত্রে, হস্তে ও বস্ত্রে ভোজন নিষেধ; কিন্তু সুবর্ণ, প্রস্তর, রজত, তাম্র, শঙ্খ, শুক্তি ও স্ফটিক পাত্র ভগ্ন হোলেও অভগ্ন বলে জানবে।

লশুন, পলাণ্ডু, ছত্রাক ও বিষ্ঠাজাত দ্রব্য দ্বিজগণের অভক্ষ্য; ভক্ষণ করলে প্রায়শ্চিত্তার্হ হবেন। প্রসবের পর দশ দিন গত না হোলে গো, মহিষী ও ছাগীর দুগ্ধ অপেয়; উষ্ট্রদুগ্ধ, অশ্বদুগ্ধ, মেষীদুগ্ধ, ঋতুমতী গাভীর দুগ্ধ, মৃগীদুগ্ধ, স্ত্রীলোকের দুগ্ধ ও সময়দোষে অম্লতাপ্রাপ্ত দুগ্ধ বর্জন করবে।…প্রাচীন বোয়াইল মৎস্য ও রোহিত মৎস্য হব্যকার্য্যে নিযুক্ত আছে। রাজীয় মৎস্য, সিংহতন্ড ও শস্কযুক্তও এই প্রকার হব্যকার্য্যে নিযুক্ত আছে। প্রোক্ষিত মাংস ও ব্রাহ্মণদের কামনাহেতু ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে শ্রাদ্ধাদিতে মাংস ভক্ষণ করতে পারবে। ক্রয় করে, কিম্বা নিজে উৎপাদন করে, কিম্বা বিধি অনুসারে অন্যের দেওয়া মাংস দেবতা ও পিতৃগণের অর্চনা করে ভোজন করলে দোষ হয় না।…কার্তিক মাসে মৎস্যমাংস ভোজন করবে না। স্ত্রীলোকদের পশুমাংস ভক্ষণ নিষেধ।

প্রতিপদ তিথিতে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ নিষেধ। দ্বিতীয়ায় বৃহতী ভক্ষণ হরিস্মরণে অযোগ্য হয়। তৃতীয়ায় পটোল ভক্ষণ শত্রুবৃদ্ধিকর। চতুর্থীতে মূলা ভক্ষণ ধনহিতকর। পঞ্চমীতে বিল্ব ভক্ষণে কলঙ্ক জন্মে। ষষ্ঠীতে নিম্ব ভক্ষণে পক্ষীপশ্বাদির যোনি লাভ হয়। সপ্তমীতে ওল ভক্ষণ শরীর নাশ করে। অষ্টমীতে নারিকেল ভক্ষণে মূর্খতা জন্মে। নবমীতে লাউ গোমাংস তুল্য হয়। দশমীতে কলম্বী শাক গোবধ স্বরূপ। একাদশীতে শিম্বী পাপকারী। দ্বাদশীতে পূতিকা ব্রহ্মঘাতিনী হন। ত্রয়োদশীতে বর্তাকু ভক্ষণে সুতহানিদোষ জন্মায়। চতুর্দশীতে মাসকলাই ভক্ষণে চিররুগ্ন হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যাতে মাংস ভক্ষণ মহাপাপময়।

এইভাবে চলেছে রঘুনন্দনের বিধান। অষ্টবিংশ স্মৃতিগ্রন্থে সম্পূর্ণ এই বিধানাবলীর অধিকাংশই অর্থহীন—এখনও অর্থহীন, রচনার সময়েও অর্থহীন ছিল। কিন্তু কয়েক শতাব্দী ধরে গৌড়বঙ্গের আবালবৃদ্ধবণিতা সকল হিন্দুর করণীয় কার্য্যগুলি এই বিধানের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

বংশ পরিচয়

রঘুনন্দন যখন সমাজ ব্যবস্থাকে নূতন করে ঢেলে সাজাচ্ছিলেন সেই সময়ে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে অনুরূপ এক শক্তিমান পুরুষ আবির্ভূত হয়ে বৈষ্ণবমতের বন্যায় সারা দেশ প্লাবিত করেন। শ্রীচৈতন্যের পূর্বপুরুষরা ছিলেন উৎকল দেশীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। যে রাজ্যকে উত্তরে গৌড় এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিভিন্ন মুসলমান সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সর্বদা তৈরী থাকতে হোত তার পক্ষে এই পরিবারের অহিংস বৈষ্ণবমতকে সহ্য করা সম্ভব হয় নি। তাই রাজা কপিলেন্দ্রদেবের কোপানল থেকে রক্ষা পাবার জন্য চৈতন্যের প্রপিতামহ মধুকর মিশ্র উৎকল ছেড়ে শ্রীহট্টে চলে যান। সেখানে ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামের কিছু অধিবাসী তাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ করায় গ্রাসাচ্ছাদনের অভাব হয় নি; যজমানদের নিয়ে মধুকরের দিন ভালই কেটে যায়।

দুই পুরুষ সেখানে অতিবাহিত করবার পর মধুকরের পৌত্র জগন্নাথ মিশ্র দেখেন যে তিনি তপ্ত কটাহ থেকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পড়েছেন। পীর শাহ জালালের প্রেরণায় গৌড় সুলতানের জনৈক সেনাপতি রাজা গৌরগোবিন্দের কাছ থেকে শ্রীহট্ট জয় করায় হিন্দুদের অবস্থা দুর্বিষহ হোয়ে ওঠে; দলে দলে হিন্দু ধর্মান্তরিত হয়। তা দেখে জগন্নাথ বিচলিত হোলেও স্বধর্মে অটল থেকে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করতে লাগলেন। কিন্তু এক সময়ে গ্রামে মড়ক দেখা দেওয়ায় বহু যজমান যখন প্রাণ বাঁচাবার জন্য স্থানান্তরে চলে গেল তখন তাঁর পক্ষে সেখানে বাস করা দুরূহ হয়ে ওঠে, শ্যালক নীলাম্বর চক্রবর্তীর সঙ্গে পরামর্শ করে পূর্ব ভারতের বারাণসী নবদ্বীপধামে চলে আসেন।

সেই যে সেনরাজগণ নবদ্বীপকে গৌড়ের প্রধান কৃষ্টিকেন্দ্রে পরিণত করেছিলেন তখনও তার দ্যুতি ম্লান হয় নি। ইসলামের বিরুদ্ধে ওই নগরী বরাবর এক রক্ষীদুর্গরূপে দাঁড়িয়ে ছিল। সেই কারণে বিদেশী শাসকরা নবদ্বীপকে কোন দিন সুনজরে দেখেন নি। জগন্নাথের আগমনের কয়েক বৎসর পরে হাবসীদের সময়ে এই ঔদাসীন্য উৎপীড়নে পরিণত হয়। তারা নবদ্বীপের বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থের জাত মারে, পার্শ্ববর্তী পিরালি গ্রামের বহু লোককে জোর করে ধর্মান্তরিত করে। এই অত্যাচারের ফলে মহাপণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য মিথিলায় শিক্ষা সমাপনের পর নবদ্বীপে ফিরে এসে দেখেন যে সেখানে বাস করা একেবারেই অসম্ভব। নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য তিনি উড়িষ্যায় চলে যান; গুণগ্রাহী রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁকে সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করেন।

জগন্নাথ যখন স্ত্রী শচীদেবী ও পুত্র বিশ্বরূপের হাত ধরে নবদ্বীপে আসেন হাবসী যুগের তখনও সূত্রপাত হয় নি, ইলিয়াসশাহী বংশের শেষ সুলতান জালালুদ্দীন ফাতের রাজত্ব চলছে। সেখানকার মায়াপুর নামক পল্লীতে একখানি কুটীর নির্মাণ করে তিনি বসবাস সুরু করেন। সেই কুটীরে ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতে শচীদেবীর গর্ভে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়।

বাল্যজীবন

চন্দ্রে তখন গ্রহণ লেগেছিল—রাহু এসে চাঁদকে গ্রাস করে ফেলছিল। সেই উপলক্ষে নবদ্বীপবাসীরা পথে পথে সঙ্কীর্তন করে ও ঘরে ঘরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতসারে সেই শিশুকে অভিনন্দন জানায়। প্রতিবেশীরা তাকে দেখতে এসে তার রূপ দেখে বিস্মিত হয়। কেউ ডাকল গৌরাঙ্গ বলে, কেউ ডাকল গৌরচন্দ্র। মায়ের সদাই ভয়, হয় তো ডাকিনী যোগিনীরা তার উপর কুদৃষ্টি হানবে। তাই নাম দিলেন নি-মা—নিমাই। ছয় মাস পরে শিশুর অন্নপ্রাশনের সময়ে নাম উঠল বিশ্বম্ভর।

দিন চলতে লাগল। বিশ্বম্ভরের বয়স যতই বাড়ে ততই সে হয়ে ওঠে চঞ্চল ও উচ্ছৃঙ্খল। তার দৌরাত্ম্যে প্রতিবেশীরা অস্থির হয়ে জগন্নাথের কাছে অহরহ নালিশ জানায়, কিন্তু পরিণত বয়সের পুত্র বলে তিনি সে সব কথা এক কানে শুনে অন্য কান দিয়ে বার করে দেন। তার ফলে তার দৌরাত্ম্য

বেড়ে চলে, আকাশের চাঁদ ধরবার জন্য সে পিতামাতার কাছে অহরহ বায়না করতে থাকে।

এত দুরন্ত হোলেও লেখাপড়ায় বিশ্বম্ভরের কোন অবহেলা ছিল না। তার ধীশক্তি ও একাগ্রতা দেখে টোলের অধ্যাপক গঙ্গাদাশ পণ্ডিত বিস্মিত হোতেন। বালক একবার যা পড়ত তা ভুলত না, যা লিখত তা মনের মধ্যে এঁকে নিত। জগন্নাথ যেমন পুত্রের দুরন্তপনার কথা শুনে ক্ষুব্ধ হোতেন তেমনি তার প্রতিভার জন্য মনে মনে গর্ব অনুভব করতেন। পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি রঙিন ছবি তাঁর চক্ষের সামনে ভেসে উঠত।

বিদ্যানুরাগী দুই পুত্রকে নিয়ে মিশ্র পরিবারের দিন সুখে কাটছিল, কিন্তু একদিন দুর্যোগের কালো মেঘ এসে চাঁদকে ঢেকে দিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ পাঠ্যজীবন শেষ করেছে দেখে জগন্নাথ তার বিবাহের উদ্যোগ করতে লাগলেন, কিন্তু এক দিন সে সবার অগোচরে ধর্মসাধনার জন্য সংসার ছেড়ে কোথায় চলে গেল। পুত্র বিরহে দম্পতী কাঁদলেন—বিশ্বম্ভরও কাঁদল। কিঞ্চিৎ সুস্থির হবার পর জগন্নাথ চারিদিকে নিরীক্ষণ করে দেখলেন যে যাদের ছেলেরা বিশ্বরূপের মত বেশী লেখাপড়া শেখে নি তারা ছেলেবউ নিয়ে সুখে সংসার করছে। আর যায় কোথায়! অধ্যয়নই বিশ্বরূপের বৈরাগ্যের মূল, বিশ্বম্ভরকে নিয়ে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করবার জন্য জগন্নাথ তার টোলে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। শচীদেবী তাতে যথেষ্ট আপত্তি করলেন, কিন্তু সে আপত্তি টিকল না।

লেখাপড়া বন্ধ করার ফলে দুষ্ট সরস্বতী এসে বিশ্বম্ভরের ঘাড়ে চেপে বসল। তার উৎপাতে পাড়া-পড়শীরা অস্থির হয়ে পড়ল। সমবয়সী ছেলেদের নিয়ে একটি দল গড়ে সে সবাইকে নানাভাবে উত্যক্ত করতে লাগল। কারও কোন জিনিষ খোয়া গেলে সে সেই দলকে সন্দেহ করত; তাদের দু একজন হাতেনাতে ধরাও পড়ল। কিন্তু দলপতির তাতে লজ্জা নেই, বরং সাথীর কৃতিত্বের জন্য মনে মনে গর্ববোধ করত! এই নিয়ে জগন্নাথের কাছে ঘনঘন অভিযোগ আসায় তিনি দেখলেন যে ছেলেকে গুরুগৃহে পাঠালে সে সন্ন্যাসী হয়, আবার সেখান থেকে ছাড়িয়ে আনলে হয় বানর। সেক্ষেত্রে তাকে ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে আবার গঙ্গাদাশ পণ্ডিতের টোলে পাঠিয়ে দিলেন।

রুদ্ধ জলরাশি নিষ্ক্রমণের পথ পেয়ে উদ্দামবেগে বইতে লাগল। পুনরায় সুযোগ পেয়ে নিমাই দ্বিগুণ উৎসাহে লেখাপড়া সুরু করল। কিন্তু বন্ধুদের ছাড়ল না ; সেই চপল স্বভাবও দূর হোল না—বরং উত্তরোত্তর বেড়ে চলল। অতি অল্পে সে রেগে যেত, কারণে অকারণে লোককে উত্যক্ত করত। গঙ্গাদাশ এসব দেখেও দেখতেন না, বালককে তার মেধার জন্য অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাঁর টোলে পাঠ সমাপনের পর বিশ্বম্ভর নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের চতুষ্পাঠীতে ভর্তি হোল। এখানেও তার প্রতিভা অধাপকদের মুগ্ধ ও সহধ্যায়ীদের বিস্মিত করল। দেখতে দেখতে সারা সহরে তার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লেও বিদ্যা তাকে বিনয়ী করবার পরিবর্তে দাম্ভিক করে তুলল। অপরাহ্নে গঙ্গার ঘাটে বিভিন্ন টোলের ছাত্রদের মধ্যে যে তর্কবিতর্ক হোত তাতে কাউকে পরাজিত করলে তাকে বক্রোক্তিতে জর্জরিত করা তার অভ্যাস হয়ে দাঁড়াল।

বৈষ্ণবদের প্রতি বিশ্বম্ভরের ছিল জাতক্রোধ। এই সম্প্রদায়কে সে একেবারেই সহ্য করতে পারত না। পথেঘাটে কোন বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হোলে তার প্রতি শ্লেষবাক্য প্রয়োগ করে সে মনে মনে আনন্দ উপভোগ করত। পুত্রের এই রূঢ়তার কথা শুনে জগন্নাথ ক্ষুব্ধ হোলেও এই ভেবে সান্ত্বনা পেতেন যে এইরূপ ধর্মদ্বেষী বালক কখনও পিতামাতাকে কাঁদিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবে না !

লক্ষ্মীর প্রতি প্রেম

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নারীর প্রতি বিশ্বম্ভরের মনে আকর্ষণের লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। যে সব বালিকা ফুলের সাজি ও নৈবেদ্যের থালা নিয়ে গঙ্গার ঘাটে পূজা দিতে আসত সুযোগ পেলে সে তাদের এতই উত্যক্ত করত যে দূর থেকে তাকে দেখলে বালিকারা অন্য ঘাটে পালিয়ে যেত। কেউ যদি সামনে পড়ত তাকে বলত ঃ দেখো, তুমি যার পূজা দেবার জন্য ঘাটে এসেছ সেই দেবতা আমি। পূজার উপকরণগুলি আমাকে দাও। আমি তোমাকে বর দেব, সুন্দর ছেলের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। একথা শুনে কোন বালিকা হেসে উঠলে সে ক্রুদ্ধভাবে বলত ঃ তবে রে ছুঁড়ি, দেবতাকে নিয়ে তামাসা ! দেখবি তোর এক বুড়োর সঙ্গে বিয়ে হবে, আর সাত সাতটা সতীন তোকে জ্বালিয়ে মারবে।

এক দিন অপরাহ্নবেলায় কয়েকজন সখীকে সঙ্গে নিয়ে সেই ঘাটে এল

বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মী। তার এক হাতে পূজার ডালায় চন্দনের মালা ও অন্য হাতে শঙ্খ। তাকে দেখে বিশ্বম্ভরের মনে হোল যেন স্বয়ং লক্ষ্মী সমুদ্র মন্থন থেকে উঠে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। লক্ষ্মীও দেখল তার সামনে নারায়ণ মানুষের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দুজনের মনে শিহরণ জাগল, উভয়ে উভয়কে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করতে লাগল। সেদিন আর বিশ্বম্ভরের মুখ দিয়ে কথা বার হোল না, লক্ষ্মীও কোন রকমে পূজা শেষ করে সেখান থেকে চলে গেল। সে দৃষ্টির বাইরে না যাওয়া পর্য্যন্ত বিশ্বম্ভর মুগ্ধদৃষ্টিতে তার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। সন্ধ্যায় তার পড়ায় মন বসল না, লক্ষ্মীব মুখখানি থেকে থেকে চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠতে লাগল।

লক্ষ্মীরও একই দশা! সারা রাত ভাল ঘুম হোল না, সকাল থেকে উদাসভাবে সময় কাটিয়ে সন্ধ্যার পূর্বে ঠিক সেই সময়ে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে গঙ্গাতীরে এসে উপস্থিত হোল। আজ সে একা—সঙ্গে কোন সখী নেই। দূরে থেকে তাকে আসতে দেখে বিশ্বম্ভর সাহস করে এগিয়ে এসে বলল: দেখো লক্ষ্মী, তোমার পথ চেয়ে আমি এতক্ষণ এখানে বসে রয়েছি। কেন তুমি এত দেরীতে এলে? ওই নৈবেদ্য তুমি কার জন্য এনেছ? ওই মালা কার গলায় দেবে? সে দেবতাকে কখনও চক্ষে দেখেছ? তার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ। উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে সলজ্জ দৃষ্টিতে তাকায় আবার চোখ নামিয়ে নেয়। বিশ্বম্ভর বলে চলে: লক্ষ্মী, আমি দেবতা না হোলেও মানুষ তো। তোমার ওই মালা আমাকে দিলে বৃথাই শুকিয়ে যাবে না। দেবে ওই মালা? লক্ষ্মীর মনের মধ্যে বিদ্যুৎ তরঙ্গ বহে গেল, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। যন্ত্রচালিতের মত বিশ্বম্ভরের গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে ত্রাস্তপদে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে স্ত্রী-পুত্রকে কাঁদিয়ে জগন্নাথ ইহলোক ত্যাগ করেন। পূজারী ব্রাহ্মণ, কায়ক্লেশে সংসার চালাতেন, সংস্থান কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। নিঃসম্বল শচীদেবী পুত্রকে নিয়ে অকূল পাথারে পড়লেন। পুত্র কিন্তু নির্বিকার, পূর্বের মতই মায়ের কাছে নিত্য নূতন আবদার করে। কিন্তু ধীরে ধীরে যখন বুঝল যে উদ্ধত ব্যবহারে প্রতিবেশীদের মনে ভীতির সঞ্চার করলেও দারিদ্র্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না তখন কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হোতে লাগল।

মায়ের দায়িত্ব ও নিজের ভবিষ্যৎ এখন বিশ্বম্ভরের হাতে। অর্থোপার্জন না করলে দুজনের অস্তিত্বই নিঃশেষ হয়ে যাবে। তাই বয়স এমন কিছু বেশী না হোলেও জনৈক প্রতিবেশীর চণ্ডীমণ্ডপে এক টোল খুলে বসল। পাড়ার কয়েকটি শিশু তাঁর কাছে পড়তে এল; ধীরে ধীরে নিমাই পণ্ডিতের অধ্যাপনার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে টোল ভরে গেল, কয়েকজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছেলেদের সেখানে পাঠালেন। তাঁদের দেওয়া দক্ষিণায় তরুণ পণ্ডিতের হাতে যথেষ্ট অর্থাগম হতে লাগল—শচীদেবীর দারিদ্র্য ঘুচল। কিন্তু ওই পর্য্যন্ত! টাকা হাতে পড়লে বিশ্বম্ভরের জ্ঞান থাকত না, অপব্যয় করে হাত হালকা করতেন।

অধ্যাপনা চলতে লাগল। সকালে বিকালে বিশ্বম্ভর ছেলেদের পড়ান ও সন্ধ্যায় গঙ্গায় সাঁতার কাটেন। ওরই মাঝে লক্ষ্মীর মুখ তাঁর চক্ষের সামনে ভেসে ওঠে, তাকে পাবার জন্য মন চঞ্চল হয়। মায়ের কাছে ব্যাপারটা গোপন থাকে না, পুত্রের মন ঘোরাবার জন্য তিনি পাত্রীর অন্বেষণ সুরু করেন। পুত্র জানালেন যে ভালভাবে নিজের পায়ে না দাঁড়ান পর্য্যন্ত বিবাহে তাঁর মত নেই; কিন্তু সে আপত্তি টিকল না। বাড়ীতে ঘন ঘন ঘটক যাতায়াত করতে লাগল, মায়ের সঙ্গে তাদের শলাপরামর্শ চলল। বিশ্বম্ভর যখন বুঝলেন যে মায়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না তখন এক দিন সঙ্কোচ পরিহার করে জানিয়ে দিলেন যে বিয়ে যদি করতেই হয় তা হোলে লক্ষ্মী ছাড়া অন্য কোন মেয়েকে তিনি বধূরূপে ভাবতে পারেন না। কে লক্ষ্মী? বল্লভাচার্য্যের মেয়ে লক্ষ্মী? শচীদেবী মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। সে হোতে পারে না, যাকে তাকে বউ করে তিনি ঘরে আনবেন না। এনো না, বললেন বিশ্বম্ভর, তবে বিয়ের কথাও আর মুখে এনো না। তার পর ক'দিন ধরে মাতাপুত্রে মন কষাকষি চলল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছেলের জেদের কাছে মা নতি স্বীকার করলেন। এক শুভ দিনে লক্ষ্মীর সঙ্গে বিশ্বম্ভরের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

প্রার্থিত তরুণীকে বধূরূপে পেলেও বিশ্বম্ভরের অদৃষ্টে দাম্পত্যসুখ ছিল না। বিবাহের কিছু দিন পরে কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে বঙ্গের কোনও এক স্থানে গিয়ে তিনি দেখেন যে তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সেখানে পৌচেছে। বহু লোক তাঁকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে পূজা করল,

ধনীরা মূল্যবান দক্ষিণা দিল। সেই সময়ে নবদ্বীপে তাঁর ঘরে যে মহা দুর্য্যোগের ঝড় বয়ে গেছে সে কথা তিনি ঘূণাক্ষরেও জানতে পারেন নি। এক দিন রাত্রিকালে লক্ষ্মীদেবী যখন গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন ছিলেন সেই সময় এক বিষধর সর্প এসে তাঁকে দংশন করে। খবর পেয়ে প্রতিবেশীরা ছুটে এল, বৈদ্য এল, ওঝা এল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। শ্বশ্রুমাতাকে অশ্রুজলে ভাসিয়ে হতভাগিনী ইহলীলা ত্যাগ করলেন।

বাড়ী ফিরে এই নিদারুণ সংবাদ শুনে বিশ্বম্ভর শোকে মূহ্যমান হয়ে পড়লেন। তাঁর গণ্ডদেশ বহে অশ্রুধারা গড়াতে লাগল। কয়েক দিন অধ্যাপনাও বন্ধ রাখলেন। কিন্তু সময়ে সব সয়। ধীরে ধীরে যখন জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে এল শচীদেবী তখন পুত্রকে বোঝালেন যে ঘরে বধূ না থাকলে ঘর মানায় না—সংসার অচল হয়ে যায়। এক বধূকে ঈশ্বর যখন কোলে টেনে নিয়েছেন তখন আর একজনকে এনে নতুন করে সংসার পাতো। তোমার বয়স আর কি? চিরদিন তো এভাবে একা থাকা চলবে না। বিশ্বম্ভর দেখলেন যে মায়ের কথা কিছু অযৌক্তিক নয়। তাই তিনি শেষ পর্য্যন্ত সম্মতি দিলে ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সনাতনের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর আবার বিবাহ হোল।

বৈষ্ণবমতে দীক্ষা

লক্ষ্মী গেলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া এলেন। বিশ্বম্ভরের কিন্তু সংসারে মন বসল না—বর্হিবিশ্ব তাঁকে অহরহ হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগল। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে এক দিন তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে জননীর কাছে রেখে পথে বেরিয়ে পড়লেন। নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে গয়ায় গেলে পাণ্ডারা তাঁকে যথেষ্ট বিরক্ত করলেও বিষ্ণুপদচিহ্ন দেখে তাঁর মনে এক অভূতপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হোল। ঠিক সেই সময়ে প্রতিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সাধক ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তিনি নিজেকে ধন্য মনে করলেন। দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শন নিয়ে আলোচনা করে শেষ পর্য্যন্ত যখন বুঝলেন ওই মতই সত্য তখন তাতে দীক্ষা নিলেন। বয়স তখন চব্বিশ বৎসর।

দীক্ষা গ্রহণের পর বিশ্বম্ভরের প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। পূর্বে তিনি ছিলেন যেমন উদ্ধত এখন হোলেন তেমনি বিনয়ী। তাঁর মন চলে

গেল পার্থিব জগতের ঊর্দ্ধে—বিষ্ণুর পদপ্রান্তে। আত্মচিন্তা ত্যাগ করে তিনি বিশ্বহিতের কথা অহরহ চিন্তা করতে লাগলেন। মানসনেত্রে দেখলেন, হিন্দুসমাজ এক কাণ্ডারীহীন নৌকার মত অকূল সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে; তাকে কূলে তোলবার কেউ নেই। একদিকে বিধর্মী শাসকদের উৎপীড়নে জনজীবন বিড়ম্বনাময় হয়ে উঠেছে, আবার অন্যদিকে কলুষতাগ্রস্ত তান্ত্রিকতা তাদের দৃষ্টিকে ঘোলাটে করে দিয়েছে। এর ভিতরে আলো নেই। গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত জনসাধারণ বেদ ও বুদ্ধকে ভুলে মঙ্গলচণ্ডী, বিষহরি, যোগীপাল, ভোগীপাল প্রভৃতিকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করছে; শাস্ত্রবচন তাদের মনে কোনও রেখাপাত করতে পারছে না। তাদের বাঁচাতে পারেন নারায়ণ, কিন্তু সে পথের নির্দেশ দেবে কে?

গয়া থেকে বিশ্বম্ভর নূতন জীবন নিয়ে নবদ্বীপে ফিরে এলেন। সে চাঞ্চল্য নেই, সে দাম্ভিকতা নেই—সে মানুষই নেই। সবাই দেখল, এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। পূর্বে তিনি যেমন ছিলেন উগ্র বৈষ্ণব বিরোধী, এখন হয়েছেন তেমনি পরম বৈষ্ণব। সব সময়ে হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে কেঁদে উঠছেন, নয়নযুগল দিয়ে বিগলিত ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। টোল বন্ধ হোল; ছাত্ররা কেউ অন্যত্র চলে গেল, কেউ বা তাঁর সঙ্গে থেকে হরি সঙ্কীর্ত্তন করতে লাগল। পরে যে কীর্ত্তনের মুর্চ্ছনায় সমস্ত গৌড়-বঙ্গ প্লাবিত হয় এইভাবে ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের পথে পথে সঙ্কীর্তন করে তার প্রথম সূত্রপাত হয়—

হরি হরয়ে নম
গোপাল গোবিন্দ নাম শ্রীমধুসূদন।

কাজী সাহেবের বিরোধিতা

বিশ্বম্ভরের নাম সঙ্কীর্তনে আকৃষ্ট হয়ে একদিকে যেমন ভক্তের দল বাড়তে লাগল অন্যদিকে তেমনি বিরোধীরও অভাব হোল না। ভাবের আবেগে তিনি এমন সব কাজ করতেন যে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কোন লোক তা পারে না। কখন বা ভাবে গদগদ হয়ে মূর্চ্ছা যেতেন, আবার কখনও বা জলে ঝাঁপ দিতেন। এই দেখে বিরোধীদের কেউ বা তাঁকে উন্মাদ বলে ধরে নিল, আবার কেউ বা

ভণ্ড বলে উপহাস করতে লাগল। তাদের পরিহার করবার জন্য তিনি এক বৎসর ধরে শ্রীবাসের বাড়ীতে দরজা বন্ধ করে কীর্তন করলেন; তাঁর নির্দেশে নিত্যানন্দ ও হরিদাস লোকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে কীর্তন প্রচার করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই, জগাই ও মাধাই নামে দুই ভাই একদিন নিত্যানন্দকে নির্মমভাবে প্রহার করল। সেই দুই পাষণ্ড পরে অনুতপ্ত হয়ে বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নিলেও বিরোধীদের সংখ্যা কমল না। বরং বেড়ে চলল। কীর্তিনীয়াদের অনাচার বন্ধের জন্য এক দিন তারা দল বেঁধে নবদ্বীপের শাসক চাঁদ কাজীর কাছে গিয়ে হাজির হোল। কাজী সাহেব ছিলেন গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ্‌র ভাগিনেয়। মাতুলের মহৎ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জনসাধারণের ধর্মজীবনে হস্তক্ষেপ করবার ইচ্ছা তাঁর ছিল না, কিন্তু বিশ্বম্ভর-বিরোধীদের পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যান্ত আদেশ জারি করলেন যে তাঁর অধিকারের মধ্যে কেউ কীর্তন করতে পারবে না—করলে অর্থদণ্ড এমন কি প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হবে। এই আদেশ যাতে বলবৎ হয় সেজন্য সৈন্যদের উপর হুকুমও দিলেন।

কাজী সাহেব আদেশ জারী করলেন বটে কিন্তু সে আদেশ আদেশই থেকে গেল। তার উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে বিশ্বম্ভর তাঁর অনুচরদের নিয়ে পূর্বের মত নাম সঙ্কীর্তন চালাতে লাগলেন। চাঁদ কাজীর কাছে একথা পৌছালে এক দিন তিনি নিজে এক কীর্তনের আখড়ায় হানা দিয়ে মৃদঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ভেঙে দেন। তা দেখে কীর্তনীয়ারা ভয়ে যে যার বাড়ীতে পালিয়ে যায়। এত বড় স্পর্দ্ধা! খবরটি বিশ্বম্ভরের কাছে পৌঁছালে তাঁর পূর্বের রাগ ফিরে এল, সঙ্গীদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন সন্ধ্যার সময়ে কীর্তনের সাজে সজ্জিত হয়ে আখড়ায় চলে আসে। নির্দেশমত সবাই এসে জমায়েত হোলে তিনি প্রত্যেকের হাতে একটি করে মশাল দিয়ে নগর সঙ্কীর্তনে বার হোলেন। কীর্তনীয়াদের শোভাযাত্রা যতই অগ্রসর হয় ততই নূতন নূতন লোক এসে তাদের দল বৃদ্ধি করে। তাদের সবাইকে নিয়ে শেষ পর্যান্ত বিশ্বম্ভর যখন কাজীবাড়ীর সামনে এসে উপস্থিত হোলেন তখন সে এক জনসমুদ্র। দূর থেকে তাদের দেখে কাজী সাহেবের ভয় হোল, শঙ্কাব্যাকুল মনে খিড়কি দরজা দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেলেন।

এই সাফল্যের ফলে কীর্তন স্থায়িত্ব লাভ করল—বিশ্বম্ভরের শক্তি বহু গুণ বেড়ে গেল।

সন্ন্যাস গ্রহণ

কিছু দিন পরে প্রতিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সাধক কেশব ভারতী নবদ্বীপে এলে বিশ্বম্ভর তাঁকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা প্রকাশ করেন। কিছুটা ইতস্ততার পর ভারতী তাতে সম্মতি দিলে তিনি ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব দিন রাত্রে ভগবানের হাতে জননী ও পত্নীকে সমর্পণ করে চুপি চুপি শয্যা ত্যাগ করলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তখনও গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন। প্রদীপের মৃদু আলোকে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বম্ভরের মনে ক্ষণিকের বিকার দেখা দিল—চিরদিনের মত সেই মুখখানি একবার দেখে নিলেন। তারপর সব শেষ! মন থেকে সকল দুর্বলতা দূর করে তিনি পথে বেরিয়ে পড়লেন। কিছু দূর অগ্রসর হবার পর পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী নিত্যানন্দ প্রমুখ কয়েকজন তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন।

কেশব ভারতীর আশ্রম ছিল নবদ্বীপ থেকে চার ক্রোশ দূরে কণ্টক নগরীতে —কাটোয়ায়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে অনুচরবর্গসহ বিশ্বম্ভর সেখানে এসে পৌঁছালে সকল গুরুর মত ভারতীও এক নূতন শিষ্য লাভের সম্ভাবনায় মনে মনে পুলক অনুভব করলেন, কিন্তু সেই যুবকের ঘরে যে প্রৌঢ়া জননী ও বালিকা বধূ রয়েছে একথা ভেবে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর এই দ্বিধার কথা শুনে বিশ্বম্ভর বললেন: গুরুদেব! যে সংসার পিছনে ফেলে এসেছি সেখানে ফিরে যাবার কথা ওঠে না। আমাকে দীক্ষা দিন। বিশ্বম্ভরের এই দৃঢ়তা দেখে ভারতীর মানসিক দ্বিধা কেটে গেল, ক্ষৌরকার ডেকে তার মস্তক মুণ্ডন করিয়ে গঙ্গায় স্নান করতে পাঠালেন। স্নানান্তে তাঁকে দিলেন কৌপীন ও দুখানি অঙ্গবাস। সেগুলি পরবার পর তুলসীচন্দন অঙ্গে ধারণ করে নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলে ভারতী তাঁর কানে মন্ত্র দিয়ে নূতন নামকরণ করলেন—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সেই গুরুপ্রদত্ত নাম পরে সংক্ষিপ্ত করে লোকে বলতে লাগল শ্রীচৈতন্য।

নীলাচলে মহাপ্রভু

সেদিনকার বৈষ্ণববিরোধী পাষণ্ড বিশ্বম্ভর মিশ্র এখন মহাবৈষ্ণব শ্রীচৈতন্য। কটিতে কৌপীন এবং হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু নিয়ে তিনি সকল বৈষ্ণবের পরম তীর্থ বৃন্দাবনে যাবার জন্য কাটোয়া থেকে যাত্রা করলেন। তিন দিন তিন রাত ধরে ক্রমাগত হাঁটলেন, নদীও পার হোলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত যে স্থানে এসে

উপস্থিত হোলেন সেটি বৃন্দাবন নয়—শান্তিপুর। কিন্তু তিনি তখন ভাবে এমনই বিভোর যে গঙ্গাকে যমুনা বলে ভ্রম করে জলে ঝাঁপ দিলেন। বহুক্ষণ পরে যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন তিনি অদ্বৈত আচার্য্যের বাড়ীতে। লোকমুখে সে খবর নবদ্বীপে পৌঁছালে সেখান থেকে বহু লোক নদী পার হয়ে তাঁকে দেখতে এল। শচীদেবী এলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও আসতে চাইলেন। কিন্তু তাঁকে নিষেধ করে নিত্যানন্দ প্রমুখ কয়েকজন অনুচরসহ শ্রীচৈতন্য চললেন নীলাচলে—পুরীতে।

সেখানকার মহামন্দির তার বহু পূর্বে বৌদ্ধদের হাত থেকে বৈদিকদের অধিকারে চলে এসেছিল। শ্রীচৈতন্যের আগমনে তাতে বৈষ্ণবমতের প্রাধান্য স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিল। দলে দলে লোক তাঁকে দেখতে এল। বাসুদেব সার্বভৌম তাঁকে পরম সমাদরে স্বগৃহে নিয়ে গেলেন। সেখানে দিনরাত নাম সঙ্কীর্তন চলতে লাগল, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে নূতন জীবনের সাড়া দেখা দিল।

চৈতন্যের চঞ্চল মন কখনও এক জায়গায় বেশী দিন স্থির থাকে নি, এখনও থাকতে চাইল না। নীলাচলে কিছু সময় অতিবাহিত করে তিনি দাক্ষিণাত্যে যাবার জন্য যাত্রা করলেন। নিত্যানন্দ, কবি মালাধর বসুর পুত্র পরমানন্দ বসু প্রমুখ কয়েকজন বৈষ্ণব এই পরিক্রমায় তাঁর সঙ্গ নিলেন। যে সব জনপদের ভিতর দিয়ে তাঁরা পথ চলতে লাগলেন দলে দলে লোক এসে তাঁর কাছে দীক্ষা নিল। দাক্ষিণাত্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের একটি উপনিবেশ স্থাপিত হোল।

উড়িষ্যা তখনও মহাশক্তিশালী রাজ্য। দাক্ষিণাত্য পরিক্রমার সময়ে শ্রীচৈতন্য এই বিশাল রাজ্যের শেষ প্রান্তে গোদাবরী তীরে রাজামন্দ্রিতে উপস্থিত হোলে উৎকলাধীশ প্রতাপরুদ্রের ক্ষত্রপ রায় রামানন্দ এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। পরশ পাথরের ছোঁয়াচ লেগে লোহা সোনা হয়ে গেল! যে রামানন্দের দোর্দণ্ড শাসনে গোদাবরী উপত্যকা সন্ত্রস্ত থাকত তিনি যে শুধু বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নিলেন তা নয় এই মত প্রচার করবার জন্য মনপ্রাণ সমর্পণ করলেন। পরে এক সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর কাছে শ্রীচৈতন্যের ঐশ্বরিক শক্তির কথা শুনে তাঁকে দেখবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তিনি জানান যে একজন সংসার বিরাগীর পক্ষে রাজসংসর্গ অনুচিত—নিজের বহির্বাস পাঠিয়ে উৎকলাধিপতির প্রতি মর্য্যাদা দেখান।

কিছু দিন পরে রথযাত্রার সময়ে চিরন্তন প্রথানুযায়ী রাজা প্রতাপরুদ্র পুরীতে

এসে দেখেন যে জগন্নাথের রথের সম্মুখে নৃত্য করতে করতে শ্রীচৈতন্য ভাবাবেশে কখনও মূর্চ্ছা যাচ্ছেন, কখনও বা মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। তাঁর দেহ ভাবে বিহ্বল, অবিরল অশ্রুধারায় বুক ভেসে যাচ্ছে। নিত্যানন্দ প্রমুখ অন্যান্য ভক্ত-বৃন্দেরও একই দশা। সবাই প্রেমাবেশে বিভোর হয়ে কীর্তন করছেন। মুগ্ধ নয়নে এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে উৎকলাধীশ এতই চঞ্চল হন যে কয়েক দিন পরে শ্রীচৈতন্যের কাছে বৈষ্ণবমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

সেই থেকে উড়িষ্যায় বৈষ্ণবমতের প্রতিষ্ঠা হয়।

আবার সেই থেকে এক মহা শক্তিশালী রাজ্যের সামরিক বল পঙ্গু হয়ে যায়।

গৌড়ে শ্রীচৈতন্য

কয়েক বৎসর নীলাচলে অবস্থানের পর শ্রীচৈতন্য জননীকে দেখবার জন্য নবদ্বীপ এবং তার পর সেখান থেকে বৃন্দাবন যাবার জন্য রওনা হন। সে কথা রাজা প্রতাপরুদ্রের কানে গেলে তিনি নিজে সাক্ষীগোপালে এসে গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দুজন মন্ত্রী হরিচন্দন ও মঙ্গরাজকে তাঁর সঙ্গে দিয়ে নিজ রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত যাবার জন্য আদেশ দেন। তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্ব দেওয়া হয় এক ব্যাটালিয়ান সৈন্যের উপর। লক্ষাধিক ভক্তের পুরোভাগে মার্চ করতে করতে তারা শ্রীচৈতন্যকে উৎকল সীমান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যায়।

গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ অবশ্যই শ্রীচৈতন্যের কথা শুনেছিলেন, কিন্তু তিনি যে তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করেছেন এ খবর তাঁকে কেউ দেয় নি। এক দিন প্রাসাদের অলিন্দে বসে তিনি দেখেন যে দলে দলে নরনারী সারিবদ্ধভাবে কোথায় চলেছে। জনৈক কর্মচারীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানালেন যে রাজধানীর উপকণ্ঠে রামকেলী গ্রামে এক বৈষ্ণব সাধু এসেছেন, সবাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছে। কে সে সাধু? কাকে দেখবার জন্য এভাবে কাতারে কাতারে লোক পথ দিয়ে চলেছে? বিস্মিত হোসেন শাহ আদেশ দিলেন কাল যেন সেই সাধুকে দরবারে আনা হয়।

রাজাদেশ শুনে হিন্দু রাজপুরুষরা বেশ কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। হোন হোসেন শাহ সমদর্শী, হোন তিনি উদার, তবু বিধর্মী তো! শ্রীচৈতন্য দরবারে এলে তিনি যে কি আদেশ দেবেন তা বলা যায় না। এই মহাপুরুষ

সম্পর্কে কোন ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না মনে করে তাঁরা রাতারাতি তাঁকে গৌড় থেকে সরিয়ে দিলেন।

তারপর নানা স্থানে পরিক্রমা সমাপনের পর তিনি পুরীতে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সেখানে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে জগন্নাথের রথের সামনে নৃত্য করবার সময় তাঁর পায়ে হোঁচট লেগে জ্বর হয়। সেই জ্বর শেষ জ্বর!

নিতাই এনেছে নাম!

বৈষ্ণব মতবাদ কিছু নূতন নয়। চৈতন্যের পূর্বেও গৌড়ে জয়দেব, মেবারে মীরাবাঈ, মিথিলায় বিদ্যাপতি, মহারাষ্ট্রে নামদেব প্রভৃতি সাধকরা এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের তৈরী ভিত্তির উপর সৌধ নির্মাণ করে চৈতন্য সম্প্রদায়। বৈষ্ণব মতের গোড়ার কথা প্রেম। ঈশ্বরকে ভালবাস শান্ত সমাহিত চিত্তে, ভালোবাস দাস্য মনোভাব নিয়ে, ভালবাস সখ্যভাবে, বাৎসল্য দিয়ে, মনে প্রেমিকার মাধুর্য্য এনে। এই মিশ্র সুর ঝংকৃত হয়েছিল জয়দেবের গীতগোবিন্দে, চণ্ডীদাসের পদাবলীতে, বিদ্যাপতির ছন্দে, মীরার ভজনে, কবীরের দোহায়। যে বীজ তাঁরা বপন করেছিলেন তাকে অঙ্কুরিত করেন শ্রীচৈতন্য, কিন্তু মহীরুহে পরিণত করেন তাঁর অন্তরঙ্গ সহচর নিত্যানন্দ—নিতাই।

নিত্যানন্দের গৃহস্থাশ্রমের নাম কুবের। কালনার দু'ক্রোশ দক্ষিণে একচাকা গ্রামে ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে মাঘ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে তাঁর জন্ম হয়। ঈশ্বর-পুরী ছিলেন তাঁর দীক্ষাগুরু। বয়সের যথেষ্ট ব্যবধান থাকলেও দুই গুরু-ভাইয়ের মধ্যে এমনিই হৃদ্যতা জন্মেছিল যে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারতেন না। তাঁদের মত ছিল এক, পথ এক, চিন্তা এক, কর্মধারা এক। দুই শক্তিমান সাধকের এই অদ্ভুত ঐক্য দেখে বৈষ্ণবরা বলত—

নিমাই নিতাই দুই ভাই।
একে অন্যে ভেদ নাই॥

জীবনদর্শনের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য সত্ত্বেও উভয়ের জীবনধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নমুখী। যেক্ষেত্রে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য বিবাহিত পত্নীকে ত্যাগ করেছিলেন, নিত্যানন্দ সেক্ষেত্রে সন্ন্যাস গ্রহণের পর সূর্য্যদাসের কন্যা বসুধাকে

বিবাহ করে চব্বিশ পরগণা জেলার খড়দহে স্থায়ীভাবে বাস করেন। বিষ্ণুপ্রিয়া স্বামীর কাছ থেকে ক্রূরতম ঔদাসীন্য পেয়েছিলেন, কিন্তু বসুধা পেয়েছিলেন বুকভরা ভালবাসা। তাঁর গর্ভে নিত্যানন্দের যে পুত্রসন্তান জন্মায় তিনি খড়দহ গোস্বামীদের আদিপুরুষ।

বিবাহ নিত্যানন্দকে বাস্তবধর্মী করে, বন্ধুর মত সংসার বহির্ভূত ধর্মসাধনায় বিরত রাখে। তাঁর সংগঠনী শক্তির ফলে চৈতন্যমত সংসারত্যাগী মুষ্টিমেয় বৈরাগীর আখড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সমস্ত সমাজদেহকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। চৈতন্যের অল্পস্থায়ী জীবনের অবসানের পর তিনি যদি এই মতকে দৃঢ়হস্তে ধারণ করে না থাকতেন তাহোলে আখড়াগুলি লোপ পেত ও সেই সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের নাম ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে যেত।

শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণবদের মহাপ্রভু—নিত্যানন্দ প্রভু। বৈষ্ণবমতকে সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রভু নিত্যানন্দ এক সুনির্দিষ্ট কর্মধারা গ্রহণ করেন। তাঁর সংগঠনের শীর্ষস্থানে অবস্থান করে সপ্ত গোস্বামী বৈষ্ণবদের জীবনযাত্রার জন্য যে সব বিধি প্রণয়ন করেন তাতে শুধু যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় কলুষতামুক্ত হয় তা নয় সমগ্র সমাজদেহ থেকে বহু আবিলতা মুছে যায়। তান্ত্রিকদের পশুবলি ও কারণবারির উপর জনসাধারণের মনে বিতৃষ্ণা জন্মায় এবং উচ্চনীচ সকল শ্রেণীর নরনারী বৈষ্ণবদের সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন স্মৃতিগ্রন্থসমূহের সংস্কার সাধন দ্বারা সমাজব্যবস্থায় যেরূপ নূতন ধারা সঞ্চার করেছিলেন ধর্মজীবনে চৈতন্য-নিত্যানন্দ তাই করেন। তান্ত্রিকদের বীভৎসতার ফলে হিন্দুধর্মের উপর জনসাধারণের যে আস্থা শিথিল হয়ে গিয়েছিল নূতন বৈষ্ণব সমাজের শান্ত, সৌম্য রূপ দেখে তা আবার ফিরে আসে।

উভয় সাধক ছিলেন জাতিভেদ প্রথার বিরোধী। সকল বৈষ্ণব যখন ঈশ্বরের সন্তান তখন তাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদ থাকতে পারে না। এই ঐক্য ইসলাম প্রচারকদের হাত থেকে একটি বড় অস্ত্র খসিয়ে দেয়। যে সামাজিক সাম্যের গর্ব তাঁরা করতেন এর চেয়ে কিছু মাত্রায় বেশী সাম্য তাঁদের সমাজে ছিল না। উপাসনাগৃহে সকল মুসলমান যেমন সমান, বৈষ্ণবের আখড়াতেও তেমনি সকল বৈষ্ণব সমান। অন্য সর্বত্রই বৈষম্য। তবে লোকে কিসের লোভে সমাজ ত্যাগ করবে? কিসের লোভে ইসলাম গ্রহণ করবে? সেখানে তারা মসজিদে

গিয়ে আমীরদের পাশে বসে নমাজ পড়তে পারবে বটে, কিন্তু কেউ সম্পদের অংশ দেবে না, নিম্নবংশীগণকে কন্যা দান করবে না। নূতন বৈষ্ণব সমাজে এর চেয়ে কিছু কম সাম্য নেই দেখে সেই থেকে ধর্মত্যাগের হিড়িক চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

এই যে সর্বব্যাপী বৈষ্ণব সংগঠন শ্রীচৈতন্য তার উৎস হোলেও স্রষ্টা তিনি নন—নিত্যানন্দ। গৌতম বুদ্ধের যেমন আনন্দ, যীশুখৃষ্টের যেমন পিটার ও পল, হজরত মহম্মদের যেমন আবু বাকর, রামকৃষ্ণ পরমহংসের যেমন বিবেকানন্দ শ্রীচৈতন্যের তেমনি এই নিত্যানন্দ। বিবেকানন্দ না থাকলে শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যেতেন—নিত্যানন্দ না থাকলে শ্রীচৈতন্যের নামও লোকে ভুলে যেত। সেই কথা পরোক্ষে স্বীকার করে বৈষ্ণবগণ আজও গান করে—

নিতাই এনেছে নাম।
বলো হরে কৃষ্ণ হরে রাম॥

অষ্টাদশ অধ্যায়

বরণীয় বৈষ্ণব সাহিত্য

কবীরের দোঁহা

এখন আমাদের কিছুটা পিছন দিকে ফিরতে হবে।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূবে মালাধর বসু যখন শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেন তখন কবীরের দোহা উত্তরাপথের অসংখ্য নরনারীর মনে এক নূতন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করেছিল। মুসলমান পিতামাতার সন্তান কবীর বৈষ্ণব সাধক রামানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে প্রচার করেন যে রাম ও রহিমে কোন ভেদ নেই—সবই সেই নারায়ণের বিভিন্ন রূপ। বন্ধু, বেঁচে থাকতে থাকতে তাঁকে পাবার আশা করো, তাঁকে বুঝে নাও, কারণ জীবনের মধ্যেই মুক্তির নিবাস। জীবিত থাকতে যদি কর্মের ফাঁস না কাটে তবে মৃত্যুর পর মুক্তির আশা কোথায়? দেহ ত্যাগ হোলে তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটবে এরূপ আশা করা বৃথা। যদি এখন মিলে থাকে তবেই তখন মিলবে, নতুবা যমপুরে তোমার বাস। তাই কবীর কহে, সদগুরুকে জানো, সত্যনামে বিশ্বাস করো। আমি সাধনের দাস, সাধনই হিতকারী।

> সাধো ভাই জীবতহী করো আসা।
> জীবত সমঝে জীবত বুঝে জীবত মুক্তি নিবাসা।
> জীবত করমকী ফাঁস ন কটি মুক্তি কী আসা॥
> অ ছুটেজিব মিলন কহত হৈ সো সব ঝুটি আসা।
> অবহুঁ মিলা সো তবহু মিলেগা নাহি তো যমপুর বাসা।
> সওগহে সতগুরুকো চিন্ হে সত্ত নাম বিশ্বাসা।
> কহৈ কবীর সাধন হিতকারী হম সাধনকে দাসা॥

মীরার ভজন

কবীরের পর এলেন মীরা। মেবারের রাজমহিষী মীরা—মহারাণা কুম্ভের পত্নী মীরাবাঈ। স্বামী বৈষ্ণব, স্ত্রীও বৈষ্ণব। কিন্তু উভয়ের বৈষ্ণবমতের ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাণা একদিকে গীতগোবিন্দের ভাষ্য রচনা করে বৈষ্ণবমতকে নূতন রূপ দেন আবার অন্যদিকে প্রবল যুদ্ধে তুর্কীদের পরাভূত করে গুজরাট ও মালব পুনরুদ্ধার করেন। রাণার বিষ্ণু সুদর্শনচক্রধারী মুরারী, রাণীর বিষ্ণু সকল হিংসাদ্বন্দ্বের উর্দ্ধে অবস্থিত গিরিধারী গোপাল।

রাণী মেবার রাজপ্রাসাদে নিজস্ব মন্দিরে দেবতার সামনে যখন নাম সঙ্কীর্তন করতেন তখন দলে দলে নরনারী বৈষ্ণববেশে সেখানে এসে তাতে যোগ দিত। তাদের সে অধিকার তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু রাণা ভুলতে পারেন নি যে তিনি বাপ্পা রাওয়ের বংশধর—হিন্দুধর্মের রক্ষক ও ভারতের সকল নরপতির স্বাভাবিক নায়ক। উপেক্ষা করতে পারেন নি যে মেবারেশ্বরীর কীর্তন শোনবার জন্য বৈষ্ণবের ছদ্মবেশ পরে শত্রু সৈন্যরা প্রাসাদে প্রবেশ করে বহু অনর্থের সৃষ্টি করতে পারে। তাই তিনি মীরাকে বাধা দেন, মনঃক্ষোভে মীরা গেয়ে ওঠেন ঃ হে সখি, আমি যে হরি বিনা থাকতে পারি না। শ্বাশুড়ী কুন্দন করেন, ননদ গঞ্জনা দেন, আর রাণা তো আমার উপর বিরক্ত হয়েই আছেন। তিনি চৌকিতে প্রহরী বসিয়েছেন, দুয়ারে তালা লাগিয়েছেন। কিন্তু আমার এই জন্মজন্মান্তরের প্রেম ভুলি কেমন করে? হে মীরার প্রভু গিরিধারী নাগর আমার আর কিছু যে ভাল লাগে না—

হেরী মহাঁসু হরি বিন
বাহ্যো না জায়।
সাসু লড়ে মেরি ননদ খিজারে
রাণা বাহ্যো রিসায়।
পহ রোভী রাখো চৌকী
বিঠায়ো তালা দিয়ো জড়ায়।
পূর্ব্ব জনমকী প্রীত পুরাণী
সো ক্যুঁ ছোড়ী জায়॥
মীরাকে প্রভু গিরিধর

নাগর আওর না আয়ে
সহারী দায় ॥

বিদ্যাপতির কাব্যঝঙ্কার

মীরার সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা মিলিয়ে যাবার পূর্বে মিথিলায় আবির্ভূত হোলেন বিদ্যাপতি। এক মহাপণ্ডিত বংশের সন্তান বিদ্যাপতি নিজের সৃজনী শক্তি দিয়ে সকল পূর্বপুরুষের জ্যোতিকে ম্লান করে দেন। তাঁর পিতা গণপতি ঠাকুর একখানি মূল্যবান স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেছিলেন, পুত্র গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা করে সবাইকে চমৎকৃত করেন। মিথিলানরেশ শিবসিংহ তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য সব সময় বিব্রত থাকলেও বিদ্যাপতির প্রতিভাকে যথেষ্ট সমাদর করতেন—রাণী লছিমাও। রাজার কাছ থেকে তিনি কবিকণ্ঠহার উপাধি ও দ্বারভাঙ্গা জেলায় বিসবিয়ার বিসকী গ্রামখানি লাভ করেন। মৈথিল ও বাংলা ভাষার মধ্যে পার্থক্য অতিশয় সূক্ষ্ম এবং আলোচ্য সময়ে অক্ষরগুলি অভিন্ন ছিল বলে গৌড়ের অধিবাসীরা তাঁকে আপনজন বলে গ্রহণ করে। সে যুগের বহু কবি তাঁর মানস শিষ্য; পরবর্তী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথসহ বহু কবি তাঁকে সম্যক মর্য্যাদা দেন।

কবীর ও মীরাবাঈয়ের ন্যায় বিদ্যাপতি পুরাপুরি বৈষ্ণব কবি। তাঁর রাধা বিরহযন্ত্রনায় কাতর হয়ে সখীকে বলছেন : যার জন্য বস্ত্র, হার, এমন কি চন্দন পর্য্যন্ত দিলাম না সে আজ গিরিনদীর অন্তর হোল! যে প্রিয়র গরবে আমি কাউকে গণ্য করি নি সেই প্রিয় বিহনে আজ কে কি না বলছে? মরমে বড় কালেও দুঃখ, প্রিয় যদি ত্যাগ করে যায় তবে এ জীবনে কাজ কি?—

চীর চন্দন উরে হার ন দেলা।
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা ॥
পিয়াক গরবে হম কাহুক না গণলা।
সো পিয়া বিনা মোহে কো কি না কহলা ॥
বড় দুখ রহল মরমে।
পিয়া বিছুরল যদি কি আর জীবনে ॥
পূরব জনমে বিহি লিখিল ভরমে।
পিয়াক দোখ নহি যে ছিল করমে ॥

আন অনুরাগে পিয়া আন দেশে গেলা।
পিয়া বিনে পাঁজর ঝাঝর ভেলা॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বরনারি।
ধৈরজ ধর চিতে মিলব মুরারি॥

চণ্ডীদাসের পদাবলী

বিদ্যাপতির কবিতা যখন মিথিলায় এক নূতন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করছিল চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তখন গৌড়ের আকাশ বাতাস ধ্বনিত হয়ে ওঠে। উভয় জনপদের ধর্মজীবনের পটভূমিকা ভিন্ন ছিল বলে দুই কবির চিন্তা ও কাব্যধারার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সেই যে সেনশক্তির অভ্যুদয়ের সময় থেকে গৌড়-বঙ্গে বৌদ্ধ মতের ক্ষয় সুরু হয়েছিল এই সময়ে তা নিম্নতম স্তরে নেমে যায়। বজ্রযান-পন্থী বৌদ্ধগণ জঘন্য যৌন সাধনাকে সহজিয়া মত বলে চালিয়ে দিয়ে কায়ক্লেশে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। কিন্তু জনসাধারণ তাদের ক্ষমা করে নি, তাদের শ্রাবক শ্রাবিকারা সমাজের ধিক্কারের পাত্র হয়ে পড়েছিল। তা সত্ত্বেও চণ্ডীদাস এই সহজিয়াদের দলে যোগ দিয়ে কাব্যসাধনা সুরু করেন।

বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষী বা বাশুলী মূলে বোধ হয় পুরীর জগন্নাথের মত বৌদ্ধ দেবী ছিলেন। এখন তাঁর মন্দিরে যেমন নিত্য পূজা ও দ্বিপ্রহরে শিবাভোগ হয় তখনও তাই হোত। মন্দিরের পূজারীর কাজ করবার সময়ে চণ্ডীদাস সহজিয়া সাধনায় আত্মনিয়োগ করে গেয়ে ওঠেন—

সহজ সহজ কহিব কাহারে
সহজ জানিবে কে ?
সহজ কথাটি মনে করিলাম
শুন লো রাজার ঝি।
বাশুলী আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর কব কি ?

নারী না হোলে সহজিয়াদের সাধনা অপূর্ণ থেকে যায়। সেরূপ নারী

কাছেই ছিল। বাশুলী মন্দির সংলগ্ন পুষ্করিণীতে রামী ধোপানী* নামে যে রজককন্যা কাপড় কাচত চণ্ডীদাস তাকে সহজ সাধনার সঙ্গিনী করে নিয়ে গাইলেন—

চণ্ডীদাস কহে তুমি যে গুরু।
তুমি যে আমার কল্পতরু॥
শুন রজকিনী রামি!
ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি॥

চণ্ডীদাসকে পেয়ে সহজিয়া সম্প্রদায় পুলকিত হয়ে উঠলেও তাঁর শক্তিশালী নেতৃত্ব জনসাধারণের ধিক্কার থেকে তাদের রক্ষা করতে পারল না। নিছক আত্মরক্ষার তাগিদে তারা দ্রুতগতিতে বৈষ্ণব সমাজে মিশে যেতে লাগল! চণ্ডীদাসও সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে গাইতে লাগলেন—

বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি।
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলে কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥

চণ্ডীদাসের পরিণত বয়সের এই কবিতা ও সঙ্গীতগুলি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত হোলেও তাঁর প্রথম জীবনের সেই সহজিয়াপন্থী মনের কোনদিন পরিবর্তন হয় নি। তাই তাঁর পদাবলীর মধ্যে আদিরসের এত ছড়াছড়ি। তা সত্ত্বেও তাঁকে আদিযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবি বলে মানতে হবে। তিনি একা কেন? সে সময়ে বৈষ্ণব সাহিত্যের যে স্রোত প্রবাহিত হয় তার

*রামী ধোপানীর ঘাট এখনও আছে

সর্বত্রই আদিরসের আধিক্য। এই ত্রুটি সত্ত্বেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে সেই বৈষ্ণব কবিতা ও সঙ্গীতগুলি ছিল অনবদ্য। শুধু হিন্দু নয়, মুসলমান কবিরাও এই সাহিত্য সাধনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে সৈয়দ আইনুদ্দিন, আলাওল, সৈয়দ মুর্তুজা প্রভৃতি কবিগণের অবদান বড় কম নয়। নাম সঙ্কীর্তনে বিভোর হয়ে সৈয়দ মুর্তুজ গেয়ে ওঠেন—

শ্যাম বঁধু আমার পরাণ তুমি।
কোন শুভ দিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান
দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুন শুন পরাণ কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু॥
সৈয়দ মুর্ত্তজা ভনে কানুর চরণে—
নিবেদন শুন হরি।
সকলি ছাড়িয়ে রহুঁ তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি॥

ঊনবিংশ অধ্যায়

হোসেনশাহী বংশ-২

নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২)

হোসেন শাহর মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নসরৎ শাহ্ মসনদে আরোহণ করেন। প্রথানুযায়ী যে তাঁকে ১৭ জন ভ্রাতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয় নি তা থেকে বোঝা যায় যে তাঁর কূটনীতিজ্ঞান প্রখর ও হৃদয়াবেগ কোমল ছিল। ভাইদের অন্ধ বা কারারুদ্ধ করবার পরিবর্তে তিনি প্রত্যেকের বৃত্তির ব্যবস্থা করেন ও মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে সকলের অভিভাবক হয়ে বসেন। বৎসর পঁচিশেক পূর্বে তাঁর পিতা হোসেন শাহ দিল্লীশ্বর সিকান্দার লোদীর আক্রমণ প্রতিহত করবার পর থেকে গৌড়ের পশ্চিম সীমান্তে কোন প্রকার ঘটনা সংঘটিত হয় নি। উভয় রাজ্য পরস্পরের স্বাধীনতা মেনে নিয়ে নিজেদের শাসনকার্য্য পরিচালনা করছিল। এখন লোদী সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেছে, নসরৎএর সিংহাসনারোহণের দুই বৎসরের মধ্যে তাদের এক সৈন্যাধ্যক্ষ বাহার খাঁ লোহানি বিহারে এসে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই লোদী-লোহানি সংঘর্ষের সুযোগে নসরৎ শাহ প্রায় বিনা বাধায় পশ্চিমদিকে হাজীপুর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করে নিজ সীমান্ত গণ্ডক নদী পর্য্যন্ত প্রসারিত করেন। তার কিছু দিন পরে মোঙ্গলবীর বাবর পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করলে তুর্কী ও আফগান সর্দাররা আশ্রয়ের জন্য দলে দলে পূর্ব দিকে পালিয়ে আসায় নসরৎ শাহ তাঁদের সংঘবদ্ধ করে মোগলের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত ফ্রণ্ট গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবরের পুত্র হুমায়ুন সবাইকে পরাভূত করে যখন ঘর্ঘরা নদী পর্য্যন্ত এগিয়ে আসেন তখন তিনি উভয় পক্ষকে দেখান যে মোগল-আফগান সংঘর্ষে গৌড় নিরপেক্ষ। তিনি তুর্কী নন, আফগানও নন। ওই

তুই জাতির রক্ত যখন তাঁর দেহে নেই তখন কি প্রয়োজন মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বার? বৎসরাধিক ধরে তিনি একজন মোগল দূতকে নিজ দরবারে রাখেন এবং পরে মূল্যবান উপঢৌকনসহ নিজের দূতকে বাবরের দরবারে পাঠিয়ে দেন।

এইভাবে নসরৎ শাহ্ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে লাগলেন। মোগল আফগান দ্বন্দ্বে তিনি বাবরের সঙ্গে সৌহার্দ্য রক্ষা করলেন, আবার গোপনে আফগানদের সাহায্য দিতে লাগলেন। বাহার খাঁ লোহানির মৃত্যুতে বিহারের আফগানরা অসহায় হয়ে পড়লে বাবর অতি সহজে গঙ্গা পার হয়ে বক্সারে পৌছান। সেই সময়ে আর একজন আফগান সর্দার শের খাঁ শূর মোগলের আধিপত্য মেনে নিয়ে বাহার খাঁর বালক পুত্র জালাল লোহানির অধীনে গঠিত নূতন রাজ্যের অস্তিত্ব সঙ্কটাপন্ন করে তোলেন। তাতে বিপদ দেখা দেয় নসরৎ শাহর। তাঁকে একদিকে মোগল বিরোধীদের সক্রিয় রাখতে হবে, আবার অন্যদিকে বাবরের সঙ্গে সদ্ভাব ক্ষুণ্ণ করলে চলবে না। যে কোন এক পক্ষ নিঃশেষ হলে বিপদ তাঁর দ্বারপ্রান্তে এসে দেখা দেবে।

সেই সময়ে হঠাৎ এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। দিল্লী সিংহাসনের নূতন দাবীদার মামুদ লোদী বাবরের সঙ্গে বিরোধ নিরর্থক বুঝে বিহারে চলে এসে বালক জালালের হাত থেকে অতি সহজে রাজ্যটি অধিকার করে নেন। অধিকাংশ বিক্ষুব্ধ আফগান সর্দার তাঁকে নিজেদের নায়ক বলে মেনে নিলেও লোহানিরা ক্রুদ্ধ হয়—রাজ্যহারা জালাল লোহানি হাজিপুরে এসে নসরৎ শাহর শরণাপন্ন হন। কিন্তু নসরৎ তাঁকে অস্বীকার করে মামুদ লোহানিকে সকল আফগানের নায়ক বলে মেনে নেওয়ায় অসহায় জালাল বাবরের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করে দূত পাঠান। সে কথা জানতে পেরে আফগানরা তাঁকে নজরবন্দী রেখে বাবরের বিরুদ্ধে একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠন করতে উদ্যোগী হয়। শের খাঁ এই ফ্রন্টে যোগ দিলে মোগলের বিরুদ্ধে এক ত্রিমুখী অভিযান চালাবার পরিকল্পনা রচিত হয়।

সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫২৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে মামুদ লোদী ও শের খাঁ নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীসহ গঙ্গার উভয় তীর ধরে চুনার ও বারাণসীর দিকে এবং বিবন ও বায়াজিদ ঘর্ঘরা নদী পার হয়ে গোরখপুরের দিকে অগ্রসর হন।

শের খাঁ বারাণসী পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়ে ওই নগরী অধিকার করেন এবং বিবন ও বায়াজিদ মন্থর গতিতে হোলেও এগোতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের সর্বাধিনায়ক মামুদ লোদী ছিলেন দুর্বলচেতা। যেই তিনি শুনলেন যে মোগলরা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে তখনই ভীতিবিহ্বল চিত্তে মাহোবার দিকে পালিয়ে গেলেন—চুনারে পৌছান হয়ে উঠল না। তাঁর কাপুরুষতার জন্য আফগানদের সেই চমৎকার পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হোল। তাতে শের খাঁর সম্মুখে দেখা দিল মহা সংকট। উপায়ন্তর না দেখে তিনি বারাণসী থেকে পেছিয়ে এসে বাবরের কাছে আর একবার আত্মসমর্পণ করেন। আফগানদের সম্মিলিত শক্তি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, বাবর একেবারে গৌড় সীমান্তে এসে উপনীত হন।

বাবরের গৌড় আক্রমণ

আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে গৌড়েশ্বর নসরৎ শাহ যে কোনও পক্ষে যোগ দেন নি সে কথা স্মরণ করে বাবর আর পূর্ব দিকে এগোলেন না বটে কিন্তু লিখিত নিরপেক্ষতা দাবী করে তাঁর কাছে এক পত্র পাঠালেন। তাঁর আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নসরৎএর মনে সন্দেহ ছিল না, তাই তিনি সে পত্রের উত্তর পাঠাবার পরিবর্তে মোগল দূতকে নানা অছিলায় নিজ রাজধানীতে বসিয়ে রাখেন। বিস্ময়বিমূঢ় বাবরের পক্ষে এ ভাবে সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়; তাই তিনি আর একজন দূতকে নসরৎ শাহর কাছে পাঠিয়ে চরম পত্র দিলেন। নিরপেক্ষতা নয়, আত্মসমর্পণ। হয় মোগলের বশ্যতা স্বীকার করুন নয় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোন। নসরৎ শাহ যুদ্ধের পথ বেছে নিলেন।

তিন দিন তিন রাত ধরে উভয় পক্ষের পদাতিক, অশ্বারোহী ও নৌবাহিনীর মধ্যে তুমুল সংগ্রাম চলল। নসরৎ শাহর সৈন্যরা মরণপণ করে যুদ্ধ করেও বাবরের উৎকৃষ্টতর রণকৌশলের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না। তাদের পর্য্যুদস্ত করে মোগল ফৌজ ছাপরায় এসে উপস্থিত হোলে উপায়ান্তরবিহীন নসরৎ শাহ বাবরের সর্ত পুরাপুরি মেনে নিয়ে সন্ধি প্রার্থনা করে দূত পাঠালেন। বাবর তাতে সম্মতি দিলে বালক সুলতান জালাল লোহানি তাঁর অধীনে বিহারের শাসনকর্তা বলে স্বীকৃত হোলেন এবং গৌড়-বঙ্গের উপর নসরৎ শাহর সার্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হোল।

যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিজয়ী শত্রুর কাছ থেকে এর চেয়ে উদার ব্যবহার আশা করা যায় না। কিন্তু নসরৎ শাহ জানতেন যে এই সন্ধির আড়ালে বাবর সাময়িক বিরতি চাইছেন, সদ্যবিজিত সাম্রাজ্যে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হোলে তাঁর সঙ্গে আবার শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবেন। সেই কারণে তাঁর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে নসরৎ পুনরায় আফগান সর্দারদের সঙ্গে গোপন চক্রান্ত সুরু করেন। লোহানিরা এখন মোগলদের উপগ্রহ বলে তাদের উপর আর আস্থা রাখা যায় না। তাদের বাদ দিয়ে শের খাঁ, মামুদ লোদী, বিবন ও বায়াজিদের সঙ্গে তাঁর আলোচনা চলতে লাগল। চতুর শের খাঁ যখন দেখলেন যে লোহানিদের অপসারণ সম্বন্ধে সকলেই একমত তখন ঝটিতি আক্রমণে জালাল লোহানিকে সরিয়ে বিহার হস্তগত করে নিলেন। এই সংবাদ দিল্লীতে বাবরের কাছে পৌছালে তিনি আবার পূর্বাঞ্চলে আসবার জন্য তৈরী হচ্ছেন এমন সময়ে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়।

বাবরের পুত্র হুমায়ুন ছিলেন যেমন অলস তেমনি বিলাসী। সারা দিন আফিম খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকতেন আর হাজারখানেক গৃহভৃত্য তাঁর পরিচর্যা করত। এরূপ এক অকর্মণ্য যুবক যে তেজোদীপ্ত পিতার মত পূর্ব ভারতে এসে আর উৎপাত করতে পারবে না সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে বিহারের আফগান সর্দাররা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলেন। মামুদ লোদী পুনরায় তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে বায়াজিদকে ডাইনে ও শের খাঁকে বামে রেখে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হোতে লাগলেন। দিল্লীতে আফগান আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সবাইকে বিভোর করে তুলল। তাদের আগমনে জৌনপুরের মোগল ফৌজ নিজেদের ছাউনি ছেড়ে চলে গেল, কিন্তু আফগানরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করবার পরিবর্তে লখনৌতির দিকে ধাবিত হোল।

হুমায়ুন আফিমখোর হোলেও আফগানদের অভিযানের সংবাদে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। তাদের অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য তিনি সসৈন্যে পূর্ব দিকে রওনা হোলেন। দাদরা প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষদের উৎকৃষ্টতর নেতৃত্বের ফলে আফগানরা বিধ্বস্ত হয়, শের খাঁ আর একবার মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে চুনার দুর্গের আধিপত্য লাভ করেন।

এবারকার এই মোগল-পাঠান যুদ্ধেও গৌড়েশ্বর নসরৎ শাহ নিরপেক্ষ ছিলেন। অথচ পূর্ব ভারতে শক্তি বলতে তখন একা তিনি। নিজ স্বার্থে আফগানদের গোপনে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন বটে কিন্তু সৈন্য দিয়ে মোগলের বিরাগ-ভাজন হন নি। দাদরার যুদ্ধে যখন সেই আফগান শক্তি পরাজিত হোল তখন তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে তিনি নিরপেক্ষ থাকলেও হুমায়ুন থাকবেন না। গৌড়ের পশ্চিম তোরণ মোগল বীরের সম্মুখে উন্মুক্ত হয়েছে এবং আজ হোক বা কাল হোক তিনি এসে তাতে আঘাত হানবেন। অথচ একক শক্তিতে হুমায়ুনের সম্মুখীন হবার সাধ্য তাঁর নেই। আবার তাঁর পূর্ব সীমান্তও নিরাপদ নয়। অহম রাজের যেরূপ মতিগতি তাতে তিনি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে পূর্ব দিক থেকে অহমরা এসে গৌড় আক্রমণ করতে পারে। সকল দিক বিবেচনা করে নসরৎ শাহ অন্যত্র মিত্রের সন্ধান করতে লাগলেন।

গুজরাটে বাহাদুর শাহরও একই দশা। ইব্রাহিম লোদী যখন দিল্লীতে রাজত্ব করছিলেন তখন তিনি তাঁর আধিপত্য অস্বীকার করে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছিলেন। দুর্বলচেতা ইব্রাহিম কোন বিদ্রোহীকে দমন করতে পারেন নি—তাঁকেও নয়। তাঁর পতনের পর তিনি রীতিমত চিন্তাকুল হয়ে পড়েন ; লোদী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে বাবর যেকোন দিন তাঁর কাছে আনুগত্য দাবী করতে পারেন। সেই কারণে নসরৎ শাহর দূত মালিক মারজান যখন তাঁর কাছে গিয়ে মৈত্রীর প্রস্তাব করল তিনি যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। নসরৎকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজ সৈন্যবাহিনীকে মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে বললেন। তিনি শক্তি বৃদ্ধি করছেন শুনে হুমায়ুন গুজরাটে যুদ্ধযাত্রার জন্য আয়োজন করতে লাগলেন। সদ্যসমাপ্ত সন্ধির সর্তানুসারে নসরৎএর সেই সময়ে হুমায়ুনকে পশ্চাদ্দিক থেকে আক্রমণ করবার কথা, কিন্তু জনৈক ক্রীতদাস তাঁকে গোপনে হত্যা করায় সকল পরিকল্পনা অপূর্ণ থেকে যায়!

গিয়াসুদ্দীন মামুদ (১৫৩৩-৩৮)

এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে ছিলেন নসরৎ শাহর এক অগ্রজ আবদুল বদর। কিছু দিন পরে তিনি নসরৎএর পুত্র আলউদ্দীন ফিরোজকে শমন সদনে পাঠিয়ে

মসনদ আত্মসাৎ করলে তাঁর সুলতানী নাম হয় গিয়াসুদ্দীন মামুদ। তাঁকে এইভাবে মসনদ অধিকার করতে দেখে হাজীপুরের শাসনকর্তা মকদুম শাহ অন্যান্য আমীরদের দলে টেনে নিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত সুরু করেন। তাতে সুবিধা হয় হুমায়ুনের। কারণ সে সময়ে তিনি গুজরাটে বাহাদুর শাহর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় গৌড়-বিহারের বিরোধী শক্তিগুলি ঐক্যবদ্ধ থাকলে তাঁকে পূর্ব সীমান্ত সম্বন্ধে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন থাকতে হোত। সেই উদ্বেগের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয় মামুদ-মকদুম সংঘর্ষ। তাঁরা যখন পরস্পরকে নিধনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন হুমায়ুন তখন নিজের সমস্ত শক্তি বাহাদুরের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করেন। সে যুদ্ধ শেষ হোলে যে হুমায়ুন পূর্ব ভারতে আসবেন সে কথা জেনেও মকদুম শের খাঁকে দলে টেনে নিয়ে গিয়াসুদ্দীন মামুদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। এই যুদ্ধের প্রথম দিকে মামুদ শাহর উজীর কুতুব খাঁ নিহত হওয়ায় তিনি বৃহত্তর এক সৈন্যবাহিনী মকদুম শাহর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। মকদুম দেখলেন, শত্রুর তুলনায় তাঁর সৈন্যবল একেবারেই নগণ্য। সেই কারণে তাঁর বিপুল ধন দৌলতের নিরাপত্তার জন্য শের খাঁর কাছে চুনার দুর্গে পাঠিয়ে দেন। মামুদ শাহ হাজীপুরে গিয়ে তাঁকে কোণঠাসা করে দিলেও শেরের গায়ে আঁচড় কাটতে পারেন নি, বরং মকদুমের গচ্ছিত অর্থ দিয়ে শের সৈন্য সংগ্রহ করতে লাগলেন।

এখন থেকে আমাদের কাহিনীর মুখ্য নায়ক হয়ে দাঁড়াবেন এই আফগান বীর শের খাঁ।

1 Ghulam Husain Salim *Riyaz-us-Salatin. Abdus Salam's trans., p. 148*

2 *Babur's Memoir's, Beveridge's trans. p. 544, 628, 637, 663-64*

3 Ahmed Yadgar *Tarikh-i-Salatin-i-Afghana, Elliots' trans, p. 184*

বিংশ অধ্যায়

শের শাহ

আফগান জাগরণ

ঘোর নগরী আফগানিস্থানে অবস্থিত হোলেও মহম্মদ ঘোরী আফগান ছিলেন না। তরাইন প্রান্তরে একদল আফগান যেমন তাঁর তুর্কী ফৌজের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল আর একদল আফগান তেমনি পৃথ্বিরাজের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য দিল্লীতে চলে এসেছিল। ফিরিস্তার বিবরণ অনুসারে ঘোরীর সৈন্যবাহিনীতে ছিল তুর্কী, তাজিক ও আফগান; পক্ষান্তরে পৃথ্বিরাজের বাহিনী গঠিত হয়েছিল রাজপুত ও আফগান সৈন্য দিয়ে। এইভাবে স্বদেশে ও বিদেশে দস্যুবৃত্তি করা এবং বিভিন্ন রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে চাকুরী করা ছিল আফগানদের প্রধান উপজীবিকা। স্বদেশের স্বাধীনতা নিয়ে তারা বিশেষ মাথা ঘামাত না। বহিরাগতরা এসে তাদের দেশে রাজত্ব করত, আর তারা করত অন্যের দেশে ভাড়াটে সৈনিকের কাজ। নিজেরা যে কোন রাজ্য চালাতে পারে এমন কথা কোন আফগান ভাবতে পারত না। অবস্থার পরিবর্তন ঘটল পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়াতে। মধ্য-এশিয়া থেকে এসে তৈমুর লং অবলীলাক্রমে দিল্লী লুণ্ঠন করে চলে গেলেন দেখে দলে দলে আফগান উপজাতি ভারতের তুর্কী সাম্রাজ্যের দুর্বলতা বুঝে নিয়ে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে এসে বসতি স্থাপন করতে লাগল। এই উপজাতিদের সংঘবদ্ধ করে ১৪০২ খৃষ্টাব্দে বহলোল লোদী দিল্লীর শেষ সৈয়দ সুলতানের কাছ থেকে ওই নগরী ছিনিয়ে নেন। সেই থেকে ভারতে প্রথম আফগান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

বাঘ রক্তের স্বাদ পেল। আফগানদেরও যে রাজ্য হোতে পারে একথা বুঝে নিয়ে তাদের সর্দাররা চারিদিকে রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা জায়গীর অধিকারের

জন্য ঘুরতে লাগলেন। পাঞ্জাব, অযোধ্যা, জৌনপুর সর্বত্র তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোল।

উদ্যোগী পুরুষ সিংহ

এই আফগান ভাগ্যান্বেষীদের অন্যতম নায়ক ছিলেন ফজলী খাঁর পুত্র ফরিদ। বহলোল লোদীর নেতৃত্বে তাঁর স্বজাতিরা যখন দিল্লী অধিকার করে ফরিদের পিতামহ তখন স্বদেশ ছেড়ে হিন্দুস্থানে চলে আসেন। জৌনপুরের হিন্দু রাজা জয়মল্লের আনুকূল্যে এই পরিবার সাসারামে একটি জায়গীর পায় এবং চুক্তিনামা অনুসারে জয়মল্লকে প্রয়োজনের সময়ে সৈন্য সরবরাহের দায়িত্ব নেয়। সেই সৈনিকদের সঙ্গে কাজ করবার সময়ে ফরিদ এক দিন একাই একটি বাঘ মারায় তাঁর নাম হয় শের খাঁ। সেই সময়ে দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর এক সৈন্যাধ্যক্ষ মোবারক লোহানি যখন প্রভুর বিরুদ্ধাচারণ করে বিহারে এক স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন শের তাঁর প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁর বালক পুত্র জালালের গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন।

কিছুদিন পরে মোবারক লোহানির অকালমৃত্যু হওয়ায় বালক জালাল বিহারের সুলতান বলে ঘোষিত হন। কিন্তু বাবরের আগমনে যে সব আফগান সর্দার দিল্লী থেকে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁরা সেই সঙ্কটের সময়ে এক বালকের উপর ভরসা রাখতে পারলেন না। সবাই মিলে জালালকে সরিয়ে দিয়ে দিল্লীর লোদী সিংহাসনের দাবীদার মামুদকে মসনদে বসালেন। শেরও এই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে সম্মিলিত আফগান বাহিনীর হয়ে বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়লেন। কিন্তু তাঁদের সবাইকে পরাজিত করে বাবর যখন জালাল লোহানিকে হৃতরাজ্যে পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করলেন তখন তিনি মোগল বীরের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে উজীরের পদ লাভ করেন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে গৌড় প্রাসাদে এক বিষম বিপ্লব সংঘটিত হয়। অজ্ঞাত এক আততায়ীর হস্তে গৌড়েশ্বর নসরৎ শাহর মৃত্যু হওয়ায় তাঁর বালকপুত্র মসনদে আরোহণ করেন, কিন্তু তাঁর জীবনাবসান ঘটিয়ে পিতৃব্য গিয়াসুদ্দীন মামুদ মসনদ অধিকার করেন। হাজীপুরের শাসনকর্তা মামুদ শাহ তাতে কুপিত হয়ে নূতন সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। সে সব কথা পূর্ব অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

সুরজগড়ের যুদ্ধ

শের শাহর অভিভাবকত্ব আগে থেকেই বালক জালালের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তার উপর যখন তিনি শুনলেন যে মকতুম শাহর গচ্ছিত অর্থে শের সৈন্য সংগ্রহ করছেন তখন তাঁকে নিধন করবার জন্য গুপ্তঘাতক নিয়োগ করেন। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় জালালের পক্ষে নিজ রাজধানীতে অবস্থান করা অসম্ভব হয়, গৌড়ে পালিয়ে এসে সুলতান গিয়াসুদ্দীন মামুদের কাছে আশ্রয় নেন। মামুদ শাহ দেখলেন, বিহারের উপর আধিপত্য স্থাপনের এই এক মহা সুযোগ। জালালকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিনি ইব্রাহিম খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী শেরের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন (১৫৩৪)। সুলতান জালালও নিজ ফৌজ নিয়ে তাদের সঙ্গে চলে যান।

শের খাঁর মহা বিপদ। হয়হস্তীপদাতিক দিয়ে গঠিত সেই বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হবার মত সম্বল তাঁর একেবারেই নেই। তার উপর তাঁর পশ্চিম সীমান্ত থেকে যে কোন সময়ে বিপদ আসতে পারে। তাই তিনি পুরোপুরি আত্মশক্তিতে নির্ভর করে মামুদ-জালালের সম্মুখীন হবার জন্য মনোমত স্থান ও উপযুক্ত সময়ের জন্য দিন গণতে লাগলেন। মুঙ্গের পার হয়ে লক্ষীসরাইয়ের কাছাকাছি কোন জায়গায় নদীপাহাড় বেষ্টিত সুরজগড় প্রান্তরে এসে সম্মিলিত বাহিনীর সেনাপতিদ্বয় তাঁবু ফেললেন। শের খাঁ তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীসহ সেখানে এসে ব্যূহ বিন্যাসের আদেশ দিলেন। উভয় পক্ষই মাসাধিক কাল ধরে চুপচাপ বসে রইল ; এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কেউই বিরোধীদের আক্রমণ না করে প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত এক দিন রাত্রে শের খাঁ সুযোগ বুঝে শত্রুর উপর ভীমবেগে ঝাঁপিয়ে পড়লে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। সংখ্যায় বহু গুণ হোলেও অস্ত্র ধারণের সুযোগ না পাওয়ায় তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তাদের সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ নিহত হন। সুলতান জালাল কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে গৌড়ে ফিরে আসেন।

মধ্যযুগের ইতিহাসের উপর এই সুরজগড়ের যুদ্ধের ফল সুদূরপ্রসারী। এখানে মুষ্টিমেয় অশ্বারোহী নিয়ে শের খাঁ গৌড় ও বিহারের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে শুধু যে বিহারের সর্বময় অধীশ্বর হয়ে বসেন তা নয় ভবিষ্যৎ ভারত ইতিহাসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবার ইঙ্গিত দেন। অসাধারণ

প্রতিভাশালী সৈন্যাধ্যক্ষ ও বিচক্ষণ কূটনীতিজ্ঞ না হোলে সুরজগড়ে সেদিন জয়লাভ করা সম্ভব হোত না। সেই যুদ্ধের ফলে বিহার থেকে জালাল লোহানির শাসনের অবসান হয়, সবাই শের খাঁকে ওই রাজ্যের অধীশ্বর বলে মেনে নেয়। কিন্তু পশ্চিমে মোগল ও পূর্বে গৌড় এই দুই প্রবল শক্তির চাপে শেরের সেই নূতন রাজ্য কত দিন টিকে থাকবে? তাই পরের দুই বৎসর ধরে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে সৈন্যবল বৃদ্ধি করেন। হুমায়ুন তখন গুজরাট যুদ্ধের প্রথম পর্ব শেষ করে দিল্লীতে বিশ্রাম নিচ্ছেন বটে কিন্তু গুজরাটে আবার বিদ্রোহবহ্নি জ্বলে উঠেছে শুনে শের বুঝলেন যে তাঁকে অবশ্যই সেখানে যেতে হবে। আপাততঃ সেদিক থেকে যখন কোন আশঙ্কা নেই তখন গৌড়েশ্বর মামুদ শাহর সঙ্গে হিসাব মেটাবার জন্য তিনি সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীসহ পূর্বদিকে অগ্রসর হোলেন (১৫৩৬)।

শের খাঁর গৌড় জয়

সুরজগড়ে পরাজয়ের পর মামুদ শাহ বুঝে নেন যে একদিন না একদিন তাঁকে শের খাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় নামতে হবে। তার প্রস্তুতি হিসাবে তিনি রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমদিকস্থ সমস্ত ভূভাগ থেকে সৈন্য সরিয়ে এনে বিহার ও গৌড়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত তেলিয়াগড়ি গিরিবর্ত্মে সকল সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত করেন। বেশীরভাগ স্থল ও নৌসৈন্যকে সেখানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখলেও একক শক্তিতে সকল আফগানের সাহায্যপুষ্ট শের খাঁর সম্মুখীন হওয়া শক্ত হবে বুঝে তিনি মিত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। কে যেন তাঁকে বলল যে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গিরা সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে তাঁর রাজ্যে ব্যবসা করছে বটে কিন্তু তারা লড়াই করে ভাল, তাদের পেলে তাঁর শক্তি যথেষ্ট বাড়বে। দুই বৎসর পূর্বে যে পর্তুগীজ মিশনকে মামুদ শাহ মুসলমান জাহাজ লুঠ করবার অপরাধে গৌড় কারাগারে আটকে রেখেছিলেন এখন তাদের শরণাপন্ন হোলেন। তাঁর নির্দেশে সকল পর্তুগীজ বন্দীকে মুক্তি দিয়ে তেলিয়া-গড়িতে পাঠান হোল এবং তাদের নেতা ডি'মেলো মারফৎ গোয়ার পর্তুগীজ ভাইসরয় ন্যুনো ডি'কুন্‌হার কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন গেল। আবহাওয়া অনুকূল করবার জন্য সুলতান মামুদ শাহ পর্তুগীজদের সপ্তগ্রাম ও চট্টগ্রামে কুঠী স্থাপনের জন্য সনদ দিলেন।

সব কথাই শের খাঁর কাছে পৌঁছাল। মামুদ শাহকে আর বেশী সময় দেওয়া উচিত হবে না বুঝে তিনি নিজ বাহিনীসহ পাটনা থেকে রওনা হয়ে তেলিয়াগড়ি গিরিবর্ত্মে এসে দেখেন—পথ বন্ধ। গিয়াসুদ্দীন মামুদ তাঁর চেয়ে এক বৃহত্তর সৈন্যবাহিনী সেখানে প্রস্তুত রেখেছেন, তাঁর সমস্ত রক্ষাব্যবস্থা রচিত হয়েছে সেই গিরিবর্ত্মকে কেন্দ্র করে। শের খাঁ দেখলেন, স্থানটি তাঁর পক্ষে যুদ্ধের অনুকূল নয়, সেখানে যুদ্ধ করলে জয় পরাজয় সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যাবে। তাছাড়া বড় রকমের সম্মুখযুদ্ধে তিনি অভ্যস্তও নন। ছদ্মবেশে সমস্ত অঞ্চলটি ঘুরে শের যখন বুঝলেন যে এখানে শত্রুব্যূহ ভেদ করা সহজসাধ্য হবে না তখন পুত্র জালালের অধীনে কয়েক রেজিমেণ্ট সৈন্য সেখানে রেখে তিনি মূল বাহিনীসহ অতি সংগোপনে ঝাড়খণ্ডের পথ ধরে গৌড় নগরীর দিকে রওনা হোলেন। তাঁর এই গতিবিধির কথা মামুদ শাহর সৈন্যাধ্যক্ষগণ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি। তাই কয়েক দিন পরে যখন তাঁদের কাছে খবর গেল যে শের খাঁ গৌড় নগরীর দ্বারদেশে গিয়ে উপনীত হয়েছেন তখন তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। প্রায় সকল সৈন্যাধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে তেলিয়াগড়ি ত্যাগ করে রাজধানীর দিকে চলে গেলেন কিন্তু তাঁদের সুলতান এমনই ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন যে সোজাসুজি যুদ্ধের আদেশ দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। পর্তুগীজরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েও তাঁর মনোবল বাড়াতে পারল না। তেরো লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মূল্য দিয়ে তিনি শের খাঁর কাছে সন্ধি ক্রয় করলেন। গৌড় নগরীর প্রবেশদ্বার তেলিয়াগড়ি গিরিপথ আফগানদের হাতে চলে গেল।

সন্ধিপত্র যথারীতি সম্পাদিত হোলেও গিয়াসুদ্দীন মামুদ কোন স্বস্তি পেলেন না। আগুনকে তিনি ছাই চাপা দিয়ে রেখেছেন—যে কোন মুহূর্তে বেরিয়ে পড়ে তাঁকে পুড়িয়ে দিতে আসবে। তাই তিনি নূতন করে সামরিক বল বাড়াতে লাগলেন, পর্তুগীজদের কাছে সাহায্যের জন্য আকুল আবেদন পাঠালেন। কিন্তু জবাব এল যে তাদের এখন বহু দায়, সুলতান যদি পরবৎসর ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন তাহোলে প্রার্থিত সাহায্য পাঠান সম্ভব হবে।

ভীতিবিহ্বল মামুদ শাহ হুমায়ুনের কাছে সাহায্যের জন্য কোন আবেদন পাঠিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু শের শাহর অভ্যুত্থানের সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছালে হুমায়ুন বিচলিত না হয়ে পারেন নি। কিছু দিন পরে গুজরাট যুদ্ধ শেষ

হোলে তিনি সসৈন্যে এসে বিহারের প্রবেশদ্বারে অবস্থিত চুনার দুর্গ অবরোধ করেন। তা দেখে শের খাঁর ভয় হোল যে হুমায়ুনের নির্দেশে হোক বা তাঁর অভিযানের সুযোগ নেবার জন্য হোক মামুদ শাহ তাঁকে পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করবেন। সেই সম্ভাবনা সমূলে বিনাশ করবার জন্য তিনি পুত্র জালালের অধীনে একটি সৈন্যবাহিনী গৌড়ে পাঠিয়ে দেন। কয়েক মাস ধরে তারা ওই নগরী অবরোধ করে রাখলে নগরমধ্যে খাদ্যাভাব দেখা দেয়, মামুদ শাহ উন্মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে এসে যুদ্ধ সুরু করেন। কিন্তু পরাজিত ও আহত হয়ে তিনি সদলবলে উত্তর বিহারে চলে গেলে গৌড়ে শের শাহর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঠিক সেই সময়ে হুমায়ুন চুনার দুর্গ অধিকার করে পূব দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। শোন নদীর তীরে মানেরের নিকটবর্তী দারেশপুর গ্রামে গৌড়েশ্বর গিয়াসুদ্দীন মামুদ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এই আশ্বাস দেন যে মোগলরা গৌড় আক্রমণ করলে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে সাহায্য করবেন। কিন্তু হুমায়ুনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৌড়ে ফেরবার পথে কহলগাঁও পৌছে তিনি শোনেন যে আফগানরা তাঁর দুই বন্দী পুত্রকে হত্যা করেছে। সেই শোকে তাঁর মৃত্যু হয়।

হোসেনশাহী বংশও সেই সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে।

হুমায়ুনের গৌড় প্রবেশ

চুনার দুর্গের পতনের পর শের খাঁ হুমায়ুনের সঙ্গে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু গৌড়েশ্বর মামুদ শাহর প্ররোচনায় তিনি সে কথায় কান না দেওয়ায় শের মাত্র পাচ শত অশ্বারোহীসহ দ্রুতগতিতে গৌড়ে এসে নিজেকে সমগ্র গৌড় রাজ্যের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। তাঁর নামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচার সুরু হয়। এই অপ্রত্যাশিত সাফল্য সত্বেও শের খাঁ জানতেন যে হোন তিনি গৌড় ও বিহারের সর্বময় অধীশ্বর হুমায়ুন যেভাবে এগিয়ে আসছেন তাতে শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করা সহজসাধ্য হবে না। তাই গৌড় নগরীর প্রবেশদ্বার তেলিয়াগড়ি গিরিবর্ত্মে একটি শক্তিশালী ফৌজ রেখে রাজকোষে সঞ্চিত ছয় কোটী স্বর্ণমুদ্রাসহ সকল ধনসম্পদ রোহটাস দুর্গে পাঠিয়ে দেন। হোসেন শাহর সময় থেকে এই অর্থ ছাড়া এত বিপুল পরিমাণ

ধনরত্ন জমা হয়ে উঠেছিল যে সেগুলি বহে নিয়ে যাবার জন্য শেরের পুত্র জালালকে অন্য জায়গা থেকে ভারবাহী পশু সংগ্রহ করে আনতে হয়।

শের খাঁ বললেন, মোগলরা গৌড়ে এসে যেন পোড়ামাটি ছাড়া আর কিছু দেখতে না পায়। তাঁর আদেশে সিপাহীরা রাজপ্রাসাদ, সরকারী দফ্তরখানা ও বড় বড় হর্ম্যগুলি অস্ত্র ও অগ্নি সংযোগে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল, কূপ ও জলাশয়গুলি আবর্জনায় ভরে দিল। তার ফলে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে সেখানে বাস করা শক্ত হয়ে উঠল। এর পর মোগলরা এসে পৌঁছালে তাদের সঙ্গে আফগানদের যে যুদ্ধ হবে তাতে কেউ ধনপ্রাণ নিয়ে টিকে থাকতে পারবে না বুঝে নগরবাসীরা দলে দলে গ্রামাঞ্চলে চলে গেল—গৌড় জনশূন্য হয়ে পড়ল (১৫৩৯, এপ্রিল)।

হুমায়ুনের অভিযাত্রীবাহিনী ছিল এক চলমান নগরী। লক্ষাধিক সৈনিক ও অফিসারদের জন্য কয়েক হাজার দাসদাসী সেই বাহিনীর পশ্চাদভাগে আসছিল। চেঙ্গিজ খাঁর সময় থেকে তিন শত বৎসর ধরে একটানা রাজ্যশাসনের ফলে এইরূপ বিলাসের ঐতিহ্য মোগল বাহিনীর মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। একে বৈচিত্র্যেভরা এই বিশাল সৈন্যবাহিনী, তার উপর এগিয়ে আসবার সময় হুমায়ুন অধিকৃত জনপদগুলির উপর নিজের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করছিলেন। তাই তাঁর অগ্রগতি খুবই মন্থর হয়ে পড়েছিল। শের খাঁ যেক্ষেত্রে চুনার থেকে গৌড়ে এসেছিলেন দুই দিনে সেক্ষেত্রে তাঁর লাগে কয়েক মাস। গৌড়ে পৌঁছে তিনি দেখেন যে আফগানরা এই নগরীকে শ্মশানে পরিণত করে অন্যত্র চলে গেছে। নগর অধিকার করবার জন্য তাঁকে যুদ্ধ করতে হোল না বটে কিন্তু পথঘাট সাফ ও বাড়ীঘর পুনর্নির্মাণের জন্য কম আয়াস স্বীকার করতে হয় নি। তাঁর সৈন্যদের পরিশ্রমের ফলে গৌড় তার পূর্ব রূপ ফিরে পেল। হুমায়ুন দেখলেন যে এরূপ সুরম্য স্থান খুবই কম আছে, তাই নগরীর নাম বদলে নিজ নামে নূতন নামকরণ করলেন জিন্নতাবাদ।*

শুধু রাজধানী হাতে এলে রাজ্য অধিকার হয় না। হুমায়ুন দিকে দিকে লোক পাঠালেন, বড় বড় অফিসারদের জায়গীর দিলেন, সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সামরিক চৌকী বসালেন। তারই মাঝে আমোদ প্রমোদ চলতে লাগল। সদ্য বিজিত রাজ্যে নিজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন তার

* হুমায়ুনের প্রকৃত নাম জিন্নতবানি আসিয়ানি—আকবরনামা, খণ্ড-১

সবই করলেন। কিন্তু কোন দিক সামলাবেন তিনি? অন্যান্য প্রান্ত থেকে আফগানদের হামলার খবর প্রায়ই আসতে লাগল। তাঁর আগমনে শের খাঁ গৌড় ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে দক্ষিণ বিহার পুনরধিকার করে বারাণসী-বাহ্‌রাইচ অঞ্চলে এক সুসম্বদ্ধ সামরিক ছাউনি রচনা করেছেন। শেরের অশ্বারোহীরা চারিদিকে লুঠতরাজ করে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে গৌড়ের উপকণ্ঠেও এসে হাজির হচ্ছে। তার চেয়েও ভাবনার কথা এই যে তাঁর নিজের ভাই মীর্জা হিন্দাল তাঁকে নিপাত করবার জন্য আগ্রায় তৈরী হচ্ছে। এদিকে যে সৈন্য বাহিনী নিয়ে তিনি জিন্নতাবাদে এসেছেন এখানকার স্যাঁতসেঁতে গরম হাওয়া তাদের সহ্য হচ্ছে না, দেশে ফেরবার জন্য সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আর বেশী দিন গৌড়ে থাকা উচিৎ নয় বুঝে হুমায়ুন দিল্লী ফেরবার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কিন্তু কার হাতে দিয়ে যাবেন এখানকার দায়িত্ব? তাঁর জনৈক উপপত্নী বাইকে বেগমের পিয়ারের লোক জাহির বেগকে সেকথা বলায় জবাব এল: মহামান্য বাদশাহ আমাকে এই দোজখের শাসনকর্তা করবার চেয়ে মৃত্যুদণ্ড দিলে খুসী হোতাম। আর কোন দায়িত্বশীল লোক যখন পাওয়া যাচ্ছে না তখন জাহাঙ্গীর কুলী বেগের উপর আপাততঃ গৌড় রাজ্য পরিচালনার ভার দিয়ে হুমায়ুন দিল্লীর দিকে রওনা দিলেন। পাচ হাজার অশ্বারোহী রইল জাহাঙ্গীর কুলীকে সাহায্য করবার জন্য।

চৌসার যুদ্ধ

জুলাই মাসের অবিশ্রান্ত বারিধারার মধ্যে হুমায়ুন গঙ্গার দক্ষিণ তীর দিয়ে দিল্লীর দিকে চলতে লাগলেন। জিন্নতাবাদ থেকে পাটনার ওপারে মুনের পর্যন্ত দীর্ঘ পথে কোথাও কোন বাধা এল না। আরও কিছু দূর অগ্রসর হয়ে বকসারের চার মাইল পশ্চিমে কর্মনাশা নদীর তীরে চৌসা গ্রামে পৌছে হুমায়ুন দেখেন, শের খাঁর সৈন্যরা তাঁকে আক্রমণ করবার জন্য পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে আসছে। তিনি থমকে দাঁড়ালেন—শের খাঁও দুই মাইল দূরে তাঁবু ফেললেন। যেখানে যত আফগান ছিল তারা যে শেরের হয়ে লড়বে সেকথা বুঝে নিয়ে হুমায়ুন আরও সৈন্য পাঠাবার জন্য আগ্রায় চিঠে লিখলেন। শেরও উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় বসে রইলেন।

উভয় পক্ষের সৈন্যরা খায়দায়, যুদ্ধের মহড়া দেয়, কিন্তু যুদ্ধ হয় না। এক দিন হুমায়ুন তাঁবুতে বসে আমীর ওমরাহদের সঙ্গে কি আলোচনা করছেন এমন সময়ে এক বার্তাবহ একখানি পত্র নিয়ে সেখানে এল। সেই পত্রে শের খাঁ লিখেছেন, তিনি মহামান্য সম্রাটের বশম্বদ ভৃত্য ফরিদ ছাড়া কিছুই নন, হিন্দুস্থানের বাদশাহর সঙ্গে লড়াই করবার স্পর্দ্ধা তিনি রাখেন না। তাঁর মত নগণ্য ব্যক্তির সেরূপ সাহস বা সম্বল নেই। শুধু বাদশাহর অধীনে গৌড় রাজ্যের তুচ্ছ শাসনকর্তা হয়ে আজীবন তাঁর খিদমত করতে পারলে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবেন। চতুর আফগানের কথায় ভুলে হুমায়ুন পত্রবাহককে বললেন যে এই সর্তে তিনি শের খাঁর প্রস্তাবে রাজী হোতে পারেন যে শের খাঁ মোগলের সঙ্গে যুদ্ধের মহড়া চালিয়ে স্বেচ্ছায় পরাজয় বরণ করে সমস্ত সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিয়ে যাবেন আর বাদশাহী ফৌজ কিছুদূর পর্য্যন্ত তাদের তাড়া করবে। এই একটি মাত্র সর্ত পালিত হোলে তিনি শের খাঁর আর্জি মঞ্জুর করে আগ্রায় ফিরে যাবেন।

এ আর এমন কি কথা! হিন্দুস্থানের বাদশাহর ইজ্জত রাখবার জন্য শের জানও দিতে রাজি আছেন। হুমায়ুনের সর্তের ভিত্তিতে উভয়পক্ষে সন্ধি সম্পাদিত হোল, শের খাঁ কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করলেন যে আজীবন তিনি বাদশাহর অনুগত দাস হয়ে থাকবেন। উভয় শিবিরের সৈন্যরা যখন শুনল যে আর যুদ্ধ করতে হবে না তখন সবার মুখে হাসি ফুটল, সারা দিন ধরে মোগল পাঠানের কোলাকুলি চলল। দিনান্তে সন্ধ্যার সময়ে সিপাহীরা পরস্পরের তাঁবুতে গিয়ে পানভোজন পর্য্যন্ত করল।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব থেকে মহারথ নামক এক যোদ্ধার নেতৃত্বে চেরো সম্প্রদায় বকসারের আশপাশে ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ চালাচ্ছিল। বহু চেষ্টা করেও সুলতান জালাল লোহানির সৈন্যরা তাদের দমন করতে পারে নি। জালালের নিষ্ক্রমণের পর শের শাহ্‌র সৈন্যদের সঙ্গেও তাদের কয়েকবার খণ্ড যুদ্ধ হয়, কিন্তু তারা অজেয় থেকে যায়। যেদিন হুমায়ুনের সঙ্গে শেরের সন্ধি সম্পাদিত হোল সেদিন উভয় শিবিরে গুজব ওঠে যে মহারথ আজ রাত্রেই আফগানদের আক্রমণ করবে। সেই যোদ্ধার সম্মুখীন হবার জন্য শের শাহ তাঁর উৎকৃষ্টতম অশ্বারোহী নিয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এইভাবে এক দিন

গেল, ছুদিন গেল, কিন্তু কোথায় মহারথ? কোথায় তাঁর চেরো যোদ্ধার দল? তৃতীয় দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর শের খাঁ আবার বেরোলেন চেরোদের দমন করতে। মাইল পাঁচেক দূরে গিয়ে তিনি অনুগত অফিসারদের একান্তে ডেকে বললেন: বন্ধুগণ! আমাদের সামনে যে বিপদ দাঁড়িয়ে রয়েছে তার তুলনায় মহারথ কিছুই নয়। বাবর বেইমানি করে আফগানদের লোদী সাম্রাজ্য গ্রাস করেছিলেন, হুমায়ুন এখন সেই ভিত্তির উপর এক নূতন সাম্রাজ্য গড়ে তুলছেন। আমরা এখনই যদি তাঁকে শেষ করতে না পারি তাহোলে আফগান জাতি হিন্দুস্থান থেকে চিরদিনের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এখন আর লোদী নয়, লোহানি নয়, শূর নয়, কোন উপজাতি নয়—আমরা সকলে আফগান। আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হই হুমায়ুনকে হিন্দুস্থান ত্যাগ করতে হবে। আমাদের পথ ন্যায়ের পথ; তাই আল্লাহ আমাদের মদদ দেবেন। ব্রহ্মজিৎ গৌড়ের মত বীর হিন্দুও আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আজ রাত্রেই আমরা হুমায়ুনের সঙ্গে শেষ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবো। তোমরা প্রস্তুত?

শের খাঁর কথা শুনে সকল সৈন্যাধ্যক্ষ আনন্দে নৃত্য করে উঠলেন। তখনই সৈন্যদের তিন ভাগে ভাগ করে এক ভাগ পুত্র জালাল, দ্বিতীয় ভাগ খাওয়াস খাঁ ও তৃতীয় ভাগ নিজের অধীনে রেখে শের খাঁ রাত্রির অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে মোগল শিবিরের দিকে অগ্রসর হোতে লাগলেন। মোগল সৈন্যরা তখন কেউ বা ঘুমে অচেতন, কেউ বা শয্যাত্যাগের আয়োজন করছে। তাদের নায়ক ভোরের নমাজের জন্য তৈরী হচ্ছেন—উজু করছেন। ঠিক সেই সময়ে শের খাঁর অশ্বারোহীরা মোগল শিবিরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। চারিদিকে শুধু মার মার কাট কাট আওয়াজ। সেই আওয়াজে সচকিত হয়ে হুমায়ুন চেঁচিয়ে বললেন: যুদ্ধ চালাও, উজু শেষ করে আমি এখনই আসছি।

কিন্তু তার সময় হোল না। আফগানরা তিন দিক থেকে মোগলদের উপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যে তারা যাতাকলে পেশাই হবার উপক্রম হোল; যতই সামনে এগোয় নিষ্ক্রমণের পথ ততই বন্ধ হয়ে যায়। নদীর পথেও যুদ্ধ চলছিল। গঙ্গার উপর নৌকা দিয়ে তৈরী যে পুলটি ছিল শের খাঁর ফৌজ সেটি ধ্বংস করে মোগল শিবিরের উপর কামান দাগছিল। দেখতে দেখতে

জালাল ও খাওয়াস খাঁর অশ্বারোহীরা হুমায়ুনের তাঁবুর কাছে এলে তাঁকে বাঁচাবার জন্য তিন শ' মোগল সৈন্য সেখানে এসে হাজির হোল। ঠিক সেই সময়ে আফগানদের একটি হাতী বাদশাহর তাঁবুর ভিতর প্রবেশ করায় সবাই ধরে নিল যে তাঁর জীবনদীপ এবার নির্বাপিত হোতে চলেছে। কিন্তু চেঙ্গিজ-বাবরের বংশধর হুমায়ুন, এত সহজে তাঁকে হতোদ্যোম করা যায় না। একজন সৈনিকের হাত থেকে বর্শা কেড়ে নিয়ে তিনি সেই হাতীটিকে এমন প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলেন যে সে আর্তনাদ করতে করতে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

তখনকার মত বাঁচলেও হুমায়ুন যে শেষ পর্য্যন্ত আফগান অশ্বারোহীদের স্রোতের নিচে তলিয়ে যাবেন সে বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ ছিল না। আফগান সৈন্যদের রণহুঙ্কারে সমস্ত মোগল তাঁবু মুহুর্মুহুঃ কাঁপতে লাগল, তাদের তরবারির আঘাতে হাজার হাজার মোগল সৈন্য ধরাশায়ী হোল। চারিদিকে আহত সৈনিকের আর্তনাদ, তারই মাঝে হুমায়ুন চীৎকার করে সৈন্যদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু সেই কোলাহলের মধ্যে তাঁর গলার স্বর কোথায় তলিয়ে গেল। এখন তাঁকে বাঁচানই মোগল অফিসারদের একমাত্র ভাবনা। একজন সৈনিক এসে প্রায় জোর করে তাঁকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিলে তিনি অদূরে নদীতীরে এসে উপস্থিত হোলেন। যে অসংখ্য মোগল সৈন্য সেখানে আগে এসেছিল নদী পার হোতে গিয়ে তারা হাজারে হাজারে জলের নিচে তলিয়ে গেল। কিন্তু তাদের নায়ক অক্ষত থেকে গেলেন। কোথা থেকে ভিস্তি নিজাম এসে তার মশক তাঁর সামনে রেখে দিলে তিনি তাই ধরে নদীর ওপারে চলে গিয়ে প্রাণ বাঁচালেন। তাঁর প্রধানা মহিষী মরিয়ম মাকানি ও চার হাজার অন্তঃপুরিকা শের খাঁর হাতে বন্দী হোলেন।

গৌড় পুনর্জয়

হুমায়ুন পালালে শের খাঁ বুঝলেন যে তাঁকে আবার মোগলের সঙ্গে হিসাব মেটাতে হবে। তার প্রস্তুতি হিসাবে সবার আগে চাই পশ্চাদ্ভাগ থেকে মোগল উৎপাটন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে এলেন গৌড়ে। যে জাহাঙ্গীর কুলী খাঁকে হুমায়ুন মাসাধিক পূর্বে এখানকার

ক্ষত্রপ নিযুক্ত করে গিয়েছিলেন তিনি নগরীর প্রবেশদ্বারে প্রাণপাত করে লড়লেন, কিন্তু আফগানদের সংখ্যাধিক্যের জন্য শেষ পর্য্যন্ত সন্ধি প্রার্থনা করেন। শের তাতে সম্মতি দিয়েও তাঁকে নিজ শিবিরে আহ্বান করে তাঁর জীবনাবসান ঘটান। সেই সঙ্গে গৌড়-বঙ্গের সর্বত্র শেরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রামে তাঁর প্রতিনিধি নওয়াজেশ খাঁ বেশ কিছুটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিলেন, কিন্তু বিরোধীদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেওয়ায় শেষ পর্য্যন্ত ওই বন্দর তাঁর হস্তগত হয়। কিন্তু সেখানকার এই জয় একেবারেই সাময়িক। কারণ পর্তুগীজ এ্যাডমিরাল ন্যানো ফার্ণান্দেজ ফায়ার নওয়াজেশ খাঁকে বন্দী করে বন্দরটির উপর নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু শেরের তারকা তখন উর্দ্ধমুখী, তাই কিছুদিন পরে পেগুতে গণ্ডগোল দেখা দেওয়ায় পর্তুগীজরা সেখানে চলে যায় এবং নওয়াজেশ খাঁ মুক্তি পেয়ে চট্টগ্রামের উপর নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

বিলগ্রামের যুদ্ধ

শের শাহ্ শূর এখন সমগ্র বিহার, গৌড় ও বঙ্গের একচ্ছত্র অধীশ্বর। কিন্তু হুমায়ুন যে আবার ফিরে আসবেন সে বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ না থাকায় তিনি একদিকে যেমন এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করলেন তেমনি অন্যদিকে মোগলের সঙ্গে শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি চালাতে লাগলেন। পাছে চেরোরাজ মহারথ তাঁকে পিছন থেকে আক্রমণ করেন সেই ভয়ে অসংখ্য সৈনিকের জীবন বলি দিয়ে তাঁকে দমন করে তিনি চললেন পশ্চিম দিকে। তাঁর অগ্রগতি প্রতিরোধের জন্য হুমায়ুনও আসতে লাগলেন দিল্লী থেকে পূব দিকে। কনৌজের কাছাকাছি পৌঁছে গঙ্গার দুই তীরে দুই বাহিনী তাঁবু ফেলে পরস্পরের আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। আফগানদের চেয়ে মোগলরা ছিল সংখ্যায় অনেক বেশী ; আট-বলদে টানা সাত শ' কামানও তাদের ছিল। কিন্তু তাদের অধিনায়কের দৈহিক ও মানসিক জড়তা কাল হয়ে দেখা দিল। তিনি আফিম খান, স্ফূর্তি করেন, যে ভৃত্যদলকে সঙ্গে এনেছিলেন তাদের খিদমদ নেন। সৈন্যরা যুদ্ধের জন্য অধৈর্য্য হয়ে উঠলেও তাঁর দিক থেকে কোন উদ্যমের লক্ষণ

দেখা যায় না। তাই দেখে সুলতান মীর্জা প্রমুখ প্রবীণ যোদ্ধারা একে একে সসৈন্যে সরে পড়লেন, যারা সেখানে রইলেন তাঁরা বলাবলি করতে লাগলেন যে এভাবে মাঠের মধ্যে বসে পোকা গোনবার চেয়ে ঘরে ফিরে গিয়ে তাস দাবা খেলা ভাল!

হুমায়ুন যখন দেখলেন যে দলত্যাগের এই হিড়িক চলতে থাকলে শেষ পর্য্যন্ত তাঁকে বেগম ও নফরদের নিয়ে সেখানে একা পড়ে থাকতে হবে তখন এক দিন নদী পার হবার জন্য আদেশ দিলেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে প্রথম দুই দিনে সকল সৈন্য নদীর অপর তীরে গিয়ে জমায়েৎ হবে, পরে কামান ও অন্যান্য রণসম্ভার তাদের পিছনে যাবে। মহরমের দিন শোকের দিন—আফগানরা নিশ্চয়ই এদিনে যুদ্ধ করবে না ভেবে সেই দিন নদী পার শুরু হোল। বাদশাহর এই অনুমানের ভিত্তিতে সেদিন ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের ১৭ই মে মোগলরা যখন পরিকল্পনানুযায়ী কাজ করছিল শের শাহ দূর থেকে তাদের গতিবিধির উপর নজর রাখছিলেন। যেই তিনি দেখলেন যে বাদশাহসহ অধিকাংশ সৈন্য স্বচ্ছন্দে নদী পার হয়ে এপারে চলে এসেছে অমনি হুকুম দিলেন: লড়াই সুরু করো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আফগান বাহিনী মোগলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শেরের এক পুত্র জামাল খাঁ গিয়েছিলেন মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ মীর্জা হিন্দালের ব্রিগেডের সামনে; তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাচ্ছেন দেখে শের নিজে তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। কিন্তু যুদ্ধ কোথায়? আফগানরা আক্রমণ করছে আর মোগলরা দিশেহারা হয়ে পালাচ্ছে। খাওয়াস খাঁ, পরমজিৎ গৌড় প্রভৃতি বিচক্ষণ জেনারেলদের নির্দেশে সুশৃঙ্খল শেরশাহী ফৌজ কয়েক মিনিটের মধ্যে অক্লেশে মোগল ব্যূহের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করে একেবারে পশ্চাদ্ভাগে গিয়ে উপস্থিত হোল। সেখানে যে হাজার হাজার গোলাম ও তাঁবুদার ছিল আফগান যোদ্ধাদের দেখে তারা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল। কামান বন্দুক সব পড়ে রইল, যে যেখানে পারল পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচাল।

এই বিলগ্রামের যুদ্ধ! এই যুদ্ধে কোন পক্ষ একটা গুলি ছুঁড়ল না, একজনও সৈনিক আহত হোল না, অথচ বিরাট মোগলবাহিনী ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। যুদ্ধশেষে দেখা গেল যে বিনা যুদ্ধে সেই যুদ্ধ যখন শেষ হোল তখন ভারতের

রাজদণ্ড আর একবার মোগলদের হাত থেকে পাঠানের হাতে চলে গেছে। চৌসায় রাত্রিশেষে যখন অধিকাংশ মোগল সৈনিক ঘুমে অচেতন ছিল সেই সময়ে শের খাঁ অতর্কিত আক্রমণ স্বরু করেছিলেন। কিন্তু বিলগ্রামে উজ্জ্বল দিবালোকে হুমায়ুনের বিশাল বাহিনী বিনা যুদ্ধে তাঁর কাছে পরাজিত হয়। পাশ দিয়ে বহে যাচ্ছিল স্রোতস্বিনী গঙ্গা। তিন দিক থেকে ঘেরাও করা মোগল সৈনিকদের সামনে নিষ্ক্রমণের সেই একটি মাত্র পথ খোলা ছিল। সেই পথ দিয়ে পালাবার আশায় তারা হাজারে হাজারে নদীতে ঝাঁপ দিল, কিন্তু মা গঙ্গা তাদের অধিকাংশকে গ্রাস করে নিলেন। তাদের বাদশাহ্ এক হাতীর পিঠে চড়ে কোনক্রমে নদী পার হন। ওপারের কয়েকজন লোক দয়া পরবশ হয়ে তাঁর দিকে পাগড়ীর কাপড় ছুঁড়ে দিলে তিনি তাই ধরে ওপরে ওঠেন। একটি ঘোড়াও মিলল, তার পিঠে চড়ে যখন তিনি আগ্রায় গিয়ে উপস্থিত হোলেন তখন তাঁর মস্তক অনাবৃত, পদযুগল নগ্ন।

হুমায়ুনের ভারত ত্যাগ

আগ্রায় ফিরে গিয়ে হুমায়ুন দেখেন তাঁর আর কিছু নেই—বিলগ্রাম প্রান্তরে সব শেষ হয়ে গেছে। আজ হোক বা কাল হোক শের খাঁ যখন সেখানে এসে পৌছাবেন তখন কি নিয়ে তাঁর সম্মুখীন হবেন? এখানে অবস্থান করলে অসহায়ভাবে হয় বন্দীত্ব, নতুবা মৃত্যু বরণ করতে হবে। ভয়ব্যাকুল হুমায়ুন গর্ভবতী মহিষী হামিদাবানু ও মুষ্টিমেয় অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথায় যাবেন? পথঘাট, মাঠনগর, গ্রামপ্রান্তর সবই তাঁর, সব কিছুরই তিনি একচ্ছত্র অধীশ্বর, কিন্তু সে আর কয়দিন? শত্রু এগিয়ে আসছে। মাঠে হোক ঘাটে হোক যেখানে তাঁকে পাবে ধরে কোতল করবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না। সারা হিন্দুস্থানে কোথাও তাঁর আশ্রয় মিলবে না। গর্ভবতী পত্নীকে সঙ্গে নিয়ে হুমায়ুন অতি সাবধানে, অতি সঙ্গোপনে পথ চলতে লাগলেন। যখন অমরকোট রাজ্যে উপস্থিত হোলেন, তখন হামিদাবানুর প্রসব বেদনা উঠল। অমরকোট রাজের কাছে সে খবর পৌছালে তিনি পরম সমাদরে সবাইকে নিজ প্রাসাদে এনে পরিচর্য্যার ব্যবস্থা করলেন। কয়েকদিন পরে সেখানে যে শিশুটির জন্ম হয় সে মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা

আকবর। শিশুর ভাগ্যরেখা গণনা করে জ্যোতিষী ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে একদিন তার যশোতরঙ্গে সারা পৃথিবী প্লাবিত হবে।

গৌড়ে বিদ্রোহ

হুমায়ুনবিজয়ী শের শাহ দিল্লীর তখতে আরোহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে আফগানরা আবার নতুন জীবন লাভ করল। মোগলরা প্রমাদ গণল। যেখানে যত মোগল ছিল ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ভারত ছেড়ে পালিয়ে গেল; নতুবা বিভিন্ন নগরে বা প্রান্তরে আত্মগোপন করে রইল। ভারতব্যাপী এই আলোড়নের মধ্যে শের শাহ তাঁর সুযোগ্য পুত্র জালাল এবং দুজন নিপুণ সৈন্যাধ্যক্ষ নওয়াজেশ খাঁ ও পরমজিৎ গৌড়ের সাহায্যে সকল অঞ্চলে নিজ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে লাগলেন। কোথাও বা নিজে, আবার কোথাও বা সৈন্যাধ্যক্ষদের পাঠিয়ে ছোট ছোট প্রতিবেশী রাজ্যও জয় করলেন। যেখানে বাধা এল সেখানে শাঠ্যের আশ্রয় নিলেন।

এক দিন খবর এল যে গৌড়ের ক্ষত্রপ খিজির খাঁর মতিগতি ভাল নয়। আফগান হোলেও তিনি বিবাহ করেছিলেন শেষ হোসেনশাহী সুলতান মামুদ শাহর কন্যাকে। এখন মামুদ শাহ নেই, তাঁর দুই পুত্রও পরলোকে। সেই কারণে তিনি নিজেকে শ্বশুররাজ্যের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। তাঁর মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে উত্তরাধিকারসূত্রে গৌড় তাঁর বলেই শের শাহ তাঁকে এখানকার তখতে বসিয়েছেন। প্রভুর কথা মন থেকে মুছে ফেলে তিনি স্বাধীন সুলতানের মত আচরণ করতে লাগলেন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌছালে শের দ্রুতগতিতে গৌড়ে এসে খিজির খাঁর হাতে বেড়ী পরিয়ে প্রকাশ্য রাজপথের উপর দিয়ে দিল্লীতে চালান দেন। তারপর আর খিজিরের কোন খবর পাওয়া যায় নি—বোধ হয় হত্যা করা হয়েছিল।

এই অভিজ্ঞতা থেকে শের শাহ বুঝলেন যে একজনের উপর কোন বিস্তৃত অঞ্চলের দায়িত্ব অর্পণ করলে তাঁর হাতে এত বেশী সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয় যে তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। তাই সমগ্র গৌড়-বঙ্গকে কতকগুলি ছোট ছোট সরকারে ভাগ করে সম সংখ্যক শাসকের হাতে পরিচালনার দায়িত্ব

অর্পণ করেন। কাজী-কাজীলাৎ নামক উচ্চস্তরের এক কর্মচারী তাঁদের উপর সর্বাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

তারপর শের শাহ্ মাত্র পাঁচ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে অনেকগুলি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়, বিজিত সাম্রাজ্যের সংহতি বিধানের জন্যও বহু সময় লাগে। এত কাজের পর আর বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে ইতিহাসকে বিকৃত করে তাঁর সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। তিনি নাকি ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তন করেন। সে ডাকের পোষ্ট অফিস কোথায় থাকত বা কি ধরণের ষ্ট্যাম্প চিঠিগুলির উপর লাগান হোত সেকথা কেউ বলতে পারেন নি। শক্তিমানদের সম্বন্ধে এরূপ বহু গুজব রটে, কিন্তু সেগুলির ভিত্তি প্রায়ই শিথিল।

মৃত্যু—গৃহযুদ্ধ

বারুদের বিস্ফোরণে শের শাহের মৃত্যু হোলে তাঁর পুত্র ইসলাম শাহ শূর দিল্লীর মসনদে আরোহণ করে এক অনুগত ব্যক্তি মহম্মদ খাঁকে সমগ্র গৌড়ের শাসনকর্তা করে পাঠান। কাজী-কাজীলাতের পদটি উঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছু দিন পরে ইসলাম খাঁ লোকান্তর গমন করলে তাঁর শিশুপুত্র ফিরোজকে হত্যা করে মাতুল মোবারিজ খাঁ মহম্মদ আদিল শাহ্ নাম নিয়ে দিল্লীর মসনদ আত্মসাৎ করেন। নরহত্যায় হাত সাফাই দেখিয়ে মসনদ অধিকার করলেও সে মসনদের নিরাপত্তা বিধানের শক্তি আদিলের ছিল না। এক দিন আফগান সর্দাররা তাঁর উপস্থিতিতেই দরবারের মধ্যে পরস্পরকে নিধন করতে লাগলেন। যে কয়েকজন বেঁচে রইলেন তাঁরা নিজ নিজ জায়গীরে ফিরে গিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন।

গৌড়ের মহম্মদ খাঁও এই বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সামসুদ্দীন মহম্মদ শাহ্ গাজী নাম নিয়ে নিজেকে স্বাধীন সুলতানরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করবার সাধ্য আদিল শাহের ছিল না, কিন্তু সামসুদ্দীন গাজী যখন পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে অবলীলাক্রমে জৌনপুর অধিকারের পর দিল্লীর দিকে ধাবিত হোলেন তখন তিনি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারেন

নি। তাঁর হিন্দু সেনাপতি হিমু এসে কালপির ত্রিশ মাইল পূব দিকে ছাপরাঘাট নামক স্থানে মহম্মদ শাহ গাজীকে পরাজিত ও নিহত করেন (১৫৫৫)।

এই যুদ্ধজয়ের পর হিমুর পরামর্শে আদিল শাহ গৌড়-বঙ্গের দায়িত্ব অর্পণ করেন শাহবাদ খাঁর উপর। কিন্তু তাঁকে পাশ কাটিয়ে মৃত সামসুদ্দীন গাজীর পুত্র গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ এলাহাবাদের কাছে জুসি নামক স্থানে নিজেকে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন (১৫৫৬)। বিহার, গৌড ও বঙ্গের সর্বত্র তাঁর নামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচাব সুরু হয়।

হুমায়ুনের প্রত্যাবর্তন

আফগানদের এই গৃহবিবাদের সংবাদ ইরাণে হুমায়ুনের কাছে নিয়মিতভাবে পৌঁচাচ্ছিল। সেখানে তেরো বৎসর নির্বাসনের সময় যে সব দুঃখ দুর্বিপাক তাঁর উপর দিয়ে বহে যায় তাতে তাঁর প্রকৃতি কঠোর হয় এবং তিনি আয়াস সহ্য করবার শক্তি অর্জন করেন। যখন তিনি বুঝলেন যে সারা হিন্দুস্থানে আফগানরা পরস্পরকে নিঃশেষ করছে তখন ছোট একটি সৈন্যদল সংগ্রহ করে দিল্লীর দিকে চলে আসেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা সেকেন্দার শূরকে অতি সহজে পরাজিত করে তিনি ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ওই সুবা অধিকার করে নেন। কিন্তু তিনি যেন একটি বিরাট মহীরুহের বীজ বপন করবার জন্য বেঁচেছিলেন—তার অঙ্কুরোদ্গম দেখে যেতে পারলেন না। সেই বীজে জল সিঞ্চন করতে লাগলেন তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর বৈরাম খাঁ। শিশু আকবরের প্রতিভূ হয়ে তিনি গর্ভস্থ ভ্রূণটিকে লালনপালন করতে লাগলেন।

দুই প্রতিভূর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সুরু হোল। মোগলপক্ষে আকবরের যেমন বৈরাম খাঁ আফগান পক্ষে তেমনি আদিল শাহর ছিলেন হিমু বা বিক্রমজিৎ। মোগলদের পুনরাগমনের খবর পেয়ে আফগান সর্দাররা নিজেদের বিভেদ ভুলে গিয়ে দিল্লীতে এসে সেই হিন্দু বীরের অধীনে সংঘবদ্ধ হোলেন। বৈরাম খাঁও সমস্ত মোগল সৈন্য নিয়ে লাহোর থেকে দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। পানিপথ প্রান্তরে উভয় বাহিনীর মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তাতে শত্রুনিক্ষিপ্ত একটি গুলি লেগে হিমু নিহত হওয়ায় আফগানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। সুলতান আদিল শাহ দিল্লী ছেড়ে চলে আসেন গৌড়ের পথে।

শিয়রে শমন প্রস্তুত রয়েছে দেখেও গৌড়ের নূতন সুলতান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর তাঁর পিতৃশত্রুকে মার্জনা করতে পারলেন না। আশ্রয়প্রার্থী স্বগোত্রীয়কে সাহায্য দানের পরিবর্তে তাঁর নিপাতের জন্য তিনি সসৈন্যে পশ্চিমদিকে এগিয়ে গেলে সুরজগড়ের কাছাকাছি ফতেপুর গ্রামে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হয়। আদিল শাহর তখন জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ—পিছনে মোগল সামনে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর। ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি পরাজিত ও নিহত হোলে দিল্লীতে আফগান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়। আফগানরাই আফগানদের নিধন করে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে।

মুল্‌ক-উৎ-তায়াফিক

এর পর গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন। আদিল শাহকে যখন তিনি খতম করেছেন তখন আকবরের মত এক দুগ্ধপোষ্য শিশুর হাত থেকে দিল্লী কেড়ে নেওয়া কিছু শক্ত হবে না। সেই আশায় তিনি ফতেপুর থেকে সৈন্যবাহিনীসহ জৌনপুরের দিকে এগোতে লাগলেন। দিল্লী তাঁর চাই—দিল্লী জয়ের স্বপ্নে তিনি বিভোর হয়ে উঠলেন। কিন্তু মোগল সেনাপতি খান-ই-জামান এসে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালে তিনি বুঝলেন, মোগল কি! যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মুঙ্গেরে চলে আসেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মোগলদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় উপনীত হন। চুক্তিনামা অবশ্য সম্পাদিত হয় নি, কিন্তু শোন নদী দুই রাজ্যের সীমান্ত বলে স্বীকৃত হয়। গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর আরও যে তিন বৎসর জীবিত ছিলেন সেই সময়ে তিনি গৌড়ে বসে ত্রিপুরা সীমান্ত থেকে জৌনপুর এবং দিল্লীতে বসে আকবর তার পশ্চিমে কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত ভূভাগের উপর শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। কিন্তু কারও মনে স্বস্তি ছিল না। উভয় শক্তির সম্ভাব্য দ্বন্দ্ব থেকে লাভবান হবার আশায় সর্বত্র মালিক ও জায়গীরদাররা স্বাধীন নরপতির মত আচরণ করতে থাকেন। তাঁদের দমন করতে উভয়ের অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হয়। সারা হিন্দুস্থান হয়ে দাঁড়ায় মুল্‌ক-উৎ-তায়াফিক।

অপুত্রক অবস্থায় ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে গিয়াসুদ্দীন বাহাদুরের মৃত্যু হোলে তাঁর

ভ্রাতা জালাল দ্বিতীয় গিয়াসুদ্দীন নাম নিয়ে তখতে আরোহণ করেন। কোন অজ্ঞাত কারণে তিন বৎসর পরে তিনিও ইহলোক ত্যাগ করলে তাঁর বালকপুত্র মসনদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু সে কেবল সাত মাসের জন্য। অজ্ঞাতনামা এক ব্যক্তি সেই বালককে হত্যা করে মসনদ আত্মসাৎ করেন। তিনি তৃতীয় গিয়াসুদ্দীন নামে পরিচিত—প্রকৃত নাম জানা যায় না।

হত্যাপর্ব এখানে শেষ হয় নি। এক বৎসর পরে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে এই নতুন গিয়াসুদ্দীনকে শমনসদনে পাঠিয়ে আফগান ভাগ্যান্বেষী তাজ খাঁ কররানি এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

1 Firishta *Gulshan-i-Ibrohimia, p. 58*
2 Ahmed Yadgar *Tarikh-i-Salatin-i-Afghana, p, 181-83, 196*
3 Campos J. J. A. *History of Portuguese in Bengal, p. 40*
4 Abul Fazl Allami *Akbarnama i, p. 159*
5 *Tarik-i-Rashidi, Eng. tr, p. 474-75*
6 Niamatulla *Makhzan-i-Afghana, Elliot's trans, p. 110-13*

একবিংশতি অধ্যায়

দুই দুয়ারে দুই আগন্তুক

এক

মোঙ্গল থেকে মোগল

পূর্বের এক অধ্যায়ে বলেছি যে চেঙ্গিজ খাঁর সময়ে মোঙ্গলগণ ছিল বৌদ্ধ—ওই ধর্মের শামান শাখার অন্তর্ভুক্ত। আজও তারা তাই। আজও মোঙ্গলিয়ার সকল অধিবাসী বুদ্ধের পথে আস্থাশীল। তিব্বত ও লাদাকে প্রচলিত বৌদ্ধমতের সঙ্গে মোঙ্গলিয়ার এই বৌদ্ধমতের সাদৃশ্য যথেষ্ট। তিব্বতের রাজধানী লাসায় ও লাদাকের রাজধানী লেহ্‌তে যেমন বহু বৌদ্ধবিহার দেখা যায় মোঙ্গলিয়ার রাজধানী উলান-বাটোরেও তাই। সেখানকার চারটি মহাবিহারে কয়েক শত শ্রমণ নিয়মিতভাবে সূত্রপাঠ করে। গানদান মহাবিহারের অধ্যক্ষের মর্যাদা সারা দেশের মধ্যে উচ্চতম ; প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী অহরহ তাঁর কাছে পরামর্শ নেন। চেঙ্গিজের সময় থেকে সাত শ' বৎসর সময় অতীত হয়েছে, কিন্তু মোঙ্গলদের ধর্মমত একটুও বদলায় নি।

জীবনযাত্রাও তাই। সে সময়ে তারা তাঁবুতে বাস করত—আজও অনেকে গ্রামাঞ্চলে তাই করে। সে সময়ে ঘোড়া ছিল তাদের সঙ্গের সাথী—আজও তাই। আজও বৌদ্ধবিহারগুলিকে কেন্দ্র করে তাদের সমাজজীবন আবর্তিত হয়। তখন তাদের কোন সাহিত্য ছিল না—এখন যে সাহিত্য গড়ে উঠেছে বুদ্ধের জীবনী ও বাণী তার প্রধান উৎস। মোঙ্গলদের সমাজ, শিল্পকলা, কৃষ্টিজীবন সবই বৌদ্ধমতের দ্বারা প্রভাবিত।

মোঙ্গলদের এক শাখা কালমুকগণ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে। ওই কম্যুনিষ্ট শাসিত রাষ্ট্রে তারা একমাত্র বৌদ্ধ সম্প্রদায়। অন্য সব মোঙ্গলের মত

তাদের চেঙ্গিজ খাঁ সম্বন্ধে গর্বের অন্ত নেই—আবার বৌদ্ধমতের উপর নিষ্ঠা অচল। তাদের পূর্বসূরীরা বিশাল ভূভাগ শাসন করলেও কখনও অবৌদ্ধদের ধর্মমতে আঘাত করে নি, কিন্তু তাদের সূর্য্য অস্তমিত হবার পর থেকে অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি নানাভাবে তাদের ধর্মবিশ্বাসের উপর আঘাত করেছে। এই নিয়ে সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে কালমুকদের যথেষ্ট অভিযোগ থাকলেও তারা সব কিছু নীরবে সহ্য করে।

আশ্চর্য্যের কথা এই যে এরূপ এক নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দুইটি অংশ চেঙ্গিজের মহাপ্রয়াণের অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করে। অথচ তখন তারা শাসিত নয়—শাসক। জ্ঞাত পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ তখনও তাদের করতলগত। সামগ্রিক মোঙ্গল জাতির তুলনায় এই ধর্মান্তরিতগণ সংখ্যায় বেশী না হোলেও ভবিষ্যৎ ইতিহাসের উপর তারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাদের এক অংশ তুর্কী-আফগান যুগের পর ভারতে এসে যে দীর্ঘস্থায়ী সাম্রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করে সেটি মোগল সাম্রাজ্য। গৌড়-বঙ্গের উপর এই মোগলদের অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছিল বলে এদের উদ্ভবকাহিনী লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন আছে।

পারস্যের বৌদ্ধ সাম্রাজ্য

১২২৭ খৃষ্টাব্দে চেঙ্গিজ খাঁর পরলোক গমনের পর তাঁর মহাসাম্রাজ্য পাঁচটি স্বতন্ত্র সাম্রাজ্যে বিভক্ত হোলেও মোঙ্গলিয়ার কারাকোরামে বসে কাগান বা মহাসম্রাট সবাইকে পরিচালিত করতেন। মহাসম্রাজ্ঞী ওগুল ঘারমিসের পর চেঙ্গিজের কনিষ্ঠ পুত্র তুলির পুত্র মাঙ্গকু খাঁ ১২৫৭ খৃষ্টাব্দে কাগান নির্বাচিত হয়ে খলিফার রাজধানী বাগদাদ আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ-উস-সিরাজের এই পাপাশয় বিধর্মী মান্‌কুটি সেবার বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গেলেও কিছুদিন পরে তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা হালাকু খাঁ বাগদাদ ধ্বংস করে খলিফা এল-মুস্তাসিনকে হত্যা করেন। ইরাক, ইরাণ, সিরিয়া ও খোরাসান নিয়ে গঠিত হয় তাঁর ইলখান সাম্রাজ্য। হালাকু ছিলেন শামানপন্থী বৌদ্ধ। তাঁর উদ্যোগে ইরাণসহ ইলখান সাম্রাজ্যের সর্বত্র বহু বৌদ্ধবিহার ও সংঘারাম নির্মিত হয়।

মাঙ্গকু খাঁর পর তুলির তৃতীর পুত্র কুবলাই খাঁ কাগান নির্বাচিত হয়ে কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়াসহ সমগ্র মহাচীন নিজের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীনে আনেন। তাঁর

ইউয়ান সাম্রাজ্যের প্রভাব সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার কতকাংশে বিস্তৃত হয়। একাধিক ঐতিহাসিক মনে করেন যে তাঁর ন্যায় সুবিবেচক ও ন্যায়বান সম্রাট পৃথিবীতে বড় বেশী জন্মায় নি। অগ্রজ হালাকুর মত তাঁরও ছিল বৌদ্ধধর্মে অগাধ নিষ্ঠা, তিব্বত থেকে শাক্যপণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র তরুণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ফাগস্পাকে নিজ রাজধানীতে আহ্বান করে তিনি স্বর্ণসনদ, মণি-মুক্তার অলঙ্কার, স্বর্ণদণ্ড, স্বর্ণসূত্র প্রভৃতি দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। পরে ফাগস্পার কাছে দীক্ষা নিয়ে মহাবৌদ্ধ কুবলাই খাঁ গুরুদক্ষিণা প্রদান করেন সমগ্র তিব্বত। ওই দেশ মোঙ্গল সম্রাটদের গুরুরাজ্যে পরিণত হয়।

কুবলাইয়ের জ্যেষ্ঠতাত জুসি খাঁর পুত্র বটু খাঁ আধুনিক রুশিয়া ও পোল্যাণ্ড নিয়ে গঠিত বরহু বা পশ্চিম কিপচাক সাম্রাজ্য শাসন করতেন। তিনিও ছিলেন শামানপন্থী বৌদ্ধ। হালাকুর মত তিনিও কুবলাই খাঁকে কাগান বলে মেনে নিলেও পুষ্পের মধ্যে একটি কীট প্রবেশ করেছিল। মধ্য-এশিয়ার কিপচাক সাম্রাজ্য ছিল কয়েকজন যুযুধমান মোঙ্গল খাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। সেখানে বটুর ভ্রাতা বরকা খাঁ ইসলাম গ্রহণ করে ঘরের শত্রু বিভীষণ হয়ে দেখা দেন। যতদূর জানা যায় মোঙ্গলদের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলমান।

বৌদ্ধ-মুসলমান যুদ্ধ

ধর্মান্তর গ্রহণের পর বরকা খাঁ স্বজাতীয় মোঙ্গল অপেক্ষা দূরদেশীয় মুসলমান নরপতিদের আপনজন বলে মনে করতেন। কাগান কুবলাই খাঁর বিরোধীতা করবার সাহস তাঁর হয় নি, কিন্তু হালাকু খাঁর উপর ছিল তাঁর জাতক্রোধ। সম্রাট হালাকু বার বার মুসলমান দেশগুলির বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিলেন শুনে তিনি এই পিতৃব্যপুত্রকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। তা সত্ত্বেও হালাকু যখন বাগদাদ ধ্বংস করে খলিফা এল-মুস্তাসিনসহ লক্ষ লক্ষ মুসলমানের প্রাণ সংহার করেন তখন এই নব-মুসলমান স্থির থাকতে পারেন নি; মিশরের সুলতানকে দলে টেনে নিয়ে ইলখান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন।

মোঙ্গলদের এই গৃহযুদ্ধের প্রথমদিকে হালাকু জয়ী হোলেও ১২৬২ খৃষ্টাব্দে বরকা খাঁর কাছে পরাজয় বরণ করেন। যুদ্ধ অবশ্য সেখানে শেষ হয় নি, ১২৬৫ খৃষ্টাব্দে হালাকুর মৃত্যুর পরও বৌদ্ধ ইলখান ও মুসলমান কিপচাক মোঙ্গলগণ

পরস্পরকে নিধনের চেষ্টা করে। এই দুঃখজনক ঘটনাস্রোতের উল্লেখ করে হসওয়ার্থ বলছেনঃ চেঙ্গিজের মহাসাম্রাজ্যের পতনের কারণ কিছু সংখ্যক মোঙ্গলের ধর্মান্তর গ্রহণ। এর ফলে যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত হয় তাতে কাগানের প্রতি ধর্মান্তরিত খাঁদের আনুগত্য শিথিল হয়ে পড়ে। তাঁর মত একজন পৌত্তলিক বৌদ্ধকে এই নব-মুসলমানগণ মান্য করবে কেন? ইসলাম এমনই এক গর্বিত ধর্মমত যে স্বেচ্ছায় নিজেকে বুদ্ধের রথের চাকায় পরিণত করতে পারে না।

১২৬৬ খৃষ্টাব্দে বরকা খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রগণ শামান মতে ফিরে এলেও জ্যেষ্ঠাগ্রজ বটুর পুত্র উজবেগ খাঁ ইসলাম গ্রহণ করেন। ধর্মমত নিয়ে চেঙ্গিজ বংশে এইভাবে লুকোচুরি খেলা শুরু হয়। উজবেগ খাঁ শুধু নিজে ইসলাম গ্রহণ করেন নি সমস্ত কিপচাক সাম্রাজ্য যাতে এই ধর্মে দীক্ষিত হয় সেজন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। বোধ হয় তাঁরই প্রেরণায় চেঙ্গিজের তৃতীয় পুত্র চাগতাই খাঁর বংশধর তোগলক তৈমুর খাঁ ইসলামে দীক্ষা নিয়ে বৌদ্ধমতের পরিবর্তে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্য্যাদা দেন।

পারস্যের ইলখান সাম্রাজ্য তখনও বৌদ্ধ। কিন্তু ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট গাজন খাঁ ইসলাম গ্রহণ করায় অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। এতদিন জনসাধারণ ছিল মুসলমান, কিন্তু শাসক সম্প্রদায় বৌদ্ধ। এখন থেকে শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণীই মুসলমান হয়ে যাওয়ায় মোঙ্গলিয়ায় মহাসাম্রাজ্যের নাভিকেন্দ্রের সঙ্গে ইলখান সাম্রাজ্যের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। তার পূর্ব বৎসর ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে কুবলাই খাঁর মৃত্যু হওয়ায় মহাসাম্রাজ্যকে একসূত্রে বেঁধে রাখবার মত ব্যক্তিত্বের অভাব হয়—বিভিন্ন সাম্রাজ্য নিজ নিজ পথে চলতে থাকে। রুশিয়া ও পোলাণ্ড তারপরও তিন শ' বৎসর ধরে মোঙ্গলদের অধিকারভুক্ত থাকলেও সেখানকার মোঙ্গল শাসকরা ধীরে ধীরে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। মধ্য-এশিয়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোঙ্গল রাজ্যের উদ্ভব হয়। সেখানে উজবেক খাঁর বংশধরগণ উজবেকিস্তান নামে এক স্বতন্ত্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। চাগতাই খাঁর বংশধরগণ আর মোঙ্গল থাকে না, মোঙ্গল ভাষা ব্যবহার করলেও চাগতাই তুর্কী নামে পরিচিত হয়। দিল্লীর মোগল বাদশহগণ চেঙ্গিজ বংশের এই চাগতাই শাখার অন্তর্ভুক্ত।

মোঙ্গল সমাজে জননীর প্রভাব

কেন এমন হোল? যে চেঙ্গিজ খাঁকে মুসলমানরা ইসলামের সব চেয়ে বড় দুষমন এবং বৌদ্ধরা বোধিসত্ত্ব বজ্রপাণি বলে মনে করত তাঁর বংশধরগণ কেন এভাবে ভিন্ন ধর্মে দীক্ষা নিল? তারা তো যুদ্ধে হারে নি, বরং নানকিং থেকে পোলাণ্ড ও কোরিয়া থেকে দামাস্কাস পর্য্যন্ত এশিয়া ও ইউরোপের অধিকাংশ দেশে নিজেদের বিজয় পতাকা উড়িয়েছিল। কবে কোন দিগ্বিজয়ী জাতি এভাবে পরাজিতের ধর্মমত গ্রহণ করেছে? এই অভিনব ঘটনার মূল অন্বেষণ করতে হোলে মোঙ্গলদের সমাজব্যবস্থা ও বিবাহবিধির পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এখন যেমন মোঙ্গল সমাজে নারীর স্থান অতি উচ্চ সে সময়েও তাই ছিল। চেঙ্গিজের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর তৃতীয় পুত্র ওকতাই খাঁ মহাসাম্রাজ্যের কাগান নির্বাচিত হয়ে সকলকে সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত করেন। বারো বৎসর পরে তিনি পরলোক গমন করলে সে দায়িত্ব পড়ে তাঁর বিধবা পত্নী মহাসম্রাজ্ঞী তোরগিনের উপর। বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত তোরগিন পাঁচ বৎসর ধরে (১২৪১-৪৬) অতি দক্ষতার সঙ্গে মহাসাম্রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁর অধীনস্থ চারজন সম্রাট ও শক্তিশালী বাগাতুর, সেচেন, নোয়ান ও খারাচুগণ* তাঁকে উচ্চতম মর্য্যাদা দিতেন। তিনিও সেই শক্তিমানদের সমদৃষ্টিতে দেখতেন।

তোরগিনের পর দায়িত্ব পড়ে গিউক খাঁর উপর। অল্পকাল মহাসাম্রাজ্য পরিচালনার পর গিউক লোকান্তরিত হোলে তাঁর শিশুপুত্র কাগান নির্বাচিত হন, কিন্তু তাঁর বিধবা মহিষী ওঘুল ঘাইমিস চার বৎসর ধরে (১২৪৮-৫২) সেই শিশুর রিজেন্টের কাজ করেন। মোঙ্গলদের মধ্যে অনুরূপ নারীর কর্তৃত্বলাভের দৃষ্টান্ত আরও আছে।

এই রমণীদ্বয় শামানপন্থী বৌদ্ধ হোলেও অ-বৌদ্ধ ও অ-মোঙ্গল রমণী চেঙ্গিজ বংশে কম প্রবেশ করে নি। ইলখান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হালাকু খাঁ বিবাহ করেছিলেন রোমান সম্রাট মাইকেল পলিওলাসের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে। বোধ হয় এই খৃষ্টান মহিষীর প্ররোচনায় বৌদ্ধ হালাকু খাঁ মুসলমানদের হাত থেকে জেরুজালেম উদ্ধার করে খৃষ্টানদের হাতে তুলে দেবার জন্য সেনাপতি কিট-বুকাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। খৃষ্টান দেশগুলি বার বার ক্রুশেড চালিয়েও

*বাগাতুর=Duke; সেচেন=Lord; নোয়ান=Wise; খারাচু=Commoner

একাজ করতে পারে নি। সম্রাট মাইকেলের কনিষ্ঠা কন্যা মেরিয়াকে বিবাহ করেছিলেন নগুই খাঁ। তগু খাঁর বিবাহ হয়েছিল গ্রীকরাজ দ্বিতীয় অ্যাণ্ডো-নিকাসের কন্যা ইরিনের সঙ্গে। আবার ইরিনের ভগ্নিকে বিবাহ করেছিলেন উজবেক খাঁ। হালাকুর মত তিনিও যে রুশ খৃষ্টানদের রক্ষক হয়ে বসেন তার পিছনে ছিল এই খৃষ্টান মহিষীর প্রেরণা। তাঁর এক কন্যার বিবাহ হয়েছিল মস্কোর খৃষ্টান রাজা জর্জের সঙ্গে; অন্য কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন মিশরের মুসলমান রাজা নাসির। গর্বিত মোঙ্গল দশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা কন্যাপণ গ্রহণ করে তবে শেষোক্ত বিবাহে সম্মতি দিয়েছিলেন।

এইসব ভিন্নধর্মীয় রাজকন্যা বিভিন্ন মোঙ্গল রাজপ্রাসাদে বধূরূপে প্রবেশ করায় সবার অলক্ষ্যে সেখানে নীরব ধর্মবিপ্লব সুরু হয়। মোঙ্গল সম্রাট ও সামন্তরা থাকতেন রাজ্যশাসন ও যুদ্ধবিগ্রহ নিয়ে—তাঁদের পুত্রকন্যারা বেড়ে উঠত ভিন্নধর্মীয় মায়েদের তত্বাবধানে। তার ফলে বয়ঃপ্রাপ্তির পর প্রায়ই তাদের মধ্যে পিতা অপেক্ষা মাতার ধর্মমত প্রবলতর হয়ে দেখা দেয়। ইউয়ান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ মোঙ্গল বাগাতুর বিভিন্ন চীনা রাজপরিবারে বিবাহ করেছিলেন বলে তাঁদের পুত্রকন্যারা স্বদেশে প্রচলিত শামান মত ছেড়ে দিয়ে লাও-সে ও বোধিধর্ম প্রভাবিত চীনা বৌদ্ধমত গ্রহণ করে। অনেকের নাম পর্য্যন্ত বদলে যায়। সম্রাট কুবলাই খাঁ তাঁর কনিষ্ট পুত্রের নাম রাখেন কমল, এক পৌত্রের নাম দেন ধর্মপাল, অপর এক পৌত্রের নাম আনন্দ। চেঙ্গিজ বংশে এইরূপ ভারতীয় বৌদ্ধ নাম আরও আছে।

ঠিক অনুরূপভাবে রুশিয়াবিজয়ী মোঙ্গলরা প্রায় সকলে খৃষ্টানমত গ্রহণ করে—কালমুক ও কসাকগণ অবশ্য আজও বৌদ্ধমতে আস্থাশীল রয়েছে। পারস্যের ইলখান ও মধ্য এশিয়ার কিপচাক সাম্রাজ্যের মোঙ্গলদের মধ্যে শামান-মুসলমান মিশ্রিত নামের প্রচলন হয়। বাবর, হুমায়ুন প্রভৃতি এইরূপ নামের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। আচারব্যবহারেও তাঁরা কোনদিন পুরাপুরি মুসলমান হোতে পারেন নি—পূর্বতন ধর্মমতের প্রভাব বরাবরই থেকে যায়। বিবাহ অনুষ্ঠানও পূর্বরীতিতে ভিন্নদেশীয় ও ভিন্নধর্মীয়দের সঙ্গে চলে। হুমায়ুনের প্রধানা মহিষী হামিদা বানু ছিলেন পারস্যের রাজকন্যা। আকবর বিবাহ করেছিলেন জয়পুররাজের দুহিতাকে। এই মহিষীর গর্ভজাত

পুত্র জাহাঙ্গীরের বিবাহ হয়েছিল অম্বররাজ ভগবানদাসের কন্যা যোধাবাঈয়ের সঙ্গে।

জহিরুদ্দীন বাবর

অনুরূপ এক মিশ্র বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় চেঙ্গিজের পঞ্চদশ বংশধর কুতলুগ নিগারের সঙ্গে তুর্কীবীর তৈমুরলংএর পঞ্চম বংশধরের। এই বিবাহের ফলে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী জন্ম হয় জহিরুদ্দীন বাবরের। পিতৃপরিচয়ে মোঙ্গল হোলেও তাঁর প্রপৌত্র জাহাঙ্গীর নিজ আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তাঁরা ঘরে নিজেদের মধ্যে তুর্কী ভাষায় কথা বলতেন। কিন্তু চেঙ্গিজ খাঁর পরিচয় বড় পরিচয়। সেই পরিচয়ে তাঁরা মোঙ্গল—সংক্ষেপে মোগল।

এগার বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হোলে বাবর ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে তুর্কীস্থানের ক্ষুদ্র রাজ্য ফারগানার মীর্জাপদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু— জ্ঞাতিদের অত্যাচারে দশ বৎসর পরে তিনি সেই রাজ্য হারিয়ে কাবুলে পালিয়ে আসেন। তখন সেখানকার সিংহাসন নিয়ে খুব গোলমাল চলছে দেখে শহর ও শহরতলিতে যে অল্পসংখ্যক মোঙ্গল বাস করছিল তাদের সংগঠিত করে তিনি অতি সহজে ওই নগরী অধিকার করেন। তারপর হিরাট, তারপর কান্দাহার।

ভারত জয়ের সাধ বাবরের ছিল, কিন্তু সাধ্য ছিল না। তাই মাঝে মাঝে প্রত্যন্ত প্রদেশে হামলা চালিয়ে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতেন। কিন্তু একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে এক মহাসুযোগ তাঁর সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়। দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে তাঁর পাঞ্জাবের ক্ষত্রপ দৌলত খাঁ লোদী ও খুল্লতাতপুত্র আলম খাঁর মন কষাকষি চলছিল। নিজ শক্তিতে ইব্রাহিমকে দূরীভূত করা সম্ভব নয় দেখে উভয়ে গোপনে বাবরের কাছে এক আহ্বানলিপি পাঠান। দৌলত খাঁ লোদী আফগান শিবিরে জয়চাঁদ হয়ে দেখা দেন!

তাঁদের সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাবর সসৈন্যে পাঞ্জাবে আসেন। কিন্তু দৌলত খাঁকে প্রার্থিত সাহায্যদানের পরিবর্তে নিজ রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন। এইভাবে ফারগানা থেকে পলায়নের কয়েক বৎসরের মধ্যে বাবর প্রায় সমগ্র আফগানিস্থান ও পাঞ্জাবের অধীশ্বর হয়ে বসেন। তারপর দিল্লী।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী সাম্রাজ্য অধিকার করতে বাবরের অসুবিধা হয় নি।

দিল্লী জয় করলেও বাবরের আসল শত্রু ছিলেন ইব্রাহিম লোদী নন—মেবারের রাণা সঙ্গ। তিনি ও অন্যান্য রাজপুত নরপতিরা ধরে নিয়েছিলেন যে পূর্বপুরুষ তৈমুর লংএর মত বাবর দিল্লী লুণ্ঠন করে আবার স্বরাজ্যে ফিরে যাবেন। কিছু দিন পরে যখন দেখা গেল যে এই অনুমান অমূলক মহারাণা সঙ্গ তখন বিরাট সৈন্যবাহিনীসহ দিল্লীর দিকে এগিয়ে যান। কিন্তু খানুয়ার প্রান্তরে তাঁকে পরাজিত করে বাবর নিজের জয়যাত্রার প্রধান প্রতিবন্ধক অপসারিত করেন। তারপর যখন তিনি পূর্বদিকে এগিয়ে এলেন আফগানরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁর সম্মুখীন হয়েছিল, কিন্তু ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে গঙ্গা ও ঘর্ঘরা নদীর সঙ্গমস্থলে তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

মোগলশক্তি গৌড়ের দ্বারপ্রান্তে এসে আপাততঃ থমকে দাঁড়ায়।

দুই

পর্তুগীজদের আগমন

বাবর যখন ফারগানার সিংহাসনে আরোহণ করেন সেই সময়ে অজানা প্রাচ্য জগতের মালিকানাসত্ব নিয়ে ইউরোপের দুইটি দেশ স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে মন কষাকষি চলছিল। স্পেনীয় অর্থে কলম্বাস 'প্রাচ্য' দেশ আমেরিকা আবিষ্কার করেছিলেন, আবার পর্তুগীজরা অন্যপথ ধরে ওই মহা দেশে পৌঁছেছিল। সেক্ষেত্রে নূতন জগত কার? দুই খৃষ্টান রাজ্যের মধ্যে এই কলহের সংবাদ উভয়ের শুভানুধ্যায়ী পোপ ৬ষ্ঠ আলেকজাণ্ডারের কানে পৌঁছালে তিনি চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি থাকতে এক পাগান দেশের মালিকানা নিয়ে দুই খৃষ্টান জাতির মধ্যে রক্তারক্তি হবে? তারা যাতে পরস্পরের উপর গুলি না চালিয়ে নবাবিষ্কৃত দেশগুলি আপোষে বাঁটোয়ারা করে নেয় সেই শুভ উদ্দেশ্য নিয়ে মহামান্য পোপ বহু আলাপআলোচনার পর এক 'বুল' জারি করেন। সেই বুল অনুসারে ভার্দি অন্তরীপের ৯৩১ মাইল পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে একটি কাল্পনিক রেখা টানলে তার পশ্চিমে যেসব অখৃষ্টান দেশ পড়ে সেগুলি পায় স্পেন,

আর পূবের অখৃষ্টান দেশগুলি পায় পর্তুগাল। কালনেমি অতি সূক্ষ্মভাগে লঙ্কা ভাগ করে দেন!

পোপের বাঁটোয়ারা মেনে নিয়ে স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে টার্টিসেলির সন্ধি সম্পাদিত হোলে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে লিসবন থেকে রওনা হয়ে সমস্ত আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণের পর পরবৎসর বসন্তকালে দক্ষিণ ভারতের উপকূলে এসে উপস্থিত হন। তাঁর নৌবহরে ছিল চারখানি জাহাজ ও ১৬১ জন নাবিক—অধিকাংশই জেলের কয়েদী। কয়েদী বা ক্রীতদাস ছাড়া এরূপ নিরুদ্দেশ যাত্রার ঝুঁকি সেযুগে কেউ নিত না। যাত্রা একদিন সার্থক হোল, ভাস্কো-ডা-গামা এসে কালিকটে পৌঁছালেন। কিন্তু আরব দেশীয় মুরদের প্ররোচনায় সেখানকার জামোরিন ফিরিঙ্গীদের কোন আমল দিলেন না—এমন কি পর্তুগালরাজ ম্যানুয়েলের লেখা পত্রখানি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। অগত্যা ভাস্কো-ডা-গামাকে রিক্তহস্তে কিছু মশলার নমুনাসহ লিসবনে ফিরে যেতে হোল। তাতেই রাজা ম্যানুয়েল খুসী—পোপের কাছে এক পত্র লিখে নূতন আবিষ্কারের উপর নিজের একচ্ছত্র অধিকার আদায় করে নিলেন।

বাণিজ্যসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন

পর্তুগীজরা ছিল উগ্র মুসলমান বিদ্বেষী। কালিকটরাজ যখন মুসলমান নন তখন অবশ্যই খৃষ্টান এই ভ্রান্ত ধারণায় ভাস্কো-ডা-গামা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে মুর, অর্থাৎ মুসলমানদের, সঙ্গে যুদ্ধ করা প্রত্যেক পর্তুগীজের অবশ্য করণীয় কাজ। কিন্তু তাতে আশানুরূপ সাড়া মেলে নি। তা সত্ত্বেও ভাস্কো-ডা-গামা ১৫০১ খৃষ্টাব্দে আবার ভারতে এসে ক্যানানোর বন্দরে কুঠী স্থাপন করেন। সেখানে কেউ তাঁকে বাধা না দেওয়ায় ভাল করে ব্যবসা জমে ওঠে। যে গোলমরিচ তিনি প্রতি কুইণ্টাল দুই ক্রুসডেজ দরে খরিদ করতেন লিসবনে চালান হয়ে তাই আশি ক্রুশডেজ দরে বিক্রয় হোত। এর ফলে রাজা ম্যানুয়েলের ধনভাণ্ডার ফুলেফেঁপে ওঠে। লাভের অর্থ দিয়ে তিনি বহু কুপোষ্য প্রতিপালন করেন এবং কয়েকখানি বৃহৎ বাণিজ্যজাহাজ ও রণতরী নির্মাণ করান।

প্রথম আগমনের সময়ে কালিকট বন্দরে বিরূপ অভ্যর্থনা পাওয়ায় সেখানকার জামোরিনের উপর ভাস্কো-ডা-গামার যথেষ্ট অভিযোগ ছিল। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ২০ খানি জাহাজসহ পুনরায় সেখানে এসে বন্দরটি তোপে বিধ্বস্ত করে তার প্রতিশোধ নেন। একই সঙ্গে ক্যানানোর ও কোচিনের কুঠীদ্বয় অস্ত্রসজ্জিত করা হয়। ফিরিঙ্গীদের এই ধৃষ্টতায় স্তম্ভিত হয়ে ক্রুদ্ধ জামোরিন কোচিন রাজ্য আক্রমণ করলে সেখানকার অধীশ্বর পরাজিত হয়ে অন্যত্র পালিয়ে যান। পর্তুগীজরা তাঁর সঙ্গে সেখান থেকে বিদায় নিলেও জামোরিন স্বরাজ্যে ফিরে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নৌবহর মাঝদরিয়া থেকে সেখানে ফিরে এসে তাঁর সৈন্যদের দূরীভূত করে। সেই থেকে কোচিন পর্তুগালের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়।

পরবৎসর অনুরূপ অবস্থার মধ্যে পূর্ব-আফ্রিকার কিলোয়া রাজ্যের উপর পর্তুগীজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা ম্যানুয়েল এতখানি আশা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন আরবদের হাত থেকে প্রাচ্য দেশের মশলা বাণিজ্য ছিনিয়ে নিতে, কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে তাঁর নাবিকরা দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে বিজয় পতাকা ওড়াল এবং কোচিন ও কিলোয়াকে আশ্রিত রাজ্যে পরিণত করল দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েন। যে যাত্রার সুরু এত উজ্জ্বল তার শেষ যে উজ্জ্বলতর হবে একথা বুঝতে তাঁর বাকি রইল না। প্রাচ্যের নূতন সাম্রাজ্য শাসন ও সম্প্রসারণের জন্য ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি ফ্রানসিস্‌কো আলমাইদাকে ভাইসরয় নিযুক্ত করে ভারতে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর উপর আদেশ দেওয়া হোল যেন সকল বাণিজ্য সাম্রাজিক নীতিতে পরিচালিত হয়। ঠিক সেই সময়ে বাবর পিতৃরাজ্য ফারগানা থেকে বিতাড়িত হয়ে কাবুলের দিকে চলে আসছিলেন!

আলমাইদা ভাবলেন, স্বয়ং পোপ যখন প্রাচ্য জগৎ পর্তুগালকে দান করেছেন তখন শুধু বাণিজ্যবিস্তারে সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য তিনি পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতের কয়েকটি দুর্বল স্থান বেছে নিয়ে সেখানে দুর্গ নির্মাণ করলেন। সেই সঙ্গে আরব বণিকদের বিতাড়িত করবার জন্য আদেশ জারি করলেন যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিযুক্ত প্রতিটি জাহাজকে পর্তুগীজদের কাজ থেকে লাইসেন্স নিতে হবে; কোন

জাহাজ এই আদেশ লঙ্ঘন করলে তাকে সার্চ করবার বা ডুবিয়ে দেবার অধিকার পর্তুগীজদের থাকবে। এই ধৃষ্টতার কথা শুনে ফিরিঙ্গীদের সমুচিত শাস্তি দানের জন্য এগিয়ে এলেন কালিকটের জামোরিন ; কিন্তু তাঁর নৌবহর বিধ্বস্ত হয়ে গেল। তাই দেখে আরব বণিকরা গোলমাল পরিহারের জন্য নিজেদের জাহাজগুলি সিংহলের পথ ধরে যাতায়াত করবার আদেশ দেওয়ায় পর্তুগীজরা গিয়ে ওই দ্বীপে অবতরণ করে।

আলবুকার্ক

তারপরই এ্যাডমিরাল আলবুকার্ক মাত্র ছয়খানি জাহাজ ও চার শত সৈন্যসহ পারস্য উপসাগরের তীরে ওরমুজ বন্দরে গিয়ে বন্দরটির আত্মসমর্পণ দাবী করেন। পারস্য সরকার তখন উপজাতি অভ্যুত্থান ও অন্তর্বিপ্লবে বিব্রত থাকায় আল-বুকার্কের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারলেন না ; তিনি বিনা যুদ্ধে ওরমুজের উপর পর্তুগীজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে আরও সম্প্রসারণের কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এই সংবাদ মিশরে পৌঁছালে সেখানকার খেদিব স্তম্ভিত হয়ে যান। ফিরিঙ্গীদের এতবড় স্পর্দ্ধা ? তাদের উৎখাত করবার জন্য তিনি নিজ নৌবহরকে আদেশ দেন ও সেই সঙ্গে সহযোগিতার জন্য কালিকটের জামোরিনের কাছে দূত পাঠান। দুই দেশের সম্মিলিত নৌবহরের আক্রমণে সকল পর্তুগীজ জাহাজ যে সমুদ্রের তলায় কবরস্থ হবে সে বিষয়ে কারও মনে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু যে জাতি দীর্ঘ দিনের নিদ্রাভঙ্গের পর এইমাত্র জেগে উঠেছে তাকে দমন করা এত সহজ নয়। সম্মিলিত নৌবহর বহু গুণ শক্তিশালী হোলেও এক দিনের জলযুদ্ধে পর্তুগীজরা তাদের সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে (৫০৯, ফেব্রুয়ারী ৪)। ভারত মহাসাগর পর্তুগীজ জলাশয়ে পরিণত হয় !

বিস্ময়বিমূঢ় আলবুকার্ক দেখলেন যে পর্তুগীজদের দ্রুতগতিতে একটি সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে বটে কিন্তু তার নিজস্ব কোন রাজধানী নেই। ভাইসরয় আলমাইদাকে একথা বলায় তিনি সে কথার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। কিছু দিন পরে আলমাইদার অকালমৃত্যু হোলে আলবুকার্ক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে একটি রাজধানী স্থাপনের জন্য স্থান অন্বেষণ করতে লাগলেন। সমস্ত মালাবার

ও করোমণ্ডল উপকূল পক্রিমার পর তাঁর নজর পড়ল বিজাপুর রাজ্যের ক্ষুদ্র বন্দর গোয়ার উপর। সেখানকার সুলতান হিদালশাহ যখন মুর তখন নিশ্চয়ই পর্তুগীজদের এই শুভ উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে, ভাবলেন আলবুকার্ক। তাই তিনি সুযোগের অপেক্ষায় বসে রইলেন। কিছু দিনের মধ্যেই সে সুযোগ এসে গেল। সুলতান হিদালশাহ এক প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ায় আলবুকার্ক নিঃশব্দে গোয়ায় এসে বন্দরটি অধিকার করে নিলেন। তারপর অবশ্য তাঁকে বিজাপুর সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল, কিন্তু সুলতানকে পরাজিত করে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গোয়ায় পর্তুগালের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন।

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি

পর্তুগীজরা ছিল ধর্মান্ধ খৃষ্টান—মুসলমানদের নাম সইতে পারত না। প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তারা যেমন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করছিল তেমনি সুযোগ পেলেই পাগানদের ধরে খৃষ্টান করত। মুর দেখলে তাদের রক্ত গরম হয়ে উঠত। স্বদেশে তারা মুরদের সঙ্গে যথেষ্ট লড়াই করেছিল, বিদেশে তাদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য সব সময়ে তৈরী থাকত। জেরুজালেম যে সেই ঘৃণ্য পাগানদের হাতে রয়েছে সেজন্য অসংখ্য ধর্মপ্রাণ খৃষ্টানের মত ভাইসরয় আলবুকার্কও ম্রিয়মান ছিলেন। ওই পবিত্র তীর্থস্থান মুক্ত করবার জন্য ইউরোপের দিক থেকে বার বার ক্রুশেড চালিয়ে সুবিধা হয় নি বটে, কিন্তু সিংহের বিবরে প্রবেশ করে সিংহের কেশর ধরে টানলে দোষ কোথায়? তাতে সমস্ত অরণ্য কেঁপে উঠবে, পশুরাজ নিজ বিবর থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণের জন্য কাকুতি মিনতি করবে। জেরুজালেম যেমন খৃষ্টানদের তীর্থক্ষেত্র, মক্কা তো তেমনি মুরদের। সেই মক্কায় গিয়ে যদি বিজয় পতাকা উড্ডীন করা যায় তা হোলে জেরুজালেম হবে তার মুক্তিমূল্য।

তার বাধাই বা কোথায়?—ভাবলেন ভাইসরয় আলবুকার্ক। আমি মিশরের নৌবহর ধ্বংস করেছি, আরব সাগর পর্তুগীজ হ্রদে পরিণত করেছি; এখন আরবের যে কোন উপকূলে অবতরণ করি না কেন আমাকে বাধা দেয় কে? তার উপর ওই দেশ বহুধাবিভক্ত। আমার সৈন্যরা গান গাইতে গাইতে মক্কায়

গিয়ে পৌঁছাবে এবং হাজার হাজার খাদেম ও নামাজীর আকুল আবেদন অগ্রাহ্য করে কাবা মসজিদকে গির্জায় পরিণত করবে।

যে চিন্তা সেই কাজ। বিরাট এক নৌবহর তৈরী করে আলবুকার্ক ১৫.৫ খৃষ্টাব্দে মক্কার দিকে রওনা হোলেন। আরব সাগর পার হয়ে ওই মরুরাজ্যের এক নিরাপদ উপকূলে অবতরণ করতে অসুবিধা হয় নি; কিন্তু সমুদ্র তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন হোলেও ঈশ্বর ছিলেন বিমুখ। অপ্রত্যাশিতভাবে রক্ত-আমাশয় রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি ধরাধাম ত্যাগ করায় তাঁর সহকর্মীগণ ন্যস্ত দায়িত্ব অসম্পূর্ণ রেখে ভারতে ফিরে আসে।

গৌড়ে পর্তুগীজ

গৌড়ে মশলা বিশেষ না থাকলেও শিল্পজাত দ্রব্য যথেষ্ট ছিল। আরব বণিকদের হাত দিয়ে সেই সব পণ্য বরাবর পর্তুগীজদের কাছে যেত। তাতে লাভের একটা মোটা অংশ যাচ্ছিল তাদের পকেটে। সেই মধ্যস্বত্বভোগীদের বিদায় দিয়ে সরাসরি গৌড়ের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য পর্তুগীজরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। গৌড়ে আসবার পথ আবিষ্কারের জন্য নূতন ভাইসরয় ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে এক নাবিককে নির্দেশ দেন। কিন্তু তাঁর জাহাজ পথ ভুল করে পৌঁছায় সুমাত্রায়। পরে সেখান থেকে কোনও এক বন্দরে পৌঁছে সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন শোনেন যে একখানি মুর জাহাজ চট্টগ্রামের দিকে রওনা হচ্ছে। জোয়াও কোয়েলহো নামক এক সহকারীকে সেই জাহাজে উঠিয়ে তিনি নির্দেশ দেন যে চট্টগ্রামে পৌঁছে তিনি যেন স্থানীয় অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেন।

কোয়েলহো চট্টগ্রামে আসবার কয়েকদিন পরে জোয়াও ডি'সিলভিরা নামক আর একজন পর্তুগীজ নাবিক চারখানি জাহাজসহ সেখানে উপস্থিত হন। তাঁকে পথের সন্ধান দিয়েছিলেন মুর বণিক গোলাম আলী। সেই মুরের ব্যবসা বেশ বড় হোলেও তিনি পর্তুগীজদের দেওয়া লাইসেন্স দেখাতে না পারায় সিলভিরা তাঁকে বন্দী করে তাঁর কাছ থেকে চট্টগ্রাম যাবার পথের সন্ধান পান। কিন্তু এখানেও মুর। স্থানীয় মুর শাসক যখন শুনলেন যে সিলভিরা মুসলমানের জাহাজ আটক করেছেন তখন তাঁর শাস্তি বিধানের

আয়োজন করেন। কিন্তু তার সময় হোল না, চতুর পর্তুগীজ গোপনে গোয়ায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে।

গৌড়ের পথ আবিষ্কৃত হোলেও পরের কয়েক বৎসর পর্তুগীজরা এদিকে দৃষ্টি দেবার অবকাশ পায় নি। উত্তর ভারতে বাবর যখন পাণিপথ প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদীর সম্মুখীন হচ্ছিলেন সেই সময়ে ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ভাজ পেরিয়ার নেতৃত্বে একখানি পর্তুগীজ জাহাজ চট্টগ্রামে এসে ইরানী বণিক সিহাবুদ্দীনের জাহাজ লুঠ করে; কারণ তাঁর কাছে পর্তুগীজদের দেওয়া লাইসেন্স ছিল না। দুই বৎসর পরে মার্টিম ডি'মেলোর আট জাহাজের নৌবহর সিংহল উপকূলে প্রবল ঝঞ্ঝাবায়ুতে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে দিক্‌ভ্রান্ত ডি'মেলোর নিজস্ব জাহাজখানি ভাসতে ভাসতে একেবারে আকিয়াব উপকূলে এসে উপনীত হয়। স্থানটির সঙ্গে তাঁর পূর্ব পরিচয় না থাকায় ধীবরদের শরণাপন্ন হোলে তারা তাঁকে পথ দেখিয়ে চট্টগ্রামের অদূরে চাকারিয়ায় নিয়ে আসে। স্থানীয় ফৌজদার খোদাবক্স তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করলেও সেই সময়ে এক প্রতিবেশী রাজার সঙ্গে তাঁর যে যুদ্ধ চলছিল তাতে সেই ফিরিঙ্গীদের কাজে লাগাবার জন্য মুক্তির আশ্বাস দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেন; কিন্তু যুদ্ধশেষে প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গিয়ে আবার তাদের কারাগারে নিক্ষেপ করেন। ইতিমধ্যে সেই ইরানী বণিক সিহাবুদ্দীনের সঙ্গে পর্তুগীজদের সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মধ্যস্থতায় খোদাবক্স খাঁ ২৫ হাজার টাকা মুক্তিমূল্য নিয়ে ডি'মেলোকে ছেড়ে দেন।

সিহাবুদ্দীন পাকা ব্যবসায়ী। যখন দেখলেন যে পর্তুগীজদের সঙ্গে ঝগড়া করে জাহাজী কারবার চালান সম্ভব হবে না তখন বহু আলাপ আলোচনার পর গৌড়ে তাদের বেনিয়ানের কাজ শুরু করেন। রাজধানীর বহু পদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বেশ দহরম মহরম থাকায় পর্তুগীজরা যাতে এখানে কুঠি নির্মাণ করতে পারে তার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করেন। তাঁর পরামর্শে গোয়ার নূতন ভাইসরয় ন্যুনো ডি'কুন্‌হা ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে পাঁচখানি জাহাজসহ ডি'মেলোকে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেন। তদানীন্তন স্থলতান গিয়াস্থদ্দীন মামুদ শাহর মনোরঞ্জনের জন্য ডি'মেলো যেসব মূল্যবান উপঢৌকন সঙ্গে এনেছিলেন সেগুলি পেয়ে স্থলতান যথেষ্ট খুসী হন। কিন্তু তাঁর মনে তখন শান্তি নেই। কারণ, একদিকে হুমায়ুন ও অন্যদিকে শের শাহ এসে তাঁর অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছেন।

তা সত্ত্বেও জনৈক ভৃত্য যখন দেখিয়ে দিল যে উপহারদ্রব্যগুলির মধ্যে কয়েকটি আতরের বোতলের উপর এক মুসলমান বণিকের লেবেল আঁটা রয়েছে তখন তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। আতরগুলি নিশ্চয়ই কোন মুসলমান জাহাজ থেকে লুঠ করা!

একদিকে ধর্মান্ধ খৃষ্টান ও অন্যদিকে কট্টর মুসলমান। সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা না করে সুলতান মামুদ শাহ মুসলমান জাহাজ লুণ্ঠনের অপরাধে পর্তুগীজদের মৃত্যুদণ্ড দিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সিহাবুদ্দীন বা অন্য কারও অনুরোধে দণ্ডাদেশ কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাবাসের আদেশ দেন। সেই সঙ্গে মামুদ শাহ চট্টগ্রামের ফৌজদারের কাছে আদেশ পাঠান, তিনি যেন বন্দরের সকল ফিরিঙ্গীকে গ্রেপ্তার করে গৌড়ে চালান দেন এবং তাদের জাহাজগুলি বাজেয়াপ্ত করেন। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি চিরদিনই টঙ্ক! পাছে ফিরিঙ্গীরা জাহাজে উঠে মহাসমুদ্রে পাড়ি দেয় সেই ভয়ে ফৌজদার তাদের সবাইকে স্বগৃহে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্দী করে ফেলেন। যারা বাধা দিয়েছিল তাদের শমনসদনে পাঠিয়ে ডি'মেলোসহ বাকি সবাইকে গৌড়ে চালান দেওয়া হয়।

'তুমি যদি গৌড়েশ্বর মামুদ শাহ আমিও পর্তুগীজ ভাইসরয় ন্যুনো ডি'কুন্‌হা। তোমার রাজ্য গৌড় ও বঙ্গ, আমার সাম্রাজ্য পূর্ব আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া ও আমেরিকায় বিস্তৃত। তোমার অফিসাররা নিরস্ত্র অতিথিকে বন্দী করে, আমার নৌবহর মহাসাগরের উপর বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সমগ্র পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই যে আমাকে শক্তি পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ দেয়। দুঃসাহস তোমার, তাই আমার লোকদের বন্দী করেছ।' ডি'মেলোর বন্দীত্ব সংবাদে গর্জন করে উঠলেন ভাইসরয় ডি'কুন্‌হা! এ্যাডমিরাল সিলভা মেঞ্জিসকে আদেশ দিলেন: চলে যাও গৌড়ে। যে সুলতান বিনা দোষে শুভেচ্ছাবাহিনীকে কারারুদ্ধ করে তাকে উচিতমত শাস্তি দাও। সে যদি বিনাসর্তে আমার লোকদের কারামুক্ত করে ভাল, না করলে কামানের মুখে উড়িয়ে দাও গৌড় রাজ্য।

গৌড়-পর্তুগাল যুদ্ধ

পর্তুগাল ও গৌড়ের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল। ভাইসরয় ডি'কুন্‌হার কাছ থেকে আদেশ পেয়ে এ্যাড়মিরাল সিলভা মেঞ্জিস বিরাট নৌবহরসহ গৌড়ে এসে

সুলতান মামুদশাহর কাছে একখানি চরমপত্র পাঠালেন। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে সেই পত্রের জবাব না আসায় বা সঙ্গীসহ ডে'মেলো মুক্তি না পাওয়ায় সিলভা মেঞ্জিসের কামান গর্জন করে উঠল—ধূলিসাৎ হয়ে গেল চট্টগ্রাম বন্দর। সুলতান মামুদ শাহর যত সৈন্য সেখানে ছিল তাদের প্রায় সকলেই কামানের গোলায় নিহত হোল; অথচ পর্তুগীজদের একজন সৈনিকের গায়ে একটু আঁচড়ও লাগল না। কিন্তু তাদের প্রতিশোধের এই শুরু—শেষ নয়। চট্টগ্রাম ধ্বংস হোলেও যতদিন না রাজধানী গৌড় নগরী অধিকৃত হয় ততদিন মামুদ শাহর শাস্তি বিধান হবে না—বললেন এ্যাডমিরাল সিলভা মেঞ্জিস।

চট্টগ্রাম থেকে সরাসরি স্থলপথে অগ্রসর হয়ে গৌড়ে পৌছাবার মত লোকবল সিলভা মেঞ্জিসের ছিল না। তাই তিনি ডিয়েগো রেবেলোকে কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজসহ বঙ্গোপসাগরের উপকূল ও ভাগীরথীর পথ ধরে গৌড় নগরীর দিকে পাঠিয়ে দিলেন। একদিন প্রত্যুষে সেই নৌবহর সপ্তগ্রাম বন্দরে এসে নোঙর করল। সুলতান মামুদ শাহর তখন সসেমিরে অবস্থা—শের শাহর ভয়ে তাঁর আহার নিদ্রা বন্ধ হয়েছে। তাই পর্তুগীজরা প্রায় বিনা বাধায় সপ্তগ্রাম অধিকার করে গোড়ের দিকে যাবার জন্য তৈরী হোতে লাগল।

মামুদ শাহর কাছে এই সংবাদ পৌছালে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি তখন একেবারেই অসহায়! তাঁর সমস্ত সৈন্যবাহিনী শেরশাহর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য পশ্চিম সীমান্তে ঘাঁটি করে বসে রয়েছে। তারপর যদি ফিরিঙ্গীরা সপ্তগ্রাম থেকে রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসে তাদের প্রতিরোধ করবেন কি করে? তারা যে কিরূপ নিপুণ যোদ্ধা এই সেদিন চট্টগ্রাম ধ্বংসের সময়ে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেই কারণে তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাবার পরিবর্তে মামুদ শাহ পর্তুগীজ বন্দীদের সসম্মানে মুক্তি দিয়ে শেরশাহর বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠনের জন্য আবেদন জানালেন। কাল যারা ছিল অসহায় বন্দী আজ তারা হয়ে দাঁড়াল তাঁর সামরিক উপদেষ্টা!

মামুদ শাহর আত্মসমর্পণ

পর্তুগীজরা মওকা পেয়ে গেল। সিলভা মেঞ্জিস যখন দেখলেন যে মামুদ শাহর দিন ফুরিয়ে এসেছে তখন তিনি শুধু বন্দী মুক্তিতে সন্তুষ্ট হবেন না বলে

স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন। চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে দুইটি কুঠী নির্মাণের অধিকারও পর্তুগীজদের দিতে হবে। সুলতান মামুদ শাহ তাতেও রাজী; সে দাবী মেনে নিয়ে একটি সনদ লিখে দিলে পর্তুগীজরা তাঁর হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে গেল। এইভাবে একটি গুলী না ছুঁড়েও গৌড়ের প্রধান দুটি বন্দরের উপর পর্তুগীজদের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোল।

শেরশাহর সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে মামুদ শাহ দেখলেন যে উচ্চ মূল্যের বিনিময়ে পর্তুগীজদের বন্ধুত্ব পাওয়া গেলেও তার মধ্যে কৃত্রিমতা নেই। তাই তিনি আরও সাহায্যের জন্য গোয়ার ভাইসরয় ন্যুনো ডি'কুন্‌হার কাছে আবেদন পাঠালেন। সেখানি পেয়ে বিজয় গর্বে ডি'কুন্‌হার বুক ফুলে উঠল, কিন্তু একজন ঘৃণ্য মুরকে সাহায্য দিয়ে তিনি নিজ নাম কলঙ্কিত করতে পারেন না! তাই এমন একজন পাগান হিন্দুর খোঁজ করতে আদেশ পাঠালেন যার সাহায্যে গৌড়ে পর্তুগীজ অধিকার সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে। মামুদ শাহর আবেদনের উত্তরে জানিয়ে দেওয়া হোল যে পর্তুগীজদের তখন অন্যত্র বহুবিধ দায়িত্ব রয়েছে বলে পরবৎসর পর্য্যন্ত তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। এইভাবে তাঁরা গৌড়েশ্বরকে নিরাশ করায় শেরশাহ যখন গৌড় রাজধানীতে এসে উপস্থিত হোলেন তখন তাঁকে বাধা দেওয়া সম্ভব হোল না॥ তার ফলে মামুদ শাহর পতন হয়। কিন্তু দুইটি বন্দরের উপর পর্তুগীজদের অধিকার অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। তারপর শেরশাহও গেলেন, কিন্তু পর্তুগীজরা অনড় হয়ে বসে রইল!

1 *Lands and Peoples, Grolier Publication p. 307, 315*
2 Hosworth H. H. *History of the Mongols, p. 105*
3 Livermore H. V. *History of Portugal, p. 229, 242*
4 Campos J. J. A. *History of the Portuguese in Bengal, p. 30-31*
5 Whiteaway F. W. *Rise of Portuguese Power in India,* p. *232-34*
6 Abdul Hamid Lahori *Padshahnama, p. 434*

দ্বাবিংশতি অধ্যায়

নরনারায়ণ

কুচবিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

গৌড়ের উত্তর-পূর্ব ও আসামের পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত কামরূপের কথা পূর্বের এক অধ্যায়ে বলেছি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে হোসেন শাহর সৈন্যগণ সেখানকার খেন বংশীয় রাজা নীলাম্বরকে বন্দী ও তাঁর রাজধানী কামতাপুর ধ্বংস করলেও রাজ্যটি অধিকার করতে পারেন নি। যে মনোবল থাকলে মানুষ সকল দুর্যোগের সম্মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে কামতাবাসীদের তা ছিল। খেন বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তারা গৌড় সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে এবং বিশ্বসিংহ নামে এক প্রতিভাবান যোদ্ধার নেতৃত্বে আক্রমণকারীদের স্বদেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়।

বিশ্বসিংহ ছিলেন কোচ সম্প্রদায়ভুক্ত ক্ষত্রিয়। এক পার্বত্যরাজ হাজোর কন্যা হিরার গর্ভে তাঁর জন্ম হয়। অপুত্রক মাতামহের মৃত্যুর পর তিনি তাঁর শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করে মাতৃস্বসা জিরার পুত্র শিবসিংহকে রায়কত বা মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। জলপাইগুড়ি-বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত পরিবার এই শিব-সিংহের বংশধর।

খেন বংশ কায়স্থ হোলেও ক্ষত্রিয় বিশ্বসিংহ তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন; তিনি ছিলেন শেষ কামতেশ্বর নীলাম্বরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সেই কারণে তুর্কীরা কামতাপুর ধ্বংস করলে বিশ্বসিংহ নিজ সৈন্যবাহিনীসহ কামতাবাসীদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। হোসেনশাহর পুত্র নসরৎ শাহ তাঁর কাছে পরাজিত হওয়ায় কামতার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে। যে হাজার হাজার মুসলমান সৈন্যকে তিনি বন্দী করেছিলেন তাদের স্বরাজ্যে স্থাপন করে ভূমি উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত

করেন। সেই বিধর্মীদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা দিলেও প্রকাশ্য স্থানে আজান দেওয়া নিষিদ্ধ করা হয়।

হোসেনশাহী বাহিনী কামতা ত্যাগ করলে সমস্যা দেখা দেয় রাজধানী ও রাজসিংহাসন নিয়ে। পুরাতন রাজধানী কামতাপুর এমনভাবে ধ্বংস হয়েছিল যে একটি নূতন শহর না গড়লে সেখান থেকে রাজ্য পরিচালনা সম্ভব নয়। এদিকে রাজ পরিবারে চন্দন নামে একটি শিশু ছাড়া আর কেউ জীবিত নেই। হোসেনশাহী ফৌজ আবার কামতা আক্রমণ করলে তার সম্মুখীন হওয়া সেই বালকের পক্ষে সম্ভব হবে না বুঝে জনসাধারণ বিশ্বসিংহকে কামতার রাজদণ্ড গ্রহণ করবার জন্য অনুরোধ জানালে তিনি কামতেশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন। চিকনা পাহাড়ের উপর অবস্থিত হিঙ্গুলাবাস নামক স্থানে তাঁর নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এক সময়ে সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয় বর্তমান কুচবিহারে।

কামতা ইতিহাসের যে ধারা নীলাম্বরের পতনের ফলে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বিশ্বসিংহ তাতে নূতন গ্রন্থি সংযোগ করেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে তাঁর অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হোলেও তিনি বেশী দিন রাজকার্য্য চালান নি; প্রৌঢ়ত্বের জন্য মধ্যম পুত্র মল্লদেবের উপর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র নৃসিংহ ছিলেন সংসারবিবাগী যুবক—মতান্তরে বিকৃতমস্তিষ্ক। পিতার মৃত্যুর পর নরনারায়ণ নাম নিয়ে মল্লদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর মত প্রতিভাশালী সমরবিশারদ ও তীক্ষ্ণধী কূটনীতিক বড় একটা দেখা যায় না। চারদিকে শত্রুবেষ্টিত হয়ে বাস করার ফলে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী না থাকলে যে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে না একথা ভাল করে বুঝে নিয়ে তিনি রাজ্যের সকল শক্তিমান যুবককে সৈন্যবিভাগে যোগ দেবার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর সৈন্যবাহিনীর সংগঠনে কুড়িজন সিপাহীর উপর থাকতেন একজন ঠাকুরিয়া, দশজন ঠাকুরিয়ার উপর একজন সাইকিয়া, দশজন সাইকিয়ার উপর একজন হাজারী, তিনজন হাজারীর উপর একজন উম্যারা এবং কুড়িজন উম্যারার উপর একজন নবাব। সবার উপর ছিলেন সেনাপতি—তাঁর কনিষ্ঠাগ্রজ শুক্লধ্বজ। শান্তির সময়ে শুক্লধ্বজের অধীনে থাকত এক লক্ষ পদাতিক, চার হাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার রণহস্তী ও একহাজার রণপোত। যুদ্ধের সময়ে এই বাহিনী যথেষ্ট সম্প্রসারিত করবার ব্যবস্থা ছিল।

দিকে দিকে প্রসার

জনসাধারণের সেই সৈন্যবাহিনীর উপর এত আস্থা ছিল যে সবাই মনে করত তাদের নিয়ে শুক্লধ্বজ কোন রাজ্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। তাদের শিক্ষা ছিল বিজ্ঞানসম্মত এবং সমরসম্ভার আধুনিক। কোন রাজ্য আক্রমণ করতে হোলে শুক্লধ্বজ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে আকাশচারী চিলের মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন এবং চিলেরই মত আক্রান্ত রাজ্যের একাংশ জয় করে হিঙ্গুলাবাসে এসে জ্যেষ্ঠাগ্রজকে উপহার দিতেন। সেই সৈন্যবাহিনী ও তার অধিনায়কের এই রণনীতির জন্য সবাই শুক্লধ্বজকে চিলারায় নামে অভিহিত করত।

চিলারায়ের সৈন্যদের দুর্দ্ধর্ষতা এবং নরনারায়ণের প্রখর কূটনীতিজ্ঞানের ফলে কুচবিহার রাজ্যের সীমান্ত দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করে। ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে এক তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে অহম রাজ্যের সঙ্গে কুচবিহারের যুদ্ধ বেধে যায়। চিলারায় তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীর ধরে ডিক্রাই নদীর কাছে পৌঁছালে অহমদের সঙ্গে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয় তাতে কয়েকজন অহম অফিসার নিহত হওয়ায় সাধারণ সৈনিকগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে। তারপর ব্রহ্মপুত্রের অপর তীরে কোলিয়াবর নামক স্থানে অহমরা পরাজিত হয়। তারপরেও যুদ্ধ চলেছিল। সেই সময়ে সৈন্য চলাচলের জন্য নরনারায়ণের অপর এক ভ্রাতা গোঁসাই কমল ৩৫০ মাইল দীর্ঘ যে রাজপথ নির্মাণ করেন সেটি আজও বিদ্যমান আছে। নির্মাতার নামানুসারে রাস্তাটির নাম হয় গোঁসাই কমল সড়ক।

সেবার অহমদের সঙ্গে শেষ যুদ্ধে শুক্লধ্বজ পরাজিত হোলেও কয়েক বৎসর পরে ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি কাছাড় আক্রমণ করেন। তাতে তাঁর পূর্ব শত্রু অহমরা এসে কাছাড়ীদের পক্ষে যোগ দেয়, কিন্তু ডিহু নদীর তীরে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। কাছাড়রাজ সভাসদ ও পরিবারবর্গসহ নামরূপ পাহাড়ে পালিয়ে গেলে তাঁর রাজধানী কুচবিহাররাজের অধিকারভুক্ত হয়।

এই সাফল্যের পর নরনারায়ণ মণিপুররাজের কাছে দূত পাঠিয়ে অনুরোধ জানান যে তিনি যদি কুচবিহারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন তাহোলে তাঁর রাজ্য চিলারায়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবে। মণিপুররাজ সে প্রস্তাবে

সম্মত হওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে যে সন্ধি সম্পাদিত হয় তার সর্তানুসারে মণিপুরকে কুচবিহাররাজের হস্তে বার্ষিক তিন হাজার টাকা, তিন শ মোহর এবং দশটি হস্তী কর হিসাবে প্রদানের বিধান থাকে। এইভাবে চিলারায়ের বীরত্বের ফলে কুচবিহারের সীমান্ত ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

জয়ন্তিয়াতেও নরনারায়ণ অনুরূপ দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার রাজা তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় চিলারায়ের সৈন্যগণ সেখানে গিয়ে হাজির হয়। যুদ্ধে জয়ন্তিয়ারাজ পরাজিত ও নিহত হোলে তাঁর পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়ে চিলারায় তাঁকে সামন্ত নরপতির পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নূতন সামন্তের সঙ্গে যে সন্ধি সম্পাদিত হয় তার সর্তানুসারে কুচবিহারকে বার্ষিক নির্দিষ্ট পরিমাণে রাজস্ব প্রদান ছাড়া জয়ন্তিয়ার নিজস্ব মুদ্রা প্রস্তুত নিষিদ্ধ হয়; কুচবিহারের নারায়ণী মুদ্রা জয়ন্তিয়ার সরকারী মুদ্রায় পরিণত হয়।

চিলারায় ত্রিপুরাও আক্রমণ করেছিলেন। সেখানে বিশেষ সুবিধা না হোলেও তিনি শ্রীহট্টে গিয়ে সেখানকার অধিপতিকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করে তাঁর ভ্রাতা আশুরায়কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। শ্রীহট্টের এই অংশ দীর্ঘকালের তুর্কী শাসনের পর সবেমাত্র হিন্দুদের হাতে ফিরে এসেছিল, কিন্তু চিলারায়ের আক্রমণের ফলে সুবিধা হয় সেই তুর্কীদের। কারণ, তিনি আশুরায়কে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা, দশ হাজার স্বর্ণমোহর ও এক শ' হস্তী দিবার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করে কুচবিহারে ফিরে এলে তুর্কীরা পুনরায় সেখানে এসে উপস্থিত হয়। তাদের প্রতিরোধ করবার মত শক্তি আশুরায়ের ছিল না, আবার চিলারায়ও তাঁকে কোন সাহায্য দিতে পারেন নি। ফলে অতি সহজে সমগ্র শ্রীহট্ট আবার অধিকার করে নেয়।

সুলেমান কররানির সঙ্গে যুদ্ধ

এইভাবে নরনারায়ণের রাজ্য পূর্বে ব্রহ্ম সীমান্ত ও দক্ষিণে কাছাড় পর্য্যন্ত প্রসারিত হোলেও প্রতিবেশী গৌড় সুলতানদের সঙ্গে তিনি বরাবর সদ্ভাব রক্ষা করে চলেছিলেন। সেখানে হোসেনশাহী বংশকে বিতাড়িত করে শের শাহ এলেন এবং তারপর এলেন সুলেমান কররানি। এই দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনাস্রোতে তিনি নিরপেক্ষ দর্শক ছাড়া অন্য কোন ভূমিকায় অভিনয়

করেন নি। সুলতান সুলেমান কররানির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল না—আবার বৈরিতাও ছিল না। এক প্রবল শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে তার ফল যে ভাল হবে না একথা তিনি ভাল করে বুঝতেন। কিন্তু নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ পরিহার করা সম্ভব হোল না।

নরনারায়ণ ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু—নিজেকে হিন্দুধর্মের রক্ষক বলে মনে করতেন। এক দিন যখন তাঁর কাছে খবর এল যে কররানিরা বিশ্বাসঘাতকতা করে উড়িষ্যা অধিকার করেছে এবং সুলেমানের পাষণ্ড জামাতা কালাপাহাড়ের হাতে জগন্নাথের পবিত্র মন্দির ধ্বংস হয়েছে তখন তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। এর পর যে তারা এসে কুচবিহারের উপর হামলা করবে না এমন কথা কে বলতে পারে! তাদের সম্মুখীন হবার জন্য তাঁর নির্দেশে চিলারায় নিজ সৈন্যবাহিনীকে নূতন করে সংগঠিত করছেন এমন সময়ে খবর এল যে কালা-পাহাড় তাঁর সৈন্যদের পাশ কাটিয়ে গৌহাটী চলে গেছেন—কামাখ্যা মন্দির কলুষিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চিলারায়ের ফৌজ চিলেরই মত ক্ষিপ্রগতিতে গৌহাটী চলে গিয়ে শুধু যে কালাপাহাড়কে বিতাড়িত করে তা নয় কররানি রাজ্যের উপর প্রত্যাক্রমণ চালায় (১৫৬৮)। রিয়াজ-উস-সালাতিনের বিবরণ অনুসারে অবশ্য প্রথম আক্রমণ শুরু করেন সুলেমান কররানি। কয়েক মাস যুদ্ধ চলবার পর চিলারায় শত্রুর হাতে বন্দী হোলেও যুদ্ধের সেখানে শেষ হয়নি। সেই সময়ে এক অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়—পশ্চিম থেকে গৌড়ের উপর মোগল আক্রমণ আসন্ন হয়ে ওঠে। সুলতান সুলেমান কররানি দেখলেন যে তাঁর সৈন্যরা যদি কুচবিহারের সঙ্গে যুদ্ধে আবদ্ধ থাকে তাহোলে সমগ্র গৌড় মোগল অধিকারে চলে যাবে। সেই সম্ভাবনা পরিহারের জন্য তিনি নরনারায়ণের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে এক দূত পাঠালে তিনি তাতে সম্মত হন। চিলারায় যে শুধু কারাগার থেকে মুক্তি পান তা নয় সুলতান সুলেমানের এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, শেরপুর ও দাক্ষটিনিয়া পরগণা তাঁকে যৌতুক দেওয়া হয়।

কালাপাহাড় ও চিলারায় পরস্পরের ভায়রা ভাইয়ে পরিণত হন!

রাণী কমলপ্রিয়া

পিতা বিশ্বসিংহ মহামায়ার উপাসক হোলেও বাল্যকালে বারাণসীতে অধ্যয়নের সময়ে নরনারায়ণ বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের প্রভাবে আসেন এবং সিংহাসনে আরোহণের পর তাদের প্রতি আনুকূল্য দেখাতে থাকেন। স্বধর্মে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল, তিনি নিজেকে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির রক্ষক বলে মনে করতেন। কুখ্যাত কালাপাহাড় এসে কামাখ্যা মন্দির অপবিত্র করায় তিনি কিভাবে তার প্রতিশোধ নেন সেকথা বলেছি। পরে ওই মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ করে তিনি নদীয়া থেকে তান্ত্রিক ব্রাহ্মণদের নিয়ে গিয়ে দেবী কামাখ্যার সেবায়েত নিযুক্ত করেন। সন্নিহিত নীলাপাহাড়ের উপর এক দুর্গা মন্দির তাঁর ভ্রাতা চিলারায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজাদের সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নয়নের জন্য তিনি মিথিলা ও রাঢ় থেকে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে এনে কুচবিহারে স্থাপন করেন।

তাঁর মহিষী কমলপ্রিয়া আপি ছিলেন বৈষ্ণব সাধক শঙ্করদেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী। আসামের শ্রীচৈতন্য এই শঙ্করদেব ছিলেন কায়স্থ। এক কায়স্থ তরুণীর সঙ্গে নরনারায়ণের বিবাহ প্রস্তাবে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তা টেকে নি। এই বিবাহ নরনারায়ণের ধর্মজীবনকে প্রভাবিত না করলেও বৈষ্ণবমতকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার সুযোগ দেয়। রাণী কমলপ্রিয়ার উদ্যোগে এই মত কুচবিহার প্রাসাদে প্রবেশ করে এবং রাজ্যের সর্বত্র বৈষ্ণবদর্শন নিয়ে আলোচনা চলে। শঙ্করদেব রচিত বহু বৈষ্ণব পদাবলী কুচবিহারের সর্বত্র গীত হয়। নিজে তন্ত্রবিশ্বাসী হয়েও নরনারায়ণ তাতে উৎসাহ দিতেন।

নরনারায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যের বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর প্রেরণায় পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ পাণিনির একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। কুচবিহারের সর্বত্র বহু টোল ও চতুস্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যয়ন ব্যাপক-ভাবে প্রচলিত হয়। অখণ্ড কান্দালি ভাগবতের একটি ভাষ্য রচনা করেন। আরও বহু গ্রন্থ রচিত হয়। এই মহাবীরের দীর্ঘ ৫৪ বৎসর (১৫৩৪-৮৮) রাজত্বের সময়ে কুচবিহার এক বহুবিস্তৃত সমৃদ্ধশালী জনপদে পরিণত হয়। তাঁর সুশাসনের গুণে প্রজাদের সুখৈশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। কুচবিহারের নারায়ণী মুদ্রা তিনি প্রবর্তন করেন। কামাখ্যার বর্তমান মন্দিরসহ বহু

মন্দিরের নির্মাতা তিনি। অন্যত্র জনগণ যখন অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল নারায়ণের প্রজাদের তখন শান্তি ও নিরাপত্তা কোনরূপে বিঘ্নিত হয় নি।

বার্দ্ধক্যের ভুল

প্রভূত শক্তি ও প্রখর কূটনীতিজ্ঞান সত্বেও বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়ে নরনারায়ণ এক মহা ভুল করে বসেন। পরিণত বয়স পর্য্যন্ত তার কোন পুত্র সন্তান না হওয়ায় তিনি চিলারায়ের পুত্র রঘুরায়কে দত্তক গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পরে রাণী কমল-প্রিয়ার গর্ভে এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় উত্তরাধিকার নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। দত্তকপুত্র বড় না নিজ পুত্র বড়? রঘুরায় বরাবর জানতেন যে অপুত্রক জ্যেষ্ঠতাতের তিরোধানের পর তিনি সিংহাসনে বসবেন—সবাই তাঁকে যুবরাজ বলে মনে করত। অপ্রত্যাশিত এই পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ার তাঁর মন বিষাদ-গ্রস্ত হয়ে পড়ে। বিক্ষুব্ধ ভ্রাতুষ্পুত্রকে খুসী করবার জন্য নরনারায়ণ স্বর্ণকোশী নদী বরাবর রাজ্যকে দ্বিখণ্ডিত করে পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে দেন পশ্চিমার্দ্ধ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুরায়কে ডিংসাই নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত পূর্বার্দ্ধ।

ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি এভাবে বাঁটোয়ারা করলে বহু সমস্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় বটে কিন্তু একটি সার্বভৌম রাজ্য দ্বিখণ্ডিত করলে বিলুপ্তির দিকে ঠেলে দেওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। নরনারায়ণ তাই করলেন! তাঁর বিভাগের ফলে কুচবিহারের গৌরবরবি চিরতরে অস্তমিত হোল। রক্ষাকবচ হিসাবে অবশ্য তিনি রঘুরায়কে লক্ষ্মীনারায়ণের সামন্তরাজারূপে রাজ্য চালাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতেই রঘুরায় রাজস্ব প্রদান বন্ধ করে নিজ নামে মুদ্রা প্রস্তুত করেন। দুর্য্যোগের এই পূর্বাভাস নরনারায়ণ দেখেও দেখেন নি। সেবারের বিদ্রোহ দমন করেও তিনি রঘুরায়ের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখেন। তার ফলে পিতৃব্যের মৃত্যুর পরই রঘুরায় নিজেকে কামরূপের সার্বভৌম অধিপতি বলে ঘোষণা করেন।

দুই কোচ রাজ্যের এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করেন প্রতিবেশী ভাটির সুলতান ঈশা খাঁ। নরনারায়ণের মৃত্যুর কিছু দিন পরে তিনি রঘুরায়ের শাসনাধীন কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করলে কুচবিহারের নূতন অধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণ পিতৃব্যকে

সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেন নি। তাঁকে একাই যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়। প্রথম দিকে তিনি ঈশা খাঁর কাছ থেকে বর্তমান ময়মনসিংহ জেলা অধিকার করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঈশা খাঁর সৈন্যরা এসে তাঁর কাছ থেকে গোয়ালপাড়া জেলার রাঙামাটি পর্যন্ত ভূভাগ অধিকার করে নেয়।

উভয়ের বৈরিতা এখানে শেষ হয় নি। লক্ষ্মীনারায়ণ যখন দেখলেন যে নিজ শক্তিতে পিতৃব্যপুত্রকে বশে আনা সম্ভব নয় তখন তাঁর পুত্র পরিক্ষিৎ-নারায়ণকে দলে টেনে নিয়ে এক ঘরভাঙ্গা বিভীষণে পরিণত করেন। সে কথা রঘুরায়ের গোচরে এলে তিনি পরিক্ষিৎকে কারাগারে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি কুচবিহারে পালিয়ে গিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে আশ্রয় নেন।

রঘুরায়ের মৃত্যুর পর পরিক্ষিৎনারায়ণ কামরূপ সিংহাসনে আরোহণ করলে উভয় রাজ্যের পূর্ব তিক্ততার অবসান হোলেও বিভাগের কুফল নানাভাবে দেখা যায়। যে মালা একবার ছিঁড়ে গিয়েছিল কিছুতেই তাতে জোড়া লাগান সম্ভব হয় নি।

১ প্রসিদ্ধ নারায়ণ, বংশাবলী
2 Gait E. A. *History of Assam, p. 52-54*
3 *Riyaz-us-Salatin, Abdus Salam's trans., p. 151*
4 Barua P. G. *Assam Buranji, p. 29-30*

ত্রয়োবিংশতি অধ্যায়

কররানি বংশ

কররানিদের পরিচয়

আফগানিস্থানের কুরম উপত্যকার অধিবাসী কররানিরা অন্য সব আফগানের মত হিন্দুস্থানে এসে বিভিন্ন হিন্দু রাজা ও তুর্কী সুলতানের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করত। তুর্কীদের পতনের পর বহলোল লোদী যখন দিল্লীতে প্রথম আফগান রাজ্য সংগঠিত করেন কররানিরা তাতে বিশিষ্ট ভূমিকার অভিনয় করেছিল। তারপর এল বাবরের অভিযান ও শের শাহর অভ্যুদয়। তাজ খাঁ কররানি ছিলেন শেরের এক উচ্চস্তরের অফিসার। তাঁর সাফল্যের ফলে কররানিদের উন্নতি সুরু হয়। তিন ভাই ইসাদ, সোলেমান ও ইলিয়াস গঙ্গাতীরে তিনটি জায়গীর লাভ করে আরও উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। আশপাশের গ্রামগুলি লুণ্ঠন ও সরকারী অর্থ আত্মসাৎ করে সকলেই নিজেদের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করেন এবং দিল্লীশ্বর আদিল শাহর সময়ে প্রত্যেকে স্বাধীন সুলতানের মত আচরণ করতে থাকেন। সবার মন্ত্রণাদাতা ছিলেন জ্যেষ্ঠাগ্রজ তাজ খাঁ। তিন কররানি আমীরের এই বাড়াবাড়িতে স্তম্ভিত হয়ে আদিল শাহর রিজেণ্ট হিমু সসৈন্যে এসে তাঁদের শক্তি চুরমার করে দিলে তাজ ও সোলেমান সমস্ত সম্পদ নিয়ে চলে আসেন গৌড়ে। এখানে তখন যে বিশৃঙ্খলা চলছিল তা থেকে লাভবান হবার আশায় তিনি সুলতান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহর পক্ষ হয়ে মোগল সেনাপতি খান-ই-জাহানের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিহারের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করেন। পাটনায় যখন তাঁর কাছে খবর গেল যে গৌড় প্রাসাদে পর পর দুটি গুপ্তহত্যার পর নূতন এক গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর মসনদে আরোহণ করেছেন তখন তিনি ভ্রাতা তাজ খাঁকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। এই তৃতীয়

গিয়াসুদ্দীনকে হত্যা করে তাজ খাঁ গৌড়, বঙ্গ ও বিহারের উপর কররানি বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন (১৫৬৩)।

সুলেমান কররানি

মসনদে আরোহণের এক বৎসর পরে তাজ খাঁর মৃত্যু হোলে সুলেমান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। গৌড় নগরীর অপর পারে অবস্থিত তাঁড়া পূর্বে ছিল তাঁর নিজস্ব জায়গীর—সেখান থেকে তাঁর উন্নতির সূত্রপাত হয়। সেই ক্ষুদ্র স্থানকে সৌভাগ্যের সূচক মনে করে তিনি গৌড় থেকে রাজধানী সেখানে স্থানান্তরিত করেন। তারপরই তিনি হয়ে দাঁড়ান হিন্দুস্থানের সকল আফগান অধিবাসীর আশ্রয়দাতা। পোনেরো বৎসর অজ্ঞাতবাসে কাটিয়ে হুমায়ুন ফিরে এসে অযোধ্যা পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের উপর নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলে যেখানে যত আফগান ছিল সকলে পালিয়ে এসে তাঁর কাছে আশ্রয় নেয়। সেই শরণার্থীদের অনেকে শের শাহর সৈন্যবাহিনীতে অফিসার ছিলেন বলে তাদের আগমনে সুলেমানের সামরিক বল যথেষ্ট বেড়ে যায়। বিচক্ষণ রাজনীতিক লুদি খাঁকে উজীর নিযুক্ত করে তিনি নবগঠিত রাজ্যের সংহতি বিধানে মন দেন।

মোগলের শক্তি যে কি প্রচণ্ড তা বুঝে নিয়ে লুদি খাঁ সকল আফগান সর্দারকে ডেকে বলেন : আগের মত নিজেদের মধ্যে কলহ কোরো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালিও না। তাতে সুবিধা হবে মোগলের। সারা হিন্দুস্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে এই যে আশ্রয়টুকু পেয়েছ তা থেকে চ্যুত হয়ে পথে পথে ঘুরবে। হুঁশিয়ার! লুদি খাঁর এই পরামর্শে আফগানরা সর্বসম্মতক্রমে সুলেমান কররানিকে নিজেদের নেতা বলে মেনে নিয়ে একযোগে কাজ করতে সম্মত হয়। সুলেমানও সকলকে মর্য্যাদানুযায়ী জায়গীর বা ফৌজী কাজ প্রদান করে আত্মপ্রসারে মন দেন।

এত উপদেশ দিয়েও লুদি খাঁ নিশ্চিন্ত হোতে পারলেন না। স্বজাতীয়দের তিনি চিনতেন। মোগলরা যদি এগিয়ে আসে তাদের অনেককে যে খুঁজে পাওয়া যাবে না এবং অনেকে যে পিছন থেকে ছুরি চালাবে একথা বুঝে নিয়ে তিনি সুলেমানকে মোগলদের সঙ্গে সদ্ভাব রেখে চলবার জন্য পরামর্শ দিলেন।

মোগলবাহিনী গৌড়ে না এলেও সুলেমান তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁর রাজ্যের সর্বত্র আকবরের নামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচার সুরু হয়। আকবরকে খুসী রাখবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে দিল্লীতে মূল্যবান উপঢৌকনও পাঠান। আকবর বা তাঁর রিজেন্ট বৈরাম খাঁ যে আফগানদের ধূর্ততা বুঝতেন তা নয়, কিন্তু তাঁদের তখন বহু সমস্যা ছিল বলে এই মৌখিক আনুগত্যে সন্তুষ্ট থাকেন।

উড়িষ্যা জয়

উড়িষ্যার তখন মহা দুর্দিন। যে গঙ্গা ও গজপতি বংশ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত করেছিল তারা এখন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছে। মহাবলশালী রাজা প্রতাপরুদ্রের তিরোধানের পর থেকে সেখানে যে হানাহানি ও প্রাসাদ চক্রান্ত সুরু হয় তার শেষ অধ্যায়ে হরিচন্দন মুকুন্দদেব বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক সমগ্র উড়িষ্যা অধিকার করে নেন। বিরোধীদের কঠোর হস্তে দমন করলেও তিনি উড়িষ্যার পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন নি।

দিল্লীর শেষ আফগান সুলতান আদিল শাহর প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্রাহিম খাঁ শূর সর্বত্র বিতাড়িত হোতে হোতে শেষ পর্য্যন্ত হরিচন্দন মুকুন্দদেবের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করে মুকুন্দদেব তাঁকে বসবাসের জন্য এক খণ্ড জমি ও ভরণপোষণের জন্য একটি ছোট জায়গীর প্রদান করেন। সুলেমান কররানির সঙ্গে ইব্রাহিম খাঁ শূরের সদ্ভাব না থাকায় তাঁড়া থেকে মুকুন্দদেবের কাছে তাঁকে বহিষ্কারের জন্য বার বার অনুরোধ যায়। সে অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ায় দুই রাজ্যের মধ্যে সম্বন্ধ যখন তিক্ত হয়ে উঠেছে তখন মুকুন্দদেবের মিত্র হয়ে দেখা দেন দিল্লীশ্বর আকবর শাহ। তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ সত্বেও সুলেমান কররানি যে সকল আফগানকে দলে টেনে নিয়ে গোপন চক্রান্ত চালাচ্ছিলেন এ খবর তাঁর কাছে পৌঁচাচ্ছিল। তা থেকে তিনি বুঝে নেন যে আজ হোক বা কাল হোক কররানিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সে সময়ে যাতে কররানিদের দুই প্রতিবেশী রাজ্যের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যায় সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আকবর মুকুন্দদেবের

কাছে উড়িষ্যায় এবং লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে কুচবিহারে দূত পাঠান। উভয় নরপতি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে পারস্পরিক সামরিক সাহায্যের ভিত্তিতে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।

উড়িষ্যার পূর্ব গৌরব তখন ম্লান হয়ে পড়লেও রাজ্যের আয়তন কিছু হ্রাস পায় নি। উত্তরে ভাগীরথীতীরে ত্রিবেণী থেকে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত জনপদের উপর রাজত্ব করতেন রাজা মুকুন্দদেব। রাজ্য নয়—সাম্রাজ্য। আয়তনে সমসাময়িক মোগল সাম্রাজ্যের সমান—সামরিক শক্তিতেও। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের ছুরিকাঘাতে এক দিন এই সাম্রাজ্য প্রায় বিনা যুদ্ধে আফগানদের পদানত হোল। আফগান শরণার্থী ইব্রাহিম শূর যে সে সময়ে কোন ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন তা বলা যায় না, কিন্তু উড়িষ্যার যে অঞ্চলে তাঁকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল তার কাছাকাছি ময়ূরভঞ্জ ও ছোট নাগপুরের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সুলেমান কররানির সৈন্যবাহিনী এক দিন অতি সঙ্গোপনে উড়িষ্যায় এসে আবির্ভূত হয়। তাদের দূরীভূত করবার জন্য মুকুন্দদেব দুজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছোটরায় ও রঘুভঞ্জকে উত্তর সীমান্তে পাঠিয়ে দেন, কিন্তু আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার পরিবর্তে উভয়েই নিজ প্রভুকে আক্রমণ করে বসেন। অসহায় মুকুন্দদেব তখন কোটসালা দুর্গে আশ্রয় নিয়ে সেই বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি বিধানে অগ্রসর হন।

সেই যুদ্ধে ছোটরায় পরাজিত ও নিহত হন বটে, কিন্তু রাজা মুকুন্দদেবকেও শেষ পর্য্যন্ত জীবনাহুতি দিতে হয়। তখন সারণগড় দুর্গের অধ্যক্ষ রামচন্দ্র ভঞ্জ সমস্ত উড়িষ্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে কররানিদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁর নেতৃত্বের ফলে আফগানদের অগ্রগতি স্তিমিত হয়—তাদের জয়ের আশা লোপ পায়। সুলেমান কররানি যখন দেখলেন যে সম্মুখ সমরে রামচন্দ্র ভঞ্জকে পরাজিত করা সম্ভব নয় তখন শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁকে হত্যা করেন। সেই সঙ্গে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার উপর আফগান আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

উড়িষ্যার সূর্য অস্তাচলে ডুবে গেল! শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে শক্তি স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান রেখে ভারত গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত কিরণ বিকিরণ করছিল তার বুকের উপর শুরু হোল বিদেশীদের তাণ্ডব নৃত্য। তুর্কীদের প্রথম আগমনের পর:থেকে উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে

উড়িষ্যার উপর কত আক্রমণ এসেছে, কিন্তু গঙ্গাসম্রাটগণ সেগুলি শুধু প্রতিহত করেন নি, শত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যাক্রমণও চালিয়েছেন। সেই উড়িষ্যা আজ বিদেশীর পদানত! ভারতের গৌরব, হিন্দুত্বের গর্ব, উৎকল ধূলায় লুণ্ঠিত। নাই সম্রাট অনঙ্গভীমদেব, নাই প্রতাপরুদ্রদেব, নাই সেনাপতি বিষ্ণু—তাই যে আফগান সুলতান তাঁড়া প্রাসাদে বসে অন্তিম সময়ের জন্য দিন গুণছিল সে গিয়ে উড়িষ্যার দুর্জয় দুর্গগুলি একে একে অধিকার করে নিল। দারুভূত দেবতা জগন্নাথ কালাপাহাড়ের হাতে অপবিত্র হোলেন!

জগন্নাথ ধ্বংসের প্রতিশোধ

উড়িষ্যার পতন ও পুরীর মন্দির কলুষিত হবার সংবাদ সমগ্র ভারতে দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়লে ত্রিপুরা ও কুচবিহার সঙ্গে সঙ্গে কররানি রাজ্যের উপর উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ সুরু করে। ত্রিপুরাধীশ বিজয়মাণিক্যের সৈন্যবাহিনী বঙ্গে প্রবেশ করে বিস্তীর্ণ জনপদ অধিকার করে নেয়। সেই সুযোগে আরাকানরাজ এসে চট্টগ্রাম দখল করে নিলেও ত্রিপুরী বাহিনী তাদের সেখান থেকে দূরীভূত করায় বন্দরটির উপর ত্রিপুরেশ্বরের বিজয়পতাকা উড্ডীন হয়। এই সব দুঃসংবাদ উড়িষ্যায় সুলেমান কররানির কাছে পৌছালে তিনি শশব্যস্তে নিজ রাজধানীতে ফিরে আসেন এবং তিন হাজার অশ্বারোহী ও দশ হাজার পদাতিকসহ মহম্মদ খাঁকে পূর্ব সীমান্তে পাঠিয়ে দেন। চট্টগ্রামের উপকণ্ঠে ত্রিপুরী সৈন্যদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। যুদ্ধের প্রথমদিকে ত্রিপুরী সেনাপতি নিহত হোলেও সৈন্যরা নিরুৎসাহ না হয়ে নিজ নিজ অধ্যক্ষের নেতৃত্বে আট মাস ধরে পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালায়। সুলেমান কররানিও যুদ্ধক্ষেত্রে স্রোতের পর স্রোত সৈন্য পাঠান। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আফগানরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় এবং তাদের সেনাপতি মহম্মদ খাঁ বন্দী হন। তাঁকে ও অন্যান্য যুদ্ধবন্দীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে রাজধানী রাঙামাটিয়ায় নিয়ে গেলে রাজা বিজয়মাণিক্যের আদেশে সবাইকে চতুর্দশ দেবতার সম্মুখে বলি দেওয়া হয়।

বিজয়দীপ্ত ত্রিপুরী সৈন্যগণ তারপর কররানি রাজ্য আক্রমণ করলে আফগানরা তাদের অগ্রগতি রোধে অসমর্থ হয়। আক্রমণকারীরা তখন সুবর্ণগ্রাম অধিকার করে লাক্ষা নদী পার হয়ে গঙ্গাতীরে এসে জয়স্তম্ভ স্থাপন করে। সৈন্য ও

সময়োপকরণের স্বল্পতার জন্য আর অগ্রসর হোতে না পারলেও প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও কয়েকটি সুন্দরী যুবতী নিয়ে তারা নিজ রাজধানীতে ফিরে যায়। রাজা বিজয়মাণিক্য সেই বিজয়ী সৈন্যদের শ্রীহট্টে পাঠিয়ে দিলে তারা সেখান থেকেও প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করে স্বরাজ্যে ফিরে আসে।

ত্রিপুরার ন্যায় কুচবিহারও উড়িষ্যার পতনের জন্য ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে এমন সময়ে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেন কালাপাহাড়। সুলতান মামুদের রণনীতি অনুসরণ করে তিনি কুচবিহারের সশস্ত্রবাহিনীকে পাশ কাটিয়ে একদিন হঠাৎ কামাখ্যা মন্দিরে উপনীত হন এবং পুরোহিতদের আকুল আবেদন অগ্রাহ্য করে লগুড়াঘাতে দেবীমূর্তি চূর্ণ করেন। তাঁর এই ধৃষ্টতায় ক্ষিপ্ত হয়ে কুচবিহার বাহিনী কররানি রাজ্য আক্রমণ করলে আফগানরা তাদের প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়। তারা পিছু হঠতে হঠতে গৌড়ের অভ্যন্তরে বহু দূর পর্য্যন্ত চলে আসে, কিন্তু এক অসতর্ক মুহূর্তে কুচবিহার সেনাপতি চিলারায় বন্দী হওয়ায় যুদ্ধের ধারা বদলে যায়।

আফগানরা তখন পাল্টা আক্রমণ সুরু করে একেবারে কুচবিহার রাজ্যের উপকণ্ঠে গিয়ে হাজির হোলেও তাদের কোন সীমান্তই বিপন্মুক্ত ছিল না। পশ্চিম থেকে মোগলরা এগিয়ে আসছে, পূর্বে ত্রিপুরী আক্রমণ প্রতিরোধ করা শক্ত হচ্ছে, দক্ষিণে উড়িষ্যার সামন্ত নরপতিগণ অজেয় রয়েছেন। সুলেমান কররানি দেখলেন যে কুচবিহারের সঙ্গে আর বেশী দিন যুদ্ধ চালালে শেষ পর্য্যন্ত হয় তো নিজেকে বিলীন হয়ে যেতে হবে। তাই তিনি সন্ধির প্রস্তাব করে কুচবিহারে রাজা নরনারায়ণের কাছে দূত পাঠান। তিনি সম্মতি দেওয়ায় বন্দী চিলারায় শুধু কারাগার থেকে মুক্তি পান না, সুলেমানের এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

দাউদ কররানি

উড়িষ্যা জয়ের চার বৎসর পরে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর সুলেমানের মৃত্যু হোলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়াজিদ তখতে আরোহণ করেন। কিন্তু সেই যুবকের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে আফগান সর্দাররা সুলেমানের এক জামাতা হান্সুর নেতৃত্বে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করেন। রাজ্যভোগ

হান্সুর অদৃষ্টেও ছিল না, তাঁর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হবার পূর্বেই উজীর লুদি খাঁ তাঁকে হত্যা করে সুলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদকে মসনদে অভিষিক্ত করেন। অতীত দিনের সেই হত্যাপর্ব নূতন করে সুরু হয়।

সিংহাসনারোহণের পর দাউদ দেখলেন যে তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীতে রয়েছে প্রায় দেড় লক্ষ পদাতিক, চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী, তিন হাজার হস্তী ও সহস্রাধিক রণতরী। এই বিরাট বাহিনী ছিল বলেই তো তাঁর পিতা উড়িষ্যার মত দুর্দ্ধর্ষ শক্তিকে পরাভূত করেছিলেন। অথচ পিতা যে মোগল গিদ্‌ধড় আকবরের ভয়ে সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতেন সে তাঁর নিছক কাপুরুষতা! আকবরের প্রতি আনুগত্য ত্যাগ করে তিনি নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচার সুরু করলেন।

চরিত্রবলে দাউদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ বায়াজিদ অপেক্ষা কোন দিক দিয়েই স্বতন্ত্র ছিলেন না। পিতার কাছ থেকে পাওয়া বিশাল রাজ্য ও অতুল ঐশ্বর্য্য দিয়ে তিনি জীবনকে পুরাপুরি ভোগ করতে লাগলেন—সুরা ও নারী তাঁর নিত্য সহচর হয়ে দাঁড়াল। এর উপর ছিল সন্দিগ্ধচিত্ততা। তাঁর মনে হোতে লাগল যে পিতৃব্য তাজ খাঁর পুত্র ইউসুফ তাঁকে মসনদ থেকে সরাবার জন্য চক্রান্ত করছে। নিশ্চয় করছে! এরূপ দুষমনকে বাড়তে দেওয়া উচিত নয় ভেবে তিনি গুপ্তঘাতক দিয়ে তাঁকে হত্যা করালেন।

অথচ ইউসুফ শুধ্ পিতৃব্যপুত্র নয় তাঁর পরম হিতৈষী লুদি খাঁর জামাতা। এই লুদি খাঁই তাঁকে মসনদে বসিয়ে তাঁর রিজেণ্টের কাজ করছিলেন। তিনি যখন ইউসুফকে হত্যা করেন মিঞা লুদি তখন মোগল সেনাপতি খান-ই-খানান মুনাইম খাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য বিহারে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিরাট সৈন্যবাহিনী থাকলেও যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নি, কূটনৈতিক চালে তিনি মোগলকে বশীভূত করেন। এহেন হিতৈষীকে দাউদ ক্ষিপ্ত করে তুললেন! জামাতা হত্যার অপরাধ যে লুদি খাঁ বরদাস্ত করবেন না সে কথা বুঝতে পেরে দাউদ সমস্ত সৈন্যবাহিনীসহ লুদি খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন। দুষমন সামনে বসে রয়েছে জেনেও তিনি নিজেরই অপর এক সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে নিজে যুদ্ধ করবেন!

শেষ পর্য্যন্ত অবশ্য যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নি। মিঞা লুদি ভাবলেন যে

মোগলকে সামনে দেখেও যদি তিনি সেই অর্বাচীন যুবকের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন তাহোলে খান-ই-খানান তাঁর দিকে একবার মুচকি হেসে গৌড় রাজধানীতে গিয়ে আকবরের পতাকা উড়িয়ে দেবেন। নির্বোধ দাউদ একাজ করতে পারেন; কিন্তু তাঁকে উত্তেজিত হোলে চলবে না। তাঁর এই ধৈর্য্য ও উদারতার মর্যাদা দাউদ দেন নি, প্রৌঢ়কে নিজ শিবিরে আহ্বান করে শমন সদনে পাঠিয়ে দেন।

মোগল বাহিনী তখন অদূরে শিবির স্থাপন করে যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছিল!

মোগল আক্রমণ

চার বৎসর পূর্বে আকবর উৎকলাধীশ মুকুন্দদেবের সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হোলেও চুক্তি অনুযায়ী কাজ করবার সুযোগ তাঁর হয় নি। কারণ মুকুন্দদেবকে হত্যা করে তাঁর নিজের এক সৈন্যাধ্যক্ষ, সুলেমান কররানি বা তাঁর পক্ষীয় কেউ নয়। তারপরই অভিভাবকহীন উড়িষ্যা ক্ষীণ প্রতিরোধের পর এত দ্রুতগতিতে আফগানদের অধিকারে চলে যায় যে আগ্রা থেকে সেখানে কোন সামরিক সাহায্য পাঠাবার সুযোগ হয় নি। তা ছাড়া আকবরের নিজের সমস্যাও বড় কম ছিল না। তখনও তাঁর শাসন বিজিত অঞ্চলে কোথাও ভালভাবে শিকড় গাড়ে নি—বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ লেগেই ছিল। তিনি কোন দিক সামলাবেন? তাই তাঁর প্রতি মৌখিক আনুগত্য দেখিয়ে সুলেমান কররানি উড়িষ্যায় নিজ অধিকার সম্প্রসারিত করছেন দেখেও কিছু করবার ভরসা তাঁর হয় নি। তার উপর কাবুলে তাঁর ভাইকে আশ্রয় করে গোপন চক্রান্ত চলছিল। সেখানে মানসিংহ আছেন, কিন্তু গৌড়ে সুলেমান কররানির মত সমৃদ্ধ সুলতান ও লুদি খাঁর মত বিচক্ষণ উজীরের সম্মুখীন হবার মত শক্তিমান ব্যক্তি মোগল সাম্রাজ্যে আর কেউ ছিল না।

এ সময়ে আফগানরা যদি শের শাহর মত কোন প্রতিভাশালী নায়কের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারত তাহোলে আকবরকে হয়তো তাঁর পিতা হুমায়ুনের মত আর একবার ভারত ছেড়ে চলে যেতে হোত। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্য এই যে সেই সন্ধিক্ষণে সুলেমান কররানি লোকান্তরিত হোলেন, দাউদ লুদি খাঁকে হত্যা করল এবং মোগলেরা পিস্তল উঁচিয়ে বসে রয়েছে দেখেও তাদের চিরন্তন আত্মকলহ নূতন করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাদের দমন করবার

জন্য আকবর খান-ই-খানান মুনাইম খাঁকে বিহারে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু লুদি খাঁর ক্ষুরধার কূটনীতির সম্মুখে তিনি পঙ্গু হয়ে যান। সম্পূর্ণ বিনা কারণে সেই লুদি খাঁকে হত্যা করে দাউদ নিজের দক্ষিণ হস্ত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। শিয়রে যার শমন দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে বাঁচাবে কে?

এ খবর আগ্রায় পৌছালে আকবর বুঝলেন, এই সুযোগ। পূর্ব রণাঙ্গনের যুদ্ধ নিজে চালাবার জন্য তিনি চলে এলেন বিহারে। সিংহাসনারোহণের আঠার বৎসর পরে এই প্রথম তাঁর পূর্বাঞ্চলে আগমন। তাঁর আগমন সংবাদে দাউদ কররানি রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েন। নিছক হঠকারিতার বশে লুদি খাঁকে হত্যা করলেও তার পর থেকে তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েছিলেন। এখন আকবর নিজে রণাঙ্গনে এসে উপস্থিত হয়েছেন শুনে তিনি পাটনা দুর্গে এসে আশ্রয় নিলেন। কোথাও কোন যুদ্ধ হোল না, অথচ তাঁকে অনুসরণ করে মোগলবাহিনী পাটনার উপকণ্ঠে এসে তাঁবু ফেলল।

বিহার হস্তচ্যুত

১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট আকবর নদীপথে সেখানে এসে নিজ ফৌজের সঙ্গে মিলিত হোলেন। যে প্রভূত পরিমাণ কামান, রণহস্তী ও নৌবাহিনী তাঁর সঙ্গে এসেছিল তাঁর নির্দেশে তারা পাটনা দুর্গের উপর চূড়ান্ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি চালাতে লাগল। ওপারে নদীর উত্তর তীরে হাজীপুর দুর্গ। পাটনা দুর্গ আক্রমণের পূর্বে আকবর সেই দুর্গের উপর অভিযান চালাবার নির্দেশ দিলে তিন দিনের দিন কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর মোগল ফৌজ দুর্গটি অধিকার করে নেয়। এর ফলে দাউদের আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়, ভয় হয় যে পাটনা রক্ষা তাঁর সাধ্যে কুলাবে না। তাঁর পিছনে বিশাল রাজ্য ও বিরাট সৈন্য-বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তিনি আতঙ্কে এমনই দিশাহারা হয়ে পড়েন যে যুদ্ধের কথা চিন্তা করবার শক্তি পর্য্যন্ত লোপ পায়। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দুর্গাবাস থেকে বেরিয়ে এসে তিনি অতি সঙ্গোপনে নিজ রাজধানীর দিকে যাত্রা সুরু করেন। তাঁর সেনাপতি গুজর খাঁ দুর্গরক্ষী সমস্ত সৈন্য নিয়ে জলপথে একই দিকে রওনা হন।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোগল ফৌজ দুর্গের উপর কিছুক্ষণ ধরে কামান

দাগাবার পর দেখে যে ভিতর থেকে কোন প্রত্যুত্তর এল না। তারা গোলা-বৃষ্টি বাড়িয়ে দিল, কিন্তু সবই নিস্তব্ধ। তখন কয়েকজন সৈন্য অতি সন্তর্পণে দুর্গদ্বারে এসে দেখে যে দ্বার উন্মুক্ত—কোথাও জনপ্রাণী পর্যন্ত নেই। মুক্ত দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে তারা বিস্মিত নেত্রে দেখল যে প্রভূত পরিমাণ রণসম্ভার পড়ে রয়েছে, আফগানরা সেগুলি ব্যবহারের চেষ্টা পর্যন্ত করে নি। প্রাণ বাঁচাবার জন্য তারা একবস্ত্রে দুর্গ ছেড়ে পালিয়ে গেছে। এই আফগান! এই শক্তি দিয়ে তারা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল! আকবর বললেন, থামলে চলবে না। দুষমন যদি দোজখে যায় সেখানে গিয়েও তাকে পাকড়াও করতে হবে। তিনি নিজেই সৈন্যদের পুরোভাগে অবস্থান করে পূর্ব দিকে যাত্রা করলেন।

আফগান পালাচ্ছে, আর তাকে পিছন থেকে তাড়া করে চলেছে মোগল ফৌজ। এক দিনে চল্লিশ মাইল পথ অতিক্রম করবার পর মোগলরা দরিয়ারপুর গ্রামে পৌঁছে দেখে যে আফগানরা এত ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল যে পাটনা থেকে অল্প যা কিছু সমরসম্ভার সঙ্গে এনেছিল বোঝা হাল্কা করবার জন্য সে সব পথের দুপাশে ফেলে রেখে পালাচ্ছে। তাদের পরিত্যক্ত ২৬৫টি হস্তীসহ প্রভূত পরিমাণ রণসম্ভার মোগলদের হস্তগত হোল। কিন্তু প্রাণভয়ে তারা এমনই বেগে পালাচ্ছিল যে কিছুতেই তাদের নাগাল পাওয়া গেল না। এভাবে তাড়া করে সুবিধা হবে না বুঝে আকবর পাটনায় ফিরে গিয়ে ১৩ই আগষ্ট খান-ই-খানান মুনাইম খাঁকে ২০ হাজার অশ্বারোহীসহ পূর্বাঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন।

গৌড় ত্যাগ

কিন্তু কোথায় আফগান? কোথায় গৌড়েশ্বর দাউদ কররানি? খান-ই-খানান যতই এগিয়ে যান আফগান গ্যারিসন অধ্যক্ষরা ততই বিনাযুদ্ধে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। মুঙ্গের, ভাগলপুর, কহলগাঁও সর্বত্রই সামরিক ছাউনিগুলির উপর থেকে আফগান পতাকা নামিয়ে দিয়ে মোগলের পতাকা তোলা হোল। কেউ তাতে বাধা দিল না—দাউদ বা তাঁর সেনাপতি গুজর খাঁর সন্ধানও মিলল না। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে তেলিয়াগড়ি

গিরিসঙ্কটের মুখে গুণা নামক স্থানে পৌঁছে মুনাইম খাঁ দেখেন যে সমগ্র আফগানবাহিনী সেখানে ব্যূহবিন্যাস করে অপেক্ষা করছে। বিনাযুদ্ধে বিহার মোগলের হাতে তুলে দিয়ে সুলতান দাউদ কররানি গৌড়ের এই প্রবেশমুখে তাদের সম্মুখীন হবেন। এই তাঁর নূতন রণনীতি! তাঁর নির্দেশে হাজার হাজার আফগান সৈন্য পরিখা খনন করে তার মধ্যে অবস্থান করছে, তাদের পাশে রয়েছে অসংখ্য দেশী পাইক। ছদ্মবেশে সমস্ত আফগান ব্যূহ ঘুরে মুনাইম খাঁ বুঝলেন যে মাত্র বিশ হাজার অশ্বারোহী দিয়ে এ ব্যূহ ভেদ করা সম্ভব হবে না। তাই নিরাপদ দূরত্বে তাঁবু ফেলবার নির্দেশ দিয়ে তিনি আরও সৈন্য ও সমরসম্ভারের জন্য পাটনায় আকবরের কাছে পত্র পাঠালেন।

এইভাবে তেলিয়াগড়ির প্রবেশমুখে মোগল ও আফগান পরস্পরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছে এমন সময়ে এক দিন কয়েকজন হিন্দু জমিদার খান-ই-খানানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানালেন যে অদূরে রাজমহল পাহাড়ের গড়হি গিরিপথের ভিতর দিয়ে তাঁড়া ও গৌড়ে যাবার আর একটি পথ আছে। সে পথ বেশ কিছুটা ঘোরা বলে আফগানরা তার উপর কোন গুরুত্ব দেয় নি, সেখানে তাদের কোন সৈন্য নেই। সংবাদটির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের জন্য খান-ই-খানান জনৈক অফিসারকে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর যখন দেখলেন যে হিন্দুরা তাঁকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করে নি তখন তাঁর নির্দেশে এক ডিভিসন মোগল সৈন্য তেলিয়াগড়ির উপর তোপ দেগে ভুয়া যুদ্ধের অভিনয় করতে লাগল, বাকি সৈন্যদের নিয়ে তিনি চললেন রাজধানী তাঁড়ার দিকে।

সেই ঘোরাপথ দিয়ে মার্চ করতে করতে ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি তাঁড়ায় পৌঁছালে সুলতান দাউদ কররানি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। তাদের বাধা দেবার মত সম্বল না থাকায় তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে গোপন পথে অন্যত্র পালিয়ে যান। এরূপ সহজ জয় খান-ই-খানান নিজেও আশা করেন নি, তাই তিনি সরাসরি দাউদের প্রাসাদে প্রবেশ না করে সন্নিহিত এক খোলা মাঠে থমকে দাঁড়ালেন। সংবাদটি তেলিয়াগড়িতে পৌঁছালে ভয়চকিত আফগান সৈন্যরা পরিখা থেকে বেরিয়ে এসে প্রাণভয়ে চারিদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। নিজেদের রাজধানীতে গিয়ে মোগলের

সঙ্গে যুদ্ধ করবার মত মনোবল তাদের লোপ পেয়েছিল। কোথাও কোন যুদ্ধ হোল না, কোন পক্ষের কোন সৈনিক একটি গুলি ছুড়ল না, কোন সৈনিকের গায়ে একটু আঁচড় লাগল না, অথচ সমগ্র বিহার, গৌড় ও বঙ্গের উপর আকবরের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোল।

গৌড় আর একবার বিনাযুদ্ধে বহিরাগতের পদানত হোল।

1 Abbas Sarwani *Tarikh-i-Sher Shahi, Elliot's trans, p. 25*
2 Ahmed Yadgar *Tarikh-i-Salatin-i-Afghann, p. 254-55*
3 Niamatulla *Makhzan-i-Afghana, Elliot's trans, p. 110-13*
৪ থানেশ্বর ও শুক্রেশ্বর, রাজমালা, পৃঃ ৮৮
5 Ghulam Husain Salim *Riyaz-us-Salatin, p. 158*
6 Abul Fazl Allami *Akhbarnama iii, p. 480-83*

চতুর্বিংশতি অধ্যায়

মোগল-পাঠান যুদ্ধ

দাউদের পলায়ন

পূর্ব অধ্যায়ে বলেছি যে মোগলরা তাঁড়ায় প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে গৌড়েশ্বর দাউদ কররানি অতি সঙ্গোপনে নিজ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ে সপ্তগ্রামের পথ ধরে উড়িষ্যার দিকে চলে যান। তাঁর সৈনিক ও সৈন্যাধ্যক্ষরা দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে চারিদিকে পালাতে স্নুরু করে। কেউ পালায় উত্তর-পূর্বে, কেউ বা পূর্বে, কিন্তু অধিকাংশ সৈনিক বিভিন্ন পথ ধরে এদিক ওদিক গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়। মোগল সেনাপতি খান-ই-খানান মুনাইম খাঁ দাউদের প্রাসাদে নিজের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করে পলায়নপর আফগানদের ধরবার জন্য সৈন্যাধ্যক্ষদের প্রতি নির্দেশ দেন। কিন্তু কে পালন করবে সে নির্দেশ? যুদ্ধ না করেও তারা সবাই রণক্লান্ত! তাদের অশীতিপর বৃদ্ধ নায়ক যুদ্ধজয়ের আনন্দে বিভোর! তাই তাঁর আদেশ পালিত হোল না—তিনিও কাউকে কিছু বললেন না। তার ফলে মোগলরা যেমন বিনাযুদ্ধে গৌড় জয় করেছিল, আফগানরা তেমনি বিনাবাধায় মেদিনীপুরে গিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হোতে লাগল।

সেই সময়ে মোগল শিবিরে এসে উপস্থিত হোলেন রাজা টোডরমল। তিনি জানতেন ঋণের শেষ, রোগের শেষ আর শত্রুর শেষ রাখতে নেই। তাই দাউদকে অনুসরণ করবার জন্য সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করতে লাগলেন এবং নিজে বর্দ্ধমানের মোগল গ্যারিসনকে সঙ্গে নিয়ে গড়-মান্দারণে অগ্রবর্তী ঘাঁটি স্থাপন করলেন। সেখানে এক দিন গুপ্তচর মুখে তাঁর কাছে খবর এল যে দাউদ মেদিনীপুর জেলায় দেবরা-কাসারি গ্রামে ব্যূহবিন্যাসের আয়োজন

করেছেন। তাঁকে ধরবার জন্য রাজা টোডরমল নূতন কয়েক ডিভিসন সৈন্য নিয়ে সেদিকে চললেন।

দাউদ দেখলেন, দেবরা-কাসারি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার পক্ষে উপযুক্ত স্থান নয়। তাই তিনি সেখান থেকে সরে গিয়ে দাঁতনের এগার মাইল দক্ষিণ-পূর্বে গড়-হরিপুর গ্রামে নূতন করে শিবির স্থাপন করলেন। তাঁকে অনুসরণ করে রাজা টোডরমল মেদিনীপুর সহরে এসে পৌছালে মোগল সৈন্যদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দেয়। তারা যুদ্ধ করবে কেন? বিনা যুদ্ধে যখন কররানি রাজ্য জয় করা গেছে তখন তাদের যুদ্ধের মধ্যে ঠেলে দেবার কারণ কি? ওসব ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে তারা কদিন তাঁবুতে বসে বিজয়োৎসব করবে, তারপর দেশে ফিরে গিয়ে পরিবারবর্গের সঙ্গে দিন কাটাবে। যে দাউদ পালিয়ে যাচ্ছে তাকে ধরবার জন্য এভাবে বনে বনে ঘুরে বেড়ান তাদের দ্বারা সম্ভব হবে না। টোডরমল অনেক বোঝালেন, কিন্তু কিছুতেই তাদের মতিগতির পরিবর্তন হোল না। এরূপ অনিচ্ছুক সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধে নামলে যে শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা হবে না সে কথা বুঝে নিয়ে রাজা টোডরমল সমস্ত ফৌজসহ গড়-মান্দারণ দুর্গে ফিরে এলেন। তারা সেখানে হৈহল্লা নাচগান চালাতে লাগল।

মোগল শিবিরে যুদ্ধভীতি

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ খান-ই-খানান মুনাইম খাঁ বিহার ও গৌড় জয়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছেন। রাজা টোডরমল মেদিনীপুর থেকে গড়-মান্দারণে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন শুনে তিনি নূতন এক ডিভিসন সৈন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও যে সুবিধা হবে এরূপ ভরসা না থাকায় শেষ পর্য্যন্ত নিজেই উড়িষ্যার দিকে রওনা হোলেন। টোডরমলকে পূর্বাহ্নে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল—পূর্ব-চেটো গ্রামে উভয় সেনানায়কের সাক্ষাৎ হোল। সেখানে তাঁরা শুনলেন যে মোগলরা মাসের পর মাস ধরে গড়িমসি করার ফলে দাউদ কররানি নূতন করে সমরসজ্জা করেছেন। তাঁর ছাউনি হরিপুর গ্রামে সরিয়ে এনে চতুর্দিকে প্রশস্ত গড় খনন করে জলপূর্ণ করা হয়েছে। সেই ছাউনিতে দাউদের ফৌজ আফগানদের চিরন্তন প্রথানুযায়ী গভীর পরিখা

কেটে তার ভিতরে অবস্থান করছে। মেদিনীপুর থেকে সেই নূতন ঘাঁটিতে যাবার যে একটিমাত্র সড়ক আছে তার সর্বত্র ছোট ছোট গুপ্ত ঘাঁটি তৈরী করে দুপাশে ঝোপঝাড়ের মধ্যে বহু সৈন্য রেখেছেন দাউদ কররানি। সংবাদ-বাহীরা যখন এই সব খবর আনতে লাগল সেগুলি শুধু অফিসারদের মধ্যে চাপা থাকল না, সাধারণ সৈনিকরাও শুনে রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। সবাই বলল, যুদ্ধের হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে দাউদের সঙ্গে কোনরকম একটা সমঝোতা করা হোক। সেজন্য অফিসারদের কাছে নানাভাবে অনুরোধ উপরোধ চলতে লাগল। কোথাও কোন যুদ্ধ না করে যখন তারা আফগানদের বিহার ও গৌড় থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে তখন উড়িষ্যার এই জঙ্গলের মধ্যে এসে খামোকা যুদ্ধ করবার দরকার কি ?

তাদের নায়কদ্বয় কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া। দাউদের সঙ্গে তাঁরা অবশ্যই হিসাব মেটাবেন, সে জন্য যদি সমস্ত সৈনিকের জীবন বলি দিতে হয় তাতে তাঁরা পেছপাও নন। তবে প্রবীণ রণনায়ক তাঁরা, কোন বেহিসাবী কাজ করতে পারেন না। ধূর্ত আফগান যখন পথের দুপাশে মৃত্যুজাল রচনা করে রেখেছে তখন সে পথ অবশ্যই পরিহার করতে হবে। কয়েকজন অফিসারকে পাঠিয়ে তাঁরা এক বিকল্প পথের সন্ধান করতে লাগলেন এবং স্থানীয় লোকদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদের পর জানতে পারলেন যে অনেক বেশী দীর্ঘ ও সংকীর্ণ হোলেও হরিপুরে যাবার আরও একটি পথ আছে। ইঞ্জিনীয়ারদের উপর নির্দেশ দেওয়া হোল সেই পথটিকে প্রশস্ত করবার জন্য। তাদের কাজ সম্পূর্ণ হোলে উভয় সেনানায়ক সেই নূতন পথের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়ে কাঁ মদিনীপুর নানজুরা গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হোলেন। এখান থেকে দাউদকে আক্রমণ করলে তাঁর সকল আয়োজন ব্যর্থ হবে—ব্যূহ বিধ্বস্ত হয়ে যাবে।

দাউদের কাছে সব খবরই পৌঁচাচ্ছিল। তিনি যখন বুঝলেন যে মোগলের সঙ্গে এবার জীবনমরণ সংগ্রামে জড়িয়ে পড়তে হবে তখন পরিবারবর্গকে পাঠিয়ে দিলেন কটকে। তারপর জঙ্গল সৈন্যদের মূল ঘাঁটিতে ফিরিয়ে এনে সমগ্র ফৌজসহ চললেন মোগল ব্যূহ নানজুরার দিকে। এখানে উন্মুক্ত প্রান্তরে দাঁড়িয়ে তিনি শত্রুর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করবেন।

পাঠানের পলাশী—তুকারই

মোগল রাজপরিবারের মত খান-ই-খানান মুনাইম খাঁ ও রাজা টোডরমলের জ্যোতিষে অটুট আস্থা ছিল। নামকরা এক জ্যোতিষীকে তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে এনেছিলেন—তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে সকল কাজে হাত দিতেন। তিনি যখন গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান দেখে গণনা করে বললেন যে দিনটি যুদ্ধ করবার পক্ষে অনুকূল নয় তখন উভয় সেনানায়ক নিরস্ত হয়ে শুভ দিনের প্রতীক্ষায় বসে রইলেন। তাঁদের গোলন্দাজরা দূরপাল্লার কামান থেকে গোলা বর্ষণ করে শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখল।

সুলতান দাউদ জ্যোতিষের ধার ধারতেন না। দিনক্ষণের তোয়াক্কা না করে তিনি এক দিন পরিখা থেকে সৈন্যদের টেনে বার করে মোগল ব্যূহের দিকে এগিয়ে চললেন। যুবক সুলতানের এই হঠকারিতা দেখে মুনাইম খাঁ ও টোডরমল বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ছোকরার তাঁবুতে কি কোন জ্যোতিষী নেই? এই ঘোর অদিনে কেউ যুদ্ধ সুরু করে? নিশ্চয়ই ছোঁড়া জাহান্নমে যাবে! কিন্তু সেজন্য চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না। খান-ই-খানান মুনাইম খাঁ যুদ্ধ সুরু করবার আদেশ দিলেন। পাশের তুকারই প্রান্তরে মোগল-পাঠানে প্রচণ্ড সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল।

বহু দিন পূর্বে চৌসায় শের শাহর হাতে হুমায়ুনের পরাজয়ের পর পূর্বভারতে মোগল ও পাঠানের এই প্রথম শক্তি পরীক্ষা। চৌসা ও বিলগ্রামের গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি আফগানদের মনে সদাজাগ্রত থাকায় তুকারইতে যে তারা মোগলদের শেষ করে দিতে পারবে এ বিষয়ে তাদের মনে কোন সংশয় ছিল না। তাদের সেনাপতি গুজর খাঁ তাঁর হস্তিবাহিনী নিয়ে সামনে অগ্রসর হয়ে মোগল অশ্বারোহীদের আক্রমণ করলেন। হাতীগুলি তো হাতী নয়, তাদের শুঁড় ও দেহ অন্য জন্তুর চামড়ায় ঢেকে দেওয়ায় এক অদৃশ্যপূর্ব হিংস্র প্রাণীর মত দেখাচ্ছিল। এই সব বীভৎস জন্তুকে দেখে মোগলদের ঘোড়াগুলি এমনই শঙ্কাকুল হয়ে উঠল যে সওয়াররা সাধ্যমত চেষ্টা করেও সেগুলিকে সংযত রাখতে পারল না। ভয়ব্যাকুল ঘোড়ার দল চারিদিকে ছোটাছুটি করতে থাকায় মোগলদের ব্যূহ ভেঙে চৌচির হয়ে গেল—সৈন্যরা দিশাহারা হয়ে পড়ল। খান-ই-আলমের বাহিনীতে যে সব প্রবীণ সৈনিক ছিল তারাও নিজেদের

ঘোড়াগুলিকে খাড়া রাখতে পারল না। তিনি নিহত হোলেন ও তাঁর সৈন্যরা দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে চারিদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল।

বিজয়োৎফুল্ল আফগান ফৌজ মোগল ব্যূহের মধ্যভাগ বিদীর্ণ করে সামনের দিকে এগিয়ে চলল—দাউদ কররানি তাদের সম্মুখে নূতন শের শাহরূপে আবির্ভূত হোলেন। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণে সর্বাধ্যক্ষ মুনাইম খাঁসহ সকল মোগল অফিসার সর্বাঙ্গে আহত হয়েও যুদ্ধ চালাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন, কিন্তু ভগ্ন ব্যূহের পুনর্বিন্যাস কিছুতেই সম্ভব হোল না। তাদেরই পলায়মান অশ্বারোহীরা স্বপক্ষীয় যোদ্ধাদের ঠেলতে ঠেলতে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পাঁচ মাইল দূরে নিয়ে চলে গেল।

দাউদ দেখলেন, যুদ্ধের হাওয়া বদলে গেছে। পাটনায় যদি তিনি এইভাবে মোগলদের আক্রমণ করতেন তাহোলে বাংলা ও বিহার তাঁর হাতছাড়া হোত না। কিন্তু সে কথা ভেবে লাভ নেই, যে মোগল পালিয়ে যাচ্ছে তাকে খতম করতে হবে। দাউদ তাঁর শৃঙ্খলাবদ্ধ সৈন্যদের নিয়ে ছিন্নভিন্ন মোগলবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন শুরু করলেন। কিন্তু মাইল খানেক যাবার পর আফগান সৈন্যদের মনে হোল যে মোগলরা পালিয়ে গেলেও তাদের শিবিরে যে প্রভূত পরিমাণ রণসম্ভার পড়ে রয়েছে সেগুলি এখনই হস্তগত না করলে আশপাশের গ্রামবাসীরা এসে সব নিয়ে চলে যাবে। লুঠের ভাগ নেবার জন্য দাউদের নিষেধ সত্বেও তারা পিছন দিকে ফিরল। যাবার সময়ে অবশ্য আশ্বাস দিয়ে গেল যে কিছু পরে ফিরে এসে মোগলের সঙ্গে শেষ মোকাবিলা করবে।

এই লোভ আফগানদের কাল হয়ে দেখা দিল। পিছন দিকে ফিরে এসে মোগল তাঁবুতে পৌঁছে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ দ্রব্যসম্ভার ও ভারবাহী পশু চারিদিকে বিক্ষিপ্ত দেখে তাদের মন আনন্দে নৃত্য করে উঠল; সেগুলি সংগ্রহ করতে গিয়ে তারা ভুলে গেল যে শত্রুসৈন্য অদূরে অবস্থান করছে। লোভী আফগানের এই লুণ্ঠন প্রবৃত্তির জন্য মুনাইম খাঁ নূতন করে ব্যূহ বিন্যাসের সুযোগ পেলেন, পলায়নপর সৈন্যদের সঙ্ঘবদ্ধ করে শত্রুর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণের জন্য তৈরী হোলেন। মূল যুদ্ধক্ষেত্রে রাজা টোডরমলের ব্যূহ তখনও অক্ষত ছিল, তিনি এক ডিভিসন আফগান সৈন্যের সঙ্গে সমানভাবে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। মুনাইম খাঁ সসৈন্যে সেখানে ফিরে এসে যখন নূতন করে যুদ্ধ শুরু করলেন সেই সময়ে

একটি গুলি লেগে আফগান সেনাপতি গুজর খাঁ নিহত হওয়ায় তাদের শিবিরের সর্বত্র নৈরাশ্য দেখা দেয়। তারপরও কয়েক ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ চলেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আফগানরা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। হাজার হাজার আফগানের রক্তে তুকারইএর মাঠ লালে লাল হয়ে যায়, অসংখ্য আফগান সৈন্য মোগলের হাতে বন্দী হয়। খান-ই-খানানের আদেশে তাদের সবাইকে হত্যা করে মাথার খুলিগুলি দিয়ে পাহাড়ের মত উঁচু আটটি মিনার তৈরী করা হয়।

এইভাবে তুকারইএর প্রান্তরে আফগানদের সৌভাগ্যসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হয়। এইভাবে বাংলার রাজদণ্ড আর একবার প্রায় বিনা যুদ্ধে এক নূতন শক্তির হাতে চলে যায়!

দাউদের আত্মসমর্পণ

তুকারই যুদ্ধে পরাজয়ের পর দাউদ কটকে পালিয়ে গিয়ে মোগলের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হোতে লাগলেন। কিন্তু এক অবর্ণনীয় শঙ্কায় তাঁর মন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বত্র এখনও তাঁর নামে খুৎবা পাঠ হচ্ছে বটে,কিন্তু সে আর কতদিন! কাল হোক বা পরশু হোক দুদিন পরে সব দীপ নিভে যাবে, কেউ তাঁর নামও করবে না। কেউ বলবে না যে এই সেই সুলতান দাউদ কররানি যাঁর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এক দিন পূর্বভারতের আকাশ বাতাস কেঁপে উঠত। কেউ বলবে না যে আকবরের সঙ্গে হিসাব মেলাবার যোগ্য অধিকারী ছিলেন ইনি। তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে রাজা টোডরমল কটকের দিকে.আসছেন, কিন্তু তাঁকে সাহায্য দেবার জন্য কেউ এগিয়ে আসছে না। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে তিনি দ্বার রুদ্ধ করে মাসাধিক কাল ধরে টোডরমলের সঙ্গে সন্ধির কথাবার্তা চালালেন, সঙ্গে সঙ্গে গোপনে সৈন্য সংগ্রহও চলতে লাগল। টোডরমল বিচক্ষণ ব্যক্তি, অতি সংগোপনে দাউদের গতিবিধির খবর রাখছিলেন। তিনি জানতেন যে ব্যাধ বিতাড়িত ব্যাঘ্র গুহার মধ্যে প্রবেশ করে যেরূপ ক্ষিপ্তের মত আচরণ করে দাউদ তাই করছেন। কিন্তু তাঁর নিষ্ক্রমণদ্বার যখন রুদ্ধ তখন কত দিন এভাবে সমর প্রস্তুতি চালাবেন? সেই কারণে কটক দুর্গের উপর কোন আক্রমণ না চালিয়ে দাউদের কাছ থেকে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব আসবার প্রতীক্ষায় দিন গণতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে সেদিন এসে গেল। দাউদ যখন দেখলেন যে যুদ্ধ করবার সম্বল তাঁর আর নেই তখন চূড়ান্ত সন্ধির প্রস্তাব করে রাজা টোডরমলের কাছে দূত পাঠালেন। কিন্তু টোডরমলের সেই এক কথা—সন্ধি নয় বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ। আর কোন কিছুতে তিনি রাজী হবেন না। তিনি চান, দাউদ কররানি আর নিজেকে কোন স্বাধীন রাজ্যের সুলতান বলে দাবী করবেন না—মহামান্য শাহান্ শাহ বাদশাহ আকবরের বশম্বদ ভৃত্য বলে নিজেকে মনে করবেন। উপায়ন্তরবিহীন দাউদ শেষ পর্য্যন্ত তাতেই রাজী হোলেন, কোনরূপ সর্ত আরোপ না করে মোগলের কাছে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত আছেন বলে জানিয়ে দিলেন।

রাজা টোডরমল যখন বুঝলেন যে দাউদের এই অঙ্গীকার আন্তরিক তখন মেদিনীপুরে এক বার্তাবাহক পাঠিয়ে খান-ই-খানান মুনাইম খাঁকে অনুরোধ জানালেন কটকে চলে আসবার জন্য। পূর্ব ভারতের মোগলবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে কেবলমাত্র তিনিই আকবরের প্রতিনিধিরূপে দাউদ কররানির আত্মসমর্পণ গ্রহণ করবার অধিকারী। কটক দুর্গের সম্মুখে তাঁবু খাটিয়ে এক সুসজ্জিত দরবার কক্ষ তৈরী করা হোল। নির্দিষ্ট দিনে দাউদ কররানি নিজ আমীরদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে সমবেত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে মুনাইম খাঁর পদপ্রান্তে তরবারি স্থাপন করে শপথ করলেন যে এখন থেকে তিনি নিজেকে বাদশাহ আকবরের অনুগত ভৃত্য বলে মনে করবেন। ভবিষ্যতে আর কখনও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না বা তাঁর শত্রুর দলে যোগ দেবেন না।

পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী দাউদের উপস্থিতিতে ও তাঁর সম্মতি নিয়ে ঘোষণা করা হোল যে গৌড়, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার উপর কররানি বংশের সকল অধিকার আজ থেকে লোপ পেয়ে শাহান শাহ্ বাদশাহ আকবরের একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোল। তবে চেঙ্গিজ বংশের চিরন্তন ঐতিহ্য অনুযায়ী বাদশাহ অনুগত ব্যক্তিদের প্রতি সদয় বলে দাউদ কররানি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই ব্যবস্থায় সম্মতি দেওয়ায় তাঁকে কটকের সামন্তপদে নিয়োগ করছেন।

আকবরের রাজ্যারম্ভের চতুর্বিংশ বর্ষে এই ভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাব উপর মোগল অধিকার প্রসারিত হয়।

গৌড়ে মহামারী

কটক থেকে তাঁড়ায় ফিরে এসে মুনাইম খাঁ ভাবলেন, অদূরে হর্ম্যশোভিত ইতিহাস প্রসিদ্ধ গৌড় নগরী থাকতে এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় রাজধানী রাখবার কোন অর্থ হয় না। কররানিরা ছিল উন্মাদ, তাই এই বেহিসাবি কাজ করেছে। তাঁর আদেশে মোগল শিবির তাঁড়া থেকে গৌড়ে স্থানান্তরের আয়োজন চলতে লাগল।

সেই মহানগরীর রূপ তখন বদলে গেছে। রূপসী তরুণী তখন জীর্ণবস্ত্রাবৃতা প্রৌঢ়া। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর অসংস্কৃত ও পতিত থাকায় পথঘাটের একেবারে ভগ্নদশা, নর্দমাগুলি পূতিগন্ধময়, বাগিচাগুলি জঙ্গলে আবৃত। ঝোপেঝাড়ে হিংস্র পশুরা এসে বাস করছে। অসংখ্য অট্টালিকা রয়েছে, কিন্তু দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত থাকায় শৃগাল, সর্প ও ইঁদুরের দল সেগুলিতে দিনের বেলায়ও ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। চারিদিকে ভাপসা বিষের হাওয়া—সমস্ত নগরীর বাতাস দূষিত।

সুলতানের প্রাসাদ রয়েছে, কিন্তু জনশূন্য। বড় বড় মসজিদ, মিনার ও দরগা মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু দিনে চামচিকা ও রাতে ঝিঁঝি-পোকা ছাড়া আর কিছুই সেখানে দেখা যায় না। যেদিকে চাওয়া যায় সেদিকেই আগাছা। খান-ই-খানানের আদেশে সিপাহীরা সেগুলি পরিষ্কার করল, পথঘাট মেরামত হোল, কূপগুলিতে জল উঠল। তাঁর জন্য দামী দামী আসবাবপত্র এনে সুলতান মঞ্জিল সাজান হোল; তিনি বেগমদের সেখানে পাঠাবার আয়োজন করতে লাগলেন। সহকর্মীদের কথাও বৃদ্ধ ভোলেন নি, প্রত্যেককে পদানুযায়ী বাসগৃহ ও সৈনিকদের জন্য কুঠি বা তাঁবুর ব্যবস্থা করলেন। এইভাবে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হোলে তাঁর শিবিরে জ্যোতিষীর ডাক পড়ল। পাজিপুথি দেখে ছক কেটে তিনি একটি শুভ দিন নির্দিষ্ট করলে সেই দিনে সমস্ত রাজধানী তাঁড়া থেকে গৌড়ে অপসারণের কাজ সুরু হোল।

গোড়ার দুই দিন বেশ সুখে কাটল। সৈনিকরা ভাবল, মাসের পর মাস মাঠে জঙ্গলে ঘোরবার পর এখন তারা প্রাণভরে স্ফূর্তি করতে পারবে। কিন্তু তৃতীয় দিন থেকে সুরু হোল জ্বর ও হাতপা ফোলা—প্লেগ। প্রতি দিন শতশত লোক প্লেগে মরতে লাগল। কে কার মুখে জল দেয় তার ঠিক নেই। অথচ চিকিৎসকের একান্তই অভাব। বিনা চিকিৎসায় পরিবারকে পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

মৃতদেহগুলি গোরস্থানে বা শ্মশানে নিয়ে যাবার মত লোক মিলল না—সেগুলি বাড়ীর মধ্যে পচতে লাগল। তাতে বাতাস আরও বিষাক্ত হয়ে উঠল, আরও লোক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ল। এইভাবে কয়েক হাজার সিপাহীর জীবন বলি দেবার পর খান-ই-খানান আদেশ দিলেন : যে যেখানে পার পালিয়ে যাও। আর একদিনও এখানে থেকো না।

আফগানদের পর্যুদস্ত করে যে নূতন যুগের সূত্রপাত তিনি করেছেন তার সুরুতে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখে তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। জ্যোতিষীকে ভর্ৎসনা করে বললেন, নিশ্চয়ই তাঁর গণনায় ভুল হয়েছে। জ্যোতিষী ক্ষুব্ধ হোলেন ; তাঁর গণনায় ভুল! এই সেদিন তাঁর গণনা না মেনে দাউদ কররানি অদিনে লড়াই সুরু করে কি ফল লাভ করেছিলেন খান-ই-খানান কি তা জানেন না? মোগল সর্বাধিনায়ক তা বুঝলেন। তবে এই দোজখপুরে আর একদিনও থাকা চলবে না। বৃদ্ধ তাঁড়ায় ফিরে গেলেন। কিন্তু তাঁর দেহেও রোগবীজাণু প্রবেশ করেছিল; তাতে ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর তাঁর মৃত্যু হয়।

আবার আফগান অভ্যুত্থান

মুনাইম খাঁর মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছালে আকবর ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর খান-ই-জাহান হোসেন কুলী বেগকে বাংলার ফৌজদার ও রাজা টোডরমলকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করে পাঠালেন। এই নিয়োগে সাধারণ সৈনিকরা খুসী হোলেও অফিসার মহলে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কারণ তাঁরা প্রায় সবাই ছিলেন ধর্মমতে শুন্নি ও জাতিতে মোগল বা তুর্কী, পক্ষান্তরে খান-ই-জাহান ছিলেন একে শিয়া তায় ইরাণী। এরূপ এক রাফেজির অধীনে কাজ করা শুন্নিদের পক্ষে মর্য্যাদাহানিকর। কিন্তু টোডরমল সবাইকে ডেকে বললেন : বন্ধুগণ, দাউদ কররানি আত্মসমর্পণ করলেও আফগানদের মেরুদণ্ড এখনও ভাঙে নি। শমন যখন শিয়রে বসে রয়েছে তখন অনেক কিছুই ভুলে যেতে হয় প্রতিনিয়ত খবর আসছে যে উড়িষ্যায় আফগানরা আবার তৈরী হচ্ছে। এসময়ে এই সব ব্যাপার নিয়ে যদি আপনারা গোলমালের সৃষ্টি করেন তাতে পরিণামে সুবিধা হবে সেই দুষমনদের।

দূরদর্শী রাজার সাবধানবাণী উচ্চারিত হোতে না হোতে খবর এল যে দাউদ কররানি আনুগত্যের মুখোশ খুলে ফেলেছেন, তাঁর সৈন্যরা কটক থেকে বেরিয়ে এসে ভদ্রক অধিকার করে জলেশ্বর জেলার মেদিনীপুর সহরে উপস্থিত হয়েছে। সেখান থেকে সেই বিদ্রোহীরা তাঁড়ার দিকে এগিয়ে আসবার জন্য আয়োজন করছে। তাদের সঙ্গে রয়েছে পঞ্চাশ হাজার অশ্বারোহী আফগান ও সংখ্যাতীত দেশী পাইক। অন্য সীমান্তও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গত বৎসর তাঁড়ার পতনের সময়ে কালাপাহাড়, বাবু মাঙ্কালি প্রভৃতি কররানিদের যেসব সৈন্যাধ্যক্ষ কুচবিহারে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁরা ফিরে এসে যোড়াঘাট দখল করেছেন। পশ্চিমে দাউদের চাচেরা ভাই জুনাইদ কররানি ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে আফগানদের একত্রিত করে দক্ষিণ বিহার অধিকার করে নিয়েছেন। উত্তর বিহারে আফগান পক্ষীয় জগদীশপুররাজ গজপতি শাহ সাহাবাদে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রোহটাস দুর্গ এখন তাঁর অধিকারে। তাঁর সৈন্যরা মাঝে মাঝে পাটনার উপকণ্ঠে পর্যন্ত এসে হাজির হচ্ছে। পূর্বাঞ্চলে ভাটির জমিদার ঈশা খাঁ মোগল নৌবহর বিধ্বস্ত করে তাদের মীর-নাওয়ারা শাহ বর্দীকে নিজ দলে টেনে নিয়েছেন। সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। কোথাও বাদশাহী ফৌজ বিদ্রোহীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। যেসব সৈন্য গৌড়ের মহামারী থেকে আত্মরক্ষার জন্য ভাগলপুরে পালিয়ে গিয়েছিল তারা যে আফগানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে এমন মনোবল তাদের নেই।

খান-ই-জাহান সমস্ত পরিস্থিতি জানিয়ে আকবরকে এক পত্রে লিখলেন : মহামান্য বাদশাহ! আমি ও রাজা টোডরমল ঠিক আছি। কিন্তু শত্রুর তুলনায় আমাদের সম্বল একেবারেই নগণ্য। কৃপা করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও হাজার হাজার কামান। আর কিছুতে এই বিদ্রোহবহ্নি নির্বাপিত করা যাবে না। লিপিখানি পড়ে আকবর বিদ্রোহের ব্যাপকতা উপলব্ধি করলেন, শাহবাজ খাঁ কম্বুকে এক শক্তিশালী বাহিনীসহ গৌড়ে পাঠিয়ে দিলেন।

এই নূতন ফৌজ বিহার সীমান্তে আসবার পূর্বেই দাউদের আফগান সৈন্যগণ সমগ্র রাঢ়ভূমি অধিকার করে তাঁড়ায় এসে উপনীত হোল। গৌড়ে মোগলদের যেটুকু আশ্রয়স্থল ছিল তাও হাতছাড়া হয়ে গেল। তাঁড়ায় নিজের পুরাতন

মঞ্জিলে একটি রাত কাটিয়ে দাউদ সমস্ত সৈন্যবাহিনী নিয়ে চলে গেলেন তেলিয়াগড়ি গিরিসঙ্কটে। ঠিক পূর্বের মতই তিনি এখানে মোগলের গতিরোধ করবেন। এই সংবাদ মোগল শিবিরে পৌছালে ভাগলপুর ও পাটনায় যত মোগল সৈন্য ছিল তারা সেখানে চলে এল। কিন্তু এবার তাদের আগের মত গিরিপথরক্ষীদের পাশ কাটিয়ে আফগান রাজধানী অধিকার করবার প্রয়োজন নেই, কারণ আফগানদের এখন কোন রাজধানীই নেই। তাই পূর্ব রণনীতিতে যুদ্ধ পরিচালিত হোল না। কয়েকদিন প্রস্তুতির পর আফগানরা এক দিন সুযোগ বুঝে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লে মোগল-পাঠানে আর একবার তুমুল যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী আফগানদের ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, তাই প্রভূত সৈন্যাধিক্য সত্ত্বেও তারা শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হোল। দাউদ তখন রাজমহলে সরে গিয়ে নূতন করে ব্যূহ বিন্যাস করলেন, তাঁর সৈন্যরা পরিখার ভিতর থেকে মাসের পর মাস যুদ্ধ চালাতে লাগল।

যুদ্ধ সর্বত্র চলছে। আকবর বিহারের সালার-এ-সুবার প্রতি আদেশ পাঠালেন, তাঁর হাতে যেসব উদ্বৃত্ত সৈন্য রয়েছে তা নিয়ে যেন তাঁড়ায় গিয়ে খান-ই-জাহানকে সর্বপ্রকারে সাহায্য দেন। সেই সঙ্গে দিল্লী থেকে নূতন এক বাহিনীসহ সাহাবাজ খাঁ এগিয়ে আসছিলেন বটে, কিন্তু শোন নদীর তীরে পৌঁছে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হয়। জগদীশপুররাজ ওই নদীর পুল এবং রাস্তা এমনভাবে ধ্বংস করেছিলেন যে স্থলপথে সৈন্য চালনা করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। নিরুপায় সাহাবাজ তখন কয়েক শত নৌকা সংগ্রহ করে খান-ই-জাহানের কাছে জলপথে রসদ ও রণসম্ভার পাঠাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে গজপতি শাহকে নির্বীর্য্য করবার জন্য যুদ্ধ চলতে লাগল।

এদিকে তাঁড়া যুদ্ধে দাউদ পরাজিত হয়েছেন শুনে তাঁকে সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ বিহার থেকে জুনাইদ কররানি, ঘোড়াঘাট থেকে কালাপাহাড় ও অন্যান্য সীমান্ত থেকে আফগান সর্দাররা নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীসহ রাজমহলে চলে এসেছিলেন। তাতে দাউদের শক্তি প্রভূতভাবে বৃদ্ধি পেলেও মোগলরা বিচ্ছিন্ন সংগ্রামের হাত থেকে রেহাই পায়। যুদ্ধ একস্থানে কেন্দ্রীভূত হয়। উভয়পক্ষে কয়েকদিন ধরে বিক্ষিপ্ত গোলাবর্ষণের পর ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুলাই তারা পরস্পরকে সামগ্রীকভাবে আক্রমণ করে। লক্ষ লক্ষ সৈনিকের রণহুঙ্কারে

রাজমহলের পাহাড় অরণ্য কেঁপে ওঠে, হাজার হাজার সৈনিকের শোণিতধারায় মাটি লাল হয়ে যায়। দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত কোন পক্ষই বিপক্ষ ব্যূহে ভাঙন ধরাতে অক্ষম হয়—বিজয়লক্ষ্মী যে কার উপর সদয়া হবেন তা বোঝা শক্ত হয়ে পড়ে।

অপরাহ্নের দিকে যুদ্ধের ধারা বদলে যায়। একটি গোলার আঘাতে জুনাইদ কররানি ধরাশায়ী হোলে আফগান শিবিরে নামে বিষাদের কালো ছায়া। তাঁর সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে নিজেদের সমগ্র ব্যূহে ভাঙনের সৃষ্টি করে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার চেয়ে এই ভয়চকিত সৈন্যদের সামলান অন্যান্য আফগান সৈন্যাধ্যক্ষদের কাছে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখে খান-ই-জাহান নূতন উদ্যমে আক্রমণ সুরু করলে অসংখ্য আফগান সৈন্য হতাহত হয় এবং দাউদ বন্দী হন। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধিভঙ্গের অপরাধে তাঁর শিরচ্ছেদ করে মৃতদেহ আগ্রায় আকবরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

সেই মহাযুদ্ধে আফগান সৈন্যাধ্যক্ষরা প্রায় সকলেই হতাহত হন। কালা-পাহাড় আহত হয়ে কোন অজ্ঞাত স্থানে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন; ছোট বড় অন্যান্য অফিসাররা হয় ধরাশায়ী নয় আহত হয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন। কেবলমাত্র কতলু খাঁ লোহানি অক্ষত দেহে রাতের অন্ধকারে কোথায় চলে যান। পরে দেখা গেল যে তিনি একাই এক শ!

গজপতিশাহর আত্মসমর্পণ

অসংখ্য সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করে দাউদ কররানি চিরদিনের মত রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করলেও সাহাবাদ জেলার ক্ষুদ্র রাজা গজপতি শাহকে বশীভূত করা সহজ হয় নি। দূর্ভেদ্য দুর্গ রোহটাস ছাড়া তাঁর ছিল কতকগুলি মাটির কেল্লা। সেগুলির ভিতর হাজার হাজার সৈন্যকে প্রস্তুত রেখে তিনি বীরবিক্রমে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। সাহাবাজ খাঁর মত প্রবীণ সেনানায়কও তাঁকে পর্য্যুদস্ত করতে অপারগ হোলেন। কিন্তু দাউদের পরাজয় তাঁকে অসহায় করে দেয়। রাজমহল যুদ্ধে জয় লাভের পর সমগ্র মোগলবাহিনী তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও তিনি বেশ কিছু দিন যুদ্ধ চালিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সর্তাধীনে রোহটাস দুর্গ মোগলের হাতে ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করেন।

গজপতি শাহর সঙ্গে সমান্তরালে বাংলার উত্তর-পূর্ব কোণে ভাটিরাজ ঈশা খাঁ

মোগলের বিরুদ্ধাচারণ করছিলেন। খান-ই-জাহান তাঁকে দমনের জন্য আয়োজন করছেন এমন সময়ে তাঁর তাঁবুতে খবর এল যে মৃত দাউদ কররানির পরিবারবর্গ ও ধনসম্পদ মামুদ খাঁ খাশখেল বা মোতি নামে একজন আফগান কোনও অজ্ঞাতস্থানে লুকিয়ে রেখেছে। বহু অন্বেষণের পর সপ্তগ্রামের কাছে এক নিভৃত গ্রামে মোতিকে পাকড়াও করা হোলে তিনি নতজানু হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করেন। কিন্তু যার হাতে এত সম্পদ তাকে সহজে রেহাই দেওয়া যায় না! খান-ই-জাহান মোতির মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সমস্ত অর্থ হস্তগত করেন। দাউদের জননী নওলাখা বেগম সপরিবারে মুর্শিদাবাদ জেলার এক নিভৃত গ্রামে আত্মগোপন করেছিলেন। মোতি নিধনের সংবাদ তাঁর কানে পৌছালে তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে মোগলের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

ঈশা খাঁকে দমনের জন্য খান-ই-জাহান ভাটিরাজ্যে এক সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তার অধিনায়ক শাহবর্দী গন্তব্যস্থলে পৌছে রং বদলে ফেলেন। তখন উভয়কে দমন করা খান-ই-জাহানের সামনে আসল দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং সেজন্য তিনি নিজেই ভাওয়ালে চলে যান। তাঁর আগমন সংবাদে শাহবর্দী পূর্বের প্রভুভক্তি ফিরে পান। কিন্তু খান-ই-জাহান নানা কারণে দেহমনে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন বলে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে কিছু করবার পূর্বে তাঁড়ায় ফিরে আসেন। সেখানে দুই বৎসর পরে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

1. Nazimuddin Ahmed *Tabakat-i-Akbari, p. 324-26*
2. Abul Fazl Allami *Akbarnama iii, p. 176-78, 183-86*

পঞ্চবিংশতি অধ্যায়

আকবরের দ্বিতীয়বার বাংলা জয়

মোগল শিবিরে বিদ্রোহ

খান-ই-জাহানের মৃত্যু সংবাদ দিল্লীতে পৌছালে আকবর ভাবলেন যে দাউদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আফগান প্রতিরোধ শেষ হয়েছে; এখন সমর নায়কদের সরিয়ে দিয়ে স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যে খান-ই-জাহানের ভ্রাতা ইসমাইল কুলীর উপর সাময়িকভাবে শাসনকার্য্য চালাবার ভার দিয়ে তিনি পর বৎসর এপ্রিল মাসে মুজাফর খাঁ তুর্বতিকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করে পাঠান। তাঁকে সাহায্য করবার জন্য দেওয়ান রায় পত্রদাস, মীর আদল রিজভি, খাঁ বক্স আবুল ফতে প্রভৃতি সিভিল অফিসাররা আসেন। এদের সাহায্যে শাসনব্যবস্থা সুসংহত করবার ইচ্ছা আকবরের ছিল, কিন্তু অন্তরায় সৃষ্টি করলেন মিলিটারী অফিসাররা। পূর্বের দু'বৎসরের মধ্যে সেই ভদ্রলোকদের কোন যুদ্ধ করতে হয় নি। তাঁদের অধিনায়ক খান-ই-জাহান তাঁড়া প্রাসাদে বসে আরাম করেছেন, আর তাঁরা নিজ নিজ এলাকায় খবরদারি চালিয়েছেন। যুদ্ধ না হোলেও যুদ্ধের জন্য সমরোপকরণ সরবরাহ করে এবং বাদশাহর রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে ব্যবসায়ী ও জমিদারের হাতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমে উঠেছিল তাতে ভাগ বসিয়ে সেই ভদ্রলোকরা স্ফূর্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন—যুদ্ধের বাজারে সবার পকেটে বেশ দু পয়সা আমদানি হচ্ছিল। তাতে সবাই খুসী, সবাই বুঝলেন, এই জন্যই তো তাঁরা বাংলার স্যাঁৎসেঁতে হাওয়ায় পড়ে রয়েছেন! দিল্লী ও অযোধ্যার হাওয়া অবশ্য ভাল, কিন্তু এত উপরি সেখানে কোথায়? খান-ই-জাহান এসব কথা জানতেন, কিন্তু এই ছেঁড়া ব্যাপার নিয়ে কোন দিন মাথা ঘামান

নি। অথচ তিনি শিয়া! মালিক তুর্বতি অফিসারদের স্বগোত্রীয় শুন্নি হয়েও সবাইকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। যে সব সিভিল অফিসার তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন, খবর এল যে তাঁরা বড় বড় হোমর চোমরা সৈন্যাধ্যক্ষের সম্পত্তির ফিরিস্তি তৈরী করছেন, আগ্রায় বাদশাহর কাছে পাঠান হবে। এই বেয়াদপিতে সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, কেউ বা প্রকাশ্যে আবার কেউ বা গোপনে আকবরের শাসন খতম করবার জন্য শলাপরামর্শ চালাতে লাগলেন।

এক দিন খবর এল যে বিহারের অফিসাররা অগ্রণী হয়ে সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের দখলে এনেছেন। সেই বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য বাংলার অফিসাররা ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী একযোগে সেদিকে চলে গেলেন। আফগানরা দেখল এ এক মহা সুযোগ, সদলবলে এসে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিল। সকল বিদ্রোহীর একটি যুক্ত ফ্রণ্ট গঠন করে ঘোষণা করা হোল যে হিন্দুস্থানের বাদশাহ আকবর নন—তাঁর ভ্রাতা মীর্জা হাকিম। সবাই মিলে মির্জা হাকিমের পতাকা উড়িয়ে পাটনা থেকে বাংলা দখলের জন্য এগিয়ে আসতে লাগলেন। মুজাফর খাঁ তুর্বতির কাছে এই সংবাদ পৌছালে তিনি তাজ্জব বনে গেলেন, বাদশাহী ফৌজ নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এগিয়ে চললেন, রাজমহলের কাছে গঙ্গার দুই তীরে দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে দাঁড়াল। দিল্লী থেকে নূতন নূতন সৈন্য এসে যেমন বাদশাহী ফৌজের শক্তি বৃদ্ধি করছিল তেমনি বিভিন্ন স্থান থেকে আফগানরা এসে বিদ্রোহীদের পক্ষে যোগ দিচ্ছিল। সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হোলে সকলে একবাক্যে মেনে নিলেন যে মোগল সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী মির্জা হাকিমের হয়ে তাঁরা আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। মির্জা হাকিম কি জয়!

উভয় পক্ষে উনিশ দিন ধরে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলবার পর বিদ্রোহীরা বাদশাহী ফৌজকে পিছনে ঠেলতে ঠেলতে একেবারে রাজধানী তাঁড়ায় এসে উপস্থিত হোলে সালার-এ-সুবা মুজাফর খাঁ তুর্বতি দুর্গাভ্যন্তরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড আক্রমণে সেখানেও আত্মরক্ষা করা সম্ভব হোল না, ১৯শে এপ্রিল তারা দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে তাঁকে শমনসদনে পাঠিয়ে দিল। সেই সঙ্গে চারমাসব্যাপী বিদ্রোহের অবসান ঘটল। বিজয়ী বিদ্রোহী সৈন্যাধ্যক্ষরা তাঁড়া দুর্গের প্রাকার থেকে ঘোষণা করলেন যে বাংলা

বিহার ও উড়িষ্যা থেকে আকবরের শাসন খতম হয়েছে—মির্জা হাকিম এখন বাদশাহ। শাহান শাহ মির্জা হাকিম জিন্দাবাদ!

যার হয়ে এই যুদ্ধ জয় তিনি তখন কাবুলে। মাঝে মাঝে সংবাদবাহী গিয়ে তাঁর কাছে সকল খবর পৌঁছে দিচ্ছিল এবং তিনিও স্বপক্ষীয়গণের প্রতি উৎসাহ বাণী পাঠাচ্ছিলেন। তুর্বতির পতনের পরও তাঁর পক্ষে বাংলায় আসা সম্ভব হোল না; তা সত্ত্বেও তাঁর নামে খুৎবা পাঠ সুরু হোল এবং সিক্কা প্রচারের আয়োজন চলতে লাগল। তাঁর প্রতিনিধিরূপে বাবা ককসাল সৈফুদ্দীন হোসেন শাহ নাম নিয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হোলেন। আফগানরা বিদ্রোহী-গণকে যথেষ্ট সাহায্য দিয়েছিল বলে তাদের এক নায়ক নূতন বাদশাহ মির্জা হাকিমের উকিল নিযুক্ত হোলেন। সৈন্যাধ্যক্ষরা পদমর্যাদা অনুযায়ী মনসবদারী পেলেন—অনেক ভবঘুরেও মনসবদারী পেয়ে গেল!

ভ্রাতার বিরুদ্ধে অভিযান

এই ভয়াবহ সংবাদ আগ্রায় আকবরের কাছে পৌঁছালে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা পুনরুদ্ধারের জন্য রাজা টোডরমল ও তরসুন খাঁর নেতৃত্বে এক শক্তিশালীবাহিনী পূর্ব ভারতে পাঠিয়ে দিলেন। বিহারে পৌঁছে টোডরমল লক্ষ্য করলেন যে বিদ্রোহীরা যথেষ্ট শক্তিশালী হোলেও তাদের মধ্যে সংহতির একান্ত অভাব রয়েছে। মির্জা হাকিম নামেই বাদশাহ, একজন বিদ্রোহী নায়ক উত্তর বিহারে স্বতন্ত্র সরকার গঠন করেছেন এবং অন্যেরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার আয়োজন করছেন। আবার কয়েকজন বিদ্রোহী নায়ক নিজেদের মধ্যে কলহ করে বাদশাহী ফৌজে ফিরে এসেছেন। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে অতি সহজে উত্তর বিহার পুনরুদ্ধারের পর পাটনা পাশে রেখে বাদশাহী ফৌজ ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে মুঙ্গেরে এসে উপনীত হোলে বাংলার বিদ্রোহীরা গাঢ় থেকে এগিয়ে গিয়ে তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। টোডরমল দেখলেন যে তাঁর পক্ষেও তখন কিছু সংখ্যক দলত্যাগী বিদ্রোহী সৈন্য রয়েছে। যুদ্ধের সময়ে যে তারা কোন ভূমিকার অভিনয় করবে তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে না পেরে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর ছাউনির চারিদিকে রাতারাতি দেওয়াল তুলে সমস্ত স্থানটিকে গড়বন্দী করা হোল। পক্ষকাল ধরে

চুপচাপ থাকবার পর বিদ্রোহীরা ছাউনীর বাইরে এসে জলপথ ও স্থলপথে আক্রমণ স্থরু করলেও এক অভাবনীয় ঘটনায় তাদের তিনশতখানি রসদ ও সমরসম্ভারপূর্ণ নৌকা বাদশাহী ফৌজের হাতে এসে পড়ল।

রাজা টোডরমল হিন্দু বলে তাঁর নিজের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে যেমন মৃদু বিক্ষোভ বিদ্যমান ছিল তেমনি তিনি হিন্দু বলেই মুঙ্গেরের কাছাকাছি যত হিন্দু জমিদার ছিলেন তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মোগলকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে আসেন। এই জমিদারদের সাহায্যে টোডরমল সকল দিক থেকে বিদ্রোহীদের রসদ সরবরাহের পথ বন্ধ করে দেন। নগদ পয়সা দিয়েও প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য কেনা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। নিরুপায় হয়ে তারা নিজেদের খাদ্য ও ঘোড়ার ঘাসদানার জন্য গৃহস্থের খেতখামার লুণ্ঠন করতে লাগল, কিন্তু তাতে অভাব মিটল না। শেষ পর্য্যন্ত ক্ষুধার তাড়নায় তারা পাটনা ও মুঙ্গের অঞ্চল ত্যাগ করে ২৫শে জুলাই পূব দিকে চলে এল।

বাদশাহী ফৌজ এইভাবে মুঙ্গের পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করলেও দক্ষিণ বিহারের সর্বত্র তখন বিদ্রোহী ঘাঁটি বিদ্যমান। টোডরমল একা যে তাদের নির্মূল করতে সক্ষম হবেন না একথা বুঝে নিয়ে আকবর আজিম খাঁ কোকাকে বিহারের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন। তাতে টোডরমলের বোঝা যথেষ্ট হালকা হয়ে যায়, তিনি বিদ্রোহীদের বাদশাহ মির্জা হাকিমের উকিল মাসুম খাঁ কাবুলিকে বিহার সরিফ, গয়া ও শেরঘাটি অঞ্চল থেকে দূরীভূত করে একেবারে উত্তর-পূর্ব বাংলায় চলে যেতে বাধ্য করেন। সাহাবাদে গজপতিশাহ লোকান্তরিত হোলেও তাঁর উত্তরাধিকায়ী দলপৎশাহ বিদ্রোহী পক্ষে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। নূতন সালার-এ-সুবা আজিম খাঁ কোকা তাঁকে দমন করেন। এইসব সাফল্য সত্বেও বাদশাহী অফিসারদের মধ্যে ঐক্যের অভাব প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দেয়। সাহাবাজ খাঁর মত গর্বিত যোদ্ধার পক্ষে হিন্দু টোডরমলকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। পাটনায় বসে প্রকাশ্যে সেই রাজাকে অগ্রাহ্য করায় তিনি বাধ্য হয়ে গঙ্গার ওপারে নিজ হেড কোয়ার্টার সরিয়ে নিয়ে যান—তাঁর মন থেকে বাংলা জয়ের প্রেরণা লোপ পায়।

যুদ্ধের সময়ে দুজন প্রবীণ সৈন্যাধ্যক্ষের মধ্যে এরূপ অবাঞ্ছিত তিক্ততা লক্ষ্য করে আজিম খাঁ কোকা বাদশাহর সঙ্গে পরামর্শের জন্য আগ্রায় চলে যান। তাঁর

কাছে সব কথা শুনে আকবর বাংলার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পণ করে আদেশ দেন যে বিহার ও বাংলার সিপাহ্ সালাররূপে তিনি উভয় সুবায় বাদশাহর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। টোডরমলকে আগ্রায় ফিরিয়ে এনে মোগল সাম্রাজ্যের রাজস্ব তালিকা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

আকবর জানতেন যে আজিম খাঁ কোকা তাঁর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন বটে কিন্তু কাবুলে মির্জা হাকিম যতদিন স্বপদে অধিষ্ঠিত থাকবেন ততদিন স্থায়ী সাফল্য লাভ সম্ভব হবে না। বিদ্রোহীদের মূল ঘাঁটি সেখানে—বাংলা বা বিহারে নয়। যুদ্ধ না করেও সেখানে বসে মির্জা হাকিম তাদের প্রেরণা যোগাচ্ছেন। তিনি আছেন বলেই তাদের স্পর্ধা আকাশ ছাড়িয়ে গেছে। তাঁকে উৎখাত করবার জন্য আকবর মানসিংহের নেতৃত্বে কাবুলে এক অভিযাত্রী-বাহিনী পাঠিয়ে দিলে তিনি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দের ৩রা আগষ্ট পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে যান।

বাংলার বিদ্রোহ সেই সঙ্গে স্তিমিত হয়।

1. *Akbarnama, iii, p. 462-75, 575, 586*

ষষ্ঠবিংশতি অধ্যায়

কতলু খাঁ

মরেও না মরে রাম

অফিসারবিদ্রোহ দ্রবীভূত হবার পর খান-ই-আজম আজিম খাঁ-কোকা আগ্রায় গিয়ে আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখান থেকে বাংলায় ফিরে এসে দেখেন যে মোগল বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভেঙে গেলেও তাদের অভ্যুত্থানের সুযোগ নিয়ে আফগানরা আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তিনি যখন আগ্রায় ছিলেন সেই সময়ে কতলু খাঁ লোহানির নেতৃত্বে তারা সমগ্র উড়িষ্যা অধিকার করে দামোদর নদী পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে। উত্তর-পশ্চিমে বাবা ককসাল ঘোড়াঘাট অঞ্চলে বেশ আসর জমিয়ে বসেছেন। বিদায়ী বাদশাহ মির্জা হাকিমের উকিল মাসুম খাঁ কাবুলি এই সেদিন টোডরমলের কাছে পরাজিত হয়ে গয়া-শেরঘাটি অঞ্চল ছেড়ে চলে গেলেও তাঁর সৈন্যবাহিনী অটুট আছে। তারপর এক আলাদিনের প্রদীপ ঘসে সেই বাহিনীকে তিনি এমনভাবে সম্প্রসারিত করেছেন যে বাদশাহী ফৌজ তাদের তুলনায় একেবারেই সংখ্যাল্প। মাসুম খাঁর এই শক্তিবৃদ্ধিতে বিস্মিত হয়ে খান-ই-আজম আরও সৈন্য ও সমরসম্ভার চেয়ে আকবরের কাছে আবেদন পাঠালেন। তারা না আসা পর্য্যন্ত তাঁর সৈন্যরা মাসাধিককাল পরিখার মধ্যে অবস্থান করে শত্রুর উপর গোলা বর্ষণ করতে লাগল।

আগ্রা থেকে খান-ই-আজমের শিবিরে যেমন নূতন নূতন সৈন্য ও সমরসম্ভার আসছিল মাসুম খাঁও তেমনি বিভিন্ন স্থান থেকে সাহায্য পাচ্ছিলেন। এপ্রিলের শেষভাগে এক আফগান নৌবহর ফরিদপুর অঞ্চল থেকে রওনা হয়ে তাঁর সাহায্যের জন্য রণাঙ্গনের দিকে এগিয়ে আসে, কিন্তু মোগলদের গোলার আঘাতে তার

অধ্যক্ষের মৃত্যু হওয়ায় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। কালাপাহাড়ের নৌবহরও বিধ্বস্ত হয় এবং তিনি ধরাশায়ী হন। স্থলযুদ্ধে আফগানদের এমনি কোন বড় রকমের বিপর্য্যয় না ঘটলেও তাদের কয়েকজন অফিসারকে খান-ই-আজম কৌশলে বশীভূত করায় দল ভেঙে যায়—ককসালপক্ষীয় সৈন্যগণ গোপনে রণাঙ্গন ত্যাগ করে। তাতে মাসুম খাঁ ক্ষিপ্ত হয়ে দলত্যাগী সৈন্যদের শাস্তি বিধানের জন্য ঘোড়াঘাটে চলে যান এবং সেখান থেকে ঈশা খাঁর রাজ্য ভাটিতে।

চতুর কতলু খাঁ লোহানি এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করবার পরিবর্তে মোগলের সঙ্গে লোকদেখান সন্ধির কথাবার্তা চালিয়ে গোপনে সৈন্যবল বাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। ঠিক তার অব্যবহিত পরে বাদশাহ খান-ই-আজমকে আগ্রায় তলব করায় তিনি ১৮ই মে সেনাপতিবিহীন মোগল সৈন্যদের উপর আক্রমণ সুরু করেন। কয়েকদিন ধরে বিক্ষিপ্ত সংগ্রাম চলাবার পর যেসব সৈন্যাধ্যক্ষের হাতে খান-ই-আজম শিবিরের দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের নির্দেশে বাদশাহী ফৌজ জুন মাসের শেষভাগে তাঁর ছাউনির উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ সুরু করে। কয়েকদিন ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলবার পর তিনি পরাজিত হয়ে উড়িষ্যার দিকে চলে যান, কিন্তু বাদশাহী ফৌজ তাঁর অনুসরণ করতে অসমর্থ হয়। কারণ কতলু খাঁর সঙ্গে সংহতি রেখে মাসুম খাঁ কাবুলি সেই সময়ে ভাটি অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসে মোগলের বিরুদ্ধে আবার আক্রমণ সুরু করেন। কতলু খাঁকে ছেড়ে বাদশাহী ফৌজ তাঁর প্রতিরোধের জন্য এগিয়ে গিয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারে না, তিনি রাজধানী তাঁড়ার ১৪ মাইল দূরে এসে আবির্ভূত হন।

শত্রু চারিদিকে। সমগ্র বাংলা এখন এক বিচ্ছিন্ন রণাঙ্গনে পরিণত হয়েছে। এই আফগান তরঙ্গ কে রোধ করবে? আকবরের আহার নিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল, তিনি খান-ই-আজমকে পাশ কাটিয়ে প্রবীণ যোদ্ধা সাহাবাজ খাঁকে বাংলার সিপাহ-সালার নিযুক্ত করে পাঠালেন। বিহারের অধিকাংশ সৈন্য তাঁর সঙ্গে বাংলায় চলে এল। সাহাবাজ অভিজ্ঞ যোদ্ধা, সকল ফ্রণ্টে এক সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার পরিবর্তে দক্ষিণের অধিকাংশ সৈন্যকে রাজধানী তাঁড়ায় ফিরিয়ে এনে সম্মিলিত-বাহিনীসহ চললেন উত্তর-পূর্ব দিকে। তাঁর খ্যাতির কথা আফগানদের জানা ছিল। তার উপরে এই বিরাট বাহিনী দেখে মাসুম খাঁ কাবুলি রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শের পর তিনি সন্ধির প্রস্তাব

দিয়ে মোগল শিবিরে দূত পাঠালে সাহাবাজ খাঁ সে প্রস্তাব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখান করে প্রবল বেগে আক্রমণ শুরু করেন। সে আক্রমণের ধাক্কা সামলাতে না পেরে মাসুম খাঁ অধিকাংশ সৈন্যসহ পুনরায় ঈশা খাঁর রাজ্যে প্রবেশ করেন—তাঁর বাকি সৈন্যরা কুচবিহারে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

এই মোগল-পাঠান যুদ্ধে ঈশা খাঁ এতদিন নিরপেক্ষ থাকলেও মাসুম খাঁ কাবুলিকে আশ্রয় দেবার অপরাধে সাহাবাজ তাঁর ভাটিরাজ্যে প্রবেশ করেন। নারায়ণগঞ্জের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে মোগল ফৌজ সোনারগাঁ ও পরে ঈশা খাঁর সদর কত্রাভূ অধিকার করে নেয়। সেখান থেকে লখিয়া নদী ধরে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থলে এগার-সিন্ধু দুর্গ অধিকারের পর ওই নদীর বিপরীত তীরে শিবির স্থাপন করে সাহাবাজ যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। কিন্তু নৌবাহিনীর স্বল্পতার জন্য সেই নদীবহুল ভূভাগে তিনি কিছুই সুবিধা করতে পারলেন না। সাত মাস ধরে যুদ্ধ চলবার পরও না মাসুম খাঁ কাবুলি না ঈশা খাঁ কেউ বশ্যতা স্বীকার করলেন না, বরং সাহাবাজের সৈন্যাধ্যক্ষ তরসুন খাঁ তাদের হাতে বন্দী হোলেন। শেষ পর্য্যন্ত তাদের কাছে পরাজিত হয়ে তিনি তাঁড়ায় ফিরে এলেন।

ত্রিপুরা যুদ্ধ

ঠিক সেই সময়ে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে মোগলের সঙ্গে ত্রিপুরার বিরোধ দেখা দেয়। বন্দরটি আসলে আরাকানে অবস্থিত হোলেও ত্রিপুরা ও গৌড়ের অধীশ্বররা এর উপর বরাবরই লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। সেই দুই শক্তি ও আরাকানের মধ্যে কয়েকবার যুদ্ধও হয়েছে। কররানিদের উত্তরাধিকারী হিসাবে মোগলরা এই দ্বন্দ্বে যোগ দেওয়ায় তাদের একটি ফৌজ গিয়ে চট্টগ্রামে প্রবেশ করলে ত্রিপুরাধীশ উদয়মাণিক্য তাদের আক্রমণ করেন। বেশ কিছু দিন ধরে উভয় শক্তির মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলে। গোড়ার দিকে মোগলরা বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি, কিন্তু সাহাবাজ খাঁ নূতন নূতন সৈন্য পাঠিয়ে তাদের অবস্থা সঙ্গীন করে তোলেন। শেষ পর্য্যন্ত ত্রিপুরী সৈন্যগণ পরাজিত হয়ে বন্দরটি মোগলের হাতে সমর্পণ করে। এই যুদ্ধে তাদের ৩৪ হাজার সৈন্য বিনষ্ট হয়।

চট্টগ্রাম অধিকৃত হোলেও মোগলের প্রধান শত্রু হয়ে দেখা দেন ভাটির অধীশ্বর ঈশা খাঁ। সাহাবাজ খাঁর মত প্রবীণ যোদ্ধা তাঁকে দমন করতে পারছেন না শুনে আকবর বাংলা ও বিহারের সকল অফিসারের কাছে নির্দেশ পাঠান যেভাবে হোক তাঁকে ধ্বংস করতে হবে। সেই সম্মিলিত মোগলবাহিনী রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হোলে মাসুম খাঁ কাবুলি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন, কিন্তু ক্ষুদ্রতর আফগান সর্দাররা মোগলদের পরাজিত করে একেবারে রাজধানী তাঁড়ার উপকণ্ঠে এসে হাজির হন। অপর কয়েকটি আফগান ফৌজ গিয়ে ঘোড়াঘাট দখল করে। ঈশা খাঁ অক্ষত থাকেন।

উড়িষ্যার সার্বভৌম অধীশ্বর

আফগানদের মধ্যে উড়িষ্যার কতলু খাঁ শুধু সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন না কূটনীতিতে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিছু দিন পূর্বে পিছু হঠতে বাধ্য হোলেও তিনি নিজ শক্তি অটুট রেখেছিলেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে মাসুম খাঁ কাবুলি ও অন্যান্য আফগান সর্দাররা যখন মোগলের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানছিলেন সেই সময়ে তিনি প্রকাশ্য সংগ্রামে লিপ্ত না হয়ে কয়েক ডিভিসন মোগল সৈন্যকে দক্ষিণ সীমান্তে আটকে রাখেন ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের সামরিক বল বাড়িয়ে চলেন। যখন তাঁর কাছে খবর এল যে উত্তর ফ্রন্টের আফগানরা মোগলদের পিছু হটাতে হটাতে রাজধানী তাঁড়ার উপকণ্ঠে ঠেলে এনেছে তখন তিনি নূতন করে যুদ্ধ সুরু করেন। তাঁর আক্রমণ এমনিই তীব্র হয়ে ওঠে যে বাদশাহী ফৌজ পিছু হঠতে হঠতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত চলে আসে। তাদের সাহায্যের জন্য দিল্লী থেকে কয়েক ডিভিসন নূতন সৈন্য এলে যুদ্ধের ধারা বদলে যায়; উজীর খাঁ হেরেবির নেতৃত্বে মোগলরা কতলু খাঁকে তুকারই পর্য্যন্ত ঠেলে নিয়ে যায়।

এই সেই তুকারই যেখানে দাউদ কররানির পরাজয়ের ফলে আফগানদের সূর্য্য অস্তমিত হয়েছিল। সেই থেকে এই স্থানকে আফগানরা অত্যন্ত অশুভ বলে মনে করত। এখানে যুদ্ধ করলে সৈন্যদের উদ্যম পরিপূর্ণরূপে জাগ্রত হবে না ভেবে কতলু খাঁ ৬০টি হস্তীসহ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্রকে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষের কাছে পাঠান সন্ধির কথাবার্তার জন্য। উজীর খাঁ হেরেবি সাময়িকভাবে

যুদ্ধ বন্ধ রেখে এ বিষয়ে সর্বাধিনায়ক সাহাবাজ খাঁর মত চেয়ে পাঠান। তাঁর অবস্থা তখন অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ—উত্তরের আফগানরা তাঁর রাজধানী অবরোধের আয়োজন করছে। এর উপর কতলু খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে হোলে তাঁর পক্ষে সকল দিক সামলান শক্ত হয়ে পড়বে। সেই কারণে তিনি দক্ষিণ সীমান্তে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাবে সম্মতি দিলে যে সন্ধি সম্পাদিত হয় তার সর্তানুসারে কতলু খাঁ লোহানি উড়িষ্যার সার্বভৌম অধীশ্বর বলে স্বীকৃতি লাভ করেন।

সাহাবাজ খাঁ কারারুদ্ধ

আগ্রায় বসে আকবর সাহাবাজ খাঁর সঠিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। তাই সন্ধিপত্র সেখানে পৌছালে তাঁর মনে সন্দেহ হয় যে সেই সালার-এ-সুবা কর্তব্য সম্পাদনে অবহেলা করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে পদচ্যুত করে উজীর খাঁ হেরেবির উপর বাংলার দায়িত্ব প্রদান করেন। সাহাবাজকে আগ্রায় নিয়ে গিয়ে আফগানদের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগে তিন বৎসরের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়।

সপ্তবিংশতি অধ্যায়

বাংলায় মান সিংহ

মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি

১৫৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট বিসূচিকা রোগে উজীর খাঁ হেরেবির মৃত্যু হোলে আকবর বিহারের শাসনকর্তা সৈয়দ খাঁকে বাংলায় বদলি করেন এবং মান সিংহকে পাঞ্জাব থেকে বিহারে এনে আফগান দমনের জন্য বিশেষ দায়িত্ব দেন। পাটনায় এসে মান সিংহ দেখেন যে গিধৌড়রাজ পুরণমল ও খড়্গপুর-রাজ সংগ্রামসিংহ মোগল-পাঠান যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে স্বাধীন হয়ে বসেছেন। আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় সাহাবাজ খাঁ বা তাঁর উত্তরাধিকারী সেই জমিদারদের ধৃষ্টতা দেখেও দেখেন নি বটে কিন্তু মান সিংহ তাঁদের উপেক্ষা করতে পারলেন না। এই সব বিদ্রোহী পকেট পিছনে রেখে আফগানদের দমন করতে গেলে তারা পিছন দিক থেকে বিপদ ঘটাতে পারে। তাই তিনি গিধৌড় আক্রমণ করে সেখানকার মাটির দুর্গ ধূলিসাৎ করেন; অসহায় রাজা পুরণমল আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে মান সিংহের কনিষ্ঠাগ্রজ চন্দ্রভানুর সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত হন। আতঙ্কগ্রস্ত খড়্গপুররাজ বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন।

এই ভাবে বিহারে মোটামুটি শান্তি স্থাপিত হোলে মান সিংহ মোগলের আসল দুষমন আফগানদের দমনের আয়োজন করেন। তাদের প্রধান নায়ক উড়িষ্যার কতলু খাঁ তখন পূর্বযুদ্ধের ধাক্কা সামলে নিয়ে নূতন উদ্যমে মোগলের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য আবার প্রস্তুত হচ্ছেন। বাংলার গোলন্দাজ বাহিনীকে পাটনায় এনে তিনি ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ভাগলপুর ও বর্দ্ধমানের পথ ধরে আরামবাগে এসে ছাউনি ফেলেন। বাংলার সালার-এ-সুবা সৈয়দ খাঁর কাছে

পূর্বে অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন তিনি যেন সসৈন্যে সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

ওদিকে কতলু খাঁ গুপ্তচরমুখে মোগলদের সকল গতিবিধির খবর রাখছিলেন। মান সিংহের আরামবাগ শিবির থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে রায়পুর দুর্গ তখন তাঁর অধিকারভুক্ত। এই স্থানকে কেন্দ্র করে তিনি মোগলের সঙ্গে মোকাবিলা করবেন। দলে দলে আফগান সেখানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় মোগল-পাঠান পরস্পরের সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে লাগল।

দুর্গেশনন্দিনরী অভিনয়

তারপর এখানে অভিনীত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনীর রোমাঞ্চময় কাহিনী। সৈয়দ খাঁর কাছে সৈন্য চেয়ে মান সিংহ তাঁড়ায় যে পত্র পাঠিয়েছিলেন তার জবাবে তিনি জানালেন, তাঁর হাতে যে ফৌজ আছে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে আফগানদের জন্য তাদের তৈরী থাকতে হচ্ছে বলে তিনি আপাততঃ দক্ষিণ সীমান্তে কোন সৈন্য পাঠাতে অক্ষম। পত্রখানি পড়ে মান সিংহ হতাশ হয়ে পড়লেন—নিজের অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ সুরু করতে সাহস পেলেন না। আবার ফিরে যাওয়াও সম্ভব নয়। কারণ, মোগল-বাহিনীর মধ্যমণি বিনাযুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করছেন শুনলে আফগানরা তাঁর দুর্বলতার সন্ধান পেয়ে রাজধানী তাঁড়া পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। তারপর সেখান থেকে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হয়ে দিল্লীর দিকে মার্চ করাও বিচিত্র নয়। বাদশাহ আকবর কোন দিক সামলাবেন? তাঁর তখন বহু সমস্যা। এত ঝুঁকি নেবার লোক মান সিংহ ছিলেন না। তাই সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাল্পতার জন্য কতলু খাঁকে সরাসরি আক্রমণ করবার পরিবর্তে তিনি নিজে আরামবাগে অবস্থান করে পুত্র জগৎ সিংহের উপর আফগানদের প্রতিরোধের দায়িত্ব দিলেন। সেই সময়কার ঘটনাবলীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন:

৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ কৃষ্ণপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলগমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুতবেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। ... ...

অল্পকাল মধ্যে মহারবে নৈদাঘঝটিকা প্রধাবিত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল। ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছুমাত্র স্থিরতা পাইলেন না; অশ্ববল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল। এইরূপ কিয়ৎদূর গমন করিলে ঘোটকচরণে কোন কঠিন দ্রব্য সংঘাতে পদস্খলন হইল। ঐ সময়ে একবার বিদ্যুৎ প্রকাশ হওয়াতে পথিক সম্মুখে প্রকাণ্ড ধবলাকার কোন পদার্থ চকিৎমাত্র দেখিতে পাইলেন। ঐ ধবলাকার স্তূপ অট্টালিকা হইবে, এই বিবেচনায় অশ্বারোহী লাফ দিয়া ভূতলে অবতরণ করিলেন। অবতরণ মাত্র জানিতে পারিলেন যে প্রস্তর নির্মিত সোপানাবলীর সংশ্রবে ঘোটকের চরণস্খলিত হইয়াছিল; অতএব নিকটে আশ্রয়স্থান আছে জানিয়া অশ্বকে ছাড়িয়া দিলেন। ....দ্বার খুলিয়া যাইবামাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন অমনি মন্দির মধ্যে অস্ফূট চীৎকারধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল ও তন্মুহূর্তে মুক্ত দ্বারপথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথায় যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল তাহা নিভিয়া গেল। মন্দির মধ্যে মনুষ্যই বা কে আছে; দেবই বা কি মূর্তি, প্রবেষ্টা তাহার কিছুই দেখিতে পাইলেন না। আপনার অবস্থা এইরূপ দেখিয়া নির্ভীক যুবাপুরুষ কেবল ঈষৎ হাস্য করিয়া, প্রথমতঃ ভক্তিভাবে মন্দির মধ্যস্থ অদৃশ্য দেবমূর্তির উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া অন্ধকার মধ্যে ডাকিয়া কহিলেন, "মন্দির মধ্যে কে আছ?" কেহই প্রশ্নের উত্তর করিল না; কিন্তু অলংকার ঝঙ্কার শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল।

"আপনি কে?" বামাস্বরে মন্দির মধ্য হইতে এই প্রশ্ন হইল। শুনিয়া সবিস্ময়ে পথিক উত্তর করিলেন, "স্বরে বুঝিতেছি যে প্রশ্ন কোন সুন্দরী করিলেন। আমার পরিচয়ে আপনার কি হইবে?"

মন্দির মধ্য হইতে উত্তর হইল, "আমরা বড় ভীত হইয়াছি।"

যুবক তখন কহিলেন, "আমি যে হই, আমাদিগের আত্মপরিচয় দিবার রীতি নাই। কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে অবলা জাতির কোনপ্রকার বিঘ্নের আশংকা নাই।"

রমণী উত্তর করিল, "আপনার কথা শুনিয়া আমার সাহস হইল, এতক্ষণ আমরা ভয়ে মৃতপ্রায় ছিলাম। এখনও আমার সহচরী অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা রহিয়াছে।

আমরা সায়াহ্নকালে এই শৈলেশ্বর শিবপূজার জন্য আসিয়াছিলাম। পরে ঝড় আসিলে, আমাদিগের বাহক, দাস-দাসীগণ আমাদিগকে ফেলিয়া কোথায় গিয়াছে তাহা বলিতে পারি না।"

যুবক কহিলেন, "চিন্তা করিবেন না, আপনারা বিশ্বাস করুন, কাল প্রাতে আমি আপনাদিগকে গৃহে রাখিয়া আসিব।"

রমণী কহিল, "শৈলেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।"

শৈলেশ্বর মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া জগৎ সিংহ পিতৃশিবিরে উপস্থিত হইলে পর, মহারাজ মান সিংহ পুত্র প্রমুখাৎ অবগত হইলেন যে, প্রায় পঞ্চাশৎ সহস্র পাঠান সেনা ধরপুর গ্রামের নিকট শিবির সংস্থাপন করিয়া নিকটস্থ গ্রাম সকল লুণ্ঠন করিতেছে এবং স্থানে স্থানে দুর্গ নির্মাণ বা অধিকার করিয়া তদাশ্রয়ে একপ্রকার নির্বিঘ্নে আছে। মানসিংহ দেখিলেন যে, পাঠানদিগের দুর্বৃত্তির আশু দমন নিতান্তই আবশ্যক হইয়াছে, কিন্তু একার্য্য অতি দুঃসাধ্য। কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণের জন্য সমভিব্যাহারি সেনাপতিগণকে একত্রিত করিয়া এই সকল বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন এবং কহিলেন, "দিনে দিনে গ্রাম গ্রাম, পরগণা পরগণা দিল্লীশ্বরের হস্তস্খলিত হইয়াছে। এক্ষণে পাঠানদিগকে শাসিত না করিলেই নয়, কিন্তু কি প্রকারেই বা তাহাদিগের শাসন হয়? তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা সংখ্যায় বলবান; তাহাতে আবার দুর্গশ্রেণীর আশ্রয়ে থাকিয়া যুদ্ধ করিবে; যুদ্ধে পরাজিত করিলেও তাহাদিগকে বিনষ্ট বা স্থানচ্যুত করিতে পারিব না; সহজেই দুর্গমধ্যে নিরাপদ হইতে পারিবে। কিন্তু সকলে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি রণে আমাদিগকে বিজিত হইতে হয়, তবে শত্রুর অধিকার মধ্যে নিরাশ্রয়ে একেবারে বিনষ্ট হইতে হইবে।...সৈয়দ খাঁর প্রতিক্ষা করা উচিত হইতেছে। অথচ বৈরী শাসনের আশু কোন উপায় করাও আবশ্যক হইতেছে। তোমরা কি পরামর্শ দাও?"

বৃদ্ধ সেনাপতিগণ সকলেই একমত হইয়া এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে, আপাততঃ সৈয়দ খাঁর প্রতিক্ষায় থাকাই কর্তব্য। রাজা মান সিংহ কহিলেন, "আমি অভিপ্রায় করিতেছি যে, সমুদয় সৈন্য নাশের সম্ভাবনা না রাখিয়া কেবল অল্প সংখ্যক সৈন্য কোন দক্ষ সেনাপতির সহিত শত্রুর সম্মুখে প্রেরণ করিব।"

একজন প্রাচীন মোগল সৈনিক কহিলেন, “মহারাজ! যথা তাবৎ সেনা পাঠাইতে আশংকা তথা অল্প সংখ্যক সেনার দ্বারা কোন কার্য্য সাধন হইবে?”

মান সিংহ কহিলেন, “অল্প সেনা সম্মুখরণে অগ্রসর হইতে পাঠাইতে চাহিতেছি না। ক্ষুদ্রবল অস্পষ্ট থাকিয়া গ্রাম পীড়নাশক্ত পাঠানদিগের সামান্য দলসকল কতক দমনে রাখিতে পারিবে।”

তখন মোগল কহিল, “মহারাজ! নিশ্চিত কালগ্রাসে কোন সেনাপতি যাইবে?”

মান সিংহ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন, “কি! এত রাজপুত ও মোগলের মধ্যে মৃত্যুকে ভয় করে না এমন কি কেহই নাই?”

এই কথা শ্রুতিমাত্র পাঁচ-সাত জন মোগল ও রাজপুত গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, “মহারাজ! দাসেরা যাইতে প্রস্তুত আছে।” জগৎ সিংহও তথায় উপস্থিত ছিলেন; তিনি সর্বাপেক্ষা বয়োঃকনিষ্ঠ, সকলের পশ্চাতে থাকিয়া কহিলেন, “অনুমতি হইলে এ দাসও দিল্লীশ্বরের কার্য্য সাধনে যত্ন করে।”

আবুল ফজলের ভাষ্য

এইখানে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে বিদায় নিয়ে সমসাময়িক ঐতিহাসিক আবুল ফজল আলামির স্মরণাপন্ন হচ্ছি। আবুল ফজল বলেন: শত্রুর সন্ধানে বেপরোয়াভাবে ঘুরতে ঘুরতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দের ২১শে মে সন্ধ্যার দিকে জগৎ সিংহ বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীরের রাজ্যের প্রত্যন্তভাগে এক প্রান্তরের মধ্যে বিশ্রাম করছিলেন। সারাদিন অসহ্য গরমের পর এখন মৃদু হাওয়া বইছে। তাই ক্লান্তি অপনোদনের জন্য সরাব পান করে তিনি কিছুটা বেহুঁস হয়ে পড়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর সৈন্যরা দেখে যে পাশের জঙ্গলের ভিতর থেকে ওমরের অধীনে একদল আফগান অশ্বারোহী বেরিয়ে এসে তাদের দিকে তীর বেগে এগিয়ে আসছে। তাদের আকস্মিক আক্রমণ পরিহারের জন্য জগৎ সিংহের অধিকাংশ অনুচর ঘোড়ায় উঠে চম্পট দেয়, কেবল বিকা রাঠোর, মহেশ দাশ ও নাড়ু চরণ প্রমুখ কয়েকজন যোদ্ধা নায়ককে ঘিরে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ শত্রুর সঙ্গে তাঁরা পেরে উঠবে কেন? তাদের সবাইকে শমন সদনে পাঠিয়ে আফগানরা রক্তাক্ত কলেবর জগৎ সিংহকে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়।

আজ আফগানদের কত আনন্দ! মান সিংহের পুত্রকে হস্তগত করে তারা যে সুবিধা পেয়েছে সমগ্র মোগলবাহিনীকে পরাভূত করলে তার চেয়ে বেশী কিছু পেত না। পুত্রের মুক্তির জন্য মান সিংহ তাদের বহু সর্তই মেনে নেবেন। তারা বলবেঃ মোগল সেনাপতি! বাংলা ছেড়ে চলে যাও, তোমার পুত্রকে অক্ষত দেহে তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব। এই হিতবাক্যে তিনি যদি কর্ণপাত না করেন তাহোলে রণক্ষেত্রে গিয়ে দেখবেন যে উচ্চ স্তম্ভের উপর পুত্রের মৃতদেহ লটকান রয়েছে। মৃত জগৎ সিংহের চেয়ে জীবিত জগৎ সিংহের মূল্য আফগানদের কাছে অনেক বেশী। তাই তাঁর রক্তপাত বন্ধ করবার জন্য তাদের নায়ক বাহাদুর খাঁ সঙ্গে সঙ্গে শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেন।

আফগানরা মান সিংহকে চেনে নি। তাঁর কাছে গিয়ে যখন এই দুঃসংবাদ পৌছায় তখন চারিদিকে গুজব উঠেছে যে জগৎ সিংহ আর ইহজগতে নেই। চিন্তাব্যাকুল সৈন্যাধ্যক্ষগণ মান সিংহকে পরামর্শ দিলেন যে এর পর আর যুদ্ধ চালান উচিত হবে না, সমগ্র বাহিনীসহ সেলিমাবাদে ফিরে যাওয়া কর্তব্য; পরে সৈয়দ খাঁর সৈন্যরা এসে পৌছালে তাদের নিয়ে শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করা যাবে। কিন্তু মান সিংহ অটল। রাজপুত আমি, যে আফগানকে তাদের পিতৃভূমি আফগানিস্থানে পঙ্গু করে দিয়েছি তার ভয়ে বাংলা ছেড়ে পালিয়ে যাব? রাজপুত নামে কলঙ্ক লেপন করব? জগৎ সিংহ গিয়েছে—যাক। তার জন্য এক হাতে অশ্রুজল মুছব আর অন্য হাতে কতলু খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করব।

জগৎ সিংহের জীবনই রোমাঞ্চময়! আফগানরা যখন তাঁকে তাদের সুলতান কতলু খাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে উপহার দেবার আয়োজন করছিল সেই সময়ে বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীরের সৈন্যরা এসে তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল। মোগল-পাঠান যুদ্ধে যখন তাদের প্রভু নিরপেক্ষ তখন তারা কোন পক্ষের সৈন্যকে নিজ রাজ্যের ভিতর দিয়ে যেতে দেবে না। আফগান সৈন্যাধ্যক্ষ বাহাদুর খাঁ তরবারি কোষবদ্ধ ও বন্দুক টোটাহীন করে বললেনঃ বিষ্ণুপুররাজের সার্বভৌমত্ব আমরা স্বীকার করি। রাজা বীর হাম্বীরের প্রতি নেপথ্যে সেলাম জানাচ্ছি। আফগানদের দুষমন তিনি নন—মোগল। তাঁর সঙ্গে আফগানরা যুদ্ধ করবে না, তারা তাঁর রাজ্যের মধ্যে থাকতেও চায় না; শুধু বন্দী জগৎ সিংহকে নিয়ে এই রাজ্যের বাইরে যেতে পারলে সুখী হবে। কিন্তু এই প্রস্তাবে

বিষ্ণুপুর সৈন্যাধ্যক্ষ অসম্মতি জানিয়ে বিদ্যুৎগতিতে জগৎ সিংহকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজ রাজধানীর দিকে চলে গেলেন। রাজা বীর হাম্বীর বিশেষ চিকিৎসক নিয়োগ করে আহত রাজকুমারকে নিরাময় করে তোলেন—দুর্গেশনন্দিনী তিলোত্তমা বা ওসমান খাঁর প্রেমিকা আয়েষা নন।

কতলু খাঁর মৃত্যু

মান সিংহের মানসিক দৃঢ়তা সেবার মোগলকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচালেও শক্তির ভারসাম্য আফগানদের হাতে থেকে যায়। কিন্তু তাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই তারা যখন ক্ষীয়মান মোগল বাহিনীর উপর চরম আঘাত হানবার আয়োজন করছে সেই সময়ে তাদের শিবিরের উপর নেমে আসে বিষাদের কালো ছায়া। সর্বাধিনায়ক কতলু খাঁ লোহানি যখন পরবর্তী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন এক দিন হঠাৎ তাঁর শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং চিকিৎসকদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে অল্প রোগভোগের পর তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। জগৎ সিংহ তখনও বিষ্ণুপুর প্রাসাদে রোগশয্যায় শায়িত—সেটি তাঁর আঘাতের নবম দিবস।

শের শাহর তিরোধানের পর কতলু খাঁ লোহানির মত প্রতিভাবান রণনায়ক আফগানদের মধ্যে আর কেউ জন্মায় নি। মোগলের চাপে যে আফগান শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তাঁর নেতৃত্বের ফলে তারা নূতন জীবন লাভ করে—মোগলকে পাল্টা আক্রমণ করবার শক্তি ফিরে পায়। দাউদ কররানি যেক্ষেত্রে বিনাযুদ্ধে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা মোগলের হাতে সমর্পণ করেছিলেন সেক্ষেত্রে নামমাত্র সম্বল নিয়ে কতলু খাঁ আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত উড়িষ্যার সার্বভৌম অধীশ্বর বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। প্রধানতঃ দক্ষিণ থেকে তাঁর এবং উত্তর থেকে মাসুম খাঁ কাবুলির প্রতিরোধের ফলে পূর্ব ভারতের উপর মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা এত দিনে সম্ভব হচ্ছিল না, মোগল সেনাপতিদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছিল।

সেই কতলু খাঁ এখন পরলোকে। বঙ্কিমচন্দ্রের নবাব কতলু খাঁ আর ইহলোকে নেই। এর পর আফগানদের চালাবে কে? কতলুর বালক পুত্র নাসির খাঁকে উড়িষ্যার মসনদে বসিয়ে অসহায় উজীর খাজা ঈশা সন্ধির প্রস্তাব

করে মান সিংহের কাছে দূত পাঠালেন। মোগল সেনাপতির মন তখন অবসাদ-গ্রস্ত—জগৎ সিংহকে নিয়ে বিষ্ণুপুর প্রাসাদে যমে মানুষে লড়াই চলছে। তার উপর তাঁর সৈন্যসংখ্যা একেবারেই নগণ্য। সকল দিক বিবেচনা করে তিনি খাজা ঈশার প্রস্তাবে সম্মতি দিলে স্থির হোল যে বালক নাসির খাঁ আকবরের করদ রাজারূপে উড়িষ্যা শাসন করবে, তাঁর শাসনাধীন জনপদের সর্বত্র বাদশাহের নামে খুৎবা পাঠ হবে। কেবল পুরীর মহামন্দির ও সন্নিহিত অঞ্চলের উপর তাঁর কোন অধিকার থাকবে না, বাদশাহের হয়ে রাজা মান সিংহ বা তাঁর প্রতিনিধি সেখানকার শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করবেন। এই সর্তে সন্ধি সম্পাদনের জন্য বালক সুলতান নাসির খাঁ উজীর সমভিব্যহারে ১৫০টি হস্তী ও বহু মূল্যবান উপহারসহ মান সিংহের তাঁবুতে এসে তাঁকে কুর্নীশ করলেন। রাজা মানসিংহ নাসিরকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বহু সদুপদেশ দিলেন, বললেন যে মোগলের অনুগত থাকলে আফগানদের লাভ বই লোকসান হবে না। নাসির ও খাজা ঈশা সেকথা মেনে নিয়ে কটকে ফিরে গেলেন।

মান সিংহও পাটনার দিকে রওনা হোলেন।

মরেও না মরে রাম

নেকড়ে বাঘ নেকড়ে বাঘ—আফগান আফগান। কেউই তাদের রং বদলায় না। মোগলদের সঙ্গে সন্ধি সম্পাদনের দুই বৎসর পরে উজীর খাজা ঈশার মৃত্যু হোলে আফগানরা আবার নিজ মূর্তি ধারণ করে। কিসের সন্ধি? দুষমন মোগলের সঙ্গে সন্ধি কিসের? আকবরকে বাদ দিয়ে উড়িষ্যার সর্বত্র নাসির খাঁর নামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচার সুরু হোল, মোগলের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আবার প্রস্তুতি চলতে লাগল। মান সিংহ আফগানদের সকল দুর্গতির মূল বলে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন জগন্নাথক্ষেত্রের উপর হামলা করে তাদের এই নূতন অভিযান সুরু হয়। পূর্বে তারা রাজা বীর হাম্বীকে নিরপেক্ষ বলে জানত—সেজন্য সম্মানও করত। কিন্তু তিনি যখন বন্দী জগৎ সিংহকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তখন আর তাঁকে নিরপেক্ষ বলা চলে না। আফগান সৈন্যরা তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করে কয়েক দিন ধরে লুঠপাট চালাল ও পরে আরও অগ্রসর হয়ে সুবর্ণরেখা নদী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করে নিল।

পাটনায় মানসিংহের কাছে সব খবর পৌছাচ্ছিল। আফগানদের তিনি ভাল করে চিনতেন, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে তারা আবার মাথা তুলে দাঁড়াবে সেকথা ভাবতে পারেন নি। তাদের দমন করবার জন্য ১৫৯১ খৃষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর তিনি আর একবার পাটনা থেকে রওনা হোলেন। এবার বাংলার সালার-এ-সুবা সৈয়দ খাঁ সসৈন্যে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেওয়ায় সম্মিলিত বাহিনী নিয়ে জলেশ্বর পর্য্যন্ত ভূভাগ অধিকার করতে তাঁর অসুবিধা হোল না। তারপর থেকে চলে আফগানদের সঙ্গে বিরামহীন যুদ্ধ। ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আফগানরা প্রতিনিয়ত মোগল শিবিরের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের অস্থির করতে লাগল। এইভাবে কয়েক মাস কাটাবার পর ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল আফগানরা আবার উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে সুবর্ণ-রেখা পার হোলে উভয়পক্ষে বিরাটাকারে সংগ্রাম সুরু হয়। গোড়ার দিকে মোগলদের অবস্থা বেশ সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল, কিন্তু জগৎসিংহ ও তাঁর ভ্রাতা দুর্জন সিংহের অপূর্ব রণনৈপুণ্যের জন্য আফগানরা শেষ পর্য্যন্ত রণে ভঙ্গ দেয়। তাদের নূতন সেনাপতি ওসমান খাঁ—আয়েষার প্রেমিক ওসমান—অল্পের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পান।

আফগানরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালাতে আরম্ভ করলে মোগল সৈন্যগণ তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে জলেশ্বরে গিয়ে উপনীত হয়। সেখানে আবার আকবরের নামে খুৎবা পাঠ সুরু হয় ও মোগল সৈন্যরা নেচে গেয়ে বিজয়োৎসব পালন করতে থাকে। কিন্তু বাংলার সালার-এ-সুবা সৈয়দ খাঁর মনে শান্তি নেই। তিনি এত প্রাণপাত করে লড়লেন, অথচ সবাই মান সিংহের জয়ধ্বনি করে—কেউ তাঁর নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে না। ঈর্ষা মানুষকে অন্ধ করে দেয়! ঈর্ষাদগ্ধ হৃদয়ে সৈয়দ খাঁ শত্রুর কথা বিস্মৃত হয়ে নিজ সৈন্যবাহিনীসহ তাঁড়ায় ফিরে গেলেন। তাতে মান সিংহের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে উঠলেও তিনি নিজ সৈন্যদের নিয়ে অগ্রসর হোতে লাগলেন। মোগল শিবিরে এই মনোমালিন্যের সংবাদ হয় তো আফগানদের কাছে পৌচেছিল, হয় তো পৌছায় নি। কিন্তু তারা এমনই ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে এসব দেখবার মনোবৃত্তিও তাদের ছিল না। আফগান পেছিয়ে পড়ল, কিন্তু মান সিংহের বিশ্রাম মিলল না, তাঁর বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিলেন খুরদারাজ রামচন্দ্রদেব।

রাজা রামচন্দ্রদেব

বিনা বাধায় ভদ্রক পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়ে মান সিংহ শোনেন যে আফগানরা আবার সারনগড় দুর্গের কাছে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। উড়িষ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সামন্ত নরপতি খুরদারাজের অধিকারের মধ্যে অবস্থিত এই দুর্জয় দুর্গ সারণগড়। গোয়ালিয়র ও রোহ্‌টাস দুর্গের মতই সুদৃঢ় তার রক্ষাব্যবস্থা। সেই দুর্গ জয়ের চেষ্টায় শক্তির অপব্যয় না করে মান সিংহ চলে গেলেন কটকের দিকে। সেখানে যতখানি প্রতিরোধ তিনি আশা করেছিলেন তার কিছুই দেখা গেল না, যে মুষ্টিমেয় আফগান সেখানে ছিল তারা স্বেচ্ছায় তাঁর হাতে রাজধানী তুলে দিল। আউল ও আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গও সহজে তাঁর হস্তগত হোল। তারপর কয়েকদিন জগন্নাথক্ষেত্রে কাটিয়ে মানসিংহ খুরদারাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা রামচন্দ্রদেব দেখলেন যে আফগানদের পতনের ফলে তিনি অসহায় হয়ে পড়েছেন—বহু আফগান হয়তো বা এখন মোগলের হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। সেই অসম যুদ্ধে সাফল্যলাভ করা সম্ভব হবে না বুঝে তিনি সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে পুত্র বীরবরকে মানসিংহের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ঠিক সেই সময়ে মোগল সেনাপতির কাছে খবর এল যে আফগানরা তাঁর পশ্চাদ্ভাগে আবার সক্রিয় হয়ে জলেশ্বর কেড়ে নিয়েছে। এই পটভূমিকায় আফগানপক্ষীয় রামচন্দ্রদেবের সঙ্গে সন্ধির আলোচনা অসঙ্গত বিবেচনা করে তিনি অর্দ্ধেক সৈন্যকে আফগানদের বিরুদ্ধে এবং বাকি অর্দ্ধেককে পুত্র জগৎ সিংহের নেতৃত্বে খুরদারাজের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন।

যুবরাজ বীরবর কিন্তু মান সিংহের শিবিরে যাতায়াত করতে লাগলেন। মোগল সেনাপতি লক্ষ্য করলেন যে খুরদারাজ আফগানদের ত্যাগ করে মোগল পক্ষে যোগ দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন বটে কিন্তু তিনি নিজে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছেন না। তাঁর সন্দেহ হোল যে রামচন্দ্রদেব হয়তো বা রাণা প্রতাপের মত তাঁর সান্নিধ্য পরিহার করতে চাইছেন। অথচ এরূপ করবার কারণ নেই। তিনি কি রামচন্দ্রদেবের চেয়ে কম হিন্দু? এই তো সেদিন তিনি আফগানদের হাত থেকে জগন্নাথক্ষেত্র মুক্ত করেছেন; অথচ খুরদারাজ সেজন্য তাঁর প্রতি কোন কৃতজ্ঞতা জানান দূরের কথা বরং আফগানদের সাহায্য করেছেন। রামচন্দ্রদেবের শাস্তি বিধানের জন্য মান সিংহ যুবরাজ

বীরবরকে রিক্তহস্তে পিতার কাছে পাঠিয়ে নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করলেন। সারণগড় দুর্গ তাঁর চাই, আর চাই রাজা রামচন্দ্রদেবকে। তাঁর আক্রমণে খুরদা রাজ্যের ক্ষুদ্রতর দুর্গগুলির একে একে পতন হোলে রামচন্দ্রদেব গিয়ে খুরদা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। ওই দুর্গ অধিকারের জন্য উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলতে লাগল। আগ্রায় আকবরের কাছে এই সংবাদ পৌছালে এক মিত্ররাজ্যের বিরুদ্ধে এই অহেতুক কঠোরতার জন্য তিনি বিস্মিত হোলেন। দ্রুতগামী এক দূত পাঠিয়ে মান সিংহকে নির্দেশ দিলেন যে রামচন্দ্রদেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যেন এখনই বন্ধ করা হয়। এক সুপ্রাচীন রাজ-বংশের সন্তান রামচন্দ্রদেব—তাঁর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করে তিনি চেঙ্গিজ বংশে কলঙ্ক লেপন করবেন না।

মান সিংহের কঠোরতায় যা সম্ভব হয় নি আকবরের কোমলতায় তাই হোল। বাদশাহর বাণী রামচন্দ্রদেবের কাছে পৌছালে তিনি ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী পাত্রমিত্র সঙ্গে নিয়ে মান সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মোগল সেনাপতির মনোব্যথা তিনি জানতেন, তাই তাঁকে যে পংক্তিবহির্ভূত ব্যক্তি বলে মনে করেন না তার প্রমাণ দেবার জন্য নিজের এক কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহে সম্মতি দিলেন। যুদ্ধক্ষেত্র বিবাহ বাসরে পরিণত হোল! বিবাহান্তে মানসিংহ নূতন শ্বশুরকে উড়িষ্যা ও অ ার প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত মানপুর দুর্গ উপহার দিয়ে সম্মান দেখালেন।

বাংলার সুবাদার নিযুক্ত

আফগান বিদ্রোহ দমনের এক বৎসর পরে মান সিংহ ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারী লাহোরে গিয়ে বাদশাহ আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সঙ্গে নিয়ে যান কতলু খাঁর তিন পুত্র এবং উড়িষ্যার প্রাক্তন আফগানপক্ষীয় দুজন সামন্ত পুরুষোত্তম ও কাশী পারিজাকে। বাদশাহ সবাইকে যথোচিত মর্য্যাদা দিয়ে বলেন যে মোগলের সঙ্গে বিরোধীতায় কোন লাভ হবে না; পূর্বের সমস্ত তিক্ততার কথা ভুলে যদি তাঁরা সংযোগিতা করেন তাহোলে নিজ নিজ রাজ্য নির্বিঘ্নে ভোগ করতে পারবেন। সবাই তাঁর কথা মেনে নিয়ে দিল্লীশ্বরের প্রতি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

কিছু দিন ধরে আকবর শাহ্‌জাদা সেলিমের পদোন্নতির কথা চিন্তা করছিলেন। ১৭ই মার্চ তারিখে এক দরবার আহ্বান করে তাঁকে দশ হা মনসবদার নিয়োগ করেন এবং শ্যালক মান সিংহের উপর তাঁর অভিভাবকত্বের দায়িত্ব দেন। ব্যবস্থা হোল যে সেলিম যত দিন না সর্ব্ব বিষয়ে পারদর্শী হন তত দিন মান সিংহ থাকবেন তাঁর আতালিক। জগৎ সিংহ, দুর্জন সিংহ প্রভৃতি যেসব বীর আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন তাঁদেরও মনসবদারি বাড়িয়ে বাংলার বিভিন্ন স্থানে জায়গীর দেওয়া হয়। লোহানি ও শূরবংশীয় যেসব আফগান সর্দার বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন তাঁদের কথাও বাদশাহ্‌ ভোলেন নি ; তাঁরা উড়িষ্যায় জায়গীর পান।

তীক্ষ্ণধী আকবর বুঝেছিলেন যে আফগানরা বারবার যুদ্ধে পরাজিত হয়েও যখন অস্ত্র সংবরণ করে নি তখন তাদের আঘাতশক্তি এখনও যথেষ্ট রয়েছে। মান সিংহ ছাড়া সেই দুষমনদের সম্মুখীন হবার মত যোগ্যতা কার আছে? আফগানিস্থানে তিনি তাদের দমন করেছিলেন, সম্প্রতি উড়িষ্যায়ও করেছেন। সেই কারণে তিনি একদিকে থাকুন সেলিমের আতালিক এবং অন্যদিকে গ্রহণ করুন আফগান নিধনের দায়িত্ব। সকল দিক বিবেচনা করে আকবর তাঁকে ৪ঠা মে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে তাঁড়ায় পাঠিয়ে দিলেন। সৈয়দ খাঁকে বদলি করা হোল বিহারে।

রাজমহল নগরের প্রতিষ্ঠা

তাঁড়ায় এসে মান সিংহ দেখেন রাজধানী রাখবার পক্ষে জায়গাটি একেবারেই অনুপযুক্ত। গৌড় এ বিষয়ে আদর্শ স্থান। সব অঞ্চলের সঙ্গে এই নগরীর যোগাযোগ রয়েছে এবং ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। এই সব বিবেচনা করে কয়েক বৎসর পূর্বে খান-ই-আজম সেখানে রাজধানী অপসারিত করেছিলেন। কিন্তু সে সময়কার মহামারীর কথা স্মরণ করে আজও সবাই শিউরে ওঠে। যেখানে যাওয়া সম্ভব না হোলেও তাঁড়ার মত এক পাণ্ডব বর্জিত স্থানে রাজধানী রাখা উচিত নয়। বহু অন্বেষণের পর মান সিংহ দেখলেন যে আগমহল জায়গাটি খুবই সুন্দর। গৌড় ও তাঁড়া থেকে কাছে, অথচ জলহাওয়া ভাল এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তম। সেখানে রাজধানী অপসারণের প্রস্তাব আকবরের কাছে পাঠালে

তিনি তাতে সম্মতি দেওয়ায় ১৫৯৪ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর সারা বাংলার নূতন রাজধানী আগমহলে স্থাপিত হোল। জয়পুর ও আগ্রা থেকে অভিজ্ঞ স্থপতিদের এনে মান সিংহ তাদের উপর পথঘাট, প্রাসাদ, উদ্যান প্রভৃতি নির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি দুর্গ নির্মাণের আয়োজনও চলতে থাকে। স্থির হয় যে ফৌজী দপ্তর ও সাধারণ শাসনকার্য্যের ব্যয় নির্বাহ করে যা কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে আপাততঃ তার সবটুকু নগরী নির্মাণের জন্য ব্যয়িত হবে। তারপর নামকরণের পালা। বাদশাহর নামানুসারে মান সিংহ আগমহলের নাম দিলেন আকবরনগর, কিন্তু জনসাধারণ তাঁরই নামানুসারে বলতে লাগল রাজমহল।

আবার আফগান যুদ্ধ

আকবর ঠিকই অনুমান করেছিলেন। এক বৎসর পূর্বে মান সিংহ আফগানদের হাত থেকে নূতন করে উড়িষ্যা জয় করলেও রোগবীজাণু ধ্বংস করতে পারেন নি। পরাজিত আফগান সর্দাররা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে স্থানীয় জমিদারদের কাঁধে ভর করে আবার মাথা তোলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান খাঁ তাদের একাংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করে দলবলসহ সপ্তগ্রামের আশপাশে লুঠপাট সুরু করেন। মানসিংহের এক পুত্র তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করলে তিনি ভূষণায় গিয়ে রাজা চাঁদ রায়কে হত্যা করেন এবং পরে ভাটির জমিদার ঈশা খাঁর দলে যোগ দেন।

প্রাক্তন সিপাহশালার সৈয়দ খাঁ এই আফগান বিদ্রোহীদের দেখেও দেখেন নি। তাই মান সিংহকে তাদের কাছ থেকে বেশ কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হোতে হয়। তাঁর এক পুত্র হিম্মৎ সিংহ ভূষণা জয় করলে তারা দল বেঁধে ঈশা খাঁর রাজ্যে চলে গিয়ে নূতন করে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। কিছু দিন পরে সেই ভূষণাও যখন আফগানরা পুনরুদ্ধার করল মান সিংহ তখন নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর রাজমহল থেকে রওনা হয়ে তিনি তাদের বিরুদ্ধে অভিযান সুরু করেন। তাঁর আগমন সংবাদে আফগানরা ব্রহ্মপুত্রের ওপারে চলে যায়, কিন্তু তাদের সৈন্যবল অটুট থাকে। মাসের পর মাস ধরে এমনি লুকোচুরি খেলা চলবার পর যখন বর্ষা নামল মান সিংহ তখন ঘোড়াঘাটে এমন গুরুতর

পীড়ায় আক্রান্ত হোলেন যে বৈদ্যরা তাঁর জীবনের আশা ছেড়ে দিলেন। এই খবর আফগানদের কাছে পৌছালে তাদের উল্লাস আর ধরে না। সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যে এক মান সিংহ ছাড়া তাদের ভয় করবার আর কেউ নেই। সেই মান সিংহ যদি লোকান্তরিত হন তাদের চাঁদ রাহুমুক্ত হবে।

মানসিংহের মৃত্যু আসন্ন শুনে মাসুম খাঁ কাবুলি দীর্ঘদিনের অজ্ঞাতবাস থেকে বেরিয়ে এসে ভাটির আফগানদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ও ঈশা খাঁর সৈন্যগণ সম্মিলিতভাবে এক বিরাট নৌবহর নিয়ে ঘোড়াঘাটের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু তাদের অদৃষ্ট ছিল মন্দ, তাই গন্তব্যস্থানের চব্বিশ মাইলের মধ্যে গিয়ে দেখে যে নদীর জল প্রায় শুকিয়ে গেছে—নৌকা আর চলে না। সেখানে অবস্থান করলে স্থলপথ ধরে মোগল অশ্বারোহীরা এসে তাদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলবে বুঝে ঈশা খাঁ ও মাসুম খাঁ কাবুলি ত্রস্তগতিতে নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে এলেন।

এদিকে চিকিৎসকদের সকল অনুমান ব্যর্থ করে মান সিংহ ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হোলেন। শারীরিক দুর্বলতার জন্য নিজে রণক্ষেত্রে যাবার মত শক্তি না থাকলেও পুত্র হিম্মৎ সিংহ তাঁর নির্দেশে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হোল। সেই বিশাল মোগলবাহিনীর সম্মুখীন হওয়া সাধ্যাতীত বুঝে ঈশা খাঁ ব্রহ্মপুত্রের ওপারে চলে গিয়ে কিছুদিন লুকোচুরি খেলেন ও তারপর কুচবিহার রাজ্যের গৃহবিবাদে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। তার ফলে মোগল-পাঠান যুদ্ধ ব্যাপকতর হয়ে ওঠে।

কুচবিহার মোগলের মিত্ররাজ্যে পরিণত

পূর্বের এক অধ্যায়ে বলেছি যে কুচবিহারাধিপতি নরনারায়ণ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর বিশাল রাজ্য দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিমার্দ্ধ কুচবিহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণকে ও পূর্বার্দ্ধ কুচহাজো বা কামরূপ ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুরায়কে দিয়ে যান। এর ফলে উভয় রাজ্যই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং উভয়ের মধ্যে তুচ্ছ কারণে মাঝে মাঝে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। সামরিক সংঘর্ষ অবশ্য হয় নি, কিন্তু শত্রুরা দুই রাজ পরিবারের মনান্তরের সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে। মোগল-পাঠান যুদ্ধে কুচবিহার নিরপেক্ষ থাকলেও কালাপাহাড়, বাবা মাঙ্কালি প্রভৃতি আফগান সৈন্যাধ্যক্ষরা

মোগলের কাছে পরাজিত হয়ে যখন সসৈন্যে কুচবিহারে প্রবেশ করেন রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ তাঁদের বাধা দিতে পারেন নি। তাঁর এই দুর্বলতা লক্ষ্য করে ভাটির সুলতান ঈশা খাঁ অতি সহজে উভয় কোচ রাজ্য থেকে কিঞ্চিত ভূভাগ জবর দখল করে নেন। তারপর সমগ্র কুচবিহার গ্রাসের জন্য তিনি কামরূপরাজ রঘুরায়কে দলে টেনে নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরে চক্রান্ত চালান। রঘুরায় ঈশা খাঁকে ভাল করে চিনতেন—তাঁর সুবিধার জন্য জ্ঞাতির সঙ্গে যুদ্ধে বিরত থাকেন। কিন্তু যখন দেখলেন যে মোগল সাম্রাজ্যের সংহতি সাধনের জন্য মান সিংহ এগিয়ে আসছেন তখন ঈশা খাঁকে দলে টেনে নিয়ে কুচবিহার আক্রমণ করেন। ঈশা খাঁর কাছ থেকে তাঁর কোন ভয় নেই, কারণ তাঁকে সংযত করবার জন্য মান সিংহ রয়েছেন!

কুচবিহারের লক্ষাধিক সৈন্য তখন সম্ভাব্য মোগল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য দক্ষিণ সীমান্তে ব্যূহ বিন্যাস করে বসে রয়েছে। তাই পূর্ব সীমান্তে রঘুরায়ের অতর্কিত আক্রমণে বিস্মিত হয়ে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মোগল সেনা-পতিরই স্মরণাপন্ন হোলেন। রাজা মান সিংহ যখন শুনলেন যে মোগলের শত্রু ঈশা খাঁ রঘুরায়ের পক্ষে রয়েছেন তখন লক্ষ্মীনারায়ণের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না। তিনি সসৈন্যে কুচবিহারে প্রবেশ করলে রাজা লক্ষ্মী-নারায়ণ নিজ রাজধানী থেকে এগিয়ে এসে গোবিন্দপুর গ্রামে তাঁকে সাদর সম্ভাষণ জানান। মান সিংহ বাহ্যতঃ খুশী হোলেও মনে মনে ভাবলেন যে বিপদের সময়ে সামরিক সাহায্য পেয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ উদারতা দেখাচ্ছেন বটে কিন্তু বিপদ কাটলে যে তাঁকে রাণা প্রতাপের মত অপাংক্তেয় মনে করবেন না তার নিশ্চয়তা কোথায়? কাউকে বিশ্বাস নেই। মান সিংহের এই মনোভাব জ্ঞাত হয়ে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ নিজ ভগ্নীর সঙ্গে সেই প্রৌঢ়ের বিবাহে সম্মতি দিলেন। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর বিবাহ সম্পন্ন হোলে রঘুরায়ের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তিনি ও ঈশা খাঁ নিঃশব্দে কুচবিহার ছেড়ে নিজ নিজ রাজ্যে চলে গেলেন।

কিছু দিন পরে বিসূচিকা রোগে মান সিংহের এক পুত্র হিম্মৎ সিংহের মৃত্যু হওয়ায় তিনি শোকে এমনই মুহ্যমান হয়ে পড়েন যে সকল ফ্রণ্টে যুদ্ধ বন্ধ থাকে। সেই সুযোগে রঘুরায় আবার এসে কুচবিহারের অভ্যন্তরে বেশ কিছু

দূর ঢুকে পড়ে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে এক দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করেন। এই সংবাদ মোগল শিবিরে পৌছালে মান সিংহ নূতন শ্যালকের সাহায্যার্থ এক ডিভিসন সৈন্য পাঠিয়ে দিলে রঘুরায় কুচবিহার ছেড়ে চলে যান। মিত্রের এই বিপদে ঈশা খাঁ চুপ করে থাকতে পারেন নি, রঘুরায়কে সাহায্যের জন্য সসৈন্যে তাঁর কাছে চলে আসেন। মোগল-পাঠান যুদ্ধে কুচবিহার এক নূতন রণভূমিতে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

মান সিংহ যখন শুনলেন যে ঈশা খাঁ স্বরাজ্য ছেড়ে কামরূপে চলে এসেছেন তখন কুচবিহারে তাঁর সম্মুখীন হবার পরিবর্তে অপর এক পুত্র দুর্জন সিংহের নেতৃত্বে মোগল বাহিনীকে ভাটি রাজ্যে পাঠিয়ে দেন। দুর্জন সিংহ তড়িৎ গতিতে অগ্রসর হয়ে বিনা প্রতিরোধে ঈশার রাজধানী কত্রাভূতে উপনীত হন। এই খবর কুচবিহার সীমান্তে ঈশা খাঁর কাছে পৌছালে তিনি সমস্ত সৈন্যবাহিনীসহ স্বরাজ্যের দিকে রওনা হন। বিক্রমপুর পরগণায় পৌছে এক দিক থেকে তিনি ও অন্য দিক থেকে মাসুম খাঁ কাবুলির নেতৃত্বে আফগানরা ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর দুর্জন সিংহকে চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যু বীরবিক্রমে লড়লেন, কিন্তু শত্রুর সংখ্যাধিক্যের জন্য পরাজিত ও নিহত হোলেন।

আবার আফগান যুদ্ধ

দুজন উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যুতে শোকার্ত মান সিংহ ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে বাংলা ছেড়ে আজমীরে চলে গেলে জ্যেষ্ঠ পুত্র জগৎ সিংহ তাঁর নায়েবরূপে এই সুবা শাসনের অনুমতি পান। কিন্তু তাঁর আয়ুও শেষ হয়ে এসেছিল। ৬ই অক্টোবর আগ্রায় তিনি দেহত্যাগ করেন। মান সিংহের চক্ষের সম্মুখে সমস্ত জগৎ মহাপ্লাবনের জলে ডুবে যায়—তিনি শোকে শয্যাগ্রহণ করেন। কিন্তু বাংলা শাসনের দায়িত্ব তখনও তাঁর উপর। সে দায়িত্ব তিনি এড়াবেন কি ভাবে? জগৎ সিংহের বালক পুত্র মহা সিংহকে রাজমহলে পাঠিয়ে তাঁর মারফৎ আজমীরে বসে তিনি সুবা বাংলা শাসন করতে লাগলেন। সেই বালকের অভিভাবক নিযুক্ত হোলেন তাঁর জ্যেষ্ঠতাত প্রতাপ সিংহ।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে ঈশা খাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু বাংলার বিদ্রোহবহ্নি

তাতে নির্বাপিত হয় নি। তাঁর পুত্র মুসা খাঁ পিতার বশ্যতাস্বীকার অগ্রাহ্য করে নূতন উদ্যমে রণসজ্জা করেন। উড়িষ্যা থেকে কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমানের নেতৃত্বে আফগানরা এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের সম্মুখীন হবার জন্য নায়েব-সুবাদার মহা সিংহ সসৈন্যে অগ্রসর হোলে ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল সম্মিলিত আফগান বাহিনী তাঁকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। এই জয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওসমান খাঁ উড়িষ্যায় চলে গিয়ে স্থানীয় মোগল ফৌজদারের হাত থেকে উত্তর উড়িষ্যা অধিকার করে নেন।

আয়েষার প্রেমিক ওসমানের নেতৃত্বে আফগানরা নূতন জীবন লাভ করে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। উড়িষ্যা থেকে এগিয়ে এসে তারা বাংলার বহু মোগল থানা অধিকার করে এবং মোগলের সঙ্গে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য তৈরী হোতে থাকে। মোগল ফৌজের বক্সী আব্দুল রেজা মাসুদীসহ কয়েকজন মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ তাদের হাতে বন্দী হন। নিহতও হন অনেকে। আয়েষা এখন দূরে—ওসমানের একমাত্র কাজ মোগল নিধন। অধিকাংশ ভূঁইয়া রাজকে দলে টেনে নিয়ে তিনি নূতন করে রণোদ্যম সুরু করেন। মোগলের ভাগ্যাকাশে দুর্য্যোগের কালো মেঘ নেমে আসে।

এই আফগান বিস্ফোরণের সংবাদ আজমীরে মান সিংহের কাছে পৌঁছালে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। বাংলা তাঁরই নামে শাসিত হচ্ছিল। তিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন বলেই বাদশাহ মহা সিংহের নিয়োগে সম্মতি দিয়েছিলেন। এখন সে দায়িত্ব এড়াবেন কেমন করে? মনের শোক মনের মধ্যে চেপে রেখে তিনি বাংলার দিকে রওনা হোলেন। তবে সরাসরি রাজধানী রাজমহলে না এসে রোহটাস দুর্গে বসে কয়েক সপ্তাহ ধরে যুদ্ধের আয়োজন চালালেন। তারপর চলে এলেন আফগানদের এক বড় ঘাঁটি শেরপুর আতিয়ায়। হাজার হাজার আফগান সেখানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু মান সিংহের আক্রমণে তারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

শেরপুরের পর ঢাকা। সেখানে অভিযান চালাবার প্রস্তুতি হিসাবে মান সিংহ শ্রীপুররাজ কেদার রায়ের আনুগত্য আদায় করেন। সেই সময়ে তাঁর কাছে খবর আসে যে তাঁর পশ্চাদ্ভাগে পূর্ণিয়া অঞ্চলের আফগানদের মতিগতি ভাল নয়। তাদের দমন করবার জন্য মহা সিংহ পিতামহের নির্দেশে সেখানে চলে

যান। পথে রাজবোখরার জালাল খাঁকে পরাজিত করেন। তারপর ওই অঞ্চলের আফগানরা তাঁকে কম বিব্রত করে নি, কিন্তু কাজী মুনিমের দুর্গ ধূলিসাৎ করে মহা সিংহ পিতামহের কাছে ফিরে আসেন।

আফগানদের সর্বাধিনায়ক ওসমান খাঁ ও তাঁর সহকর্মী মুসা খাঁর তুলনায় এই সব বিদ্রোহী একেবারেই তুচ্ছ। সেই দুজনের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য মান সিংহ প্রস্তুত হচ্ছেন শুনে ওসমান খাঁ মনে করলেন যে উড়িষ্যার চেয়ে ব্রহ্মপুত্রবিধৌত অঞ্চলে মোগলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা সহজতর হবে। কারণ নৌশক্তিতে মোগল একেবারেই দুর্বল। পক্ষান্তরে তাঁর মিত্রদের নৌবহর যথেষ্ট। তাই উড়িষ্যার দায়িত্ব এক সহকর্মীর উপর অর্পণ করে তিনি ময়মনসিংহের দিকে চলে গেলেন। মান সিংহও সঙ্গে সঙ্গে ভাওয়ালে গিয়ে বানর নদীর তীরে আফগানদের পরাজিত করেন। তাদের বহু রণপোত এ কামান তাঁর হস্তগত হয়।

ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ ও শ্রীপুরের কেদার রায় মান সিংহের কাছে পরাজিত হয়ে যখন নূতন মিত্রের সন্ধান করছিলেন সেই সময়ে আরাকানের মগেরা এসে কুমিল্লা লুণ্ঠনের পর মেঘনার অববাহিকা ধরে ঢাকার উপকণ্ঠে এসে হাজির হয়। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কেদার রায় নিজের শক্তিশালী নৌবহরসহ একটি মোগল ছাউনি অধিকার করে নেন। উভয় শত্রুর দমনের জন্য মান সিংহ একটি ফৌজ পাঠালে কেদার রায় আহত ও বন্দী হন।

মগ বিতাড়নের পর মান সিংহ আফগান শক্তিকে চূর্ণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময়ে আগ্রা থেকে তাঁর কাছে এক জরুরী আহ্বান আসে। বাদশাহ আকবর গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত—তাঁর অন্তিম মুহূর্ত আসন্ন। এ সময়ে সকল অন্তরঙ্গ ব্যক্তির তাঁর কাছে থাকা প্রয়োজন। আহ্বানলিপি পেয়ে মান সিংহ আগ্রায় যাবার কিছু দিন পরে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর আকবরের মৃত্যু হয়।

বাংলার বিদ্রোহীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

অষ্টবিংশতি অধ্যায়

ভূস্বামী বিদ্রোহ

বারো ভূঁইয়া

বিনা যুদ্ধে আকবরের হাতে বাংলা ও বিহার সঁপে দিয়ে দাউদ কররানি যখন উড়িষ্যায় চলে যান তখন পিছনে পড়ে থাকে এক বিরাট শূন্যতা। সে যুগের সকল দেশের মত দাউদ তাঁর সামন্ত নরপতিদের সাহায্যে পিতৃরাজ্য শাসন করতেন। তারা জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রক্ষা করে তাঁকে রাজ্য শাসনে সাহায্য করত। প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ, স্বনির্দিষ্ট ভূভাগের শান্তিরক্ষা, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও আপৎকালে সসৈন্যে অধিরাজের পাশে দাঁড়ান ছিল এই সামন্তদের দায়িত্ব। তাঁদের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী থাকত, অনেকের দুর্গও থাকত। তাঁরা সপরিবারে সেই সব দুর্গে বাস করতেন। দুর্গ না থাকলে বাস করতেন গড়বন্দী প্রাসাদে। শুধু গৌড়ে নয়, সকল অঞ্চলেই এই সামন্ততন্ত্র ছিল শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সামন্ত নরপতিদের সংখ্যা যাই হোক, সম্মিলিতভাবে তাদের বলা হোত বারো ভূঁইয়া। কামরূপের বারো ভূঁইয়াদের পরিচয় পূর্বের এক অধ্যায়ে দিয়েছি। ত্রিপুরায়ও বারো ভূঁইয়া ছিল। রাজস্থানের কোন কোন রাজ্যেও ছিল। এদের নিয়ে গঠিত হোত রাজার রাজসভা—পার্লামেণ্ট। তাতে সামন্তরা থাকতেন, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজগুরু, রাজপুরোহিত সবাই থাকতেন। আপৎকালে পরামর্শের জন্য ছোট ছোট জায়গীরদারদেরও আহ্বান করা হোত।

হিন্দু রাজত্বের অবসানের পর তুর্কীরা এসে ভারতের যে সব অঞ্চলের আধিপত্য লাভ করে সেখানে প্রাচীন যুগের এই সামন্ততন্ত্র চালিয়ে যায়। তাদের আমীররা পূর্বতন সামন্ত নরপতিদের স্থলাভিষিক্ত হন। আফগানরা এসে তুর্কী আমীরদের

হঠিয়ে দিয়ে স্বজাতীয়গণকে নিয়োগ করে। কররানি বংশের পতনের পর দেখা গেল যে তাদের কয়েকজন সামন্তের বিক্রম অধিরাজের চেয়ে কিছু কম নয়। দাউদ কররানি মোগলের চাপে উড়িষ্যায় পালিয়ে গেলেও তাঁর সামন্তদের দাপটে আকবরের সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে মোগল শক্তি বাংলায় ভালভাবে শিকড় গাড়তে পারে নি। বিশেষ করে পূর্ব বাংলায়। কারণ, মোগলবাহিনীর প্রধান দুটি অঙ্গ অশ্বারোহী সৈনিক ও ভারী কামান ওই জলময় ভূভাগে ছিল অচল। মোগলের কোন শক্তিশালী নৌবহর ছিল না—তাদের সেনানায়করা জলযুদ্ধ জানতেনও না। সেই কারণে এই অঞ্চলের ভূস্বামীগণ দীর্ঘ কাল ধরে মোগলশক্তিকে অগ্রাহ্য করে। দিল্লী থেকে একের পর এক ফৌজদার এসে ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন, কিন্তু যুদ্ধশেষে দেখা গেছে যে তাঁরা যেমন ছিলেন তেমনি আছেন। এইভাবে চলে আকবরের রাজত্বকাল এবং জাহাঙ্গীর শাসনের অর্দ্ধাংশ। এই সুদীর্ঘ সময় গৌড়ের ইতিহাস মুখ্যত ভূস্বামীদের ইতিহাস বলে কয়েকজন শক্তিশালী ভূস্বামীর পরিচয় এখানে দেওয়া হোল।

বীর হাম্বীর

বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীরের মর্য্যাদা ছিল সবার উপরে। প্রায় সমগ্র বাঁকুড়া জেলা এবং মানভূম, বর্দ্ধমান ও বীরভূমের কতকাংশ নিয়ে গঠিত তাঁর রাজ্য উড়িষ্যা ও গৌড়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত হওয়ায় সমগ্র তুর্কী আফগান যুগে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ প্রায়-স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। দুই সীমান্তে দুই শক্তিশালী প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব রেখে তাঁরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতেন। অন্যান্য ভূঁইয়া রাজার মত বীর হাম্বীর কোন ভুইফোঁড় রাজা ছিলেন না। তাঁর মল্লবংশের ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন। অষ্টম শতাব্দীর গোড়ার দিকে আদিশূর যখন রাঢ় অধিকার করেন সেই সময়কার রঘুনাথ মল্ল থেকে এই বংশের একটি ধারারাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। এঁরা কোন দিন সার্বভৌমত্ব দাবী করেন নি, আবার পুরাপুরি কোন রাজার অধীনও হন নি। কোনও না কোন শক্তিশালী রাজ বংশের সামন্তরূপে নিজেদের অধিকার চিরদিন অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। মাঝে মাঝে অধিরাজ বদলেছে,

কিন্তু তাঁরা বদলান নি। এইভাবে চলে মোগল যুগের শেষ ভাগ পর্যন্ত— সহস্রাধিক বৎসর। তখনও দেখা গেল যে বিষ্ণুপুররাজের দলমাদল কামানের ভয়ে মারাঠা বর্গীরা বিষ্ণুপুরকে পাশে রেখে কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছে।

গৌড়ে যত রাজবংশ রাজত্ব করেছে সবাই মল্লরাজগণকে উচ্চ সম্মান দিত— কররানিরাও দিতেন। দাউদ কররানি মসনদে আরোহণ করে আকবরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় উদ্যত হয়েছেন শুনে বীর হাম্বীর তাঁকে সতর্ক করে বলেন: মোগলের সঙ্গে কলহ কোর না। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সদ্ভাব বজায় রাখ। তাতে লাভ বই লোকসান হবে না। হিতৈষী রাজার এই পরামর্শ উপেক্ষা করে দাউদ আকবরকে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান করলে বীর হাম্বীর নিরপেক্ষ থাকেন—কোন পক্ষেই যোগ দেন নি। পরে কতলু খাঁর সৈন্যগণ তাঁর রাজ্যে প্রবেশ করে মান সিংহের পুত্র জগৎ সিংহকে বন্দী ও আহত করেছে শুনে তিনি সেই যুবককে নিজ প্রাসাদে এনে নিরাময় করে তোলেন। অন্য কেউ এ কাজ করলে আফগানরা তাকে রেহাই দিত না, কিন্তু বিষ্ণুপুররাজের মর্যাদা এত উচ্চ ছিল যে তারা কিছু করতে সাহস পায় নি।

বীর হাম্বীরের এই নির্ভীকতা ও উদারতার জন্য মানসিংহ তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনিও নামমাত্র মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে পূর্বের মত রাজ্যশাসন চালিয়ে যান। কিন্তু জাহাঙ্গীর রাজত্বের গোড়ার দিকে সম্পূর্ণ বিনা কারণে মোগলের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধে। সে কথা যথাস্থানে বর্ণিত হবে।

ঈশা খাঁ মসনদ-ই-আলা

বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিমান ঈশা খাঁকে আবুল ফজল অন্যান্য সকল ভূস্বামীর অগ্রগণ্য বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা কালিদাস গজদানি যে কিভাবে ঢাকা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ভাটি রাজ্য সংগঠিত করেছিলেন তার বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। মূলে রাজপুত বৈশ্য কালিদাস শের শাহর পুত্র ইসলাম শাহর রাজত্বকালে (১৪৪৫-৫৩) গৌড়ে এসে আফগানদের সঙ্গে অহরহ মেলামেশা করতেন। সেই সময়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করায় তাঁর নাম হয় সোলেমান খাঁ। তিনি ইসলাম কবুল

করেছেন শুনে সুলতান ইসলাম সাহ যথেষ্ট খুশী হোলেও তাঁর ভাটি জমিদারী যেভাবে মাথা তুলে উঠছে তাতে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত না হয়ে পারেন নি। সোলেমানকে দমনের জন্য তিনি ভাটিতে ফৌজ পাঠালে তারা তাঁকে বন্ধুভাবে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে শমন সদনে পাঠিয়ে দেয় ও তাঁর পুত্র ঈশা ও ইসমাইলকে তুরাণী দাস ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রয় করে। সেই ব্যাপারীরা উভয় ভ্রাতাকে জাহাজে তুলে বিদেশে চালান দেয়।

ইসলাম গ্রহণের পর কালিদাসের এক আফগান রমণীর সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় তাঁর পুত্র ঈশাকে মাতৃ পরিচয়ে আফগান বলা হোত। মোগলরা বলত ঈশাও আফগান। এই নয়া আফগান যখন অগ্রজের সঙ্গে বিদেশে কৃতদাসের জীবন যাপন করছিলেন সেই সময়ে ইসলাম খাঁর মৃত্যু হয়। তার কিছু দিন পরে হুমায়ুন এসে যখন দিল্লী অধিকার করেন সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে ঈশার পিতৃব্য কুতুবুদ্দীন উভয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে বহু অন্বেষণের পর খুঁজে বার করে দেশে ফিরিয়ে এনে সুকৌশলে ভাটি জমিদারীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে হোসেন শাহ বংশীয়া ফতেমা খানমের সঙ্গে ঈশার বিবাহ হওয়ায় তাঁর মর্যাদা যথেষ্ট বেড়ে যায়। কররানিদের পতনের পর তাঁর সম্প্রসারিত ভাটিরাজ্য মোগল বিতাড়িত বহু আফগানের আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায়। এই আশ্রয়প্রার্থী আফগানদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মাসুম খাঁ কাবুলি।

কররানিদের পতনের পর অন্যান্য জমিদারের মত ঈশা খাঁ সেই রাজবংশের আনুগত্য থেকে মুক্ত হোলেও মোগলের বশ্যতা স্বীকারে অসম্মত হন। তাঁকে দমন করবার জন্য খান-ই-খানান মুনাইম খাঁ ওই নদীবহুল ভূভাগে নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ মীর-নাওয়ারা শাহবর্দীকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে স্থলবাহিনীসহ সেখানে যাত্রা করেন। ভাওয়ালে বাদশাহী ফৌজের ঘাঁটি স্থাপিত হোলে তিনজন আফগান জায়গীরদার এসে খান-ই-জাহানের প্রতি আনুগত্য জানান। কিন্তু মোগলের শত্রু তো তাঁরা নন, তাঁদের নায়ক ঈশা খাঁ ও তাঁর দক্ষিণ হস্ত মাসুম খাঁ কাবুলি। তাঁরা বিদ্রোহপ্রবণ থাকলে এই আনুগত্যের কোন অর্থ হয় না। শাহবর্দী ও মহম্মদ কুলির নেতৃত্বে খান-ই-খানান দুইটি শক্তিশালী জল ও স্থল বাহিনীকে সেই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। শাহবর্দী পূর্বে বিদ্রোহপ্রবণ থাকলেও এখন বাদশাহর অনুগত ভৃত্য হয়েছেন শুনে খান-ই-খানান তাঁর কাছে

অনেক কিছু আশা করেছিলেন। কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে শাহবর্দীর নৌবহর যুদ্ধের সময়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও কস্তাল নামক স্থানে প্রচণ্ড সংগ্রামের পর মোগল ফৌজ ঈশা খাঁকে পর্যুদস্ত করে; তাঁর পরিত্যক্ত বহু রণসম্ভার তাদের হস্তগত হয়। কিন্তু এই সাফল্য একেবারেই সাময়িক। কারণ, ঈশা খাঁর দুজন অনুচর মজলিশ দিলওয়ার ও মজলিশ প্রতাপ তাঁদের নৌবহরসহ সেখানে এসে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ সুরু করলে মোগল পক্ষের বহু সৈনিক হতাহত হয়; বহু সৈনিক নৌকা চড়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়। মহম্মদ কুলি যথেষ্ট বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আফগানদের হাতে বন্দী হন। অবস্থা প্রতিকূল দেখে খান-ই-খানান যুদ্ধ অমীমাংসিত রেখে নিজ রাজধানী তাঁড়ায় ফিরে আসেন। কিছু দিন পরে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

পরবর্তী ফৌজদার সাহাবাজ খাঁ কম্বু তাঁড়ায় এসে দেখেন যে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। দক্ষিণে কতলু খাঁ লোহানির নেতৃত্বে উড়িষ্যার আফগানরা আবার সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে, পূর্বে মাসুম খাঁ কাবুলি ভাটি অঞ্চলে গিয়ে মোগলদের উত্তর-পূব বাহিনীর অধ্যক্ষ তরসুন খাঁকে আক্রমণের উদ্যোগ করছেন। সর্বত্র বিদ্রোহ! ভূষনার কেদার রায় ও যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রমুখ যে সব ভূস্বামী রয়েছেন তারা কেউই মোঙ্গলদের গ্রাহ্য করে না। সাহাবাজ খাঁকে আবার নূতন করে বাংলা জয় করতে হবে। শুধু আশার কথা এই যে বিদ্রোহ-প্রবণ শাহবর্দী লোকান্তরিত হওয়ায় তাঁর অধীনস্থ তিন হাজার নৌসৈন্য বাদশাহী ফৌজে ফিরে এসেছে এবং ভূঁইয়া রাজদের মধ্যে কোন সংহতি নেই।

সাহাবাজ লক্ষ্য করলেন যে মাসুম খাঁ কাবুলির নিজস্ব কোন রাজ্য না থাকলেও বিদ্রোহীদের মধ্যে তিনিই সব চেয়ে বেশী আক্রমণশীল। তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে সাহাবাজ ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে ঈশা খাঁর রাজ্যে প্রবেশ করেন। খিজিরপুরের পথ ধরে অগ্রসর হয়ে তাঁর সৈন্যদের পক্ষে সুবর্ণগ্রাম ও সেখান থেকে ঈশার সদর কত্রাভুতে পৌছান কষ্টসাধ্য হয় নি। তার পর এগারসিন্ধু দুর্গ অধিকার করে সাহাবাজ ব্রহ্মপুত্র তীরে পৌছালে মাসুম খাঁ কাবুলি তাঁর সম্মুখীন হন, কিন্তু পরাজিত হয়ে এক দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁকে বন্দী করবার জন্য সাহাবাজ খাঁ জাল বিস্তার করছেন এমন সময়ে ঈশা খাঁ এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনীসহ সেখানে এসে মোগল ছাউনি টোকের উপর

প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করেন। সেই ফাঁকে মাসুম খাঁ নিজ সৈন্যদের সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে অদূরে মোগলের দ্বিতীয় সৈন্যাধ্যক্ষ তরসুন খাঁর বিচ্ছিন্ন বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। আকবরের এক শ্রেষ্ঠ সৈন্যাধ্যক্ষ এই তরসুন খাঁ। কিন্তু অপ্রত্যাশিত আক্রমণের ফলে তিনি আহত ও বন্দী হন। মাসুম খাঁ তাঁকে বোঝালেন: মোগলদের ত্যাগ করে শাহবর্দীর মত আমাদের সঙ্গে যোগ দাও; আমরা তোমাকে মাথায় তুলে নেব। জায়গীর দেব, আমিরী দেব। কিন্তু তরসুন সে কথায় কান দিলেন না, বাদশাহর প্রতি তিনি বেইমানি করবেন না। তখন মাসুম খাঁ রুষ্ট হয়ে তাঁকে শমন সদনে পাঠিয়ে দেন।

সাত মাস ধরে এইভাবে ঈশা খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে তাঁকে বশীভূত করা গেল না দেখে সাহাবাজ ভগ্নহৃদয়ে তাঁড়ায় ফিরে এলেন। তার এই ব্যর্থতার কথা আকবরের কাছে পৌছালে তিনি বাংলা ও বিহারের সকল অফিসারের প্রতি আদেশ পাঠালেন, যেমন করে হোক ভাটির বিদ্রোহী জমিদারকে ধ্বংস করো। কিন্তু তারা করবেন কি? বিদ্রোহ তো শুধু ভাটিতে নয়—সর্বত্র চলছে। মোগল শক্তি নামেই বাংলা জয় করেছে—কোন জমিদারই তার কাছে মাথা নীচু করেন নি। তার উপর উড়িষ্যা থেকে আফগানরা এসে পশ্চিম বাংলায় মাঝে মাঝে হামলা চালাচ্ছে। কিন্তু বাদশাহ যখন ঈশা খাঁর ধ্বংসের উপর এত গুরুত্ব দিচ্ছেন তখন সে কাজ আগে করতে হবে। সম্মিলিত বাদশাহী ফৌজ বিপুল রণসম্ভার নিয়ে ভাটির দিকে এগিয়ে গেল। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে মাসুম খাঁ কাবুলি দুইটি দুর্গ তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। ঈশা খাঁরও সাধ্য ছিল না যে সেই বিরাট বাহিনীর সম্মুখীন হন। তাই শত্রুর অনুগ্রহ লাভের আশায় পূর্ব যুদ্ধে যে সব হস্তী ও কামান হস্তগত করেছিলেন সেগুলি সাহাবাজ খাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে বাদশাহর প্রতি আনুগত্য জানালেন (১৫৮৫)। এই সংবাদে আকবর খুসি হোলেও ঈশা খাঁর প্রতি কোমলতা দেখাতে নিষেধ করেন। তাঁর আদেশ মোগল শিবিরে পৌছালে সৈন্যাধ্যক্ষরা নূতন উদ্যমে আক্রমণ সুরু করেন। ঈশা খাঁ যখন দেখলেন যে আর যুদ্ধ চালান নিরর্থক তখন বাদশাহর কাছে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠিয়ে অনুকম্পা ভিক্ষা করেন। মাসুম খাঁ কাবুলিও নিজ পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ আগ্রায় পাঠিয়ে মক্কায় তীর্থযাত্রা করেন।

তার পর সাত বৎসর চুপচাপ। সাম্রাজ্যের সর্বত্র বহু সমস্যা থাকায় আকবর ঈশা খাঁ ও অন্যান্য ভূস্বামীদের দিকে নজর দেবার অবসর পান নি। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মান সিংহ বাংলার ফৌজদার হয়ে এসে দেখেন যে কোন ভূস্বামীই রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করেন নি, বরং সবাই সামরিক বল বাড়িয়ে যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাদের পূর্বসুহৃদ আফগানরা রয়েছে, তার উপর পর্তুগীজরা এসে অনেকের ঘাড়ে ভর করেছে। মাসুম খাঁ কাবুলি তার যে পুত্রকে আগ্রায় প্রতিভূ পাঠিয়েছিলেন সে চুপিচুপি পালিয়ে এসে নিজস্ব জমিদারী বেশ বাড়িয়ে ফেলেছে। তার পিতাও হজ শেষ করে ভাটিতে ফিরে এসে যথেষ্ট ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। মান সিংহ বুঝলেন, এদের যদি এখনই শেষ করা না হয় তা হোলে একদিন এরাই বাদশাহী শাসন খতম করবে। তাই তিনি সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করে ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ভাটির দিকে রওনা হন।

তাঁর আগমন সংবাদে আফগানরা গা ঢাকা দেওয়ায় তিনি বিনা যুদ্ধে ভাটি রাজ্যের অর্দ্ধাংশ জয় করলেন। কিন্তু সমস্যা শুধু ঈশা খাঁ নন--বিদ্রোহী আরও রয়েছে। তাদের বিরোধীতার জন্য মোগল শক্তি কোথাও স্থিতিলাভ করতে পারছে না। সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে মান সিংহ গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হোলে ঈশা খাঁ, মাসুম খাঁ কাবুলি প্রভৃতি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। কিন্তু তিনি রোগশয্যা থেকেই যুদ্ধ পরিচালিত করতে লাগলেন—তাঁর পুত্র হিম্মৎ সিংহ সসৈন্যে ভাটিতে গিয়ে ঈশা খাঁকে এগারসিন্ধু দুর্গে আটক করে ফেললেন।

তারপর থেকে উভয় পক্ষে চলে লুকোচুরি খেলা। পর বৎসর ৫ই সেপ্টেম্বর মান সিংহের অপর এক পুত্র দুর্জন সিংহ ঈশা খাঁর সদর কত্রাভু আক্রমণ করে স্থলযুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করেন। কয়েক দিন ধরে যুদ্ধ চলবার পর ভাটি রাজ্যের সকল অঞ্চল থেকে আফগান নৌবহর এসে দুর্জন সিংহকে এমনভাবে ঘিরে ফেলে যে তিনি নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজে পেলেন না। এক দিন শত্রু নিক্ষিপ্ত একটি গুলি এসে তাঁর বক্ষস্থল বিদ্ধ করায় তিনি ধরাশায়ী হোলেন।

দুর্জন সিংহের মৃত্যুতে ঈশা খাঁ আপাতদৃষ্টিতে জয়ী হোলেও এক অভূতপূর্ব আশঙ্কায় তাঁর মন অভিভূত হয়ে পড়ে। মান সিংহ এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন,

নূতন নূতন সৈন্য এনে তিনি শুধু বিদ্রোহ দমন করবেন না পুত্রহত্যার প্রতি-শোধও নিতে আসবেন। তাঁর সম্মুখীন হবার মত শক্তি ঈশা খাঁর নেই। ভয়ব্যাকুল চিত্তে তিনি মান সিংহের শিবিরে দূত পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করলে মোগল সেনাপতি প্রত্যুত্তরে জানালেন যে ঈশা যদি বিনা সর্তে আত্মসমর্পণ করেন তাহোলে তিনি নূতন অভিযানে বিরত থাকবেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে ঈশা খাঁ নিজে গিয়ে মান সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে তাঁকে আগ্রায় আকবরের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

বাদশাহ পরাজিত শত্রুর প্রতি কোনরূপ রূঢ়তা দেখাবার পরিবর্তে তাঁকে ২২টি পরগণার জমিদারী ও মসনদ-ই-আলা উপাধি প্রদান করেন। ঈশা খাঁও তাঁর প্রতি আনুগত্য জানিয়ে ভাটিতে ফিরে আসেন। তারপর তিনি কোন দিন মোগলের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি, কিন্তু ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হোলে পুত্র মুসা খাঁ আবার মাথা তুলে ওঠেন। সে কথা পরে বর্ণিত হবে।

পূর্বে বলেছি, ঈশা খাঁ বিবাহ করেছিলেন হোসেন শাহ বংশীয়া ফতেমা খানম নামে এক তরুণীকে। কিন্তু পরে এক সময়ে তিনি শ্রীপুররাজ চাঁদ রায়ের রূপলাবণ্যময়ী কন্যা স্বর্ণময়ীর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হরণ করে মুসলমানী প্রথায় বিবাহ করেন। অসাধারণ বুদ্ধিমতী সোনাবিবি স্বামীর মৃত্যুর পর কিছু দিন ভাটি রাজ্য ভালভাবে পরিচালিত করলেও শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষায় অসমর্থ হন। আরাকানের মগেরা জলপথে কত্রাভু পর্যন্ত এগিয়ে এসে তাঁকে নিজ প্রাসাদে অবরুদ্ধ করলে তিনি সর্বশক্তি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালিত করেন, কিন্তু যখন দেখলেন যে শত্রুকে আর ঠেকান যাচ্ছে না তখন হিন্দু পদ্ধতিতে জহরের আগুনে জীবনাহুতি দেন।

চাঁদ রায়—কেদার রায়

ঈশা খাঁর ভাটি জমিদারীর পশ্চিমে আধুনিক ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার দুইটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল চাঁদ রায়ের জমিদারী শ্রীপুর। কররানি বংশের পতনের পর অন্যান্য জমিদারদের ন্যায় চাঁদ রায়ও স্বাধীনতা অবলম্বন করে ঈশা খাঁর সঙ্গে একযোগে মোগলকে অস্বীকার করেন। উভয়ের মধ্যে এই ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকলে আকবরের পক্ষে বিদ্রোহ দমন করা আরও কষ্টকর হোত, কিন্তু

ঈশা চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণময়ীকে হরণ করে সে সম্ভাবনার উপর যবনিকাপাত করেন। তারপর চাঁদ রায় মোগলের সঙ্গে যোগ দেবার কথা চিন্তা করছিলেন, কিন্তু এক অভাবনীয় ঘটনায় তাঁর জীবনাবসান হয়।

মান সিংহের পুত্র হিম্মৎ সিংহ সপ্তগ্রাম থেকে কয়েকজন আফগানকে তাড়া করলে তাদের মধ্যে উড়িষ্যার নিহত স্থলতান কতলু খাঁ লোহানির ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমান প্রমুখ কয়েকজন সর্দার ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আশ্রয়ের সন্ধানে চাঁদ রায়ের সদর ভূষণার দিকে পালিয়ে যান। সে সময়ে চাঁদ রায় তাঁর পুরাতন বন্ধু ঈশা খাঁর বিশ্বাকঘাতকতায় মর্মাহত হয়ে মোগলের সঙ্গে যোগ দেবার কথা চিন্তা করছিলেন। পলাতক আফগানগণ ভূষণার চার ক্রোশ দূরে এসে পৌছালে তাদের কৌশলে বন্দী করে মোগলের হস্তে অর্পণের জন্য তিনি স্বগৃহে আমন্ত্রণ জানান। সে আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে দুজন আফগান সর্দার চাঁদ রায়ের বাড়ীতে এলে তিনি একজনকে বন্দী করেন, কিন্তু অপরজন তরবারি আস্ফালন করতে করতে সেখান থেকে সরে পড়েন। তাঁকে তাড়া করে চাঁদ রায় বেশ কিছু দূর চলে গেলে তাঁর আফগান ভৃত্যদের স্বজাতি-প্রেম মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে—তারা বিনা দ্বিধায় প্রভুকে হত্যা করে। তার পর সকল আফগান সম্মিলিত হয়ে ভূষণা দুর্গে ফিরে এলে দুর্গরক্ষীরা তাদের পুরোভাগে আফগান ভৃত্যদের দেখে মনে করে যে তাদের প্রভুও বোধ হয় ফিরে এসেছেন। এই বিশ্বাসে তারা দুর্গদ্বার খুলে দিলে আফগানরা ভিতরে প্রবেশ করে লুঠপাট স্থরু করে দেয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চাঁদ রায়ের সৈন্যরা এসে তাদের আক্রমণ করলে শুধু দুর্গ নয় শ্রীপুর রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যায় ঈশা খাঁর আশ্রয়ে—ভাটিতে।

চাঁদ রায়ের পর তাঁর পুত্র কেদার রায় শ্রীপুরের অধীশ্বর হন। পিতার মৃত্যুর জন্য তাঁর মন আফগানদের প্রতি তিক্ত হয়ে উঠলেও কোন মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁর বশ্যতা গ্রহণ করবার জন্য এগিয়ে এল না দেখে তিনি সম্ভাব্য সকল বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য নিজের সামরিক বল বাড়াতে থাকেন। পিতার নৌবহর যথেষ্ট সম্প্রসারিত করে তাকে ইউরোপীয় প্রথায় পুনর্গঠিত করবার জন্য তিনি ডোমিনিগো কার্ভালো নামে এক পর্তুগীজ এ্যাডমিরালকে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

সেই নৌবহর নিয়ে কার্ভালো সন্দ্বীপ জয় করেন, কিন্তু স্থানীয় মুরদের

বিরোধীতার জন্য সে জয় সংহত করতে পারেন নি। তাই তিনি সন্নিহিত দিয়াঙ্গার পর্তুগীজ অধিনায়ক ম্যানোয়েল ম্যাণ্ডেসের সাহায্য গ্রহণ করলে মুররা বশীভূত হয়। তাঁর এই সাফল্যে উদ্বিগ্ন হয়ে আরাকানরাজ মেংরাজগি সন্দ্বীপ অধিকার করতে এসে কার্ভালোর কাছে পরাজিত হন (১৬০২, নভেম্বর)। দেড় শতখানি ছোট বড় আরাকানী নৌকা কার্ভালোর হাতে পড়ে।

অজ্ঞাতকুলশীল নাবিকের এই অসাধারণ সাফল্যের সংবাদ লিসবনে পৌছালে পর্তুগালরাজ তাঁকে সম্মানিত করেন, কিন্তু কিছু দিন পরে আরাকানীরা আবার সন্দ্বীপ আক্রমণ করলে তিনি ওই দ্বীপ ছেড়ে চলে আসেন শ্রীপুরে। তাঁর প্রভু কেদার রায় তখন মোগল আক্রমণে বিব্রত। মাত্র তিনখানি জেলিয়া নৌকা নিয়ে মোগলদের এক শ কোসার নৌবহর বিধ্বস্ত করে তিনি রণনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখান। তাঁব বলে বলীয়ান কেদার রায়ের শক্তিতে বিস্মিত হয়ে বহু আফগান নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শ্রীপুরে চলে আসে। তাদের মধ্যে সোলেমান খাঁ প্রধান।

সোলেমানের মত এক দুর্দ্ধর্ষ বিদ্রোহী কেদার রায়ের কাছে আশ্রয় নিয়েছেন শুনে মান সিংহ এক সৈন্যবাহিনীকে শ্রীপুরে পাঠিয়ে দেন। তারা এসে ভূষণা অবরোধ করলে কেদার রায় বীরবিক্রমে লড়লেন, কিন্তু এক দিন দুর্গের ভিতর গোলা বিস্ফোরিত হওয়ায় বহু সৈনিকসহ সোলেমান খাঁ নিহত ও তিনি আহত হন। সেই অবস্থায় গোপন পথে দুর্গ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে তিনি ভাটিতে গিয়ে ঈশা খাঁর কাছে আশ্রয় নেন (১৫৯৬)।

তারপর ভূষণা দুর্গ অধিকার করে মান সিংহ কেদার রায়কে ধরবার জন্য নিজ নৌবহরের উপর নির্দেশ দেন। কার্ভালো তাদের পরাজিত করলেও তারপরই কেদার রায়ের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ বটে। উপায়ন্তরবিহীন কার্ভালো তখন ঈশা খাঁর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়ায় দিশাহারা হয়ে মান সিংহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই আরাকান-রাজের সঙ্গে তাঁর সন্ধি সম্পাদিত হওয়ায় মগদের সোনারগাঁ আক্রমণে সাহায্য দেন।

তাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতায় রুষ্ট হয়ে মান সিংহ পর বৎসর ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে আরাকানীদের দমনের পর কেদার রায়কে আক্রমণ করেন। ফতেজংপুরে

উভয় পক্ষে যে প্রচণ্ড সংগ্রাম হয় তাতে কেদার রায় আহত ও বন্দী হন। সেই অবস্থায় তাঁকে মান সিংহের কাছে নিয়ে আসবার পরই তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

কেদার রায়ের জমিদারী অধিকার করে মান সিংহ মধু রায় নামে এক অনুগত ব্যক্তিকে সেখানকার সামন্ত নিয়োগ করেন এবং কেদার রায়ের আরাধ্যা দেবী শিলামাতাকে অম্বরে পাঠিয়ে দেন।

রামচন্দ্র বসু

আর একজন পরাক্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন এখনকার বরিশাল জেলার বাকলা চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি রামচন্দ্র বসু। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি সোনারগাঁর শেষ অধীশ্বর দনুজমাধবদেবের বংশধর—গৌড়ের সেনরাজগণের দৌহিত্র বংশীয়। তাঁর পিতামহ পরমানন্দের সঙ্গে পর্তুগীজদের সৌহার্দ স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে চট্টগ্রাম ও হুগলীতে কুঠী স্থাপনের পর থেকে পর্তুগীজরা দেখে যে প্রথমোক্ত বন্দরের উপর এক দিক থেকে মুর ও অন্য দিকে মগদের আক্রমণের ফলে শান্তিতে ব্যবসা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে। পূর্বাঞ্চলে বিকল্প একটি বন্দরের অন্বেষণ করতে করতে তাদের দৃষ্টি পড়ে বাকলার উপর। একেবারে নগণ্য স্থান হোলেও উন্নয়নের সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে দেখে তারা রাজা পরমানন্দকে আশ্বাস দেয় যে ঠিকমত সুযোগ সুবিধা পেলে বাকলাকে দ্বিতীয় চট্টগ্রামে পরিণত করবে। তাদের কথায় আস্থা স্থাপন করে চন্দ্রদ্বীপরাজ এক কর্মচারীকে গোয়ায় পর্তুগীজ ভাইসরয় কনষ্টান্টিনো ডি ব্রাগাঞ্জার কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁর মারফৎ আলাপ আলোচনার পর ১৫৫৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল পারস্পরিক সামরিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উভয় পক্ষে যে চুক্তিনামা সম্পাদিত হয় তার সর্তানুসারে রাজা পরমানন্দ পূবে বাকলা থেকে পশ্চিমে চট্টগ্রাম পর্যন্ত উপকূলীয় অঞ্চলে পর্তুগীজদের অবাধ বাণিজ্য করবার অধিকার প্রদান করেন। প্রতিদানে তারা প্রতিশ্রুতি দেয় যে চট্টগ্রামে কোন বাণিজ্য জাহাজ প্রেরণে বিরত থাকবে ও চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের চারখানি জাহাজকে গোয়া, অর্মুজ ও মালাক্কায় গিয়ে বাণিজ্য করবার লাইসেন্স দেবে। আরও সর্ত এই থাকে যে চন্দ্রদ্বীপরাজ পর্তুগীজদের কোন শত্রুর সঙ্গে কোন প্রকার

সন্ধিতে আবদ্ধ হবেন না এবং পর্তুগীজরা তাঁকে যে সামরিক সাহায্য দেবে সেজন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যদ্রব্য প্রদান করবেন।

সন্ধির সর্তগুলি চন্দ্রদ্বীপরাজের পক্ষে আদৌ সম্মানজনক না হোলেও চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত হয়ে বাস করায় তাতে সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। গৌড় সে সময়ে কররানিদের শাসনাধীন। তাদের সঙ্গে পরমানন্দ বা তাঁর পুত্র জগদানন্দের সম্পর্ক যে কিরূপ ছিল তা জানা যায় না, কিন্তু মোগলের আক্রমণে দাউদ কররানি বিব্রত হয়ে পড়লে জগদানন্দের পুত্র কন্দর্পনারায়ণ তাঁকে কোন সাহায্য দেন নি। তার সুযোগও অবশ্য হয় নি। দাউদবিজয়ী মোগল সেনাপতি খান-ই-খানান মুনাইম খাঁ জগদানন্দের বশ্যতা দাবী করে স্থবাদ খাঁকে এক ব্যাটালিয়ান সৈন্যসহ চন্দ্রদ্বীপে পাঠালে তিনি বিনা দ্বিধায় মোগলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। যে পর্তুগীজদের সঙ্গে তাঁর পিতা সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন সেই বিপদের দিনে তাদের মুখ দেখা যায় নি!

এই ঘটনার পর জগদানন্দ তাঁর সদর কচুয়া থেকে মাধবপাশা গ্রামে স্থানান্তরিত করেন। কিছু দিন পরে তাঁর মৃত্যু হোলে অষ্টমবর্ষীয় পুত্র রামচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর হন। পর্তুগীজ মিশনারি মালিফায়ার ফোনেস্কা এই বালক নরপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর রাজ্যের সর্বত্র গির্জা নির্মাণ ও প্যাগানদের খৃষ্টান করবার অধিকার আদায় করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে এই নূতন মৈত্রী স্থাপনের সংবাদ আরাকানে পৌছালে সেখানকার অধীশ্বর বাকলা বন্দর আক্রমণের আয়োজন করেন। তাদের সেই আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পর্তুগীজ এ্যাডমিরাল গঞ্জালেশ সন্দ্বীপ অধিকার করে সেখানে নিজেদের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য রাজা রামচন্দ্রের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তুই শত অশ্বারোহী ও কয়েক শত বরকন্দাজ এই সর্তে পাঠান যে সন্দ্বীপের রাজস্ব উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে। কিন্তু কাজের সময়ে দেখা গেল যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা তো দূরের কথা গঞ্জালেশ চন্দ্রদ্বীপ থেকে দক্ষিণ সাহাবাজপুর ও পাপেলভাঙা নামক তুইটি মৌজা অধিকার করে নিয়েছেন।

এই বালক রাজার হাত থেকে চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের জন্য তাঁর শ্বশুর প্রতাপাদিত্য যে ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করেছিলেন এখন তা বর্ণিত হবে।

প্রতাপাদিত্য

হিন্দু ভূস্বামীদের মধ্যে বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর ও বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্র বসু প্রাচীন বংশসম্ভূত হোলেও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিলেন যশোহর-ধূমঘাটের প্রতাপাদিত্য। মূলে সপ্তগ্রামবাসী এই পরিবারের ইতিহাস কররানিদের উত্থান পতনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতাপাদিত্যের পিতামহ রামচন্দ্র গুহ গৌড়েশ্বর সুলেমান কররানির কানুনগো দফ্‌তরে মুহুরির কাজ করতেন। তাঁর দুই পুত্র শ্রীহরি ও জানকীবল্লভ পিতার সুপারিশে একই দফ্‌তরে উচ্চ-স্তরের অফিসারের কাজ পেয়ে সপ্তগ্রাম থেকে গৌড় নগরীতে চলে যান। সেখানে সুলেমানের পুত্র দাউদের সঙ্গে শ্রীহরির পরিচয় হয় ও তাঁর অনুগ্রহে চাকুরিতে বহু সুবিধা লাভ করেন। পরে দাউদ মসনদে আরোহণ করে যখন মোগলের প্রভুত্ব অস্বীকার করেন তখন তাঁর বুঝতে বাকি থাকে না যে যুদ্ধ অনিবার্য্য। তার প্রস্তুতি হিসাবে তিনি রাজকোষের বহু অর্থ শ্রীহরির হাতে সমর্পণ করে নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য সুন্দরবনের কোন দুর্গম স্থানে পাঠিয়ে দেন। তার কিছু দিন পরে দাউদ যখন বিনাযুদ্ধে বিহার ও গৌড় আফগানদের হাতে তুলে দিয়ে উড়িষ্যার দিকে পালিয়ে যান তখন শ্রীহরি সেই অর্থ আত্মসাৎ করে নিজ নামে সুন্দরবনে এক জমিদারীর পত্তন করেন।

আফগানরা চলে গেছে, অথচ মোগল আসে নি। উভয় পক্ষে মাঝে মাঝে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে। দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আরাকানের মগরা এসে প্রায়ই লুটতরাজ চালাচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলের সর্বত্র পর্তুগীজরা সুযোগ পেলেই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। বাংলার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা দূরের কথা নিজের সৈন্যবাহিনীও পুরাপুরি আকবরের অনুগত নয়। সর্বত্রই বিশৃঙ্খলা, সর্বত্রই বিদ্রোহ। শ্রীহরিকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না—কেউ তাঁর কাছে এসে হিসাব চায় না। যা আদায় হয় তার সবটাই লাভ! এই লাভের টাকা দিয়ে তিনি জমিদারী বাড়ান—আবার কখনও বা লাঠির জোরে। বাড়তে বাড়তে সেই জমিদারী যখন আর জমিদারী থাকল না, একটি ছোটখাট রাজ্যে পরিণত হোল, শ্রীহরি তখন সপ্তগ্রাম থেকে পরিবার-বর্গকে এনে ইছামতী তীরে ধূমঘাট গ্রামে বসবাস সুরু করলেন। এখানে স্থাপিত হল তাঁর সদর দফ্‌তর। কোন যুদ্ধ জয় করে রাজ্য স্থাপন না করলেও

তিনি দিগ্বিজয়ী বীর! দিগ্বিজয়ীদের চিরন্তন রীতি অনুযায়ী নিজেই নিজেকে বিক্রমাদিত্য উপাধিতে ভূষিত করলেন। রাজভ্রাতা আর জানকীবল্লভ থাকতে পারেন না—তাঁর নূতন নাম হোল রাজা বসন্তরায়।

আকবর এসব ব্যাপারের কিছু খোঁজ রাখতেন না। তাঁর নির্দেশে রাজা টোডরমল যখন বিভিন্ন সুবার রাজস্ব তালিকা তৈরী করলেন তখন তাঁর কাছে খবর গেল যে কররানি রাজ্যের জমিজমার যা কিছু হিসাব তা তাদের কানুনগো শ্রীহরি ও তাঁর ভ্রাতা জানকীবল্লভের কাছে রয়েছে। টোডরমল উভয়কে আগ্রায় আহ্বান করে তাঁদের দেওয়া বিবরণের ভিত্তির উপর বাংলার রাজস্ব তালিকা প্রস্তুত করলেন। তার পর যখন দেখলেন যে উভয় ভ্রাতাই বেশ করিতকর্মা ব্যক্তি তখন উভয়কে বাদশাহী দফ্তরে উচ্চ পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানালেন। কত উচ্চ পদ? নূতন রাজ্যের তুলনায় সে পদ কতটুকু?—ভাবলেন শ্রীহরি। টোডরমলের আহ্বান ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে উভয় ভ্রাতা ফিরে এলেন ধুমধাটে।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে শ্রীহরি পরলোক গমন করলে তাঁর দেওয়া বণ্টননামা অনুযায়ী জমিদারীর দশ আনা পেলেন পুত্র প্রতাপাদিত্য ও ছয় আনা ভ্রাতা বসন্ত রায়। বণ্টননামাটি দেখে প্রতাপ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কোনও জমিদারী শরিকদের মধ্যে বণ্টিত হোতে পারে, কিন্তু পিতা যখন বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেছেন তখন তাঁর রাজ্য ভাগ হয় কেমন করে? প্রতাপ তুমুল কাণ্ড সুরু করলেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্খা ছিল গগনস্পর্শী, তায় তুর্কী-আফগানদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে তাদের রীতিনীতিতে ভালভাবে রপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাদেরই পদ্ধতিতে পথের কাঁটা দূর করবার জন্য এক দিন তিনি সুযোগ বুঝে পিতৃব্য বসন্তরায় ও তাঁর দুই পুত্রকে হত্যা ও সাত পুত্রকে কারারুদ্ধ করে সমস্ত জমিদারী আত্মসাৎ করলেন। কেবল দুগ্ধপোষ্য শিশু রাঘবরায়কে জনৈকা পরিচারিকা এক কচু বনের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল বলে সে রক্ষা পায়। পরে এক সময় সে আত্মপ্রকাশ করলে তার নাম হয় কচুরায়।

এইভাবে স্ববংশীয়গণকে নিধন করবার পর প্রতাপাদিত্য বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের উপর লুব্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। সে রাজ্যের তরুণ অধীশ্বর রামচন্দ্র বসুর সঙ্গে নিজ কন্যা বিন্দুমতির বিবাহ স্থির করে এক শুভ দিনে যথারীতি

তাঁকে ধুমধাটে আহ্বান জানালেন। প্রথামত বরযাত্রীগণসহ বর রামচন্দ্র সেখানে এলে মহা ধুমধামের সঙ্গে গোধূলি লগ্নে বিবাহ সম্পন্ন হোল। উৎসব শেষে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলে মধ্যরাত্রে সদ্য বিবাহিতা বিন্দুমতি বাসরঘরে প্রবেশ করে স্বামীকে বললেনঃ পালাও! এখনই পালাও! আর কিছুক্ষণ পরে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন পিতার ঘাতকরা এসে ওই পাশের দরজা দিয়ে এই ঘরে ঢুকে তোমাকে হত্যা করবে। আমার চক্ষের সম্মুখে তোমার জীবনদীপ নিভে যাবে। সে দৃশ্য আমি সইতে পারব না। তুমি পালাও! দেখছ না, ওই দরজায় কোন অর্গল নেই। ওই পথ দিয়ে এখনই তারা ঘরের ভিতর চলে আসবে। শুনছ না তাদের পায়ের শব্দ? ঘরে এসে তারা খড়্গাঘাতে তোমার দেহ দ্বিখণ্ডিত করবে। তুমি পালাও! ওগো পালাও!

বলতে বলতে সদ্য বিবাহিতা বিন্দুমতি মূর্ছিতা হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে রামচন্দ্র বললেনঃ আর তুমি? আমি পালালে তারা কি তোমাকে ছেড়ে দেবে? মরতে হয় সেও ভাল, কিন্তু যতক্ষণ জীবন থাকবে ততক্ষণ কাউকে তোমার কেশ স্পর্শ করতে দেব না। না, তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাব না।

—ওগো আমার প্রাণের দেবতা, আমার জন্য একটুও ভেবো না। তুমি বাঁচলে তবে আমি বাঁচবো। তুমি গেলে, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকবো? তুমি এখনই পালাও। আমি নিজের পথ নিজে তৈরী করে রেখেছি। আমাকে বাঁচাবার জন্যই তুমি পালাও। ওই ওদিকে খিড়কি দরজা। সেখান দিয়ে বেরিয়ে বাগান পার হয়ে সদর রাস্তা পশ্চিমে রেখে সোজা নদীতীরে চলে যাও। এখনই যাও, এক মূহুর্তও দেরী কোরো না।

রামচন্দ্র চলে গেলেন। ঘাটে ছিপ বাঁধা ছিল, তাতে উঠে কিছু দূর যাবার পর তিনি শোনেন নারীকণ্ঠের আহ্বানঃ ছিপ থামাও! মাঝি, সামনের ঘাটে নৌকা ভেড়াও। অন্য পথ ধরে বিবাহসাজে সজ্জিতা বিন্দুমতি সেখানে এসে স্বামীর সঙ্গে মিলিতা হোলেন। সেই নৌকার মধ্যে রচিত হোল তাঁদের বাসর সজ্জা।

এদিকে ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যায় আফগান বিদ্রোহ আপাতত দমিত হোলে মান সিংহ যখন বাংলার বিদ্রোহী ভুঁইয়াদের প্রতি দৃষ্টি ফেরালেন তখন তাদের

মধ্যে সব চেয়ে শক্তিমান ঈশা খাঁ তাঁর প্রধান লক্ষ্য হোলেও অন্যদের উপেক্ষা করতে পারেন নি। রাজমহল থেকে যাত্রা করে কৃষ্ণনগরের পথ ধরে তিনি ধূমঘাটের কাছাকাছি এলে প্রতাপাদিত্য নামমাত্র প্রতিরোধের পর আত্মসমর্পণ করেন। কচুরায় তখন সাবালক হয়ে বাদশাহী ফৌজের সঙ্গে এসেছেন। মান সিংহ তাঁকে শ্রীহরির বণ্টননামা অনুযায়ী ছয় আনা জমিদারী প্রদান করে যশোরজিৎ উপাধি দেন। বাকি দশ আনা প্রতাপাদিত্যকে এই সর্তে দেওয়া হয় যে আজীবন তিনি মোগলের অনুগত থাকবেন ও প্রয়োজনের সময়ে তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য দেবেন।

কয়েকটি মহা দোষ সত্বেও প্রতাপাদিত্য যে একজন শক্তিশালী ভূস্বামী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বহু অলঙ্ঘনীয় বাধা অতিক্রম করে তিনি পিতার জমিদারীকে একটি ছোটখাট রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। তাঁর সামরিক বল কিছু নগণ্য ছিল না। পর্তুগীজ অফিসারদের নিয়োগ করে তিনি সৈন্য ও নৌবাহিনীকে আধুনিক রণনীতিতে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। নিজ শক্তির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তাঁর কোন ভ্রান্ত ধারণা ছিল না। তাই মোগলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতার দুরাকাঙ্খা তিনি করেন নি। শান্তিতে নিজের জমিদারী বজায় রাখতে পারলে সুখী হোতেন। কিন্তু তাও তাঁর অদৃষ্টে ঘটল না। জবরদস্ত সুবাদার ইসলাম খাঁ তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠিয়ে মশা মারতে কামান দেগে বসলেন। সে কথা পরে বর্ণিত হবে।

সে যুগে আর কোন জমিদার যা করেন নি প্রতাপাদিত্য তাই করেছিলেন। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য তিনি যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করতেন। নিজ রাজ্যের সর্বত্র বহু চতুষ্পাঠী ও টোল স্থাপন করেছিলেন। দাক্ষিণাত্য থেকে কয়েকজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে এনে রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে বর্তমান ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁরাই দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণদের আদিপুরুষ।

বিদ্রোহ আর বিদ্রোহ

বিদ্রোহী ভূস্বামী আরও ছিলেন। তাঁদের বিরোধীতার জন্য আকবরের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে বাংলায় মোগল আধিপত্য স্থিতিলাভ করতে পারে নি।

বাহারিস্তান-ই-গৈবি থেকে জানা যায় যে জাহাঙ্গীর রাজত্বের গোড়ার দিকে শামস্ খাঁ মানভূম জেলায় এবং সেলিম খাঁ হিজলিতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করতেন। মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনার জমিদার চন্দ্রভানু ও বড়দা-ঝাকরার জমিদাররা তখনও মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন নি; সুবাদার দরবারে হাজির হবার জন্য আমন্ত্রণ গেলে তাঁরা তা সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করতেন।

বরেন্দ্রভূমিতে পুঠিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা পীতাম্বর মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেও প্রায় সকল বিষয়ে স্বাধীন নরপতির মত আচরণ করতেন। পাটনা জেলায় মাসুম খাঁ কাবুলির পুত্র মীর্জা মুনিমের জমিদারিতে বাদশাহর নামে খুৎবা পাঠ হোত বটে, কিন্তু ঈশা খাঁর পুত্র মুসা খাঁ যখন মোগলের বিরুদ্ধাচারণ করেন তখন মীর্জা মুনিম গিয়ে বিনা দ্বিধায় তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। আধুনিক ফরিদপুর জেলায় ফতাবাদের জমিদার মজলিশ কুতুবও মুসা খাঁর সঙ্গে যোগ দেন।

আবার মোগলের অনুগত ভূস্বামীও কম ছিল না। পাটনা জেলায় সাহাজাদপুরের জমিদার রাজা রায় মোগলকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। কেদার রায়ের পতনের পর মুকুন্দ রায় নামক যে ব্যক্তিকে মান সিংহ ভূষণা জমিদারী প্রদান করেন তিনি ও তাঁর পুত্র সত্রজিৎ বাংলায় মোগলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বিশিষ্ট ভূমিকার অভিনয় করেছিলেন। কামরূপ ও আসাম যুদ্ধে সত্রজিৎ ছিলেন মোগলের দক্ষিণ হস্ত। সুসংএর জমিদার রঘুনাথও এই সব যুদ্ধে মোগলকে যথেষ্ট সাহায্য দিয়েছিলেন।

রাজা মান সিংহ প্রথম বাংলায় এসে দেখেছিলেন যে ভূঁইয়া রাজগণের প্রতাপ দুর্দ্দমনীয়। তাঁর মত প্রতিভাবান সেনানায়কের পক্ষে সবাইকে উচ্ছেদ করা হয় তো শক্ত হোত না, কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের সংহতি তখন বহু দূর বলে তিনি শত্রু না বাড়িয়ে বারো ভূঁইয়াদের নির্বিষ সর্পে পরিণত করে বাংলা থেকে বিদায় নেন।

1. *Akbarnama iii, p. 968–69, 1059*
2. Mirza Nathan *Baharistan-i-Gaibi, p. 121-37*

উনত্রিংশৎ অধ্যায়

জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনীতে মধ্যযুগের বাংলা

নুরজাহানের কাহিনী

আকবরের মৃত্যুর পর শাহজাদা সেলিম জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে মসনদে আরোহণ করলে রাজা মান সিংহ বাংলায় তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য রাজমহলে ফিরে আসেন। তিনি পূর্বের মত বাংলার ফৌজদার রইলেন, সাম্রাজ্য পূর্বের মতই চলতে লাগল। কিন্তু রাজধানী আগ্রায় নূতন বাদশাহর মনে শান্তি নেই— তাঁর সমস্ত হৃদয় অধিকার করে রয়েছে বর্দ্ধমানে জায়গীরদার মঞ্জিলে এক রূপসী ইরাণী তরুণী। বাংলার বিদ্রোহ দমন তার তুলনায় একেবারেই তুচ্ছ কাজ। সেই তরুণীকে তাঁর চাই; সমস্ত সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্য তাঁর কাছে সঁপে দেবার জন্য তিনি উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। রাজা মান সিংহ তাকে যদি এনে দিতে পারতেন তা হোলে কতই না স্থখের হোত! কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের সব চেয়ে সম্ভ্রান্ত ওমরাহ মান সিংহ, তাঁকে সে কথা বলতে সাহস হয় না। তাই জাহাঙ্গীর তাঁকে বিহারে বদলি করে নিজের কোকলতাস—ধাত্রী পুত্র—কুতুবউদ্দীনকে বাংলার ফৌজদার করে পাঠালেন।

এ সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন: তেহেরানের অধিবাসী মীর্জা গিয়াস বেগ যখন তাঁর দুই পুত্র ও এক কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্থানে আসছিলেন সেই সময়ে পথে কান্দাহারে তাঁর আর একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ফতেপুরে তিনি মহামান্য বাদশাহ আকবরের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করেন ও একটি সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হন। সেই কাজে প্রভুভক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় দিয়ে তিনি ধীরে ধীরে আগ্রা প্রাসাদের দেওয়ানপদ লাভ করেন।

বহু গুণ তাঁর ছিল। অতি সুচারুরূপে তিনি সিকস্তা লিখতেন এবং নানা কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতেন। কিন্তু একটি মহা দোষ তাঁর চরিত্রকে কালিমাময় করে তোলে। লোকের উপর চাপ দিয়ে উৎকোচ আদায়ে তাঁর জুড়ি ছিল না।

আলিকুলি বেগ ইস্তালজু পূর্বে ইরানের প্রাক্তন শাহ ইসমাইলের অধীনে সামান্য চাকুরী করত ও পরে হিন্দুস্থানে এসে খান-ই-খানানের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। এক সময়ে মহামান্য সম্রাট আকবর যখন লাহোরে বাস করছিলেন সেই সময়ে এই ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করে। অদৃষ্টের এরূপ বিধান ছিল বলে মীর্জা গিয়াস বেগের যে কন্যার জন্ম কান্দাহারে হয়েছিল তার বিবাহ হয় এই আলিকুলির সঙ্গে। পরে আমি তাকে উপযুক্ত মনসব ও শের-এ-আফগান উপাধি দিয়ে বাংলায় পাঠিয়ে দিই। সেখানে নিজস্ব জায়গীরের তত্ত্বাবধান করবার সময়ে সে অত্যন্ত অবাধ্য ও বিদ্রোহপ্রবণ হয়ে ওঠায় কুতুবউদ্দীন কোকলতাসকে বাংলায় পাঠাবার সময়ে তার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখবার জন্য নির্দেশ দিই। যদি শের-এ-আফগান বাধ্য ও কর্তব্যপরায়ণ থাকে তা হোলে সে নিজ জায়গীরে বহাল থাকবে, কিন্তু এর বিপরীতধর্মী হোলে তাকে বাদশাহ দরবারে পাঠিয়ে দিতে হবে। আসতে দ্বিধা করলে যথাযোগ্য শাস্তি দেবার দায়িত্ব কুতুবউদ্দীন কোকলতাসের।

রাজমহলে পৌঁছে কুতুবউদ্দীন বর্দ্ধমানে শের-এ-আফগানের কাছে আদেশ পাঠালেন, সে যেন সত্বর এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। কিন্তু সেই জায়গীরদার মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে সে আদেশ অমান্য করায় কুতুবউদ্দীন বাদশাহকে সে কথা জানান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে নির্দেশ যায়, যেন এই বেয়াদবির জন্য তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। নির্দেশ পেয়ে কুতুবউদ্দীন নিজ সহচরদের সঙ্গে নিয়ে বর্দ্ধমানে চলে গেলে শের-এ-আফগান দুজন পার্শ্বচরসহ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। কিছুক্ষণ বাকবিতণ্ডার পর উভয় পক্ষে সুরু হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি। জাহাঙ্গীর বলেন : শের-এ-আফগান আগে কুতুবউদ্দীনের পাকস্থলীতে তরবারি চালিয়ে দিয়েছিল বলে তার শাস্তি বিধানের জন্য পীর খাঁ কাশ্মীরী ও অন্যান্য বীর অফিসাররা তাকে সঙ্গে সঙ্গে শমন সদনে পাঠিয়ে দেয়।

জাহাঙ্গীর লিখছেন : এই ঘটনার পর গিয়াস বেগকে সম্মানজনক ইৎমদউদ্দৌলা উপাধি দিয়ে তাঁর কন্যাকে বর্দ্ধমান থেকে আগ্রা প্রাসাদে এনে

পরলোকগত বাদশাহর অন্যতম বেগম রুকিয়া সুলতানার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। বেশ কিছু কাল তিনি সেখানে সকলের অলক্ষ্যে বাস করেন। কিন্তু অদৃষ্টের বিধান এই ছিল যে তিনি পৃথিবীর সম্রাজ্ঞী হবেন। তাই তাঁর রাজ্যারম্ভের ষষ্ঠ বর্ষে নওরোজের দিন তাঁর সৌন্দর্যমুগ্ধ বাদশাহ জাহাঙ্গীর তাঁকে নিজের হারেম গ্রহণ করেন! সেখানে দিন দিন তাঁর প্রভাব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রথমে তিনি নূরমহল বা প্রাসাদজ্যোতি উপাধি পান। পরে বাদশাহ অনুভব করেন যে এই উপাধি তাঁর পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই নূরজাহান বা জগজ্জ্যোতি উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

যিনি ভারত সম্রাটের হৃদয়েশ্বরী তাঁর আত্মীয় স্বজন সাধারণ অবস্থায় থাকতে পারে না। জাহাঙ্গীরের আদেশে প্রত্যেককে উচ্চ পদবী ও জায়গীর প্রদান করা হয়। মহিষীর ব্যক্তিগত ক্ষমতা যাতে সবাই অনুভব করতে পারে সেজন্য তিনি ফরমান জারী করেন যে কোন নারী যদি কাউকে ভূমি দান করে তা হোলে দানপত্রের উপর নূরজাহান বেগমের শীল না থাকলে তা আইনত গ্রাহ্য হবে না। পরে তাঁকে বাদশাহী ক্ষমতাও প্রদান করা হয়। তিনি প্রায়ই প্রাসাদের অলিন্দে বসে আমীর ওমরাহদের প্রতি নির্দেশ দিতেন। বাদশাহর সঙ্গে তাঁর নাম জুড়ে দিয়ে সিক্কা প্রচারও করা হয়। বাদশাহী ফরমানের উপর তাঁর স্বাক্ষরও থাকত। জাহাঙ্গীর বলেন: নূরজাহানই সব! আমি এক সির সুরা ও আধ সির মাংস ছাড়া আর কিছুই চাই না।

ওসমান আফগান নিধন

নূরজাহান হরণের জন্য কুতুবউদ্দীন কোকলতাস যেমন শের আফগানকে হত্যা করেছিলেন শেরও তেমনি তাঁকে রেহাই দেন নি। এই অনুগত ব্যক্তির মৃত্যুতে জাহাঙ্গীরের মন কয়েকদিন ভারাক্রান্ত থাকে, পরে তিনি বিহারের ফৌজদার জাহাঙ্গীর কুলি খাঁকে বাংলায় পাঠিয়ে দেন।

পূর্ব জীবনে জাহাঙ্গীর কুলি ছিলেন ক্রীতদাস; আকবরের অনুগ্রহভাজন হয়ে বৃদ্ধ বয়সে বিহারের ফৌজদারী লাভ করেন। বাংলায় আসবার কিছু দিন পরে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে তাঁর মৃত্যু হোলে ইসলাম খাঁকে এখানকার সুবাদার করে পাঠান হয়। তাঁর নিয়োগে ফৌজী যুগের অবসান সূচনা করে। তাঁর সর্বাপেক্ষা

বড় কীর্তি উড়িষ্যার শেষ আফগান স্থলতান কতলু খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ওসমানের নিধন। এই প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর লিখছেন : আমার রাজ্যারম্ভের সপ্তম বর্ষে ১৬১২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ইসলাম খাঁর কাছে থেকে সংবাদ আসে যে দুষমন পরাজিত হয়েছে—বাংলা ওসমান আফগানের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। সেই ঘটনা বর্ণনা করবার পূর্বে বাংলার কিছু বিবরণ লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

বাংলা একটি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড—দ্বিতীয় স্তরে অবস্থিত। দৈর্ঘে বন্দর চাটগাঁ থেকে গাঢ়ি পর্য্যন্ত ৪৫০ ক্রোশ, প্রস্থে উত্তরের পর্বত থেকে মান্দারণ পর্য্যন্ত ২২০ ক্রোশ। রাজস্ব ৬০ কোটি দাম। পূর্বকালে এখানকার শাসকরা আট হাজার অশ্বারোহী, এক লক্ষ পদাতিক, এক হাজার হস্তী ও চার পাঁচ শ জাহাজের নৌবহর রাখতেন। আফগান শের খাঁ ও তাঁর পুত্র সেলিম খাঁর সময় থেকে এই দেশটি আফগানদের অধিকারে ছিল। আমার মাননীয় পিতা হিন্দুস্থান মসনদের শোভা বর্দ্ধন করবার পর থেকে এই দেশকে বশে আনবার জন্য একটি ফৌজ নিয়োগ করেন। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর খান-ই-জাহান কর্তৃক শেষ আফগান স্থলতান দাউদ কররানি নিহত ও তাঁর সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়।

সেই থেকে সাম্রাজ্যের কর্মচারীরা এই দেশ শাসন করছে বটে কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে আফগানদের উৎপাত বরাবর চলছে। মান সিংহ দীর্ঘকাল এই দেশের স্থবাদার ছিলেন। আমি মসনদে আরোহণের প্রথম বৎসরে তাঁকে রাজধানীতে ফিরিয়ে এনে আমার কোকলতাস কুতুবউদ্দীনকে তাঁর জায়গায় নিয়োগ করি।.........ইসলাম খাঁ বয়সে তরুণ ও শাসন বিষয়ে অনভিজ্ঞ হোলেও এই দেশে শৃঙ্খলা এনেছেন। তাঁর অনন্যসাধারণ কৃতিত্ব ওসমান আফগানের নিধন। আমার পিতার রাজত্বের সময়ে বাদশাহী ফৌজ এই ব্যক্তির সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ চালিয়েও বশে আনতে পারে নি।

স্থানীয় জমিদারদের আনুগত্য আদায় করবার জন্য ইসলাম খাঁ ঢাকায় বসবাস করে ওসমান ও তার দুর্দ্ধর্ষ অনুচরবর্গকে বশীভূত বা নিধন করতে যত্নবান হন। স্থজাৎ খাঁ সে সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। এই কাজের দায়িত্ব স্থজাৎএর উপর ন্যস্ত করে আরও বহু অফিসারকে তাঁর সঙ্গে পাঠান হয়। যখন তাঁরা ওসমানের দেশ ও দুর্গের কাছে গিয়ে পৌছান তখন কয়েকজন উপযুক্ত বাগ্মীকে তার কাছে পাঠিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয় সে যেন বিদ্রোহ-

প্রবণতা ত্যাগ করে একজন সৎ প্রজার মত আচরণ করে। কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী! সেই স্পর্দ্ধিত উচ্চাকাঙ্খী আফগান এই সদুপদেশে কান দিল না; এ দেশকে নিজ অধিকারে আনা ছাড়া অন্য কোন পরিকল্পনা তার ছিল না। তাই সকল উপদেশ উপেক্ষা করে সে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে এক গ্রাম্য নালার ধারে জলায় ঘেরা উচ্চভূমিতে নিজ সৈন্যদের সন্নিবেশিত করে। সুজাৎ খাঁও তাকে আক্রমণের জন্য নূতন করে ব্যূহ বিন্যাস করেন। ওসমানের সেদিন যুদ্ধ করবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যখন শুনল যে বাদশাহী ফৌজ এগিয়ে আসছে তখন নালার ধারে গিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হোল।

১৬১২ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ প্রত্যুষে উভয় পক্ষে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেলে সেই দুঃসাহসী বিদ্রোহী এক ভীমদর্শন হাতীর পিঠে চড়ে এগিয়ে এসে আমাদের অগ্রবাহিনীর সামনে একেবারে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। বাদশাহী অফিসাররা প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করলেন বটে কিন্তু একে একে ধরাশায়ী হোতে লাগলেন। দক্ষিণ উইংএর অধিনায়ক ইফতিকার খাঁ বীরত্বে কিছু কম ছিলেন না, কিন্তু তিনিও যুদ্ধে নিহত হোলেন। তাঁর সৈন্যরা প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করে শেষ পর্য্যন্ত নির্মূল হয়ে গেল। বাম উইংএর কিশোয়ার খাঁ অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে শেষ পর্য্যন্ত মৃত্যু বরণ করলেন।

শত্রু পক্ষের বহু লোক আহত হোলেও তাদের নায়ক ওসমান অদ্ভুত নৈপুণ্যের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে লাগল। যখন সে দেখল যে আমাদের অগ্রবাহিনীর দক্ষিণ ও বাম উইংএর কমাণ্ডাররা নিহত হয়েছেন বটে কিন্তু মধ্য উইং অটুট রয়েছে তখন নিজের লাভলোকসানের কথা বিবেচনা না করে বীর বিক্রমে সেই উইংএর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুজাৎ খার পুত্র, আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য লোকজন সিংহ ও ব্যাঘ্রের মত তার সামনে গিয়ে মহা নির্ঘোষে যুদ্ধ করলে শত্রুপক্ষের অনেকে নিহত ও অনেকে সাংঘাতিকরূপে আহত হবার পর ওসমানের সেই বিরাটকায় হস্তী এসে সুজাৎ খাঁকে আক্রমণ করল। তিনি বর্শা দিয়ে হাতীটিকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন; কিন্তু সেই ভীষণ জন্তু বর্শাকে কতটুকু গ্রাহ্য করে? সুজাৎ তখন তরবারি কোষমুক্ত করে তাকে দুবার আঘাত করলেন। কিন্তু তাতে কি? পরে তিনি ছোরা দিয়ে আঘাত করলেও সে কোন কিছুতে ভ্রুক্ষেপ না করে অশ্বসহ সুজাৎকে ধরাশায়ী করবার চেষ্টা করল। অশ্ব থেকে নিক্ষিপ্ত হবার সময়ে সুজাৎ খাঁ

চেঁচিয়ে উঠলেন : জাহাঙ্গীর শাহ! ঠিক সেই সময়ে একজন সিপাহী এসে সেই ভীষণ জানোয়ারের সামনের পায়ে দুমুখো তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করায় সে পা বেঁকে নীচু হয়ে পড়ল। সুজাৎ ও সেই সিপাহী তখন হস্তীর আরোহী ওসমান খাঁকে মাটিতে ঠেলে ফেলে জন্তুটির মাথা ও শুঁড়ে বারবার তরবারি বিঁধতে থাকায় সে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে করতে পশ্চাদপসারণ করল। এত বেশী অস্ত্রাঘাতে সে বিদ্ধ হয়েছিল যে নিজ ব্যূহে পৌছাবার পরই তার মৃত্যু হয়।

সুজাৎ খাঁর ঘোড়া অক্ষত দেহে মাটি থেকে উঠে পড়লেও তিনি যখন তার পিঠে আরোহণ করতে যাবেন সেই সময়ে তাকে আবার ভূপতিত করবার জন্য শত্রু তাঁর পতাকাবাহীর দিকে আর একটা হস্তী ঠেলে দিল। তাই দেখে সুজাৎ পতাকাবাহীকে সতর্ক করে চেঁচিয়ে উঠলেন : মানুষের মত কাজ করো, আমি এখনও বেঁচে রয়েছি। আশপাশের সকল লোক তখন তরবারি, তীর ও ছোরা মেরে হাতীটিকে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। সুজাৎ খাঁ পতাকাবাহীকে মাটি থেকে ওঠবার আদেশ দিয়ে আর একটি ঘোড়া চেয়ে নিয়ে পতাকাসহ লোকটিকে বসিয়ে দিলেন।

এই ধস্তাধস্তির সময়ে একটি বন্দুকের গুলি বিদ্রোহী নায়কের কপাল ভেদ করে চলে যায়। কিন্তু যে হাত সেই গুলি চালিয়েছিল পরে যথোচিৎ অনুসন্ধান করেও তাকে খুঁজে বার করা যায় নি। গুলি লাগতেই ওসমান কিছুটা পেছিয়ে গেল, কারণ সে বুঝে নিয়েছিল যে মৃত্যু আসন্ন। কিন্তু আশ্চর্য্য সৈনিক এই ওসমান! আঘাত সত্বেও সে আড়াই ঘড়ি ধরে তার লোকদের যুদ্ধ চালাবার জন্য উদ্দীপনা জোগাল। যুদ্ধ ও হত্যা সমানভাবে চলতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত শত্রু পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে যতক্ষণ না তারা নিজেদের সুরক্ষিত স্থানে গিয়ে পৌছাল আমাদের সৈন্যরা তাদের অনুসরণ করতে লাগল। সেখানে পৌছেও তারা অবিশ্রান্তভাবে তীর ও গুলি বর্ষণ করে আমাদের সৈন্যদের পক্ষে ভিতরে প্রবেশ অসম্ভব করে তুলল।

ওসমানের সাংঘাতিক আঘাতের কথা তার ভ্রাতা ওয়ালি ও পুত্র মামরেজের গোচরীভূত হোলে তারা বুঝে নিল যে মৃত্যু আসন্ন। তারা একথাও চিন্তা করল যে এই পরাজয়ের পর যদি নিজেদের দুর্গম স্থানে ফিরে যাবার চেষ্টা করে একজনও সেখানে গিয়ে পৌছাতে পারবে না। সকল দিক বিবেচনা করে তারা স্থির করল

যে কোন রকমে রাতটা সেখানে কাটিয়ে সূর্যোদয়ের পূর্বে নিজেদের কেল্লার দিকে সরে পড়বে। মধ্য রাত্রে ওসমান দোজখে চলে গেল। পরের ঘড়িতে দুষমনরা সব কিছু ফেলে রেখে তার লাস নিয়ে নিজ দুর্গের দিকে রওনা দিল। এই পলায়নের কথা শুনে সুজাৎ খাঁ চেয়েছিলেন যে তাদের তাড়া করে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় না দিতে, কিন্তু তাঁর সৈন্যরা একে রণক্লান্ত তায় নিহতদের কবর দেওয়া ও আহতদের শুশ্রূষা করবার দায়িত্ব থাকায় সেরূপ কিছু করা সম্ভব হোল না। সেই সময়ে মোয়াজ্জিম খাঁর পুত্র আব্দুল ইসলাম কয়েকজন অফিসার, ছয় শত ঘোড়সোয়ার ও চার শত গোলন্দাজসহ এক ব্যাটালিয়ন সৈন্য নিয়ে সেখানে উপস্থিত হোলেন। এই নূতন সৈন্যগণ বিদ্রোহীদের পশ্চাদ্ধাবন সুরু করেছে দেখে তাদের নূতন নায়ক ওয়ালি সন্ধি প্রার্থনা করে সুজাৎ খাঁর কাছে দূত পাঠালেন। তিনি ও অন্যান্য অফিসাররা সে প্রস্তাব গ্রহণ করে নিজেদের সর্ত জানিয়ে দিলে পরের দিন ওয়ালি এবং নিহত ওসমানের পুত্র ও আত্মীয়গণ বাদশাহী তাবুতে এসে ঊনপঞ্চাশটী হস্তী ও অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করল। অধিকৃত দেশে প্রহরার জন্য কিছু সৈন্য রেখে সুজাৎ খাঁ ওয়ালিসহ সকল আফগান বন্দীকে নিয়ে জাহাঙ্গীরনগরের (ঢাকা) দিকে রওনা হে লেন এবং ৬ই সাফার তারিখে সেখানে পৌছে সুবাদার ইসলাম খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনিই এই যুদ্ধের পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন বলে আমি তাঁকে ছয় হাজারী মনসবদারীতে উন্নীত করি এবং সুজাৎ খাঁকে রুস্তম উপাধি ও এক হাজারী মনসবদারী দিই।

ওসমান নিধনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গেশনন্দিনীর এক নায়ক চিরতরে ধরাধাম ত্যাগ করেন! আফগানদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধও চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়!

Memoirs of Jahangir (Susil Gupta ed.), p. 82-86

ত্রিংশৎ অধ্যায়

বাংলার জন্ম

টোডরমলের রিপোর্ট

নিরক্ষর হোলেও আকবর ছিলেন সত্যিকার রাজনীতিক। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সত্বেও তিনি যখন দেখলেন যে বামিয়ান গিরিবত্ম থেকে চট্টগ্রাম এবং কাশ্মীর থেকে খান্দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডের উপর তাঁর অধিকার প্রসারিত হয়েছে এবং মান সিংহ, মুনাইম খাঁ প্রভৃতি শক্তিমান যোদ্ধাগণ বিদ্রোহীদের দমন করবার দায়িত্ব নিয়েছেন তখন তাঁর বুঝতে বাকি রহিল না যে অদূর ভবিষ্যতে মোগল অধিকার এই বিশাল জনপদের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাই দাউদ কররানির আত্মসমর্পণের পর তিনি রাজা টোডরমলকে রাজধানীতে নিয়ে এসে সদ্যগঠিত সাম্রাজ্যের রাজস্ব তালিকা প্রণয়ন ও শাসন প্রণালী নির্দ্ধারণের দায়িত্ব অর্পণ করেন। সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবার জন্য টোডরমল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পদস্থ রাজপুরুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আগ্রায় আহ্বান জানিয়ে তাঁদের সাহায্যে সমগ্র মোগল সাম্রাজ্যকে তেরটি সুবায় ভাগ করেন। গৌড় থেকে যারা গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন কররানিদের কানুনগো দফতরের দুজন পদস্থ অফিসার শ্রীহরি ও তাঁর ভ্রাতা জানকীবল্লভ গুহ। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শের পর তিনটি স্বতন্ত্র জনপদ রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গ সংযুক্ত করে যে প্রদেশটি গঠিত করা হয় সেটি মোগল যুগের সুবা বাংলা। যুগ যুগান্তরের গৌড় সেই সঙ্গে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বিলীন হয়ে যায়!

রাজা টোডরমলের এই বিভাগ আবুল ফজল তাঁর আইন-ই-আকবরীতে যেভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা থেকে জানা যায় যে উড়িষ্যাসহ সুবা বাংলার পূর্বদিকে সমুদ্র, উত্তর ও দক্ষিণে (?) পর্বত এবং পশ্চিমে সুবা বিহার। ঢাকা

ময়মনসিংহের অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত ভাটি রাজ্য তখন বাংলার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এক বিদ্রোহী জনপদ। ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য। এই রাজ্যের অধিপতি যশোমাণিক্যের সৈন্য সংখ্যা এক সহস্র হস্তী ও দুই লক্ষ পদাতিক; অশ্বারোহী নেই বললেও চলে। বাংলার উত্তর সীমান্তে কুচবিহার আর একটি স্বাধীন রাজ্য; সৈন্য সংখ্যা এক হাজার অশ্বারোহী ও এক লক্ষ পদাতিক। কামরূপ এই রাজ্যের অংশ; কুচহাজোও বলা হয়। তার ওপারে আসাম খুবই শক্তিশালী রাজ্য। আসামের সন্নিহিত দেশ তিব্বতের গা ঘেঁষে গেছে খিতাই; এর প্রকৃত নাম মহাচীন। বাংলার উত্তর-পূর্ব (?) সীমান্তে আরাকান একটি স্বতন্ত্র দেশ; চট্টগ্রাম বন্দর এই দেশে অবস্থিত।

আবুল ফজল বলেন, বাংলা ১৯ সরকার ও ৬৮২ মহলে বিভক্ত। সেগুলির মধ্যে সরকার জিন্নতাবাদের স্থান অতি উচ্চ। জিন্নতাবাদ খুবই প্রাচীন নগর। পূর্বে এর নাম ছিল লখনৌতি—গৌড়ও বলা হোত। মহামান্য স্বর্গীয় সম্রাট জিন্নতবানী আসিয়ানী (হুমায়ুন) এখানে অবস্থান করবার সময়ে নিজ নামানুসারে বর্তমান নামটি প্রদান করেন। এখানে একট চমৎকার দুর্গ আছে।

মামুদাবাদের দুর্গ জলায় ঘেরা। শের শাহ এই দুর্গ জয় করলে রাজার হাতীগুলি নিকটবর্তী জঙ্গলে পালিয়ে যায়; সেখানে তাদের সংখ্যা এখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার খলিফাবাদেও হাতী পাওয়া যায়। সরকার বাকলা সমুদ্র তীরে অবস্থিত। মহামান্য আকবরের রাজ্যারম্ভের ২৯তম বৎসরে এখানে সমুদ্র থেকে প্রচণ্ড ঝড় ও বন্যা এসে দুই লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটায়। একটি হিন্দু মন্দির ব্যতীত সব কিছু বন্যার জলে ডুবে যায়। রাজা সেই মন্দিরের উপরে উঠে প্রাণ বাঁচান।

সরকার ঘোড়াঘাট পট্টবস্ত্রের জন্য বিখ্যাত। এখানে যথেষ্ট ঘোড়াও পাওয়া যায়। বরবকাবাদ সরকারে গঙ্গাজল নামে যে সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হয় তার খ্যাতি সর্বত্র। সরকার বাজুহাতে যে সব বড় বড় গাছ জন্মায় সেগুলি থেকে নৌকা ও কড়িবরগার কাঠ সংগৃহীত হয়। এখানে একটি লোহার খনি আছে।

সরকার সোনারগাঁয়ে কসবা বস্ত্র তৈরী হয়। এখানকার চরসিন্ধুর সহরে যে জলাশয়টি আছে তার জলে কাপড় কাচলে সেই কাপড় খুব সাদা হয়। সরকার সিলেট পর্বতময়। এখানে সান্তারা নামে যে ফল পাওয়া যায় তা ঠিক

কমলালেবুর মত। এখানকার লোকেরা বর্ষার সময়ে গাছ কেটে কয়েক মাস পরে সেগুলি ঘরে তোলে। সিলেটের বনরাজ পাখীর রং কালো, চক্ষু লাল, লেজ লম্বা ও ডানা বিচিত্র বর্ণের। এই সরকার থেকে বহু খোজা সংগৃহীত হয়।

চট্টগ্রাম সমুদ্র তীরবর্তী বৃহৎ বন্দর ও বাণিজ্যপ্রধান স্থান। ব্যবসায়ের জন্য বহু খৃষ্টান এখানে এসে বাস করে। এই সরকারটি আসলে আরাকান রাজ্যে অবস্থিত। সরকার সরিফাবাদে বৃহদাকার ষাঁড়, ছাগল ও মুরগী পাওয়া যায়। সাতগাঁয়ে দুইটি বৃহৎ বাজার আছে। একটির নাম সাতগাঁ ও অন্যটির নাম হুগলী। দুটিই ফিরিঙ্গীদের অধিকারে।

আসল তুমার জমা

টোডরমলের যে রাজস্বতালিকা থেকে আবুল ফজল সুবা বাংলার উপরোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাকে বলা হয় তকসীম জমা বা আসল তুমার জমা। এই তালিকায় বাংলাকে ১৯ সরকার ও ৬৮২ মহলে ভাগ করা হয়েছে। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হোল ঃ—

১) সরকার তাঁড়া

মহল—৫২

রাজস্ব—২৪,০৭৯,৩৯৯½ দাম

২) সরকার জিন্নতাবাদ

মহল—২৬

রাজস্ব—১৫,৭৩,১৯৬ দাম

৩) সরকার ফতাহাবাদ

মহল—৩১

রাজস্ব—৭৯,৬৯,৫৬৭ দাম

অশ্বারোহী—৯০০, পদাতিক—৫০,৭০০

৪) সরকার মামুদাবাদ

মহল—৮৮

রাজস্ব—১,১৬,১০,২৫৬ দাম

অশ্বারোহী—২০০; পদাতিক—১০,০০০

৫) সরকার খলিফাবাদ

মহল—৩৫

রাজস্ব—৫৪,০২,১৪০ দাম

অশ্বারোহী—১০০ ; পদাতিক—১৫,১৫০

৬) সরকার বাকলা

মহল—৪,

রাজস্ব—৭১,৩০,৬৪৫ দাম

অশ্বারোহী—৩২০ ; পদাতিক—১৫,০০০

৭) সরকার পূর্ণিয়া

মহল—৯

রাজস্ব—৬৪,০৮,৭৯৮ দাম

অশ্বারোহী—১০০ ; পদাতিক—৫,০০০

৮) সরকার তাজপুর

মহল—২৯

রাজস্ব—৬৪,৮৩,৮৫৭ দাম

অশ্বারোহী—১০০ ; পদাতিক—৭,০০০

৯) সরকার ঘোড়াঘাট

মহল—৮৪

রাজস্ব—৮৩,৮৩,০৭২½ দাম

হস্তী—৫০ ; অশ্বারোহী—৯০০ ; পদাতিক—৩২,৬৮০

১০) সরকার জিঞ্জিরা

মহল—২১

রাজস্ব—৫৮,০৩,২৭৫ দাম

অশ্বারোহী—৫০ ; পদাতিক—৭,০০০

১১ সরকার বরবকাবাদ

মহল—৩৮

রাজস্ব—১,৭৪,৫১,৫৩২ দাম

অশ্বারোহী ৫০ ; পদাতিক—৭,০০০

১২) সরকার সিলেট

মহল – ৮

রাজস্ব -৬৬,৮১,৬২০ দাম।

হস্তী --১৯০ , অশ্বারোহী—১,১০০ , পদাতিক – ৪২,৯২০

১৩) সরকার চট্টগ্রাম

মহল—৭

রাজস্ব—১১,৪২,৩১০ দাম

অশ্বারোহী—১০০ , পদাতিক—১,৫০০

১৪) সরকার সরিফাবাদ

মহল—২৬

রাজস্ব—২,২৪,৮৮,৭৫০ দাম

অশ্বারোহী—২০০ , পদাতিক—৫,০০০

১৫) সরকার সেলিমাবাদ

মহল—৩১

রাজস্ব—১,৭৬,২৯,৭৬৪ দাম

অশ্বারোহী —১০০ ; পদাতিক — ৫,০০০

১৬) সরকার বাজুহা

মহল - ৩২

রাজস্ব -- ৩,৯৫,১৬,৮৭১ দাম

হস্তী —১০ , অশ্বারোহী—১,৭০০ , পদাতিক —৪৭,৩০০

১৭) সরকার সোনারগাঁ

মহল - ৩২

রাজস্ব -১,০৩,৩১,৩৩৩ দাম

হস্তী -২০০ ; অশ্বারোহী—১,৫০০ , পদাতিক—৪৬,০০০

১৮) সরকার সাতগাঁ

মহল ৫৩

রাজস্ব—১,৬৭,২৪,৭২০ দাম

কলিকাতা
মেকুমা } ৯,৩৬,২১৫ দাম
বরবাকপুর

অশ্বারোহী—৫০ ; পদাতিক—৬,০০০

১৯) সরকার মান্দারণ

মহল—১৬,

রাজস্ব—৯৪,০৩,৪০০ দাম

কুচবিহার ও বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া তখন স্বতন্ত্র রাজ্য এবং মেদিনীপুর সুবা উড়িষ্যার সরকার জলেশ্বরের অন্তর্ভুক্ত। সেই কারণে বাংলার রাজস্ব তালিকায় ওই অঞ্চলগুলির স্থান নেই। সরকার সিলেট, সরকার চট্টগ্রাম ও সরকার সোনারগাঁ তখনও শত্রু কবলিত থাকলেও যে পুনরুদ্ধার আসন্ন তার ইঙ্গিত এই রাজস্ব তালিকায় পাওয়া যায়। সুবা বাংলার রাজস্ব সর্বসাকুল্যে টাঃ ১,৪৯,৬১, ৪৮২৬৩/৭ পাই। কিন্তু সবই কাগজে কলমে। কারণ বারো ভূঁইয়াদের অনেকেই তখন মোগল বিরোধী, কোন রাজস্ব দেন না। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা অন্যান্য সুবা থেকে আনতে হয়।

খালসা জমি অর্থাৎ বাদশাহর সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন জমির পরিমাণ কিছু কম নয়। সেখানকার প্রজারা সরকারী কোষাগারে মুদ্রায় রাজস্ব দেয়। অন্যান্য সুবার মত উৎপন্ন শস্যের পরিবর্তে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদান এই সুবার চিরাচরিত রীতি। আকবর সে রীতি মেনে নিয়ে ১৫৯২ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী রায় রামদাসকে বাংলার তহশীলদার নিযুক্ত করেন। তিনি যে কত টাকা আদায় করতেন তার বিবরণ কোথায় লিপিবদ্ধ নেই।

1. Abul Fazl Allami *Ain-i-Akbari, Gladwin's trans., p. 459-73*
2. Ibid *Akbarnama iii., p. 924*

একত্রিংশৎ অধ্যায়

ইসলাম খাঁ

জবরদস্ত সুবাদার

জাহাঙ্গীর লিখছেন : মান সিংহ বহু দিন ধরে বাংলার সুবাদারের কাজ করলেও আমার রাজ্যারম্ভের প্রথম বর্ষে আমি তাঁকে ফিরিয়ে এনে আমার কোকলতাস কুতুবউদ্দীনকে ওই সুবায় পাঠাই। তিনি সেখানে পৌঁছবার কিছু দিন পরেই এক দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি তাঁকে হত্যা করে ও নিজে নিহত হয়। তখন আমি বিহারের সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলি খাঁর কাছে আদেশ পাঠাই, তিনি যেন বাংলায় গিয়ে সেখানকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পূর্বে আমি তাঁকে পাঁচ হাজারী মনসবদার নিয়োগ করেছিলাম। ইসলাম খাঁ সে সময়ে আগ্রায়; জাহাঙ্গীর কুলির জায়গায় তাঁকে বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করে এক ফরমান পাঠাই। কিছু দিন পরে জাহাঙ্গীর কুলি বাংলার জলবায়ুর দোষে অসুস্থ হয়ে পরলোকগমন করলে ইসলাম খাঁকে আদেশ দিই তিনি যেন শীঘ্র সেখানে গিয়ে ওই সুবার ভার নেন। আফজল খাঁকে বিহারে নিযুক্ত করি।

ইসলাম খাঁর নিয়োগে আমার কয়েকজন ভৃত্য তাঁর অপরিণত বয়স ও অভিজ্ঞতার অভাবের জন্য বিরূপ মন্তব্য করেছিল, কিন্তু আমি নিয়োগ করেছিলাম তাঁর চরিত্র মাধুর্য্য ও প্রতিভার কথা বিবেচনা করে। তার ফল ভালই হয়েছে, পূর্বে বাংলায় যে শৃঙ্খলার অভাব ছিল ইসলাম খাঁ তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ চিস্তি ছিলেন প্রসিদ্ধ পীর সেলিম চিস্তির পৌত্র ও জাহাঙ্গীরের বাল্যবন্ধু। শাসনকার্য্যে কোনরূপ অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁর নিয়োগের পিছনে শৈশবের বন্ধুপ্রীতি ছাড়া আর কিছু বিবেচ্য বাদশাহর ছিল না। তিনি তখন সবেমাত্র নূরজাহানকে পেয়ে সাকী ও সুরার বেহেস্তে বাস

করছেন, আর তাঁর বাল্যবন্ধু আগ্রায় একজন সাধারণ নাগরিকের জীবন যাপন করবে? সেই অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তিকে বাংলার সুবাদারীতে নিয়োগ করবার পিছনে যে কারণই থাকুক তিনি নিজ কর্মতৎপরতার দ্বারা প্রমাণ করেন যে দান অযোগ্য পাত্রে পড়ে নি। সব কাজেই ইসলাম খাঁর উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল যথেষ্ট এবং কূটনীতিতে তিনি ছিলেন ধুরন্ধর। ঝানু কুটনীতিকের মত কোন কাজ সিধা পথ ধরে করতেন না; বাদশাহর মনোরঞ্জনের জন্য শত্রু মিত্র সবার উপর মাত্রাতিরিক্ত ক্রুর আচরণ করে তিনি বাংলায় শ্মশানের শান্তি স্থাপন করেন। তাঁর বহু দোষ সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে যে এরূপ একজন জবরদস্ত সুবাদার না এলে যে বাংলা আকবরের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে নামেই মোগল সাম্রাজ্যের এক সুবা হয়েছিল তার উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন সম্ভব হোত না।

মীর্জা নাথান বলেনঃ বাংলায় এসে ইসলাম খাঁ জাহাঙ্গীরকে লেখেন, দেওয়ান উজীর খাঁকে আগ্রায় ফিরিয়ে নিয়ে ইমতিহান খাঁ বা অনুরূপ কোন যোগ্য অফিসারকে যেন এখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই পত্র পেয়ে জাহাঙ্গীর আবুল হাসানকে মুতাইদ খাঁ উপাধি দিয়ে দেওয়ান ও ইমতিহান খাঁকে মীরবহর বা প্রধান নৌ-সৈন্যাধ্যক্ষ নিয়োগ করে বাংলায় পাঠান। ইমতিহান খাঁর সঙ্গে আসেন তাঁর যোদ্ধা-ডায়েরী লেখক পুত্র সিতাব খাঁ। মীর্জা নাথান এই ছদ্ম নামে লিখিত তাঁর রোজনামচা বাহারীস্থান-ই-গৈবি থেকে এই অধ্যায়ের উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে।

ঢাকায় রাজধানী স্থাপন

ইসলাম খাঁ এসে মান সিংহ প্রতিষ্ঠিত রাজধানী রাজমহলে অবস্থান করবার সময়ে দেখেন যে বাংলার সর্বত্র বিদ্রোহ, সর্বত্রই বিদ্রোহীরা মোগল শক্তিকে বিপন্ন করে তুলেছে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর, পঞ্চকোটের সাম্‌স খাঁ ও হিজলীর সেলিম খাঁ না স্বাধীন না মোগলের অধীন। তাঁদের দমন করবার দায়িত্ব শেখ কামালের উপর অর্পণ করে তিনি নিজে চললেন ঢাকায়। সেখানে কোয়ার্টার স্থাপন করে মুসা খাঁ ও অন্যান্য ভুঁইয়া রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবেন। আবার ওসমান খাঁ লোহানি ও বায়াজিদ কররানির নেতৃত্বে আফগানরা শ্রীহট্টে যে দুইটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছে সেগুলি ধ্বংস করতে হোলে ঢাকার চেয়ে উৎকৃষ্টতর স্থান আর নেই। এই সব বিদ্রোহীর ক্রিয়াকলাপে উৎসাহিত হয়ে

ত্রিপুরী সৈন্যরা মাঝে মাঝে এসে মোগল অধিকারের মধ্যে উপদ্রব করছে। আরাকানের মগরাও উপকূল অঞ্চলে লুঠতরাজ চালাচ্ছে। রাজমহলে রাজধানী থাকলে এই মোগল বিরোধীরা দমিত হওয়া তো দূরের কথা উত্তোরত্তর শক্তি সঞ্চয় করবে, ভাবলেন ইসলাম খাঁ।

মোগল সাম্রাজ্যের প্রসারের কথাও ভাবতে হয়। যে সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত আফগানিস্থানে গিয়ে শেষ হয়েছে তাকে পূর্ব দিকে এসে ক্ষুদ্র কুচবিহার, কামরূপ, কাছাড়, ত্রিপুরা, আসাম ও আরাকান রাজ্যকে সমকক্ষ বলে মেনে নিতে হবে? তাদের কারও স্বাধীন থাকবার অর্থ হয় না—স্বেচ্ছায় মোগল শান্তি মেনে নিলে নিজেদের সমৃদ্ধির পথ মুক্ত করবে। এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে সমঝৌতা করতে হোলে ঢাকায় রাজধানী স্থাপন একেবারে গোড়ার কথা। মান সিংহ সে কথা বুঝেছিলেন বলে দুই বৎসর ধরে ওই নগরীতে বাস করেছিলেন। তাঁর সময় থেকে ঢাকা ধীরে ধীরে রাজধানীর মর্যাদা পাচ্ছিল। সে সময়ে গোড়ার দিকে অবশ্য সকল সরকারী দফতর আগের মত রাজমহলে থাকত, কিন্তু সুবাদার ঢাকায় বাস করায় অধিকাংশ কাজকর্ম সেখান থেকেই চলত। এই সব কথা বিবেচনা করে ইসলাম খাঁ ১৬১২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সমস্ত দফতর রাজমহল থেকে সরিয়ে এনে ঢাকাকে পুরাপুরি রাজধানী বলে ঘোষণা করলেন। নাম দেওয়া হোল জাহাঙ্গীরনগর।

প্রতাপাদিত্যকে জায়গীর প্রদান

ইসলাম খাঁ বাংলার সুবাদার হয়ে এসেছেন শুনে রাজা প্রতাপাদিত্য মূল্যবান উপঢৌকনসহ পুত্র সংগ্রামাদিত্য ও বিশেষ দূত শেখ বাদীকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। ইসলাম খাঁ খুশী হয়ে তাঁদের বলেন, রাজা প্রতাপাদিত্য সত্যিই যদি মোগলের বন্ধু হন তাহোলে যেন যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আলাইপুরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই অনুযায়ী ইসলাম খাঁ যখন ভাটি আক্রমণের জন্য রওনা হয়ে আত্রেয়ী নদীর তীরে শাহপুর থানায় শিবির সন্নিবেশ করেন প্রতাপাদিত্য তখন সেখানে চলে আসেন। ভূঁইয়া রাজদের মধ্যে রাজা প্রতাপাদিত্যের স্থান যে অতি উচ্চ সে কথা জানা থাকায় ইসলাম খাঁ তাঁকে প্রভূত সম্মান দেখিয়ে একটি ঘোড়া, একখানি মনিমুক্তাখচিত তরবারির খাপ ও মূল্যবান পোষাক উপহার দেন।

সে সময়ে দারুণ বর্ষা সুরু হওয়ায় ইসলাম খাঁ আপাততঃ ভাটি আক্রমণ স্থগিত রেখে ঘোড়াঘাটে অবস্থানের সিদ্ধান্ত করেন। প্রতাপাদিত্যকে বলেন, তিনি যেন নিজ রাজ্যে ফিরে গিয়ে সংগ্রামাদিত্যের অধীনে চার শত কোষা নৌকা মীরবহর ইমতিহান খাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁর নিজের এখন কিছু করবার নেই, তবে বর্ষা শেষে যখন মুসা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান সুরু হবে সেই সময়ে যেন বিশ হাজার পদাতিক ও এক শত রণতরীসহ আন্দিল নদী ধরে শ্রীপুর ও বিক্রমপুরে গিয়ে মুসা খাঁ মসনদ-ই-আলা ও তাঁর পক্ষীয় জমিদারদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এক হাজার মণ বারুদও যেন সঙ্গে আনেন। এই সব সাহায্য লাভের আশায় ইসলাম খাঁ প্রতাপাদিত্যকে শ্রীপুর ও বিক্রমপুর জেলা দুইটি জায়গীর দেন। তার পর তাঁকে পাঁচটি ইরাকী ও তুর্কী ঘোড়া, একটি পুং হস্তী, দুইটি স্ত্রী হস্তী, মণিমুক্তাখচিত কর্প্‌রদান প্রভৃতি বহু মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিয়ে রাজকীয় আড়ম্বরে বিদায় দেন।

মুসা খাঁর পরাজয়

বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলে ইসলাম খাঁ ভাটির জমিদার মুসা খাঁকে আক্রমণের জন্য ঘোড়াঘাট শিবির থেকে রওনা হয়ে করতোয়া নদী ধরে বালিয়ায় চলে গেলেন। এখানে স্থির হয় যে মূল জল ও স্থলবাহিনীসহ তিনি ও ইমতিহান খাঁ যাত্রাপুরের দিক থেকে মুসা খাঁকে আক্রমণ করবেন, নিম্নতর সৈন্যাধ্যক্ষরা ক্ষুদ্রতর বাহিনী নিয়ে ঢাকা থেকে এক দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলবেন। মুসা খাঁও প্রস্তুত ছিলেন। তিনজন প্রবীণ সৈন্যাধ্যক্ষ মীর্জা মুনিম, দরিয়া খাঁ ও মধু রায়ের উপর যাত্রাপুর দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি নিজে সকল সীমান্ত পরিদর্শন করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর সৈন্যাধ্যক্ষরা ন্যস্ত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছিলেন, কিন্তু এক দিন মীর্জা মুনিম তুচ্ছ কারণে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে দরিয়া খাঁকে হত্যা করেন। মুসা খাঁর কাছে এই সংবাদ পৌছালে তিনি বুঝে নেন যে দুর্গরক্ষীদের এরূপ আত্মকলহ চলতে থাকলে পরিণামে শত্রু লাভবান হবে। তাই নিজে সাত শতখানি রণতরীসহ সেখানে চলে গিয়ে মোগলদের আক্রমণ করেন।

মূল মোগল বাহিনীর সঙ্গে মূল ভাটি বাহিনীর যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। সারা দিন

যুদ্ধ চলবার পর কোন পক্ষই প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে না পেরে নিজ নিজ ঘাটিতে ফিরে গেলেও মুসা খাঁ নিশ্চেষ্ট বসে থাকেন নি; হাজার হাজার শ্রমিক লাগিয়ে রাতারাতি সেখানে এক পরিখাবেষ্টিত মাটির কেল্লা নির্মাণ করে ফেলেন। পর দিন প্রভাতে মোগল সৈন্যরা বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখল যে সেই নূতন দুর্গ প্রাচীরের অন্তরাল থেকে মুসা খাঁর সৈন্যগণ তাদের উপর তীর ও গুলি বর্ষণ করছে! সুবাদার ইসলাম খাঁ সে সময়ে তাঁবুর ভিতর প্রাতরাশে বসেছিলেন; শত্রু নিক্ষিপ্ত একটি গোলা তাঁবুর সম্মুখে বিদীর্ণ হওয়ায় তাঁর ২০।২৫ জন খানসামা ও পতাকাবাহী নিহত হয়।

এইভাবে পরপর কয়েক দিন যুদ্ধ চলবার পর মুসা খাঁ সে স্থান ত্যাগ করে সন্নিহিত যাত্রাপুর ও ডাকচড়া দুর্গে ব্যূহ অপসারিত করেন। কোন স্থান থেকেই ইসলাম খাঁ তাঁকে দূরীভূত করতে না পারলেও এক দিন তিনি দূত পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করেন এবং পরে নিজে মোগল শিবিরে গিয়ে সন্ধির সর্ত সম্বন্ধে আলোচনা চালান। তিন দিন ধরে দুই প্রধানের মধ্যে দর কষাকষির পর যখন কোন সিদ্ধান্তে পৌছান গেল না তখন পরের দিন আবার মিলিত হবার জন্য উভয়ে পরস্পরের প্রতি যথোচিত সৌজন্য দেখিয়ে বিদায় নিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে মুসা খাঁ যখন নিশ্চেষ্ট হয়ে নিদ্রা যাচ্ছেন সেই সময়ে ইসলাম খাঁ অতর্কিতভাবে যাত্রাপুর দুর্গ আক্রমণ করেন। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সীমান্তে মোগল সৈন্যরা যুদ্ধ সুরু করে দেয়।

ইসলাম খাঁর এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদে মসনদ-ই-আলা মুসা খাঁ সসৈন্যে যাত্রাপুরে গিয়ে দেখেন—সব শেষ। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর তিনি যখন বুঝলেন যে শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা হবে না তখন শত্রুর হাতে দুর্গ ছেড়ে দিয়ে ডাকচড়ায় ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁর সৈন্যরা প্রস্তুত ছিল। তাঁর মাটির দুর্গ অধিকারের জন্য উভয় পক্ষে মাসাধিক কাল ধরে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলে। শেষ পর্য্যন্ত মীর্জা নাথানের নেতৃত্বে মোগল নৌবাহিনী ১৫ই জুলাই সেই দুর্গ অধিকার করায় যুদ্ধের প্রথম পর্ব শেষ হয়।

মুসা খাঁর এই পরাজয় সত্বেও পূর্ব পর্য্যায়ের যুদ্ধে খান-ই-খানান মুনাইম খাঁ ও রাজা মান সিংহ ভাটিতে এসে যেটুকু সাফল্য অর্জন করেছিলেন ইসলাম খাঁর পক্ষে তাও সম্ভব হোল না। কারণ নৌশক্তিতে তিনি ছিলেন একেবারেই দুর্বল।

তাই তিনি প্রতাপাদিত্যের কাছে পাঁচ শতখানি নৌকা সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু তা না আসায় ওই নদীবহুল দেশে আর অগ্রসর হবার মত সাহস পেলেন না, ঢাকায় ফিরে গিয়ে নূতন উদ্যমে রণসজ্জা স্থরু করলেন।

মুসা খাঁও চুপচাপ বসে থাকেন নি। হাজী সামস্থদ্দীন বাগদাদীর উপর রাজধানী সোনারগাঁ রক্ষার ভার দিয়ে তিনি লখিয়া নদী বরাবর জল ও স্থল সৈন্যদের স্থাপন করে মোগলের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যূহ নির্মাণ করেন। তাঁর এক ভ্রাতা দাউদ কত্রাভু ও অপর ভ্রাতা আবদুল্লা নারায়ণগঞ্জের বিপরীত দিকে অবস্থিত কদমরসুল রক্ষার দায়িত্ব নেন। অধীনস্থ জমিদারদের উপর দেওয়া হয় বিভিন্ন সীমান্ত রক্ষার ভার।

এইভাবে প্রায় এক বৎসর ধরে প্রস্তুতির পর ১৬১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ নওরোজের দিন মোগলপক্ষে মীর্জা নাথান কত্রাভু আক্রমণ করেন। সেই সঙ্গে যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্য্যায় স্থরু হয়। কত্রাভু রক্ষক দাউদ ক্ষীণ প্রতিরোধের পর ভীতসন্ত্রস্ত মনে জ্যেষ্ঠাগ্রজ মুসা খাঁর কাছে চলে গেলে পুত্র গর্বে গর্বিত মীর-নাওয়ারা ইমতিহান খাঁ নিজ নৌবহরসহ মীর্জা নাথানের সাহায্যের জন্য সেখানে এসে শত্রুর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে থাকেন। অন্যান্য মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ-গণও পূর্বনির্দিষ্ট বিভিন্ন লক্ষ্যবস্তুর উপর আক্রমণ স্থরু করেন। সে আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে মুসা খাঁ মেঘনার এক ক্ষুদ্র দ্বীপ ইব্রাহিমপুরে গিয়ে আশ্রয় নেন। হাজী সামস্থদ্দীন বাগদাদীর কাছে এ খবর পৌছালে তিনি বিনা যুদ্ধে রাজধানী সোনারগাঁ মোগলের হাতে অর্পণ করেন।

নূতন আশ্রয়স্থল ইব্রাহিমপুর থেকে মুসা খাঁ আরও কিছু দিন বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আত্মসমর্পণ করলে স্থবাদার ইসলাম খাঁ উদারতার ছদ্মাবরণে তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন। তাঁর ও তাঁর সামন্তদের রণতরীগুলি লাভ হওয়ায় এত দিন পরে মোগলের একটি শক্তিশালী নৌবহর সৃষ্টি হয়।

মৌচাকে ঢিল

মুসা খাঁর রাজধানীরক্ষক হাজী সামস্থদ্দীন বাগদাদী বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করলে স্থবাদার ইসলাম খাঁ তাঁকে কাজে লাগাবার জন্য নিজ সৈন্যাধ্যক্ষ আব্দুল

ওয়াহিদের প্রহরায় নোয়াখালির অদূরে ভুলুয়া জয়ের জন্য পাঠিয়ে দেন। ক্ষুদ্র দ্বীপ ভুলুয়ার পক্ষে নিজ শক্তিতে যে মোগলকে পরাভূত করা সম্ভব হবে না এ কথা বুঝে নিয়ে রাজা অনন্ত মাণিক্য প্রতিবেশী আরাকানরাজের কাছে সাহায্য চেয়ে দূত পাঠান। সেখান থেকে প্রার্থিত সাহায্য না আসা পর্যন্ত তিনি নিজ সীমান্তে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালিয়ে যান। মোগল সেনাপতি যখন দেখলেন যে সাধ্যমত চেষ্টা করেও অনন্ত মাণিক্যকে পরাভূত করা যাচ্ছে না তখন তাঁর দেওয়ান মীর্জা ইউসুফ বারলানকে উৎকোচ প্রদানে বা অন্য উপায়ে হাত করে তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করে তোলেন। তার ফলে অনন্ত মাণিক্য আর যুদ্ধ না চালিয়ে নিজ রাজধানীতে ফিরে যান। কিন্তু সেখানেও আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয় নি, মোগল ফৌজ গিয়ে তাঁর রাজধানী অধিকার করে ভুলুয়া ও যোগদিয়ায় দুইটি থানা প্রতিষ্ঠিত করে।

ভুলুয়া অধিকৃত হোল বটে কিন্তু ইসলাম খাঁর এই হটকারিতার ফলে শক্তিশালী আরাকান রাজ্য মোগলের চিরশত্রু হয়ে দাঁড়াল। ভুলুয়া থেকে মোগলবাহিনী এসে যে আরাকানের উপর হামলা চালাবে এরূপ আশঙ্কা করে আরাকানরাজ রাজা অনন্ত মানিক্যকে দলে টেনে নিয়ে দুই প্রান্ত থেকে মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। তাঁর একটি বাহিনী সকল প্রতিরোধ চূর্ণ করে ঢাকা জেলার অভ্যন্তরভাগ পর্যন্ত এগিয়ে আসে, আর একটি বাহিনী ভুলুয়া থেকে মোগলদের তাড়িয়ে দেয়। মোগল ও মগের এই যুদ্ধ অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ধরে চলে।

প্রতাপাদিত্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

সুবাদার ইসলাম খাঁ কেন মুসা খাঁকে আক্রমণ করেছিলেন? মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে মুসা খাঁর পিতা ঈশা খাঁ মান সিংহের কাছে পরাজিত হয়ে যখন মোগলের বশ্যতা স্বীকার করেন বাদশাহ আকবর তখন তাঁকে ভাটির ২২টি পরগণা ও মসনদ-ই-আলা উপাধি দেন। তার কিছু দিন পরে ১০৬২ খৃষ্টাব্দে আকবর ও ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ঈশা খাঁ গতায়ু হোলে প্রথম জনের পুত্র জাহাঙ্গীর দিল্লীর মসনদ ও দ্বিতীয় জনের পুত্র মুসা খাঁ মসনদ-ই-আলা ভাটির জমিদারী প্রাপ্ত হন। তার পর আট বৎসরের মধ্যে এমন কিছুই ঘটে নি যার জন্য ইসলাম খাঁ বাংলায় এসে

১৬১১ খৃষ্টাব্দে মুসা খাঁকে আক্রমণ করতে পারেন। যে সব সীমান্ত দিয়ে তাঁর সৈন্যগণ ভাটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল সেগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আকবরের দেওয়া ২২টী পরগণার বাইরে কোন ভূভাগ মুসা খাঁ অধিকার করেন নি। অথচ এই অনুগত ভূস্বামীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য ইসলাম খাঁ বিরাট সৈন্য-বাহিনী সন্নিবেশিত করেন ও প্রতাপাদিত্যকে আদেশ দেন পাঁচশত নৌকার একটি নৌবহর পাঠাবার জন্য। তাঁর আয়োজন দেখে প্রতাপাদিত্যের বুঝতে বাকি থাকে নি যে সেই জবরদস্ত সুবাদারের পরবর্তী বলি হবেন তিনি। তাই তিনি মুসা খাঁর বিরুদ্ধে কোন সামরিক সাহায্য পাঠান নি। বলিদানের জন্য ঘাতক যখন খড়্গ উত্তোলিত করে তখন কোন মেষশাবক নিজের গলা স্বেচ্ছায় যূপকাষ্ঠের উপর রেখে দেয়?

প্রতাপাদিত্য ঠিকই বুঝেছিলেন। মুসা খাঁর মত তাঁর নিধনও সুবাদার ইসলাম খাঁর কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু সেই চতুর সুবাদার জানতেন যে ভাটির ঈশা খাঁ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য ও বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের রামচন্দ্রের নৌবহর একত্রিত হোলে তার সম্মুখীন হবার মত সম্বল মোগলের নেই। ইমতিহান খাঁ নামেই মীর-নাওয়ারা, তাঁর রণতরী কয়খানি? নৌসৈন্যই বা কত? তাই ইসলাম খাঁ ভাটি আক্রমণের প্রাক্কালে প্রতাপাদিত্যকে খিলাৎ ও জায়গীর দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন। মুসা খাঁকে শেষ করবার পর তিনি স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে নিজের সমগ্র বাহিনী ও সদ্যঅধিকৃত ভাটি নৌবহর প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। গিয়াস খাঁ নিযুক্ত হন অভিযাত্রি বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।

কিন্তু প্রতাপাদিত্য তো মোগলের শত্রু ছিলেন না। এরূপ এক অনুগত ভূস্বামীর বিরুদ্ধে কে কবে সৈন্য পাঠিয়েছে? এ কথার সমর্থনে মীর্জা নাথান তাঁর বাহারীস্থান-ই-গৈবিতে লিখেছেন যে মুসা খাঁ ও অনন্ত মাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের পর রাজা প্রতাপাদিত্য নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখলেন এবং ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হয়ে পূর্ব অবহেলার জন্য যথেষ্ট অনুতাপ করলেন; বাদশাহর কাজের জন্য পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে ৮০খানি নৌকাসহ ইসলাম খাঁর কাছে পাঠিয়ে অতীত ভ্রান্তির জন্য মার্জনা চাইলেন। ইসলাম খাঁ তাতে খুসী হবার পরিবর্তে সেই নৌকাগুলি ধ্বংস করে প্রতাপাদিত্যের শাস্তি বিধান ও যশোহর অধিকারের জন্য গিয়াস খাঁর অধীনে এক সৈন্যবাহিনী ও অসংখ্য যুদ্ধজাহাজ পাঠিয়ে

দিলেন। এক শুভ মুহূর্ত দেখে গিয়াস খাঁ, মীর্জা নাথান, মীর্জা মাকি, লছমী রাজপুত প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণসহ গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হোলেন।

পেটে খেলে পিঠে সয়

জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকা থেকে যশোহর এমন কিছু দূর নয়। এখন মোগলের হাতে যে নৌবহর এসেছে তাতে ২।৩ দিনের মধ্যে সেখানে পৌছান সম্ভব। কিন্তু রওনা হবার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াস খাঁর সম্মুখে নানা বাধা এসে দেখা দিতে লাগল। ইমতিহান খাঁর গোলন্দাজরা বেঁকে বসল—তারা বেতন পায় না, রেশন পায় না, খালি পেটে যুদ্ধ করে কেমন করে? শুনে মীরবহর মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বেয়াদবরা বলে কি? এদের পোষবার জন্য সুবাদার সাহেব তাঁকে তমলুক, জাহানাবাদ, বর্দ্ধমান, সোনাবাজু, ভাতুড়িয়াবাজু প্রভৃতি পরগণাগুলি জায়গীর দিয়েছেন, আর বেইমানরা বলে কিনা খেতে পায় না! সুবাদার ইসলাম খাঁ বয়সে তরুণ হোলেও বুদ্ধিমান ব্যক্তি; তিনি কয়েকজন সৈনিককে অন্তরালে ডেকে সব কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বলল, মীরবহরকে যে জায়গীর দেওয়া হয়েছে তার মুনাফার সবটাই তিনি নিজের পকেটে পোরেন, সিপাহীদের দুমুঠো চাল বা গম পর্য্যন্ত দেন না।

ইসলাম খাঁ দেখলেন যে এই সব বিক্ষুব্ধ সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ চালান যাবে না। তাই আপাততঃ যাত্রা স্থগিত রেখে ইমতিহান খাঁকে সমস্ত হিসাবপত্র দাখিল করবার আদেশ দিলেন। যথা আজ্ঞা তথা কাজ! কয়েক গাড়ী ভর্তি জাবদা খাতা এনে ইমতিহান খাঁ এক দিকে দেখালেন যে তাঁর জায়গীর থেকে যত আয় হবার কথা তা হচ্ছে না; রায়তরা সব বদমায়েস, ঠিকমত খাজনা দেয় না। আবার অন্য দিকে রোস্টার খুলে দেখালেন যে বাদশাহর কাজের জন্য তিনি হাজার হাজার সিপাহীকে পুষছেন। সবারই টিপ সই রয়েছে। টিপ সইয়ের ছড়াছড়ি! ইসলাম খাঁ শুধালেন, সিপাহীরা সব কোথায়? মীরবহর উত্তরে বললেন—সব বেইমান, সব ফাঁকিবাজ। দিনের পর দিন টিপ সই দিয়ে মাইনে নেয়, আর কাজের বেলায় দেয় গা ঢাকা। দুনিয়ার মালিক শাহানশাহ বাদশার কথা কেউ ভাবে না! যশোহরের লড়াইটা শেষ হয়ে যাক, তারপর ব্যাটাদের উচিত মত শিক্ষা দেবেন।

খাতায় পত্রে সব ঠিক আছে বটে কিন্তু তা দিয়ে তো সিপাহীদের খুসী করা যায় না। তাদের বেহায়াপনায় রেগে ইমতিহান খাঁ এগারসিন্ধু দুর্গে চলে গেলেন, সিপাহীরা যেমন ছিল তেমনি রইল! মীর্জা নাথান দেখলেন যে তার পিতা বেইজ্জত হচ্ছেন; তাই সিপাহীদের আশ্বাস দিলেন যে যুদ্ধশেষে তাদের হিসাব কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেবেন। তারা আবার চলতে লাগল।

সৈফুদ্দীনের বেহেস্ত

কিছু দূর গিয়ে বাদশাহী ফৌজের অগ্রগতি আবার বন্ধ হয়ে গেল। তাদের পথের পাশে ছিল এক গণ্ডগ্রাম - বাঘা। ছোট শহরও বলা চলে। সেখানকার গৃহস্থদের সমৃদ্ধি ও দোকানীদের স্বচ্ছলতা দেখে মীর্জা মাকির সৈন্যদের কিছু উপরি রোজগারের লোভ হোল। তারা প্রথমে দোকানপাটগুলি লুঠ করল, তারপর গৃহস্থদের বাড়ীতে ঢুকে সিন্দুক বাক্স প্রভৃতি ভেঙ্গে সোনাদানা যা পেল তাই পকেটে পুরল। তারা নিষ্ঠুর নয়, অকারণে কাউকে কষ্ট দেয় না। তাই তরুণী স্ত্রীলোক ছাড়া আর সবাইকে গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার জন্য হুকুম দিল। তরুণীরা বড় কোমল—কোন কষ্ট সইতে পারে না! পাছে তারা কোথাও গিয়ে বিপদে পড়ে সেই ভয়ে তাদের রক্ষার জন্য একজন জুনিয়ার অফিসার সবাইকে এনে একটা ছোট বাড়ীর মধ্যে জড় করলেন। মীর্জা নাথান বলেন: সেই তরুণীদের মধ্যে কয়েকটী ছিল বেশ খুবসুরৎ। সেগুলিকে দিয়ে সৈফুদ্দীন তাঁর তাঁবু বেশ ভাল করে সাজালেন। অন্যান্য অফিসাররা এসব কিছু জানতে না পারায় সৈফুদ্দীনের ব্যাটেলিয়ান কেন যে পেছিয়ে থাকছে তা বুঝতে পারলেন না। কিন্তু খাপ-ছাড়া হয়ে তো এগোন যায় না; তাই সবাই থমকে দাঁড়াল। সমস্ত অভিযাত্রী বাহিনীর গতি বন্ধ হয়ে গেল।

দেখতে দেখতে খবরটা সব তাঁবুতে ছড়িয়ে পড়ল। সর্বাধিনায়ক গিয়াস খাঁর কানেও পৌছাল। তিনি সৈফুদ্দীনকে বলে পাঠালেন: বাবজান, আঙ্গুর আপেল খুব মিঠা, কিন্তু বেশী খেলে পেটদরদ হয়। এতগুলি হুরি নিয়ে তুমি কি করবে? কয়েকটা নিজের কাছে রেখে বাকিগুলোকে আমার জন্যে পাঠিয়ে দাও। আমারও তো সাধআহ্লাদ আছে! আমাকে খুসী করলে আমিও তোমাকে দেখব, সুবাদার সাহেবকে বলে একটা জায়গীর পাইয়ে দেব।

একথা শুনে সৈফুদ্দীন ক্রোধে আগ্‌ববুলা হয়ে গেলেন। এত মেহনৎ করে যে হুরিদের তিনি হাত করেছেন তাদের তুলে দেবেন এক বেয়াদবের হাতে? হোলই বা সে সিপাহ্‌সালার, তার বেহিসাবী কথা মানতে হবে? জায়গীরের লোভ! যদি মর্দ হয় তো এখানে এসে লড়াই করে নিয়ে যাক—নিজে থেকে একটা হুরিও তিনি অন্যের হাতে তুলে দেবেন না। এদের নিয়ে তিনি যে বেহেস্ত সাজিয়ে বসেছেন সেখানে কারও খবরদারি চলবে না।

সৈফুদ্দীনের এই স্পর্দ্ধার কথা শুনে সর্বাধিনায়ক গিয়াস খাঁর ইচ্ছা হচ্ছিল যে তার তাঁবুতে গিয়ে টুঁটি ছিঁড়ে দেন। কিন্তু মাথার উপর স্থবাদার রয়েছেন, তাই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন। তবে এই অবাধ্যতার কথা তিনি ভোলেন নি, প্রতাপাদিত্য নিধনের পর স্থকৌশলে স্থবাদারকে দিয়ে সৈফুদ্দীনকে কারারুদ্ধ ও জায়গীর থেকে বঞ্চিত করেন।

সালকা যুদ্ধ—জামাল খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা

এইভাবে তিন দিনের পথ তিন মাসে অতিক্রম করে শেষ পর্য্যন্ত বাদশাহী ফৌজের এক অংশ বাকলায় ও অপর অংশ যশোহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হোল। বাকলারাজ রামচন্দ্রের পুরোহিতরা তাঁকে আক্রমণকারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু অন্তঃপুরে মায়ের বিরোধীতার জন্য তাঁর পক্ষে মনস্থির করা অসম্ভব হয়। বিধবা জননী পুত্রকে ডেকে উপদেশ দিলেন মোগলের সঙ্গে একটা মিটমাট করবার জন্য। এই অনুজ্ঞা অমান্য করে পুত্র যদি সেই দুর্দান্ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তা হোলে তিনি বিষপানে আত্মহত্যা করবেন। মায়ের এই চঞ্চলচিত্ততার জন্য রামচন্দ্র সৈন্যদের প্রতি যুদ্ধের আদেশ দিতে পারলেন না; নামমাত্র প্রতিরোধের পর তারা আত্মসমর্পণ করল। তার ফলে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা কিছুই হোল না, রাজা রামচন্দ্র শত্রুহস্তে বন্দী হয়ে ঢাকায় প্রেরিত হোলেন।

প্রতাপাদিত্যের কথা স্বতন্ত্র। তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী, বিশাল নৌবহর, অপরিমিত রণসম্ভার—তার উপর অদম্য সাহস। ছিল সব, শুধু ছিল না পাহাড় পর্বত মরুভূমি বা অনুরূপ প্রাকৃতিক রক্ষাব্যবস্থা। তাই মোগল সৈন্যগণ অবলীলাক্রমে তাঁর সীমান্ত ভেদ করে বহু দূরে চলে এল। তাদের সম্মুখীন হবার জন্য

তিনি পুত্র উদয়াদিত্যকে সালকা নামক স্থানে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর সঙ্গে চলল খাজা কামালের অধীনে পাঁচ শত রণতরী ও জামাল খাঁর অধীনে কয়েক হাজার পদাতিক। এক হাজার অশ্বারোহী ও চল্লিশটী উন্মত্ত হস্তীও উদয়াদিত্যের বাহিনীর সঙ্গে ছিল।

তাঁর নৌবাহিনীর সম্মুখীন হবার জন্য মোগলের হাতে এখন এক শক্তিশালী নৌবহর থাকলেও তার কোন প্রয়োজন হোল না। কারণ নদী এখানে অপ্রশস্ত বলে মীর্জা নাথানের স্থলবাহিনী এসে তীরের উপর থেকে উদয়াদিত্যের রণতরীগুলির উপর প্রচণ্ড অস্ত্র বর্ষণ স্বরু করল। তাতে বহু নৌসৈন্য ধরাশায়ী হয়, রণতরীগুলি ছত্রভঙ্গ হয়ে পরস্পরের পথরোধ করতে থাকে। উদয়াদিত্য বীর বিক্রমে লড়লেন, তাঁর সৈন্যরা বৃষ্টিধারার মত তীর ও গুলি বর্ষণ করে শত্রুকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। কিন্তু হঠাৎ একটি বন্দুকের গুলি এসে খাজা কামালের বক্ষ বিদ্ধ করায় তিনি ধরাশায়ী হোলেন। তাঁর বিচ্ছিন্ন রণতরীগুলিকে পুনর্বিন্যাসের আশা নির্মূল হয়ে গেল। যুবরাজ উদয়াদিত্য রণস্থল ত্যাগ করলেন।

যুবরাজের নিজস্ব রণতরী 'মহলগিরি'তে ছিলেন তাঁর দুই সহধর্মিনী। মোগল সৈন্যরা যখন সেই বিশাল তরীর উপর উঠে এক প্রকোষ্ঠ থেকে অন্য প্রকোষ্ঠে যাচ্ছিল তখন তিনি উভয় পত্নীর হাত ধরে পাশের একখানি ছোট কোষা নৌকার উপর নামিয়ে দেন ও পরে নিজে লাফিয়ে পড়েন। যাত্রীসহ নৌকা ছেড়ে দিলে শত্রু তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, কিন্তু পাল্লা দিতে অসমর্থ হয়। আরও ৪২খানি নৌকা উদয়াদিত্যের সঙ্গে পালিয়ে গেলেও মহল-গিরিসহ বাকি নৌকাগুলি মোগলের হস্তগত হয়। মীর্জা নাথান মহলগিরির আভ্যন্তরীণ বিলাস আয়োজনে বিস্মিত হয়ে সেখানি নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখেন।

উদয়াদিত্য যখন নৌসৈন্যদের নিয়ে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন তাঁর স্থলবাহিনীর অধ্যক্ষ জামাল খাঁ তখন পার্শ্ববর্তী মাটির কেল্লার ভিতর সকল সৈন্যসহ নিশ্চেষ্ট বসেছিলেন। নৌসৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তিনি যদি শত্রুর উপর অস্ত্র বর্ষণ করতেন তাহোলে হয় তো যুদ্ধের ধারা বদলে যেত। কিন্তু তাঁর কামানশ্রেণী থেকে একটি গোলাও বর্ষিত হয় নি। সৈনিকরা একটি গুলি

খাঁ তীর শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করে নি। অসহাল উদয়াদিত্য একাই লড়লেন এবং একাই রণস্থল ছেড়ে চলে গেলেন। তারপরই জামাল খাঁ তাঁর নিরাপদ আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এসে মোগলপক্ষে যোগ দেন।

প্রতাপাদিত্যের আত্মসমর্পণ

পুত্রের পরাজয়ের সংবাদ প্রতাপাদিত্যের কাছে পৌছালে তিনি মীর্জা নাথানের শিবিরে দূত পাঠিয়ে অনুরোধ জানান যে মীর্জা যেন শান্তি স্থাপনের কথাবার্তার জন্য তাঁকে সেনাপতি গিয়াস খাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু এই প্রস্তাবে গিয়াস খাঁ সম্মতি না দেওয়ায় প্রতাপাদিত্য ভাগীরথী ও কাগার-ঘাটার খালে এক স্থানে সালকার মত এক মাটির দুর্গ নির্মাণ করে হয়-হস্তী-পদাতিক-রণতরী সমন্বিত নিজের বিশাল সৈন্যবাহিনীসহ মোগলের সম্মুখীন হবার জন্য সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

সেদিন দারুণ বর্ষা। তা সত্বেও মীর্জা নাথানের সৈন্যবাহিনী এসে খালের উভয় তীর থেকে প্রতাপাদিত্যের রণতরীগুলির উপর গোলাবর্ষণ সুরু করে। সঙ্গে সঙ্গে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড জলযুদ্ধ সুরু হয় এবং দুর্গ প্রাচীরের আড়াল থেকে প্রতাপাদিত্যের সৈন্যরা শত্রুর উপর বৃষ্টিধারার মত গোলাবর্ষণ করতে থাকে। মীর্জা নাথান বলেন, রাজা প্রতাপাদিত্যের সেই প্রচণ্ড আক্রমণে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত ও নিহত মোগল সৈন্যদের একটি স্তূপ রচিত হয়েছিল, কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে তিনি শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাতে অক্ষম হয়ে পশ্চাদপসরণ সুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে মীর্জা নাথান গিয়ে তাঁর দুর্গ অধিকার করে নেন।

প্রতাপাদিত্য জানতেন যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের তুলনায় তাঁর শক্তি একেবারেই নগণ্য। তাই তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীতার পরিবর্তে মোগলের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সুবাদার ইসলাম খাঁ বিনা কারণে তাঁর ঘাড়ে যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ায় অনিচ্ছাসত্বেও অস্ত্রধারণ করেন। সেদিনকার যুদ্ধ শেষে তিনি অশ্রুসজল নয়নে রণক্ষেত্র ত্যাগ করে যশোহরে চলে যান। সেখানে উদয়াদিত্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

এইভাবে সকল আশা নির্মূল হওয়ায় প্রতাপাদিত্য স্বয়ং দুজন পেশকারসহ কাগারঘাটায় মোগল শিবিরে গিয়ে আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পেশ করেন। সে

খবর পেয়ে গিয়াস খাঁ তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য দুজন আত্মীয়কে পাঠিয়ে দিলে তাঁরা এসে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে করমর্দন করে সসম্মানে গিয়াস খাঁর তাঁবুতে নিয়ে যান। সেখানে মোগল সর্বাধিনায়ক তাঁর প্রতি যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়ে বসবার জন্য মর্য্যাদানুযায়ী আসন প্রদান করেন। তারপর পরস্পরের কুশলবাদ সমাপ্ত হোলে গিয়াস খাঁ প্রতাপাদিত্যকে একটি ঘোড়াসহ উপযুক্ত খিলাৎ দিয়ে নিজ তাঁবুতে পাঠিয়ে দেন। প্রত্যাবর্তনের পূর্বে প্রতাপাদিত্য মীর্জা নাথান ও মীর্জা মাকির তাঁবুতে গেলে তাঁরাও অনুরূপ খিলাৎ প্রদান করেন।

এই সাক্ষাৎকারের সময়ে স্থির হয়েছিল যে উচ্চনীচ সকল অফিসারকে যুবরাজ উদয়াদিত্যের তত্ত্বাবধানে রেখে রাজা প্রতাপাদিত্য ঢাকায় গিয়ে সুবাদার ইসলাম খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন; তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন সেনাপতি গিয়াস খাঁ স্বয়ং। সুবাদারের কাছ থেকে নির্দেশ না আসা পর্য্যন্ত বাদশাহী অফিসার ও সৈনিকরা মীর্জা নাথানের তত্ত্বাবধানে কাগারঘাটায় অবস্থান করবেন। তিনি হবেন গিয়াস খাঁর নায়েব। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী মীর্জা নাথানের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে গিয়াস খাঁ প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হন।

সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, ইসলাম খাঁ এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। পূর্বের মত তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে খিলাৎ প্রদান দূরের কথা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করতে সম্মত হোলেন না। তাঁর আদেশে পরাজিত রাজাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করে আগ্রায় জাহাঙ্গীরের কাছে চালান দেওয়া হয়। সেই অবস্থায় পথে বারাণসীতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

শ্রীহট্ট জয়—বায়াজিদ কররানির আত্মসমর্পণ

প্রতাপাদিত্য নিধনের পর ইসলাম খাঁ আফগান শক্তির যা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাকে চিরতরে নির্মূল করবার জন্য তৈরী হোতে লাগলেন। তাঁর অনুরোধে জাহাঙ্গীর তাঁর পিতৃব্যপুত্র সুজাৎ খাঁকে দাক্ষিণাত্য থেকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেওয়ার যুদ্ধের আয়োজন বেশ ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। সেখান থেকে আসবার সময়ে সুজাৎ সঙ্গে আনেন জ্যেষ্ঠাগ্রজ শেখ বায়াজিদ, ভ্রাতুষ্পুত্র শেখ ঈশা ও

শেখ কাসিমকে। সকলেই সেলিম চিস্তির বংশধর—আফগান দমনের কাজে চিস্তি পরিবারের আর কেউ বাকি থাকল না। এদের সবার সঙ্গে পরামর্শ করে সুবাদার ইসলাম খাঁ আফগানদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করলেন। সুজাৎ খাঁ ভার নিলেন আফগান সর্বাধিনায়ক ওসমান খাঁকে দমনের। উড়িষ্যা ছেড়ে এসে ওসমান শ্রীহট্টের যে অংশের উপর রাজত্ব করছিলেন আয়তনে তা অতি ক্ষুদ্র হোলেও তাঁর শৌর্য্যের কথা স্মরণ করে সুজাতের সঙ্গে চলল ইমতিহান খাঁর নৌবহর ও মীর্জা নাথানের গোলন্দাজ বাহিনী। মোগলের রণভেরীতে শ্রীহট্টের আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল।

কয়েকটি পরগণা নিয়ে গঠিত ওসমান খাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যে প্রবেশ করবার একমাত্র পথ তুপিয়া গিরিবর্ত্মে একটি দুর্গ নির্মাণ করে ওসমান নিজ ভ্রাতা ওয়ালির উপর তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছিলেন। তাঁর হাতে যথেষ্ট সৈন্য ও সমরসম্ভার থাকলেও জ্যেষ্ঠাগ্রজের মত অদম্য সাহস ও দুর্জয় মনোবল ছিল না। মোগল ফৌজের আগমন সংবাদে তিনি সসৈন্যে গিরিদুর্গ ত্যাগ করে এক নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যান। অথচ, মীর্জা নাথান বলেন, বর্মাচ্ছাদিত সৈনিক বা শিরস্ত্রাণ পরিহিত গোলন্দাজ তো দূরের কথা একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকও সাহসে ভর করে দাঁড়ালে গিরিপথটি রক্ষা করতে পারত। ওয়ালির এই কাপুরুষতার জন্য সুজাৎ খাঁ বিনা বাধায় তাঁর ভ্রাতার রাজ্যে প্রবেশ করেন এবং তিনি অসাধারণ সাহসের সঙ্গে লড়েও ১৬১২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ কিভাবে পরাজিত ও নিহত হন সে কাহিনী জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

আফগান নায়কদের মধ্যে ওসমান খাঁ সবচেয়ে কর্মনিপুণ হোলেও বায়াজিদ কররানি ছিলেন সঙ্গতিসমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠাবান। তিনি গৌড়ের কররানি বংশের সন্তান—শ্রীহট্টে এসে সেই বংশের ঐতিহ্য রক্ষা করছিলেন। উড়িষ্যা থেকে বিতাড়িত হয়ে ওসমান খাঁ লোহানি যখন দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময়ে বায়াজিদ তাঁকে আশ্রয় দেন—উভয় নায়ক আফগানদের শেষ অবলম্বন হয়ে দাঁড়ান। ওসমানের সঙ্গে বায়াজিদকে ধ্বংস না করলে বিষবৃক্ষ নির্মূল হবে না বুঝে সুবাদার ইসলাম খাঁ যখন ওসমানের বিরুদ্ধে

সুজাৎ খাঁকে পাঠান সেই সময়ে শেখ কামালের অধীনে আর একটী বাহিনী বায়াজিদের রাজ্য আক্রমণ করবার জন্য পাঠান হয়েছিল। উভয় বাহিনী একই সঙ্গে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে দুই পথ ধরে শ্রীহট্টের দুই প্রান্তের দিকে অগ্রসর হয়।

সুজাৎ খাঁ ও শেখ কামালের রণনীতিতে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। সুজাৎ যে ক্ষেত্রে ওসমানকে সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন শেখ কামাল সে ক্ষেত্রে বায়াজিদের রাজ্যের উপকণ্ঠে পৌঁছে জনসাধারণের মনে ভীতি উৎপাদনের জন্য চারিধারে লুঠতরাজ সুরু করেন। ইতিমধ্যে বিহার থেকে এক ডিভিসন সৈন্য ঢাকায় এসে পৌঁছালে ইসলাম খাঁ সেটি শেখ কামালের কাছে পাঠিয়ে দেন। সুর্মা নদীর তীরে গিয়ে তারা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়।

বায়াজিদ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। মোগলের আগমনবার্তা পেয়ে তিনি কনিষ্ঠাগ্রজ ইয়াকুব ও অধীনস্থ সর্দারদের পাঠিয়ে সুর্মা নদীর তীরে তাঁর রাজধানীতে আসবার পথের পাশে একটী মাটির দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গমধ্যে অবস্থান করে তাঁর সৈন্যরা নদীর অপর তীরে মোগল ফৌজের উপর অস্ত্র বর্ষণ করবে। মোগল শিবিরে এই সংবাদ পৌছালে শেখ কামাল ভূষণারাজ শত্রজিৎকে পাঠিয়ে নদীর অপর তীরে কদমতলা গ্রামের পাশে অনুরূপ এক অস্থায়ী দুর্গ নির্মাণ করান। এইভাবে সুর্মার দুই তীরে দুই দুর্গমধ্যে অবস্থান করে বিরোধীপক্ষদ্বয় পরস্পরকে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হোতে থাকে।

এক দিন রাজা শত্রজিৎ শত্রুর প্রবল গোলাবর্ষণের মধ্যে নদী পার হোলে পূর্ণ এক সপ্তাহ ধরে উভয় পক্ষে লোমহর্ষক সংগ্রাম চলে। শেষ পর্য্যন্ত শত্রজিৎ ইয়াকুবকে পরাজিত করে তাঁর দুর্গ অধিকার করে নেন। সে খবর বায়াজিদের কাছে পৌছালে তিনি রণক্ষেত্রে নূতন নূতন সৈন্য পাঠান। শত্রজিতের পক্ষে আর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হয়—যুদ্ধ সেই দুর্গের চারিপার্শ্বে আবর্তিত হোতে থাকে। উভয় পক্ষই জানত যে তাদের যুদ্ধের শেষ পরিণতি নির্ভর করছে শ্রীহট্টের অপর প্রান্তে—ওসমান ও সুজাৎ খাঁর যুদ্ধের ফলাফলের উপর। তাই উভয় পক্ষের সাধারণ সৈনিকরাও প্রতিনিয়ত সেই যুদ্ধের খবর নিচ্ছিল। এক দিন খবর এল যে ওসমানের অবস্থা খুব ভাল - সুজাৎ খাঁ কোণঠাসা

হয়ে পড়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে বায়াজিদের সৈন্যরা দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধ সুরু করল—রাজা শত্রজিৎ কোণঠাসা হোলেন। ঠিক সেই সময়ে বায়াজিদের আবেদনে সাড়া দিয়ে কাছাড়রাজ এক ডিভিসন সৈন্য পাঠানয় তাঁর ফৌজের মনোবল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

এত দিন শেখ কামাল সুজাৎ খাঁর মত নিজ ফৌজের পুরোভাগে না থেকে রাজা শত্রজিৎকে দিয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। কাছাড় সৈন্যের বলে বলীয়ান হয়ে বায়াজিদ পাল্টা আক্রমণ সুরু করেছেন শুনে তিনি নদী পার হয়ে নিজে রণক্ষেত্রে চলে আসেন। আফগানরা সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সকল শক্তি দিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু এক দিন অন্য সীমান্ত থেকে ওসমান খাঁর পতন সংবাদ তাদের শিবিরে পৌঁছালে তারা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। বায়াজিদ প্রমাদ গণেন। যখন দেখলেন যে আর যুদ্ধ করা বৃথা তখন সন্ধির প্রস্তাব করে মোগল শিবিরে দূত পাঠান। শেখ কামাল তাতে সম্মতি দিলে তিনি নিজের সমস্ত হস্তী ও অন্যান্য রণসম্ভার বিজয়ী সেনাপতির হস্তে অর্পণ করে ইয়াকুব ও অনুচরবর্গসহ ঢাকায় চলে যান।

ইসলাম খাঁ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী বায়াজিদের সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন। তাঁকে ও অন্যান্য আফগান সন্ধিপ্রার্থীকে কারাগারে পাঠিয়ে তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। শ্রীহট্ট সুবা বাংলার একটী জেলায় পরিণত হয়ে যায়।

কাছাড়ে ব্যর্থতা

শ্রীহট্টের পর কাছাড়। সেখানে রাজা শত্রুদমন শুধু বীর যোদ্ধা ছিলেন না, কূটনীতিজ্ঞানও তাঁর যথেষ্ট ছিল। মোগল ফৌজ শ্রীহট্ট আক্রমণ করলে তিনি বুঝে নেন যে তাদের পরবর্তী লক্ষ্য তিনি। সেই কারণে শ্রীহট্ট যুদ্ধের সময়ে তিনি বায়াজিদ কররানির কাছে যথেষ্ট সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। বায়াজিদের পতনের পর শেখ কামালের সৈন্যবাহিনী তাঁর সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়। তাদের সম্মুখীন হবার জন্য তিনি শিলচর থেকে পঞ্চাশ মাইল উত্তরে পর্বতময় অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত তাঁর রাজধানী মায়বংকে বিশেষভাবে সুরক্ষিত করেন। ঐ নগরীর প্রবেশপথে অসুরটেকা ও

প্রতাপগড়ে যে দুইটী দুর্গ ছিল সেগুলি নূতন করে সুরক্ষিত করা হয়। রাস্তার দুপাশে পাহাড় পর্বত ও ঝোপঝাড়ের আড়ালে তিনি বহু গুপ্ত সৈন্য রেখেছিলেন; মোগল ফৌজকে তারা অতর্কিত আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। শত্রুর তুলনায় তারা নিতান্তই সংখ্যাল্প হোলেও দিবাভাগে পাহাড় জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে নিশাগমের পর গুপ্ত আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এই গেরিলা যুদ্ধের ফলে অসংখ্য মোগল সৈন্য হতাহত হোলেও শেষ পর্য্যন্ত প্রতাপগড় দুর্গের পতন হয় এবং রাজা শত্রুদমন অম্বুরটেকায় গিয়ে আশ্রয় নেন।

শেখ কামাল সেই দুর্ভেদ্য পার্বত্য দুর্গে গিয়েও তাঁকে আক্রমণ করেন। তাঁর পিছনে ছিল বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অমিত সৈন্যবল ও অফুরন্ত ঐশ্বর্য্য। তার তুলনায় কাছাড় কতটুকু? এই অসম প্রতিযোগিতায় রাজা শত্রুদমন কত দিন সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন? বেশ কিছু কাল ধরে বীর বিক্রমে লড়ে শেষ পর্য্যন্ত তিনি সন্ধির প্রস্তাব করে শেখ কামালের কাছে দূত পাঠালেন। মোগল সেনাপতি এ প্রস্তাব গ্রহণ করে যথারীতি সুবাদারের সমর্থন চেয়ে এক সহকর্মীকে ঢাকায় পাঠান। ইসলাম খাঁ তাতে সম্মতি দেওয়ায় উভয়পক্ষে সন্ধি সম্পাদিত হোল বটে কিন্তু কয়েক দিন পরে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে এক ফরমান এল যে কাছাড়রাজের প্রতি এই কোমলতায় তিনি বিস্মিত হয়েছেন। তাঁর নির্দেশে শেখ কামালকে অপসারিত করে মোবারেজ খাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

বাদশাহর আদেশ ইসলাম খাঁ অমান্য করতে পারেন না। শ্রীহট্ট থেকে মোবারেজ খাঁ এসে পৌছালে সদ্যসমাপ্ত সন্ধি বাতিল করে তিনি নূতন উদ্যমে কাছাড় যুদ্ধ সুরু করেন। কিন্তু তার কয়েক দিন পরে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় সে যুদ্ধের শেষ পরিণতি তিনি দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে এসে কাসিম খাঁ দেখেন যে মোবারেজ এক নূতন পথ ধরে কাছাড়ের অভ্যন্তরভাগে বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছেন বটে কিন্তু কাছাড়ীরা অন্য পথ দিয়ে এসে প্রতাপগড় দুর্গ পুনরধিকার করে নিয়েছে। যে ব্যাটেলিয়ানের উপর দুর্গ রক্ষার ভার ছিল তারা পালিয়ে এসেছে। তাঁর কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে মোবারেজ খাঁ ঢাকায় ফিরে এলে রণনীতিতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। দুই বৎসর পূর্বে শেখ

কামাল যে পথ দিয়ে কাছাড় গিয়েছিলেন মোবারেজের ফৌজ গতি পরিবর্তন করে সেই পথ ধরে এগোতে থাকে।

রাজা শত্রুদমন পূর্বের মত বীর বিক্রমে লড়তে লাগলেন; তাঁর সৈন্যরা নৈশ আক্রমণে মোগল ফৌজকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। কিন্তু তারা অসহায়, লড়বে কার সঙ্গে? দিনমানে কোন শত্রু সৈন্যের দেখা পায় না, রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে এলে দেখে যে কোন অদৃশ্য স্থান থেকে দলে দলে সশস্ত্র সৈনিক এসে তাদের তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তাদের অসংখ্য সৈন্য হতাহত হোলেও তারা আক্রমণকারীদের টিকি ছুঁতে পারছে না। এরূপ অদ্ভুত রণনীতির সঙ্গে মোগলদের কোন পরিচয় না থাকায় লোকক্ষয়ের অবধি থাকল না। তবুও সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মোবারেজ খাঁ শেষ পর্য্যন্ত প্রতাপগড় দুর্গ পুনরধিকার করে অসুরটেকার দিকে চলে গেলেন। দীর্ঘ দিন অবরোধের পরও তিনি দুর্গটিকে অধিকার করতে অক্ষম হোলেও শেষ পর্য্যন্ত দুর্গাভ্যন্তরে খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় রাজা শত্রুদমন আবার সন্ধির প্রস্তাব করে তাঁর কাছে দূত পাঠালেন। তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করায় উভয় পক্ষে সন্ধির কথাবার্তা চলছে এমন সময় হঠাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। নূতন সৈন্যাধ্যক্ষ মিরাক বাহাদুর কোনরূপ সন্ধিতে সম্মত না হয়ে দুর্গের উপর নূতন করে আক্রমণ সুরু করেন। প্রত্যুত্তরে কাছাড়ীরাও এরূপ প্রবলভাবে পাল্টা আক্রমণ চালায় যে মোগল ফৌজকে অসুরটেকা ছেড়ে হন্তদন্ত হয়ে শ্রীহট্টে পালিয়ে আসতে হয়।

কাছাড় অজেয় থাকে!

কামরূপ জয়

মুসা খাঁ গেলেন, প্রতাপাদিত্য গেলেন; রামচন্দ্র গেলেন, আফগানরাও গেল। এই সব পরাজিত নরপতির সৈন্যবাহিনী ও নৌবহর পেয়ে মোগলের সামরিক বল এতই বৃদ্ধি পেল যে তাদের কাজে লাগান ইসলাম খাঁর সামনে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। যে সব সৈন্যাধ্যক্ষকে দিয়ে এই সব শক্তিমান বিরোধীকে নিধন করা হয়েছিল তারা কর্মহীন হয়ে বসে থাকলে নানা সমস্যার উদ্ভব হবে ভেবে তিনি শেখ কামালকে কাছাড়ে পাঠিয়ে দিয়ে অন্যত্র প্রসারের সুযোগ খুঁজছেন এমন সময়ে খবর এল যে কামরূপরাজ পরীক্ষিতনারায়ণ তাঁর

আশ্রয়প্রার্থী সুসঙ্গের জমিদার রঘুনাথের পরিবারবর্গকে আটক করেছেন। এই অজুহাতই যথেষ্ট। রঘুনাথের জন্য ইসলাম খাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল, সৈন্যবাহিনীর প্রতি তিনি আদেশ দিলেন যেন পরীক্ষিতনারায়ণের সমুচিত শাস্তি বিধান করা হয়। তাঁর নির্দেশে ১৬১২ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মোকারম খাঁর নেতৃত্বে মোগল ফৌজ কামরূপের দিকে রওনা হোল। মীর্জা মাকি, মীর্জা নাথান প্রভৃতি সৈন্যাধ্যক্ষগণ নিজ নিজ বাহিনীসহ মোকারম খাঁর সঙ্গে চললেন। মীর-নাওয়ারা ইমতিহান খাঁর অধীনে মোগল নৌবহর ছাড়া মুসা খাঁ ও প্রতাপাদিত্যের কাছে থেকে অধিকার করা রণতরীগুলিও অভিযাত্রী বাহিনীর সঙ্গে চলল। ওসমান খাঁ ও বায়জিদ কররানির অধীনস্থ যে সব আফগান সৈন্য আত্মসমর্পণ করেছিল তারাও চলল।

ঢাকা থেকে রওনা হয়ে মোকারম খাঁর অভিযাত্রী বাহিনী ব্রহ্মপুত্র তীরে শালকোনায় গিয়ে পৌঁছালে কামরূপ নৌবহর এসে তাদের বাধা দেয়। কিন্তু মোগলদের সেই সম্মিলিত নৌবহরের সঙ্গে তারা এঁটে উঠতে পারবে কেন? তাদের পরাজিত করে বিজয়ী মোগল ফৌজ শালকোনা পিছনে রেখে গভীর জঙ্গল ও পাহাড়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে ধুবড়ীতে গিয়ে উপনীত হয়। এখানকার দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করবার জন্য তারা তিন মাস ধরে অবিশ্রান্তভাবে গোলাবর্ষণ করে। রাজা পরীক্ষিতনারায়ণ বীর বিক্রমে মোগলদের বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত এক দিন মোকারম খাঁর বেলদাররা দুর্গের একটি প্রাচীরে ভাঙনের সৃষ্টি করায় তিনি বুঝে নেন যে এর পর দুর্গ রক্ষা করা সহজসাধ্য হবে না। অন্য সীমান্তেও যুদ্ধ চলছিল। তাই তিনি ফাৎ খাঁ সালকার হাতে ধুবড়ী দুর্গের দায়িত্ব অর্পণ করে মূল বাহিনীসহ গিলায় চলে যান। ফাৎ খাঁ বেশ কয়েক দিন ধরে শত্রুকে বাধা দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন যে আর কোন আশা নেই তখন হতাবশিষ্ট সৈন্যদের গোপনে দুর্গ থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজে জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করতে যান। সেই উদ্দেশ্যে তিনি নদীতে নেমেছেন এমন সময়ে তাঁর কাছে খবর এল যে তাঁর পুত্র মোগলের হাতে বন্দী হয়েছে। স্নেহান্ধ পিতা তখন জল থেকে উঠে এসে আত্মসমর্পণ করেন (১৬১৩, এপ্রিল)।

রণদুর্মদ রণভ্রমর

ফাৎ খাঁর সৈন্যরা দুর্গ ছেড়ে চলে গেলেও রাজা পরীক্ষিতনারায়ণের এক শিক্ষিত হস্তী রণভ্রমর এসে মোগল ফৌজের পথরোধ করে দাঁড়াল। সে একাই সমগ্র মোগল বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করবে! যখন সব সৈন্য দুর্গ থেকে চলে গেছে তখন রণভ্রমরের মাহুত দুর্গ প্রকারের যে স্থানে মোগল বেলদাররা ভাঙনের সৃষ্টি করেছিল সেখানে নিজ হস্তীর পিঠে চড়ে শত্রুকে সম্বোধন করে বলল : যুদ্ধ দাও। এই বিরাট দুর্গের ভিতর আমি আর আমার রণভ্রমর ছাড়া কেউ নেই। আমাদের প্রভুর জন্য আমরা দুজনেই প্রাণ দেব। এস, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর।

মোগলপক্ষের সর্বোৎকৃষ্ট হস্তী শ্রীহট্টরাজ বায়াজিদ করবানির হস্তীলা আক্রমণকারী ফৌজের পুরোভাগে আসছিল। তার সঙ্গে রণভ্রমরের প্রচণ্ড যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। উভয় হস্তী পরস্পরকে শুঁড়ের আঘাতে ব্যতিব্যস্ত করল, উভয়ের মাহুত পরস্পরের প্রতি অস্ত্র বর্ষণ করতে লাগল। পিছন থেকে মোগল সৈন্যগণ মৌন বিস্ময়ে সেই অপরূপ দৃশ্য উপভোগ করতে লাগল। হাতীকে যে এভাবে যুদ্ধের জন্য শিক্ষিত করে তোলা যায় একথা তারা পূর্বে জানত না। দেখতে দেখতে হস্তীলার মাহুত মারুফের নিক্ষিপ্ত একটি বর্শা গিয়ে রণভ্রমরের মাহুতের বক্ষ বিদীর্ণ করায় সে হতজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। স্নেহশীল পালকের এই মৃত্যুর কথা বুঝতে পেরে রণভ্রমরের চক্ষু দিয়ে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাসও ফেলল। তার পর প্রতিশোধ নেবার জন্য সে যেন দ্বিগুণ বিক্রমে হস্তীলাকে আক্রমণ করল। তার মাহুতের সহকারী পিছন দিকে বসেছিল, শত্রুর তীর বর্ষণের জন্য সম্মুখভাগে আসবার সুযোগ পাচ্ছিল না। কিন্তু রণভ্রমরের বিক্রম দেখে স্বয়ং ইন্দ্র যেন নিজের একটি বজ্র তার শুঁড়ের ভিতর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন! মাহুতবিহীন রণভ্রমর একাই যুদ্ধ করে হস্তীলাকে ধরাশায়ী করল। দুর্গ তুমি নেবে? আমার প্রভু রাজা পরীক্ষিতনারায়ণের দুর্গ জয় করে তুমি জাহাঙ্গীর বাদশাহকে উপহার দেবে? আমার দেহে প্রাণ থাকতে তা হবে না—কিছুতেই হবে না।

সেই সময় মীর্জা নাথান তাঁর অশ্বারোহীদের নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হোলেন। তিনি ছিলেন সৈন্যদের পুরোভাগে নিজ হস্তী জয়মঙ্গলের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট। হস্তীলাকে ধরাশায়ী হোতে দেখে তিনি জয়মঙ্গলকে রণভ্রমরের সম্মুখে

এগিয়ে দিয়ে নিজে বসলেন একটি ঘোড়ার পিঠে। রণভ্রমর ও জয়মঙ্গলের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। রণভ্রমরের জুনিয়ার মাহুত ততক্ষণে সামনের দিকে চলে এসেছিল, কিন্তু যুদ্ধ করা তার অদৃষ্টে ঘটল না; মীর্জা নাথানের অশ্বারোহীদের তীরের আঘাতে বিদ্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ধরাশায়ী হোল। রণভ্রমর কিন্তু তখন রণদুর্মদ। কারও নির্দেশের অপেক্ষা না রেখে সে একাই যুদ্ধ চালাতে লাগল। তার সেই বিক্রম দেখে মীর্জা নাথান তাঁর ডায়েরীতে লিখে গেছেন: অসংখ্য তীরের আঘাতে রক্তাক্ত কলেবর হয়েও রণভ্রমর রণে ভঙ্গ দেবার কোন লক্ষণ দেখাল না। বরং আরও উগ্রমূর্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করতে লাগল। যেদিকেই যে আক্রমণ চালাল সেদিকেই যেন এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা প্রবলবেগে এগিয়ে যেতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত সে জয়মঙ্গলকে ধরাশায়ী করে অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যদের দিকে ধাবিত হোলে দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি সুরু হয়ে গেল। তার দাপটে বহু সৈনিক হতাহত হোলেও সে নিজে রক্তক্ষয়ের জন্য যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তখন তাকে হত্যা করা কিছু কঠিন কাজ হোত না, কিন্তু এরূপ এক অনন্যসাধারণ হস্তীকে হত্যার চেয়ে অধিকার করা বিজ্ঞোচিত কাজ বিবেচনা করে মীর্জা নাথান আদেশ দিলেন: ওই যে রণভ্রমর দাঁড়িয়ে পড়েছে, রক্তক্ষয়ের জন্য তার আর আক্রমণের শক্তি নেই। তাকে মেরো না, একটা বাদশাহী হাতীকে তার পাশে পাঠিয়ে মাহুত তার পিঠে লাফিয়ে পড়ে তাকে অধিকার করুক। রক্তক্ষয়ের জন্য সে এতই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে এখন তাকে অধিকার করা কিছু কঠিন হবে না।

রণভ্রমর কি মানুষের কথা বুঝত? পৃথিবীর সকল ভাষা জানত? মীর্জা নাথানের এই আদেশ উচ্চারিত হোতে না হোতে সে আবার রুখে দাঁড়াল, তার উগ্রচণ্ডা মূর্তি দেখে কি পুরুষ কি স্ত্রী কোন হাতীই তার পাশে যেতে সাহস পেল না। তখন আবার নূতন করে যুদ্ধ সুরু হোল। সৈনিকরা তীর বর্ষণে রণভ্রমরের দেহ ক্ষতবিক্ষত করে দিল। শরশয্যায় পিতামহ ভীষ্মের গায়ে যত তীর বিধেছিল রণভ্রমরের গায়েও বোধ হয় তত তীর বিধল। সেই অবস্থায় সে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও রক্তক্ষয়ের জন্য চলচ্ছক্তিবিহীন হয়ে পড়েছিল। তাই দেখে একটি বাদশাহী হাতীর পিঠ থেকে জনৈক মাহুত তার হাওদার উপর লাফ দিয়ে পড়ল।

এখনকার দিনে হাতীর এরূপ বিক্রমের কথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু মীর্জা নাথানের মত ডায়েরী লেখক স্বচক্ষে এই দৃশ্য দেখে তাঁর বাহারিস্তান-ই-গৈবিতে তা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বাদশাহ জাহাঙ্গীরও তাঁর আত্মজীবনীতে ওসমান আফগানের হাতীর এইরূপ বিবরণ লিখেছেন। তুকারই যুদ্ধের গোড়ার দিকে দাউদ কররানির সাফল্যের মূলে ছিল তাঁর সুশিক্ষিত হস্তীবাহিনী। শতাব্দীর পর শতাব্দী চেষ্টা করেও যে তুর্কীরা কামরূপ জয় করতে পারে নি তার জন্য ওই অঞ্চলের রণহস্তীদের গৌরব বড় কম নয়। কিন্তু আলোচ্য সময়ে কামরূপ দ্বিধাবিভক্ত। তাই ধুবড়ী দুর্গের পতন ও রণভ্রমরের পরাজয়ের সংবাদ রাজা পরীক্ষিতনারায়ণের কাছে গিলায় পৌঁছালে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন।

ডিমুরিয়া রাজা নিহত

পরীক্ষিতনারায়ণের পিতৃব্যপুত্র কুচবিহারাধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণ ছিলেন মোগলের বন্ধু। কামরূপ জয়ের জন্য মোকারম খাঁকে পাঠাবার কিছু দিন পরে সুবাদার ইসলাম খাঁ এই রাজ্য তাঁর হাতে প্রত্যার্পণের অঙ্গীকার দিয়ে নির্দেশ পাঠান তিনি যেন পশ্চিম সীমান্ত থেকে পরীক্ষিতনারায়ণকে আক্রমণ করেন। সে আদেশ পালন করে কুচবিহার বাহিনী পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে এখনকার রংপুর জেলা ছেয়ে ফেলে। কিন্তু স্বজাতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আন্তরিকতা না থাকায় সেই সৈনিকরা প্রায় নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে শুনে ইসলাম খাঁ ভূষণারাজ শত্রুজিতকে এই সীমান্তে পাঠিয়ে দেন। সেই সম্মিলিত বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়ে পরীক্ষিতনারায়ণ সেখান থেকে সৈন্যদের গিলায় সরিয়ে নিয়ে যান।

সর্বাধ্যক্ষ মোকারম খাঁ তখন গিলা আক্রমণ করবার জন্য দুজন জমিদার বাহাদুর গাজী ও সোনা গাজীকে পাঠিয়ে তাঁদের প্রতি নির্দেশ দেন যেন ওই নগরী অবরোধ করে বহির্জগতের সঙ্গে জলপথ ও স্থলপথে সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। সে আদেশ যথারীতি পালিত হওয়ায় পরীক্ষিতনারায়ণ যখন দেখলেন যে তাঁর খাদ্য ও রসদ সরবরাহ বন্ধ হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে তখন সেখানে অবরুদ্ধ না থেকে ধুবড়ী দুর্গ আক্রমণ করবার জন্য কৃতসংকল্প হন। এই উদ্দেশ্যে জামাতা ডিমুরিয়া রাজার প্রতি আদেশ দেন তিনি যেন গদাধর

নদীর তীরে অবস্থিত বাদশাহী ছাউনি ধ্বংস করে ধুবড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। শ্বশুরের আদেশ শিরোধার্য্য করে ডিমুরিয়ার রাজা এক দিন রাত্রিতে তড়িতাক্রমণে বাহাদুর গাজী ও সোনা গাজীর নৌবহর ধ্বংস ও মোগল ছাউনির বিলোপ সাধন করে নিশাবসানের পূর্বেই ধুবড়ীতে চলে আসেন।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী পরীক্ষিতনারায়ণ স্থলবাহিনীসহ সেই সময়ে ধুবড়ীতে এসে উপস্থিত হোলে দুর্গ প্রাচীরের অদূরে শ্বশুর-জামাতার দুইটি বাহিনীর মিলন ঘটে। সেই সম্মিলিত বাহিনী বীর বিক্রমে দুর্গ আক্রমণ করলে জামাল খাঁ মাঙ্কালি ও লছমী রাজপুতের অধীনে মোগল ফৌজ তাদের কাছে পরাজিত হয়। তারপর মুসা খাঁ ও ওসমান আফগানের সৈন্যরা এসে পরীক্ষিতনারায়ণের গতিরোধ করে দাঁড়ায়। এই সব প্রাক্তন মিত্রের সঙ্গে যুদ্ধ বেদনাদায়ক হোলেও কামরূপরাজের পতাকাবাহী শত্রুকে আক্রমণ করে প্রায় পর্য্যুদস্ত করে এনেছে এমন সময়ে তাঁর হস্তী আহত হয়ে প্রভুকে মাটিতে ফেলে রণস্থল ত্যাগ করে। তার ফলে কামরূপ সৈন্যদের মধ্যে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; তা সত্ত্বেও পরীক্ষিতনারায়ণ তাদের পুনর্গঠিত করে দুর্গের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে থাকেন। কিন্তু নিশাগম পর্যন্ত কোন পক্ষই জয়ী না হওয়ায় যুদ্ধ পর দিবস পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

এদিকে জলযুদ্ধে ডিমুরিয়া রাজার নেতৃত্বে কামরূপ নৌবহর আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করে। পূর্ব রাত্রে এই তরুণের আক্রমণে মোগল নৌবহরের এক বিরাট অংশ যে অচল হয়ে গিয়েছিল সে কথা পূর্বে বলেছি। আজ সকাল থেকে তাঁর শ্বশুর যখন স্থলসৈন্য নিয়ে দুর্গের উপর আক্রমণ চালাচ্ছিলেন সেই সময়ে তিনি জলযুদ্ধে শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে কোণঠাসা করে দেন। যে সব মোগল রণতরী তাঁর সম্মুখীন হয়েছিল তিনি তাদের সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করে বহু নৌ-সৈনিককে হতাহত ও বহু রণতরী হস্তগত করেন। তাঁর প্রচণ্ড আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হয়ে অপরাহ্নকালে মোগল নৌবহর অন্যত্র পলায়নের আয়োজন করছে এমন সময়ে হঠাৎ একটি কামানের গোলা এসে তাঁকে আঘাত করায় তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন। এখানেও রাত্রের মত লড়াই বন্ধ হয়ে গেলেও জামাতার মৃত্যুতে মর্মাহত পরীক্ষিতনারায়ণের আর যুদ্ধ করবার শক্তি লোপ পায়। প্রভাতে যখন তিনি সংবাদ পেলেন যে সর্বাধিনায়ক মোকারম খাঁর কাছ থেকে নূতন কয়েকটি

রেজিমেণ্ট রণাঙ্গণের দিকে এগিয়ে আসছে তখন আর যুদ্ধ চালাবার পরিকল্পনা ত্যাগ করে গিলার দিকে রওনা হন। তাঁকে অনুসরণ করে মোগল ফৌজ সেখানে গিয়ে পৌঁছালে তিনি সে স্থান ছেড়ে রাজধানী বড়নগরের দিকে চলে যান এবং শেষ পর্য্যন্ত সন্ধি স্থাপনের জন্য মোগল শিবিরে দূত পাঠান।

1. Memoirs of Jahangir (*Susil Gupta edn.*), *p. 83*
2. Mirza Nathan *Baharisthan-i-Ghayibi, Eng, Tr. M. Borah, p. 14-28, 121-137. 235-252*

দ্বাত্রিংশৎ অধ্যায়

ব্যাপক গণবিদ্রোহ

পরীক্ষিতনারায়ণের আত্মসমর্পণ

ঈশা খাঁ ও প্রতাপাদিত্যের নৌবহর এবং ওসমান আফগান ও বায়াজিদ করবানির স্থলবাহিনীর বলে বলীয়ান হয়ে সম্প্রসারিত বাদশাহী ফৌজ বড়নগরের পথে পাণ্ডুতে গিয়ে পৌছালে রাজা পরীক্ষিতনারায়ণের বুঝতে বাকি থাকল না যে এর পর যুদ্ধ চালান একেবারেই অসম্ভব। সম্মানজনক সর্তে মোগলের কাছে আত্মসমর্পণ সম্ভব কিনা তা জানবার জন্য তিনি নিজের একান্ত সচিব রামদাসকে মোগল শিবিরে পাঠিয়ে সেনাপতি মোকারম খাঁ ও বক্সি শেখ কামালের মতামত জানতে চাইলেন। আক্রমণের উদ্যোগ তখন পুরাপুরি মোগলের হাতে থাকলেও তাদের সমস্যা কম ছিল না। তাই উভয় সৈন্যাধ্যক্ষ যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, পরম সৌজন্যের সঙ্গে রামদাসকে আপ্যায়িত করে আশ্বাস দিলেন যে রাজা পরীক্ষিতনারায়ণ যদি নদীতীরের এক নির্দিষ্ট স্থানে এসে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাহোলে তাঁকে পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে সুবাদার ইসলাম খাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁর মর্য্যাদার জন্য দায়ী থাকবেন স্বয়ং মোকারম খাঁ।

এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে রাজা পরীক্ষিতনারায়ণ তৃতীয় দিবসে রামদাসের সঙ্গে নির্দ্ধারিত স্থানে এসে উপস্থিত হোলে মোগল ফৌজ তাঁকে রাজোচিত অভিনন্দন দেয়। তারপর এক সুসজ্জিত মণ্ডপের নীচে সর্বাধিনায়ক মোকারম খাঁ ও বক্সি শেখ কামাল এক হাতে কোরান ও অপর হাতে তাঁর দেহ স্পর্শ করে শপথ করেন যে তিনি মোগলের আনুগত্য স্বীকার করলে মোকারম খাঁ নিজে তাঁকে সন্ধি সম্পাদনের জন্য পূর্ণ মর্য্যাদা সহকারে ঢাকায় নিয়ে যাবেন। পরীক্ষিতনারায়ণ তাতে সম্মত হয়ে মোগল সেনাপতির সঙ্গে ঢাকার দিকে রওনা হন।

ওই নগরীতে পৌছে তাঁরা শোনেন যে ভাওয়ালের জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে সুবাদার ইসলাম খাঁ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কাছাকাছি কোন ভাল কবিরাজ না থাকায় এক হাকিমকে ডাকা হয়; তিনি ভুল ঔষধ দিয়ে রোগীর জীবনান্ত ঘটিয়েছেন। এই দুঃসংবাদে সমস্ত ঢাকা নগরী বিষাদমগ্ন। মৃতের শবদেহ সেখানে আনা হয়েছে এবং প্রথানুযায়ী বহু লোক এসে তাঁর প্রতি মৌন সম্মান জানাচ্ছে। মোকারম খাঁর নির্দেশে কামরূপরাজও সময়োচিত সম্মান দেখিয়ে পববর্তী সুবাদার কাসিম খাঁর অপেক্ষায় বসে রইলেন।

কাসিম খাঁর বিশ্বাসঘাতকতা

ইসলাম খাঁর মৃত্যু সংবাদ আগ্রায় পৌছালে জাহাঙ্গীর তাঁর ভ্রাতা ঐতিহাসিক আবুল ফজল আলামির জামাতা কাসিম খাঁকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। কয়েক দিন পরে তিনি ঢাকায় এসে পৌছালে কুচবিহারাধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণ এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই স্বাধীন নরপতির প্রতি নূতন সুবাদার প্রথম দিন যথেষ্ট সৌজন্য দেখালেও পরের দিন সমাগত সকল ওমরাহকে বিস্ময়বিমূঢ় করে দরবারকক্ষেই তাঁকে বন্দী করেন। অথচ কুচবিহার ছিল মোগলের মিত্ররাজ্য! প্রতাপাদিত্য, মুসা খাঁ প্রভৃতি ভূঁইয়া রাজগণকে যে ভাবে যুদ্ধে পরাজিত করা হয়েছিল কুচবিহারকে তা করা হয় নি। উভয় পক্ষে কোন দিন যুদ্ধই হয় নি। বরং মান সিংহের সময় থেকে রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মোগলকে বারবার সাহায্য করেছেন। বস্তুতঃ, তাঁর সাহায্য না পেলে পরীক্ষিতনারায়ণকে বশীভূত করা সহজসাধ্য হোত না। সে সময়ে তাঁকে প্রতিদানস্বরূপ কামরূপ প্রদানের অঙ্গীকার করা হোলেও কাসিম খাঁ সে অঙ্গীকার পালনের পরিবর্তে সেই মহামান্য অতিথিকে বন্দী করে চরম বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয় দেন।

মোকারম খাঁর সত্যনিষ্ঠা

রাজা পরীক্ষিতনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে মোকারম খাঁও সেই দরবারে উপস্থিত ছিলেন। যে কুচবিহারাধিপতির সাহায্য পাওয়ায় তাঁর পক্ষে কামরূপ বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা সহজসাধ্য হয়েছিল তাঁর প্রতি এই কাপুরুষ আচরণে

আর সবার মত তিনিও বিস্মিত ও মর্মাহত হন। সে বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পেল যখন প্রহরী রাজা লক্ষ্মীনারায়ণকে নিয়ে দরবারকক্ষ ত্যাগ করবার পর তাঁর প্রতি আদেশ দেওয়া হয় পরীক্ষিতনারায়ণকে সুবাদারের হস্তে সমর্পণ করবার জন্য! মোকারম খাঁ ছিলেন সত্যকার যোদ্ধা, কোরান ছুঁয়ে যে অতিথিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁকে সমর্পণ করা যে সম্ভব নয় সে কথা জানিয়ে দীপ্ত কণ্ঠে বললেন: সুবাদার সাহেব! আমি আপনার সহকর্মী ও ভ্রাতুষ্পুত্র। এই সুবার সকল অফিসারের মত আমিও আপনার আদেশ পালন করতে বাধ্য। কিন্তু আপনি ভুলবেন না যে রাজা পরীক্ষিতনারায়ণ যুদ্ধে পরাজিত হোলেও আত্মসমর্পণ করেন নি। আমার কাছে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়ে তবে তিনি ঢাকায় এসেছেন সন্ধির কথা কইতে। আমি তাঁকে নিজে সঙ্গে করে এনেছি এবং তাঁর নিরাপত্তার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছি। আমার সে প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদা আপনি যদি দেন তাহোলে পৃথিবীপতির (জাহাঙ্গীরের) সেবায় আত্মনিয়োগ করে আপনার অনুগত থাকব; আর যদি তাঁকে ছিনিয়ে নেন—আল্লা না করুন—আমি বেঁচে থাকতে কেউ তাঁর অঙ্গ স্পর্শ করতে পারবে না। আপনার সঙ্গে আমার চিরদিনের মত বিচ্ছেদ ঘটবে।

ঝানু রাজনীতিক কাসিম খাঁ অধীনস্থ সেনাপতির এই কথাগুলি কান পেতে শুনলেন, কিন্তু কোনরূপ চিত্তচাঞ্চল্য না দেখিয়ে অন্য কাজে মন দিলেন। পরের দিন দরবার বসলে সেখানে আসবার পূর্বে তিনি একজন বেয়ারা পাঠিয়ে মোকারম খাঁকে নিজের খাস কামরায় ডেকে পাঠালেন। মোকারম খাঁ তাঁকে ভাল করে চিনতেন, তাই পরীক্ষিতনারায়ণকে সেখানে একা না রেখে নিজের সঙ্গে নিয়ে সুবাদারের কামরার দিকে চললেন। কিন্তু তিনি কিছু দূর এগোবার পর এক অস্ত্রসজ্জিত প্রহরী এসে সেই নরপতির কোমরবন্ধে হঠাৎ টান দিয়ে সজোরে পাশে সরিয়ে নিয়ে গেল। পিছন ফিরে মোকারম খাঁ সে দৃশ্য দেখলেন, কিন্তু তিনি অসহায়! চক্ষের নিমেষে প্রহরী পরীক্ষিতনারায়ণকে নিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

মোকারম খাঁর বেয়াদবির জন্য কাসিম খাঁ তাঁকে কামরূপে যেতে নিষেধ করে শ্রীহট্টে বদলী করলেন। পরীক্ষিতনারায়ণকে পাঠান হোল আগ্রায়।

আগুন! আগুন!!

কাসিম খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ কামরূপে পৌঁছালে সেখানকার জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, মোগলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহবহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। মীর্জা নাথান সেদিন বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে গিলানীর অদূরে এক জঙ্গলে শিকার করতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে দেখলেন, ওই নগরীর আকাশ লালে লাল হয়ে গেছে। তিনি লিখছেন: 'আমি জঙ্গলে গিয়ে পানভোজনে ব্যস্ত আছি ও সহরে আমার তহ্‌বিলদাররা কারখানার দরজায় তালা লাগিয়ে স্ফূর্তি করছে এমন সময়ে রাস্তার এক মিঠাইওয়ালার দোকানে আগুন লেগে দু' তিন শ বাড়ী পুড়ে গেল। সেই আগুন ছড়াতে ছড়াতে আমার আস্তাবল, কারখানা ও সিপাহীদের ব্যারাকগুলি স্পর্শ করল। অন্দরমহলেও আগুন ছড়িয়েছিল. কিন্তু দুজন খোজা বেগমদের বোরখা পরিয়ে নদীতীরে নিয়ে যাওয়ায় তাঁরা মহলগিরি জাহাজে উঠে আত্মরক্ষা করেন।...সহরের মধ্যে আগুন এত দ্রুতবেগে চারিদিকে ছড়াতে লাগল যে তার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। সেই আগুনের লেলিহান শিখায় প্রতিটি গৃহ ভস্মস্তূপে পরিণত হোল, সবাই ভাবল পুনরুজ্জীবনের দিন এসে গেছে। শেষ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা আমার অস্ত্রাগার স্পর্শ করলে সেখানে রক্ষিত বারুদস্তূপ বিকট আওয়াজে বিদীর্ণ হয়ে সারা সহরে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করল। ধোঁয়ায় সূর্য্য ঢেকে গেল—আগুনের ফুলকি শিলাবৃষ্টির মত সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

বিদ্রোহী কবলে খুণ্টাঘাট

এইভাবে বৈশ্বানরের তাণ্ডব দিয়ে যে গণবিক্ষোভের সূত্রপাত হয় তা যেমন ব্যাপক তেমনি ভয়াবহ। এ সম্বন্ধে মীর্জা নাথান লিখছেন: দুজন কোচ নরপতিকে বন্দী করবার সংবাদ তাদের দেশে পৌঁছালে সেখানকার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজেদের অসম্মান ঢাকবার জন্য একজন অসমসাহসী ও প্রতিভাবান কোচের অধীনে বিদ্রোহ সুরু করে। কয়েকজন কড়োরী ও মুতাজী তাদের হাতে নিহত হোলে আল্লামা বেগকে পাঠান হয় বিদ্রোহ দমনের জন্য। কিন্তু তারা বাদশাহী ফৌজকে ছিন্নভিন্ন করে প্রায় সকল অফিসারকে হত্যা করে।...............ভারোয়ালের অধিবাসীরা একজনও বাদশাহী সৈন্যকে রেহাই দেয় নি, সবাইকে বেহেস্তে পাঠায়।

মীর্জা লিখে চলেছেন : বিদ্রোহ দিন দিন তীব্রতর হচ্ছে। বিদ্রোহীরা আমাদের কাছ থেকে রাঙামাটি দুর্গ কেড়ে নিয়ে গদাধর নদীর মুখ অধিকার করতে চেষ্টা করছে। তাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হোলে ঢাকার সঙ্গে সংযোগ-সূত্র বিচ্ছিন্ন হবে, কাসিম খাঁ অন্য কোন পথ দিয়ে সমরসম্ভার পাঠাতে পারবেন না।

নূতন সেনাপতি আবদুস সালাম রাঙামাটি পুনরুদ্ধারের জন্য এক শক্তিশালী বাহিনীসহ মীর আবদুর রজাক সিরাজীকে পাঠালেন। তাঁর নিজস্ব বাহিনী ছাড়া কয়েকজন মনসবদার ও আফগান সর্দারের ফৌজও সঙ্গে চলল।

দক্ষিণকূল হস্তচ্যুত

দক্ষিণকূল থেকে মীর্জা ইউসুফ বার্লান এক জরুরী পত্র পাঠিয়ে জানালেন যে সেখানে যদি এখনই যথেষ্ট সৈন্য পাঠান না হয় তাহোলে তাঁর অবস্থা আল্লামা বেগের মত শোচনীয় হবে। পরে আর এক পত্রে তিনি লিখলেন, শত্রুর এই অভ্যুত্থান অতি ভয়ঙ্কর। তারা আমাদের প্রতিনিয়ত তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে; বিতাড়িত হোতে হোতে শেষ পর্য্যন্ত আমরা ব্রহ্মপুত্র তীরে এমন এক জায়গায় এসেছি যে খাদ্যশস্য তো দূরের কথা ঘোড়ার জন্য দুমুঠো ঘাস পাওয়াও দুষ্কর।

পত্র দুখানি পড়ে আবদুস সালাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন দেখে মীর্জা নাথান কয়েকখানি অস্ত্রসজ্জিত রণতরীসহ ইউসুফ বার্লানের কাছে চলে গেলেন। সেখানে পৌঁছে দেখেন যে বার্লান কিছু অতিশয়োক্তি করেন নি। তাঁর অবস্থা সত্যই শোচনীয়, সমস্ত রেজিমেণ্টসহ তিনি অনাহারে রয়েছেন। বহু কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করে মীর্জা সবাইকে গিলানীতে নিয়ে এলেন।

কিন্তু গিলানীও নিরাপদ নয়। বিদ্রোহীরা সেই নগরী অবরোধ করে প্রতিনিয়ত সবার মনে ভীতির উদ্রেক করছে। তাদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করবার জন্য মনসবদাররা পালা করে নিজ নিজ অশ্বারোহী বাহিনীসহ নগর পাহারা দিতে লাগলেন। কিন্তু মীর্জা ইসকিন্দিয়ারের পালার দিন বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গের মত কোথা থেকে তারা বেরিয়ে এসে তাঁর রেজিমেণ্টের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মারধোর সুরু করল। তারপর তারা কামাখ্যাদুয়ার দিয়ে নগরীর মধ্যে

প্রবেশ করে বহু লোককে হতাহত করবার পর যেখান থেকে এসেছিল সেখানে চলে গেল। শেষ পর্য্যন্ত বাদশাহী ফৌজ তাদের দূরীভূত করলেও সেদিন যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল তা সংশোধন করা সম্ভব হয় নি। বিদ্রোহীরা আরও বেশী শক্তি সংগ্রহ করে মাঝে মাঝে এসে গিলানী আক্রমণ করতে লাগল।

জাহাঙ্গীর বিভ্রান্ত

বিদ্রোহের এই তীব্রতা দেখে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষরা স্তম্ভিত হয়ে পড়লেন। তাদের আঘাত যতই প্রবল হোতে লাগল মোগল শিবিরে আত্মদ্বন্দ্ব ততই বেড়ে চলল। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না, কেউ কাউকে মানতে চায় না। সুবাদার কাসিম খাঁর দুর্ভাবনার অন্ত নেই, ইমাম কুলী খাঁর উপর কামরূপ শাসনের দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যোগ্যতর অফিসারের অন্বেষণ করতে লাগলেন। কে করতে পারবে বিদ্রোহীদের পর্য্যুদস্ত ?

আগ্রায় বাদশাহ জাহাঙ্গীরও সমান দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। যে ফৌজ প্রতাপাদিত্য ও ওসমান আফগানকে পরাস্ত করেছে তারা যে কোচ বিদ্রোহীদের সামনে এইভাবে পঙ্গু হয়ে পড়বে একথা তিনি ভাবতে পারেন নি। তাদের এই ব্যর্থতার জন্য তিনি সুবাদারের কাছে বারবার কৈফিয়ৎ চেয়ে পত্র পাঠালেন। কিন্তু কি কৈফিয়ৎ তিনি দেবেন ? তাঁর সৈন্য বা সমরসম্ভারের অভাব নেই, অথচ সর্বত্র বিদ্রোহীরা তাদের কোণঠাসা করে দিচ্ছে। শেষ পর্য্যন্ত জাহাঙ্গীর প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য ইব্রাহিম খাঁ ওরফে ইতিমাম খাঁকে ঢাকায় পাঠালেন। এই নিয়োগে সুবাদার কাসিম খাঁ খুসী হন নি, কিন্তু তিনি করবেনই বা কি ?

দালগাঁওয়ের যুদ্ধ

অশান্ত কামরূপ আরও অশান্ত হয়ে উঠতে লাগল। রাঙামাটিতে আবদুর রজাকের অবস্থা খুব কাহিল হয়েছে শুনে মীর্জা নাথান তাঁর শক্তি বৃদ্ধির জন্য এক রেজিমেণ্ট সৈন্য পাঠিয়ে নিজে আবদুল বাকি ও অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে শুমা পরগণায় চলে গেলেন। বেশ কিছু দূর অগ্রসর হবার পর দালগাঁও গ্রামে পৌছে তাঁরা দেখেন যে বহু সশস্ত্র বিদ্রোহী সেখানে জমায়েৎ হয়েছে। নিজেদের

সংখ্যাবহুলতার জন্য তাদের আত্মপ্রত্যয় এত বেশী যে ছাউনির চারিদিকে রক্ষা-বেষ্টনী তৈরীর প্রয়োজন পর্য্যন্ত বোধ করে নি। মীর্জা নাথান নিজের সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাদের আক্রমণ করতে চাইলেন, কিন্তু সহকর্মীরা তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন যে জ্যোতিষীদের মতে দিনটি অত্যন্ত অশুভ—এদিন যুদ্ধ করলে ফল ভাল হবে না। কাজেই তিনি নিজে না গিয়ে লছমী রাজপুতকে শত্রুর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন।

মীর্জা নাথান লিখছেন : বিদ্রোহীরা সব নওজোয়ান বলে তাদের রক্ত গরম। দিনক্ষণের কোন তোয়াক্কা না করে তারা লছমী রাজপুতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সংবাদ বাদশাহী শিবিরে পৌঁছালে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না, নিজ রেজিমেণ্টসহ লছমী রাজপুতের পাশে চলে গেলেন। উভয় ফৌজের সম্মিলিত আক্রমণে বিদ্রোহীরা খাল পার হয়ে ওপারে চলে গেলেও তাদের বিষাক্ত তীরের আঘাতে মোগলদের অসংখ্য সৈন্য ও অশ্ব নিহত হোল। সেই তীরবৃষ্টির সম্মুখে সোজা দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব হওয়ায় বাদশাহী ফৌজ নিজ তাঁবুতে ফিরে এসে রাশিকৃত কলা গাছ জড়ো করে নিজেদের চার দিকে একটি রক্ষাব্যূহ তৈরী করল।

দিনমণি অস্তাচলে চলে গেলে মোগলরা সেদিনকার মত যুদ্ধ বন্ধ রেখে নিজেদের তাঁবুতে বিশ্রাম করতে লাগল, শত্রুকে প্রত্যাক্রমণের চেষ্টা করল না। তা সত্ত্বেও তাদের দুঃশ্চিন্তার অন্ত নেই, যে কোন সময়ে শত্রু এসে তাঁবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সকল প্রকার সতর্কতার মধ্যে রাত কাটিয়ে পর দিন প্রভাতে যুদ্ধ স্বরু করবার জন্য যখন তারা সবেমাত্র ঘোড়ায় চড়েছে সেই সময়ে একদল কোচ তাদের তাঁবুতে এসে খবর দিল যে রাত্রি এক প্রহর থাকতে বিদ্রোহীরা ঘাঁটি ছেড়ে কোথায় চলে গিয়েছে। এই সংবাদে মোগল অফিসাররা বিস্মিত হয়ে সেনাপতি আবদুস সালামের কাছে বিজয়বার্তা পাঠিয়ে দেন। তখনও তাঁরা জানতেন না যে গেরিলা যুদ্ধের রীতিই এই!

রণাঙ্গনে আসাম অভিযাত্রী বাহিনী

যুদ্ধ চলতে লাগল। সমগ্র কামরূপ মোগল সৈন্যে ছেয়ে গেলেও বিদ্রোহ দমন করা যাচ্ছে না দেখে কাসিম খাঁর মনে বরাবর সন্দেহ ছিল যে সেই দুর্দ্ধর্ষ শত্রু অবশ্যই আসাম থেকে সাহায্য পাচ্ছে। তাদের প্রেরণা জোগাচ্ছেন

শক্তিশালী আসামরাজ। তাঁর রাজ্য অধিকার না করলে বিদ্রোহ দমন সম্ভব হবে না ভেবে তিনি বরাবর আসামের বিরুদ্ধে অভিযানের কথা চিন্তা করছিলেন। কিছু দিন পরে আরাকান যুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ায় বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সম্মতি নিয়ে সেই ফ্রন্টের সর্বাধিনায়ক আবা বাকরের প্রতি আদেশ পাঠালেন, তিনি যেন কামরূপের পথ ধরে আসাম জয়ের জন্য যাত্রা করেন। আদেশলিপি পেয়ে সৈয়দ আবা বাকর ঢাকায় না ফিরে মাঝ পথে যাত্রাপুর নামক স্থান থেকে নিজ বাহিনীসহ কামরূপের দিকে রওনা হোলেন। পথে তাঁর সঙ্গে সুবাদার কাসিম খাঁর নিজস্ব বাহিনী ছাড়া রাজা টোডরমলের পুত্র জগদেব, ভূষণারাজ মুকুন্দের পুত্র সত্রজিৎ, জামাল খাঁ মাংঘি প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় মনসবদারগণ যোগ দিলেন। মোগল সৈন্যে আসাম ছেয়ে ফেলবার আয়োজন চলতে লাগল।

সৈয়দ আবা বাকরের সম্মিলিত বাহিনী কামরূপে পৌছালে সেখানকার অফিসাররা খুসী হবার পরিবর্তে নিজেদের হীন বলে মনে করতে লাগলেন। সবাই একবাক্যে জানিয়ে দিলেন যে বহু অসুবিধা সত্ত্বেও বিদ্রোহ দমনের শক্তি তাঁরা রাখেন, আসাম অভিযাত্রী বাহিনী যেন নিশ্চিন্তমনে গন্তব্যস্থলের দিকে রওনা হয়। তাঁরা কৃতকার্য্য হোলে পরোক্ষে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করা হবে। ঢাকায় সুবাদার কাসিম খাঁর কাছে এই অভিমত পৌছালে তিনি তা গ্রহণ করে আবা বাকরকে কামরূপে অযথা কালক্ষেপ করবার পরিবর্তে সরাসরি আসামের দিকে রওনা হবার জন্য আদেশ পাঠালেন।

বোধনভারা ও পুটামারি অধিকার

আবা বাকর তাঁর অভিযাত্রীবাহিনীসহ আসামের দিকে যাত্রা করবার পর আবদুল বাকি ও মীর্জা নাথান জয়গড় দুর্গের পথে রওনা হয়ে গুমায় পৌছে চারিদিকে বিভীষিকার সৃষ্টি করেন। তিনি প্রতি দিন প্রত্যুষে পাঁচ শ অশ্বারোহী ও এক হাজার বন্দুকীসহ আশপাশের গ্রামগুলিতে গিয়ে জনসাধারণের উপর উৎপীড়ন চালাতে থাকেন—যোদ্ধা বা অযোদ্ধায় বাচবিচার রহিত হয়। এই ভাবে কয়েক দিন কাটবার পর তারা সঙ্কোশ নদীর তীরে উপস্থিত হোলে আবদুস সালাম ও আরও কয়েকজন অফিসার তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান যে বিদ্রোহীদের উপদ্রবে ওই অঞ্চলের ঠিকাদারদের পক্ষে রেশন সরবরাহ অসম্ভব

হয়ে পড়েছে। যখনই তারা খাদ্যশস্য নিয়ে পথ চলে তখনই সেই দুষমনরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে তাদের সব কিছু লুটপাট করে নিয়ে যায়। তাদের দমন করবার জন্য আবদুল বাকি মীর্জা সাহ্‌লির প্রতি আদেশ দিলেন।

মীর্জা সাহ্‌লি ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে উদ্যোগী হয়ে দেখেন যে বাধা দুর্লঙ্ঘ্য। কয়েক দিন ব্যর্থ আয়োজনের পর তিনি আবদুল বাকিকে লেখেন ঃ পুটামারিতে পৌঁছে আমরা বিদ্রোহীদের দূরীভূত করলেও তারা আবার ফিরে এসে সাত দিন ধরে আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ চালায়। তাদের উপদ্রবে আমাদের খাদ্য সরবরাহের সকল পথ বন্ধ হওয়ায় আমরা পুটামারি ত্যাগ করে বোধনতারায় চলে আসি।··· এখানে বিদ্রোহীরা আমাদের অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছে—খাদ্য বা রণসম্ভার কিছুই নেই। আজই যদি পর্য্যাপ্ত সাহায্য পাঠাতে না পারেন তাহোলে আমাদের অবস্থা আল্লামা বেগের রেজিমেণ্টের মত অসহনীয় হয়ে দাঁড়াবে। যদি একান্তই কিছু করা সম্ভব না হয় তাহোলে অন্ততঃ বাদশাহী হাতীগুলির একটা ব্যবস্থা করুন। দুর্গ রক্ষার জন্য আমরা জীবনপণ করে লড়ব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কয়জন আপনার কাছে ফিরে যেতে পারব তা বলতে পারি না।

পত্রখানি পেয়ে আবদুল বাকি নিজেই খুঁটাঘাটে যাবার জন্য উদ্যোগী হোলেন, কিন্তু মীর্জা নাথান তাঁকে নিরস্ত করে স্বেচ্ছায় যে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। নিজস্ব ও আফগান সৈন্যদের নিয়ে তিনি বোধনতারা দুর্গে পৌছালে মীর্জা সাহ্‌লি এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। পরের দিন শনিবার—যাত্রা নাস্তি। তাই তিনি দুর্গের বাইরে তাঁবু ফেলে শুভক্ষণের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা কোন দিনক্ষণের ধার ধারে না। রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে গুপ্তচররা সংবাদ নিয়ে এল যে তাদের নায়ক পুটামারি থেকে এক ব্যাটেলিয়ন সৈন্য রাজ-ঘাটে পাঠিয়েছেন। একথা শুনে তিনি আর সময়ক্ষেপ না করে নিশাবসানের সঙ্গে সঙ্গে মীর্জা সাহ্‌লিকে সঙ্গে নিয়ে পুটামারিতে চলে গেলেন। এই নূতন সৈন্যদের দেখে বিদ্রোহীরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তাদের অনেকেই নিহত হোল, অনেকে টাকুনিয়া নামক পার্বত্য দুর্গে গিয়ে ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য তৈরী হোতে লাগল।

শত্রুকে নূতন করে ব্যূহ বিন্যাসের সুযোগ দেওয়া অনুচিত বিবেচনা করে মীর্জা নাথান এক ডিভিসন সৈন্য টাকুনিয়ার দিকে পাঠালেন। বিদ্রোহীদের প্রচণ্ড প্রতিরোধ সত্ত্বেও মোগল ফৌজ সেখানকার দুর্গ অধিকার করে তাদের অধি-

কাংশকে শমন সদনে পাঠিয়ে দিল। যারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল তারা কুচবিহার-রাজ লক্ষ্মীনারায়ণের খুল্লতাত মানিকদেবের অধিকারের মধ্যে চলে গেছে শুনে মীর্জা নাথান তাঁর কাছে সহযোগিতা দাবী করে একখানি পত্র পাঠালেন। সেই সঙ্গে বন্দী কুচবিহাররাজ লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্রের কাছে এক কড়া নোট পাঠিয়ে জানান হোল যে বিদ্রোহী সেনাপতি যদি তাঁর রাজ্যের ভিতর দিয়ে কোথাও পালিয়ে যায় সেজন্য তাঁকে শাস্তি পেতে হবে। এই দৃঢ়তার ফল হাতে হাতে ফলল, মানিকদেব বিদ্রোহী নায়ককে খাঁচায় পুরে লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্রের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

মহানায়ক সনাতন

তাঁকে পেয়ে মোগল শিবিরে উল্লাসের তরঙ্গ বহে গেল, বিদ্রোহ দমিত হয়েছে মনে করে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কিন্তু রক্তবীজের বংশ এত সহজে নির্মূল হয় না! কয়েক দিন পরে দেখা গেল যে সনাতন নামক এক অজ্ঞাত-পরিচয় যুবকের অধীনে বিদ্রোহীরা আবার সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নূতন করে যুদ্ধ সুরু করেছে। দেখতে দেখতে তাদের চাপ এতই প্রবল হয়ে উঠল যে কামরূপের করোরি শেখ ইব্রাহিম ঢাকায় নূতন সুবাদার কাশিম খাঁর কাছে এক পত্র লিখে জানালেন যে এখনই প্রভূত পরিমাণ সাহায্য না পাঠালে কামরূপ হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং তিনি নিজেও নিহত হবেন।

মীর্জা নাথান তখন খরবুজাঘাটে তাঁবু ফেলে খুণ্টাঘাট অঞ্চল রক্ষা করছিলেন। যখন তিনি শুনলেন যে সাধারণ কৃষকরাও বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়ে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করছে তখন বলভদ্র দাস প্রমুখ কয়েকজন অফিসারকে তাদের দমন করবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গেলেন কিন্দুগুড়ি ও বোধনতারার মধ্যবর্তী এক স্থানে। বহু বিদ্রোহী সেখানে শিবির সন্নিবেশ করে অবস্থান করছিল। নদীর দুই তীর থেকে উভয় পক্ষ পনের দিন ধরে পরস্পরের প্রতি তীর ও গুলি বর্ষণের পর ১৮ই রমজান তারিখে বিদ্রোহীরা নদী পার হয়ে বারো হাজার তীরন্দাজ ও বন্দুকীসহ মোগলের উপর আক্রমণ সুরু করে। সারা দিন ধরে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলবার পর মোগল ফৌজ জয়ী হয়ে বটে, কিন্তু তাদের অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়।

অন্য ফ্রন্টে সেনাপতি আবদুল বাকি ব্রহ্মপুত্র নদীর উপর দিয়ে অগ্রসর হবার

সময়ে সারা রাস্তা বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হন। নদীর উভর তীর থেকে আক্রমণের ফলে তাঁর নৌবহরের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। শেষ পর্য্যন্ত অসংখ্য সৈন্যের জীবন বলি দিয়ে তিনি বড়নগর দুর্গে পৌছালেও বিদ্রোহীদের হাত থেকে রেহাই পান নি। তারা প্রায়ই সেখানে এসে তাঁর উপর আক্রমণ চালাতে থাকে। তাঁর এই বিপত্তির কথা মীর্জা নাথানের কাছে পৌছালে তিনি ধর মুস্কট নামক এক হিন্দু অফিসারকে বড়নগরে পাঠিয়ে দেন। ধর মুস্কটের রেজিমেণ্ট সেখানকার দুর্গের কাছে পৌছালে আবদুল বাকি তাদের বিদ্রোহী ভ্রমে কামান দাগতে স্বরু করেন; শেষ পর্যন্ত প্রকৃত অবস্থা বুঝে নিয়ে তিনি প্রকৃতিস্থ হন।

মীর্জা নাথানের শান্তি প্রচেষ্টা

কয়েক দিন পরে আবদুল বাকির কাছ থেকে খবর এল যে সনাতনের শক্তি এখন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি ইব্রাহিম কড়োরির অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছেন। কড়োরিকে সাহায্য দেবার জন্য মীর্জা নাথানকে সঙ্গে নিয়ে আবদুল বাকি দমদমায় চলে গেলেন। সরাইলের জমিদার সোনা গাজির নৌবহরও নদীপথ ধরে তাঁর সঙ্গে চলল। সেই সম্মিলিত বাহিনী সনাতনের বিরুদ্ধে আক্রমণের উদ্যোগ করছে এমন সময়ে মীর্জা নাথান আবদুল বাকিকে ডেকে বললেন: আজ মঙ্গলবার। কি হিন্দু কি মুসলমান সকল জ্যোতিষী এ বিষয়ে একমত যে এই অদিনে উত্তরদিকে পথ চললে ফল ভাল হয় না। সেক্ষেত্রে আমরা যখন সোমবার দিনটা হেলায় নষ্ট করেছি তখন আজ আক্রমণ স্বরু করে গ্রহের কোপে পড়া উচিত হবে না। সেনাপতি আবদুল বাকি এই যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব গ্রহণ করলেও দুজন তরুণ অফিসার প্রায় জোর করে তাঁর সম্মতি আদায় করে নিজ নিজ রেজিমেণ্টসহ শত্রু দুর্গের দিকে এগিয়ে চললেন। এই হঠকারিতার ফল যা হবার তাই হোল, অধিকাংশ সৈন্য হতাহত হওয়ায় উভয় অফিসার সাহায্য চেয়ে মূল শিবিরে লোক পাঠালেন।

এইভাবে দুটি রেজিমেণ্টের পরাজয়ের ফলে বাদশাহী ফৌজের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলে সেনাপতি আবদুল বাকির সমর্থন নিয়ে মীর্জা নাথান সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে এক তুর্কী ক্রীতদাসকে সনাতনের কাছে পাঠালেন। সেই বুদ্ধিমান ক্রীতদাস দুর্গ প্রাকারের সন্নিকটে গিয়ে উচ্চৈঃস্বরে সনাতনকে বলল, ইব্রাহিম

কড়োরি যেভাবে কামরূপে লুণ্ঠন চালিয়েছেন ও সুন্দরী নারীদের হস্তগত করেছেন সেজন্য মোগল সেনাপতি খুবই দুঃখিত। বিদ্রোহী সৈন্যাধ্যক্ষ যদি যুদ্ধের পথ ছেড়ে দিয়ে মোগলের সঙ্গে সহযোগিতা করেন তাহোলে তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে। উত্তরে তিনি জানিয়ে দিলেন যে তাঁরা মোগলকে ভালভাবে চিনেছেন, তাদের বিশ্বাস করে দুজন কোচ নরপতি যে জঘন্য ব্যবহার পেয়েছেন তারপর আর সন্ধির কোন কথা চলতে পারে না।

ক্রীতদাসটি এত সহজে দমবার পাত্র নয়। দুই পক্ষের কথা বহন করে সে দুই শিবিরের মধ্যে বারবার যাতায়াত করল। যুদ্ধও সে সময়ে বন্ধ থাকল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোন ফল হোল না।

দমদমার যুদ্ধ

সন্ধির কথাবার্তা ভেঙে যাবার পর উভয় পক্ষে নূতন করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল। দুর্গাভ্যন্তর থেকে বিদ্রোহীরা গোলা, গুলি ও তীর বর্ষণ করে অসংখ্য বাদশাহী সৈন্যকে ধরাশায়ী করতে লাগল। এই ঘটনার উল্লেখ করে মীর্জা নাথান বলেন : যুদ্ধের ভারসাম্য উভয় পক্ষে সমান। প্রতি দিন প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চলতে লাগল এবং তারই মধ্যে আমাদের পরিখাগুলি সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা চলল। শত্রুও বীরবিক্রমে লড়ে দুর্গ রক্ষা করবার শক্তির প্রমাণ দিতে লাগল। আমাদের পক্ষে সেনাপতি আবদুল বাকির নিজস্ব বাহিনী ছাড়া শেখ ইব্রাহিম কড়োরি, হিন্দু ধর মুস্কট এবং ওসমানী আফগানরা এসে লড়তে থাকলেও বিদ্রোহীরা সেই দিগ্বিজয়ী বীরদের উপর সমানে অস্ত্রবর্ষণ করে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। আমাদের দিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত সত্বেও তারা রণে ভঙ্গ না দিয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালাতে লাগল।

এইভাবে দিনের পর দিন মাসের পর মাস যুদ্ধ চালিয়েও যখন দুর্গ জয় সম্ভব হোল না তখন আবদুল বাকি এক দিন সকল অফিসারকে নিজ শিবিরে আহ্বান করে বললেন, তাঁরা সবাই যখন মুসলমান এবং সকল মুসলমান যখন পরস্পরের ভাই তখন নিজেদের মধ্যে কোনরূপ অনৈক্য রাখা উচিত নয়। সকলে সে কথা মেনে নেওয়ায় স্থির হোল যে শত্রুকে বিভ্রান্ত করবার জন্য কয়েকটি ক্ষুদ্র রেজিমেণ্ট সেখানে রেখে বাকি অফিসাররা নিজ নিজ রেজিমেণ্ট

নিয়ে বিভিন্ন দিক থেকে একযোগে দুর্গ আক্রমণ করবেন—কেউ কারও প্রতি ঈর্ষা দেখাবেন না। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাত এক প্রহর থাকতে হাজার হাজার বাদশাহী সৈন্য বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একযোগে দুর্গ আক্রমণ করল। কিন্তু সব বৃথা! বিদ্রোহীরা উপর থেকে অস্ত্র ও অগ্নি বর্ষণ করে তাদের শমন সদনে পাঠাতে লাগল। নূতন নূতন সৈন্য এনেও যুদ্ধের গতি ফেরান গেল না। আবদুল বাকির হস্তী শঙ্করের মাহুত শত্রুর গুলির আঘাতে নিহত হোলে সে আরোহীসহ রণাঙ্গন ছেড়ে পালিয়ে গেল। তা সত্ত্বেও যুদ্ধ চলতে লাগল। প্রতি দিন অসংখ্য বাদশাহী সৈন্য হতাহত হোল।

নূতন পর্য্যায়ের এই যুদ্ধ পাঁচ দিন ধরে চলবার পরও শত্রুকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব না হওয়ায় বাদশাহী ফৌজ হতাশ হয়ে পড়েছে এমন সময়ে গুপ্তচররা এসে খবর দিল যে দুর্গের পশ্চাদ্ভাগে এক সুড়ঙ্গ পথ রয়েছে, তাই দিয়ে প্রত্যহ বহু লোক রেশন ও সমরসম্ভার নিয়ে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সেই পথ বন্ধ করবার জন্য যুদ্ধ সেদিকে স্থানান্তরিত করে কোন ফল হোল না—দুর্গরক্ষীরা বাদশাহী ফৌজকে ছত্রভঙ্গ করে দিল। কিন্তু খাদ্য তো আসছে আশপাশের গ্রাম থেকে, ভাবলেন মীর্জা নাথান। সেক্ষেত্রে সেই গ্রামগুলিকে ঠাণ্ডা করলে সবই তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যে চিন্তা সেই কাজ—নিজ রেজিমেণ্টসহ তিনি গ্রামগুলির উপর হামলা সুরু করলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখছেন: এক দিনে শত্রুর দুই হাজার খাদ্য সরবরাহকারীকে আমরা শমন সদনে পাঠালাম। তার ফল হাতে হাতে ফলল; আতঙ্কগ্রস্ত গ্রামবাসীরা বাড়ীর বার হওয়া বন্ধ করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহীদের রসদ সরবরাহও বন্ধ হয়ে গেল।

খালি পেটে যুদ্ধ করা যায় না। তবু সনাতন হাল ছাড়লেন না, দুর্গের পশ্চাদ্ভাগ সুরক্ষিত করবার জন্য রাতারাতি সেখানে এক উপদুর্গ নির্মাণ করলেন। কিন্তু তাতে তাঁর চেয়ে মোগলের সুবিধা হোল বেশী। এই উপদুর্গ অধিকারের জন্য উভয় পক্ষে যে প্রবল যুদ্ধ সুরু হোল তাতে তাঁর সমস্ত আয়ুধ নিঃশেষ হয়ে গেল, অথচ নূতন করে আয়ুধ কোথাও থেকে এল না। বাদশাহী ফৌজ সে পথ পূর্বেই বন্ধ করে দিয়েছিল। মরিয়া হয়ে বিদ্রোহীরা দুর্গ প্রাকারের উপর উঠে জ্বলন্ত কাঠ ছুঁড়ে বহু লোককে হতাহত করল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়ে দুর্গ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল।

আসাম বিপর্য্যয়—প্রতিক্রিয়া

এইভাবে সাড়ে চার মাস লোমহর্ষক সংগ্রামের পর দমদমা দুর্গের পতন হোলে সনাতন হতাবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে এক গুপ্ত পথ ধরে চলে গেলেন জুটিয়ায়। গভীর অরণ্যের মধ্যে অবস্থিত সেখানকার পার্বত্য দুর্গে বসে যখন তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনা করছিলেন সেই সময়ে খবর এল, সৈয়দ আবা বাকরের নেতৃত্বে যে বাদশাহী ফৌজ আসাম জয়ের জন্য যাত্রা করেছিল তা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে—কেবল রাজা শত্রুজিৎ কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। এই নিদারুণ সংবাদে মোগল শিবিরে যেমন বিষাদের কালো মেঘ নেমে এল তেমনি বিদ্রোহীদের মনে নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হোল। মহানায়ক সনাতন সঙ্গে সঙ্গে জুটিয়া থেকে নেমে এসে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ স্থরু করলেন, দলে দলে নওজোয়ান এসে তাঁর পতাকাতলে সমবেত হোল। তাদের নিয়ে তিনি বড়নগর দুর্গ আক্রমণ করলে দুর্গাধ্যক্ষ মীর্জা ইউসুফ বার্লান বিভ্রান্ত হয়ে সাহায্যের জন্য ঢাকায় আকুল আবেদন পাঠালেন। সুবাদার কাসিম খাঁর নির্দেশে রাজা শত্রুজিৎ ও সৈয়দ ইসমাইল দুইটি শক্তিশালী রেজিমেণ্টসহ বড়নগরে চলে গেলেন। কিন্তু সনাতনের রক্ষী ও হস্তী বাহিনী তাদের ছিন্নভিন্ন করে দিল। পরে নূতনতর মোগল ফৌজ এসে পৌছালে তিনি স্থান ত্যাগ করেন।

পাণ্ডু যুদ্ধ

বিদ্রোহীদের আর একটি ঘাঁটি রানী ময়দান আক্রমণ করে মীর আবদুর রজাকের রেজিমেণ্ট বহু অসামরিক নরনারীকে বন্দী করে। সেই বন্দীদের নিয়ে বাদশাহী ফৌজ যখন এক পার্বত্য স্রোতস্বিনীর কাছে এসে পৌছাল তখন বিদ্রোহীরা কোথা থেকে বেরিয়ে এসে তীর বর্ষণ স্থরু করলে ইসলামের সৈন্যগণ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু কোথায় পালাবে? বিদ্রোহীরা তাদের পিছু ধাওয়া করে প্রায় সকলকে শমন সদনে পাঠাল নতুবা বন্দী করল। তাদের নায়ক মীর রজাককে এক ক্রীতদাস অচৈতন্য অবস্থায় কাঁধে তুলে নিয়ে পাণ্ডু দুর্গে পালিয়ে গেল।

এই সংবাদ মীর্জা নাথানের কাছে পৌছালে তিনি মীর রজাকের সাহায্যের জন্য পাণ্ডুতে চলে আসেন। তাঁর সম্মুখীন হবার জন্য বিদ্রোহীদের পক্ষে

হিজদা রাজা বাইশ হাজার সৈন্যসহ সেখানে এসে দুর্গ অবরোধ করেন। এই সৈন্যগণ তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে কামরূপ দরজা, কামাখ্যা দরজা ও কামাখ্যা পাহাড়ের উপর থেকে দুর্গের উপর আক্রমণ সুরু করে। তৃতীয় বাহিনীর অধিনায়ক ডিমুরিয়া রাজা দুর্গ প্রাকারে ভাঙন সৃষ্টি করে সসৈন্যে ভিতরে প্রবেশ করলেও নিজে আহত হয়ে রণে ভঙ্গ দেন। তার ফলে সমগ্র বিদ্রোহী বাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়—মোগল ফৌজ জয়ী হয়। মীর্জা নাথান বলেন, এই জয় সে যুগের এক শ্রেষ্ঠ জয়।

পাণ্ডু যুদ্ধের পর মীর্জা নাথান রানীহাটের পার্বত্য দুর্গ আক্রমণ করেন। রাজা পরীক্ষিতনারায়ণের দৌহিত্র নূতন ডিমুরিয়া রাজার উপর এই দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব আগে থেকে ন্যস্ত ছিল। সেই বালক তার পিতা ও মাতামহের মত বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলেও বাদশাহী ফৌজ শেষ পর্য্যন্ত দুর্গ অধিকার করে চারপাশের গ্রামবাসীদের উপর নির্মম উৎপীড়ন চালায়। তারা বহু পুরুষকে হত্যা ও তরুণীকে হরণ করে।

সুবাদার পদচ্যুত

আসামে মোগল বাহিনী নিশ্চিহ্ন হয়েছে শুনে বাদশাহ জাহাঙ্গীর বিশেষ বিচলিত হন। তাঁর ভরসা ছিল, হয় তো কামরূপ বিদ্রোহ দমন করে আসামে আবার সার্থক অভিযান চালান হবে। কিন্তু তাঁর নিজস্ব প্রতিনিধি মুকলিস খাঁর কাছ থেকে যে সব রিপোর্ট আসছিল তাতে সুবাদার কাসিম খাঁর উপর আস্থা রাখা তাঁর পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে। স্রোতের পর স্রোত সৈন্য পাঠিয়ে সারা কামরূপে আগুন জ্বালান হয়েছে, তবু বিদ্রোহীরা দমিত হওয়া দূরের কথা রক্তবীজের মত বেড়ে উঠছে। কি করছে সুবাদার কাসিম খাঁ? কি করছে সেনাপতি আবদুল বাকি?—শুধালেন জাহাঙ্গীর।

এর পর মুকলিস খাঁ যখন এক পত্রে জানালেন যে কাসিম খাঁ বাদশাহী তহবিল থেকে বহু অর্থ আত্মসাৎ করেছেন ও তাঁর উপর অসৌজন্য দেখিয়েছেন তখন জাহাঙ্গীর নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না, এক ফরমান পাঠিয়ে তাঁকে পদচ্যুত করলেন। কামরূপের সেনাপতি আবদুল বাকিকেও পদচ্যুত করলেন।

Ref. Mirza Nathan *Baharisthan-i-Ghayibi*, *p. 252–419*

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খলা

সুবাদার-দেওয়ান কলহ

কাসিম খাঁ ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ সুবাদার ইসলাম খাঁর প্রতিবিম্ব। সমান দাম্ভিক, সমান নির্মম, সমান স্বেচ্ছাচারী এই সুবাদার বাংলার দায়িত্ব গ্রহণ করে যে কেবল কুচবিহারাধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণ ও কামরূপরাজ পরীক্ষিতনারায়ণকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক বন্দী করেন তা নয় পুরাতন অফিসারদের সঙ্গে কলহ সুরু করেন। দেওয়ান মীর্জা হোসেন বেগ তাঁর চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ান। কার্য্যভার গ্রহণ করবার পর কাসিম খাঁ রাজধানীর জন্য যে নূতন কোতোয়াল নিযুক্ত করেন তিনি দেওয়ানের সঙ্গে এমনই তিক্ততার সৃষ্টি করেন যে তাঁদের কেলেঙ্কারির কথা নিয়ে সর্বত্র আলোচনা চলতে থাকে। সবাই জানল যে কোতোয়ালকে সামনে রেখে কলহ চালাচ্ছেন সুবাদার স্বয়ং। শেষ পর্য্যন্ত দেওয়ানের পুত্রগণ উত্যক্ত হয়ে এক দিন সুবাদারপক্ষীয় কয়েকজনকে হতাহত করেন। এতখানি অপমান বরদাস্ত করবার লোক কাসিম খাঁ ছিলেন না। দেওয়ান ও তাঁর পুত্রদের কারাগারে নিক্ষেপ করে তিনি তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেন। তাঁর এই কঠোর ব্যবহারের কথা দেওয়ানপক্ষীয়গণ জাহাঙ্গীরের কাছে পৌঁছে দিলে তিনি সমস্ত ব্যাপারের তদন্ত করবার জন্য একজন পদস্থ কর্মচারীকে ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে কিছু দিন পরে কাসিম খাঁকে আদেশ দেওয়া হয় যে তিনি যেন দেওয়ানের সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দিয়ে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। টাকাটা অবশ্য রাজকোষ থেকে দেওয়া হয়েছিল!

আরও নানা ব্যাপার থেকে কাসিম খাঁ যখন বুঝলেন যে তাঁর সাত খুন

মাপ তখন জ্যেষ্ঠাগ্রজ ইসলাম খাঁর সমস্ত সম্পত্তি গায়েব করে ও রাজ-কোষের কিছু অর্থ নিজের কোষাগারে সরিয়ে নিয়ে এসে বেশ ফুলে ফেঁপে ওঠেন। তাতে কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী কিছুটা চাঞ্চল্য প্রকাশ করায় তাদের অন্যত্র বদলি করা হয়। কিন্তু তাঁরা নিশ্চেষ্ট বসে থাকেন নি, গোপনে বাদশাহর কাছে সব খবর পৌছে দেন। তার ফলে জাহাঙ্গীর কাসিম খাঁ সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ইমতিহাম খাঁর উপর দায়িত্ব প্রদান করে। তাঁর প্রাথমিক রিপোর্টের ভিত্তিতে বহু অর্থ সেই সুবাদারের কাছ থেকে আদায় করা হয়।

রাঢ়ে বিদ্রোহ

রাজা মান সিংহ বাংলায় যে শান্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন দুই চিস্তি ভ্রাতা যেন আসেন তার উপর যবনিকা টানবার জন্য। জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাংলায় আসবার সময়ে ইসলাম খাঁ যে সামরিক পরিকল্পনা সঙ্গে এনেছিলেন তাকে কার্য্যকরী করবার জন্য রাজমহলে পৌছে তিনি শেখ কামালকে এক সৈন্য-বাহিনীসহ রাঢ়ের ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে নিজে ঢাকায় চলে যান। যে বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীরকে সুলতান দাউদ কররানি ও রাজা মান সিংহসহ সারা দেশ সম্মান করত তাঁকে উত্যক্ত করতেও ইসলাম খাঁর বাধে নি। তার পরই যখন তিনি বিনা কারণে মুসা খাঁ, প্রতাপাদিত্য ও রামচন্দ্র বসুকে নিধন করে জঘন্যতম অসম্মান তাঁদের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে দিলেন তখন রাজা বীর হাম্বীরও তাঁর ক্রূরতম শত্রু হয়ে দাঁড়ান। তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে মানভূমের সামস্ খাঁ, হিজলীর বাহাদুর খাঁ ও চন্দ্রকোনার বীর ভানু মোগলের আধিপত্য অস্বীকার করেন। এই চার ভূস্বামীর অধিকার মধ্যে বাদশাহ জাহাঙ্গীরের নামে খুৎবা পাঠ বন্ধ হয়। তাঁদের এই দুঃসাহসের প্রতিকার করবার সাধ্য ইসলাম খাঁর ছিল না। কারণ আরাকানী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তাঁর সমস্ত সামরিক বল পূর্বাঞ্চলে স্থানান্তরিত করতে হয়। যে শেখ কামালকে বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি রাঢ়ে পাঠিয়েছিলেন তাঁকেও পূর্ব রণাঙ্গনে অপসারণ করা অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। সেই থেকে ভূস্বামী চারজন নিরুপদ্রবে রাজত্ব করতে থাকেন, হিজলীর বাহাদুর খাঁ পর্তুগীজদের সাহায্যে নিজ সৈন্য বাহিনীকে আধুনিক রণবিদ্যায় সুশিক্ষিত করেন।

কাসিম খাঁ সুবাদার নিযুক্ত হয়ে এসে ভাবলেন যে জ্যেষ্ঠাগ্রজ ইসলাম খাঁ যেমন মুসা খাঁ, প্রতাপাদিত্য ও আফগানদের দমন করে বাদশাহর কাছে প্রশংসা পেয়েছিলেন তিনিও তেমনি এই সব জমিদারকে দমন করে বাহাদুরী নেবেন। বীর হাম্বীর ও সামস্ খাঁর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন শেখ কামালকে এবং বীর ভানু ও বাহাদুর খাঁর বিরুদ্ধে পাঠান বর্দ্ধমানের ফৌজদার ইফতিকার খাঁর পুত্র মীর্জা মাকিকে। উভয় সৈন্যাধ্যক্ষ বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে সেই ভূস্বামীদের আক্রমণ করলেও দেখা গেল যে সুবাদার তাঁদের যত দুর্বল মনে করেছিলেন তাঁরা তা নন। শেখ কামাল কোথাও সুবিধা করতে না পেরে নূতন নূতন সৈন্য চেয়ে পাঠালেন, কিন্তু তাঁর প্রতি কাসিম খাঁর ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকায় সে দাবী অগ্রাহ্য হোল। মীর্জা মাকিকে অবশ্য সাহায্য পাঠান হয়েছিল, কিন্তু তিনি কিছু কববার পূর্বে দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত ভেদ করে যে ঝড় এগিয়ে আসছিল তার সম্মুখীন হবার জন্য উভয় সৈন্যাধ্যক্ষকে সেখানে পাঠিয়ে দিতে হয়।

আরাকানী আক্রমণ

আলোচ্য সময়ের কিছু পূর্বে আবুল ফজল আলামি আইন-ই-আকবরীতে লিখেছিলেন যে চট্টগ্রাম বন্দরটি প্রকৃতপক্ষে আরাকান রাজ্যে অবস্থিত। ইসলাম খাঁ ভুলুয়া দ্বীপ আক্রমণ করে এই বিতণ্ডাকে ঘোরাল করে তোলেন। চট্টগ্রামের অদূরে অবস্থিত ওই দ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন আরাকানরাজের সামন্ত। মোগল ফৌজ দ্বীপটি আক্রমণ করলে আরাকানরাজ মিন্-খামং (১৬১২-২২) প্রতিশোধ নেবার জন্য মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিলেন, এখন পর্তুগীজদের হাত করে আবার নতুন পর্য্যায়ে আক্রমণ সুরু করেন। তাঁর সঙ্গে, পর্তুগীজদের মতে আশী হাজার, মীর্জা নাথানের মতে, তিন লক্ষ সৈনিক! এ ছাড়া পঞ্চাশখানি সমুদ্রগামী যুদ্ধ জাহাজ ও চার হাজার নৌ-সৈনিক।

রাজা মিন্-খামংএর সেই বিরাট বাহিনী দেখে ভুলুয়ার থানাদার আবদুল ওয়াহেদ ভয়ে পালিয়ে গেলে মগ ও ফিরিঙ্গীরা দ্বীপটি দখল করে মেঘনা নদী ধরে উত্তর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকলে ঢাকা পর্য্যন্ত আসা কিছু শক্ত হোত না, কিন্তু এক তুচ্ছ কারণে আরাকানরাজ কয়েকজন

পর্তুগীজ অফিসারকে বন্দী করায় পর্তুগীজ এ্যাডমিরল তাঁর অধীনস্থ আরাকানী অফিসারদের নিয়ে সমগ্র নৌবাহিনীসহ সন্দীপে চলে যান। ঠিক সেই সময়ে রাঢ়ে যুদ্ধ স্থগিত রেখে শেখ কামাল ও মীর্জা মাকি সসৈন্যে এসে নূতন রণাঙ্গনে উপস্থিত হওয়ায় মোগলের শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। আরাকানরাজ যখন দেখলেন যে পর্তুগীজদের দলত্যাগের ফলে তাঁর পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে তখন যুদ্ধ স্থগিত রেখে চট্টগ্রামে ফিরে যান (১৬১৪, ডিসেম্বর)। ঢাকায় এই সংবাদ পৌঁছালে নূতন সুবাদার কাসিম খাঁ বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে এক পত্রে জানান যে তাঁর পুত্র ফরিদের অপূর্ব বীরত্বের জন্য মগরা পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে!

এত আয়োজন এভাবে ব্যর্থ হওয়ায় রাজা মিন্-খামং নিজ শক্তিতে মোগলের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য পরবর্তী কয়েক মাস ধরে সৈন্যবল আরও বৃদ্ধি করেন। পাছে পশ্চিম থেকে কোন আক্রমণ এসে তাঁর পরিকল্পনা বানচাল করে দেয় সেই ভয়ে ব্রহ্মরাজ মহাধর্মের সঙ্গে তাঁর যে সীমান্ত দ্বন্দ্ব চলছিল তা আপোষে মিটিয়ে ফেলে এক দিন তিনি পর্তুগীজদের বাদ দিয়ে নিজের জল ও স্থল বাহিনীসহ ভুলুয়ার দিকে রওনা হন। এবার হাজার হাজার মোগল সৈন্য সেখানে তাঁবু ফেলে বসে রয়েছে। কিন্তু তাতেও থানাদার আবদুল ওয়াহেদের মনে এমন সাহস হোল না যে আক্রমণকারীদের সম্মুখীন হন। অধীনস্থ সকল সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে তিনি পলায়ন সুরু করেন। কিন্তু কপালে জয়টীকা থাকলে যুদ্ধ না করেও যুদ্ধ জেতা যায়। এক কৌতুকজনক প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের ফলে সেই বিরাট আরাকানী বাহিনী নিশ্চল হয়ে পড়ে, আবদুল ওয়াহেদ বিজয়ীর গৌরব লাভ করেন।

ভুলুয়া জয় করে মগগণ যখন মোগলদের তাড়া করে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন দেখে তাদের আঁকাবাঁকা পথের এক সংযোগস্থলে শুষ্ক এক জলাভূমি। পথ সংক্ষেপ করবার জন্য আরাকানরাজ তাঁর বিশালবাহিনীসহ সেই জলার উপর দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন, কিন্তু কিছু দূর যাবার পর তাঁর নিজস্ব হস্তীসহ সমস্ত হাতী ও ঘোড়ার পা পাঁকের মধ্যে আটকে যায়। শতাধিক হস্তী ও হাজার হাজার অশ্ব পাঁকে পড়ে ছটফট করতে থাকে। তারা এগোতে পারে না পেছোতেও পারে না, যতই পা তুলতে চেষ্টা করে ততই পাঁকের মধ্যে ডুবে যায়! পলায়নপর মোগল সৈন্যরা অদূরে রাস্তার উপর থেকে তাদের সেই করুণাব্যঞ্জক অবস্থা দেখে

হাসাহাসি করতে লাগল। তারপর অফিসারদের নির্দেশে কিছুটা পেছিয়ে এসে তারা প্রত্যাক্রমণ সুরু করলে আরাকানরাজ তাঁর মাহুতকে বহু ধমক দিলেন এগোবার জন্য ; কিন্তু সে বেচারা যত চেষ্টা করে হাতীর পা তত পাঁকে ডুবে যায়! অশ্বারোহীদেরও সেই দশা। রাস্তার উপর থেকে মোগলরা তাদের উপর ক্রমাগত গুলিবর্ষণ করছে, কিন্তু তারা প্রত্যুত্তরে কিছু করতে পারছে না ; অসহায়ভাবে আহত বা নিহত হয়ে ঘোড়ার পিঠ থেকে পাঁকে পড়ে যাচ্ছে। গুলির বদলে গুলি ছোড়াবার শক্তি তাদের লোপ পেয়েছে। যে সব সৈনিক এই পঙ্কক্ষেত্রে নামে নি তারা অবশ্য যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু রাজার হাতী যদি পাঁকে ডুবে আর্তনাদ করে তারা স্থির থাকবে কতক্ষণ? অনেকগুলি তীর ও গুলি এসে মিন্-থামংএর হাতীর হাওদায় আঘাত করলে তিনি নিরুপায় হয়ে আবতুল ওয়াহেদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠান। সেই সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে আরাকানরাজকে নিজের সমস্ত সৈন্যবাহিনী ও রণসম্ভার মোগলের হাতে সমর্পণ করে একবস্ত্রে চট্টগ্রামে ফিরে যেতে দেওয়া হয়।

এই যুদ্ধ জয়ের সংবাদ আগ্রায় পৌছালে বাদশাহ জাহাঙ্গীর আবতুল ওয়াহেদের মনসব বাড়িয়ে দেন ও সরহন্দ খাঁ উপাধি প্রদান করেন। তাতে উৎসাহিত হয়ে সরহন্দ খাঁ স্বপ্ন দেখতে থাকেন যে সমগ্র আরাকান জয় করে বাদশাহকে উপহার দিচ্ছেন, আর প্রতিদানে তাঁকে সুবাদার বা উজীরীতে নিযুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু সে স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। যে বিশাল আরাকানী বাহিনী সরহন্দ খাঁর হাতে পড়েছিল তাকে হজম করবার শক্তি তাঁর ছিল না। কয়েক দিনের মধ্যে তাঁকে কলা দেখিয়ে সমস্ত যুদ্ধবন্দী নিজ নিজ সাজসরঞ্জামসহ দেশের দিকে রওনা হোল, সরহন্দ খাঁ তাদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন!

মগ রাজার এই বেইমানির কথা ঢাকায় পৌছালে নূতন সুবাদার কাসিম খাঁ এক বিরাট ফৌজসহ নিজেই ভুলুয়ায় চলে যান। এবার সরহন্দ খাঁ নয়, অনুরক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ আবতুল নবির উপর চট্টগ্রাম জয়ের দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি ঢাকায় ফিরে আসেন (১৬১৬, ফেব্রুয়ারী)। আরাকানরাজও প্রস্তুত ছিলেন। কর্মকারীকে এক লক্ষ পদাতিক ও চার শ' হস্তীসহ চট্টগ্রামের ২০ মাইল উত্তরে কাটগড় নামক স্থানে পাঠিয়ে সেখানে একটি দুর্গ নির্মাণের আদেশ দেন। সে দুর্গ সম্পূর্ণ হোলে তিনি নিজে মূলবাহিনীসহ চট্টগ্রামে চলে আসবেন, এই ছিল

তাঁর পরিকল্পনা। সেজন্য তাঁর রাজধানী ম্রহংএ তিন লক্ষ পদাতিক, দশ হাজার অশ্বারোহী ও সহস্রাধিক রণহস্তী প্রস্তুত রাখা হয়েছে। মগ ও মোগলে মহাযুদ্ধের পটভূমিকা তৈরী হতে লাগল।

ভুলুয়া থেকে কাসিম খাঁ ঢাকায় ফিরে যাবার পর নূতন সেনাপতি আবদুল নবি গুপ্তচর মুখে খবর পেলেন যে কাটগড়ের সৈন্যরা নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র দূরে রেখে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত দুর্গ তৈরী করে এবং অফিসাররা তাঁবুতে বসে খানাপিনায় সময় কাটান। তাদের সর্বাধিনায়ক রাজা মিন্‌-খামং তাঁর বিশাল বাহিনীসহ ম্রহং থেকে রওনা হয়েছেন বটে কিন্তু পথঘাটের অবস্থা খারাপ বলে চট্টগ্রামে পৌছাতে বেশ কিছু দিন সময় লাগবে। এই সুযোগ—এ সুযোগ হেলায় হারালে পরে পস্তাতে হবে। শেখ কামাল ও আবদুল ওয়াহেদ স্বরহন্দ খাঁর উপর পশ্চাদ্ব্যূহ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে সেনাপতি আবদুল নবি মূল বাহিনীসহ কাঠগড়ে গিয়ে হাজির হোলেন। তাঁর অতর্কিত আক্রমণে মগরা বিহ্বল হয়ে পড়লেও অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ব্যূহ বিন্যাস করে শত্রুর উপর গোলা, গুলি ও তীর বর্ষণ করতে লাগল। সারা দিন ধরে তুমুল যুদ্ধ চলবার পর সন্ধ্যার সময়ে উভয় পক্ষের সৈন্যরা নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে গেল।

পর দিন প্রভাতে যুদ্ধ সুরু হোলে দেখা গেল যে মোগল সেনাপতির পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। তিনি চেয়েছিলেন অতর্কিত আক্রমণে মগদের পর্যুদস্ত করে তাদের নূতন দুর্গ অধিকার করতে; কিন্তু এখন তাঁর সৈন্যরাই তাদের হাতে ঘেরাও হয়ে পড়েছে। খাদ্যদ্রব্য বিশেষ কিছু সঙ্গে আনা হয় নি, আবার মগরা তাদের এমনভাবে ঘিরেছে যে আশেপাশের গ্রাম থেকে কিছু সংগ্রহ করা সম্ভবও নয়। এই অবস্থায় আত্মসমর্পণ ছাড়া অন্য পথ আবদুল নবী দেখতে পেলেন না। কিন্তু তার প্রয়োজন হোল না, সন্ধ্যার পর রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে তিনি সমস্ত ফৌজসহ ঢাকার দিকে রওনা হোলেন। তাঁর সকল ভারী কামান ও ও পাঁচ শত মণ বারুদ মগদের হস্তগত হোল।

প্রথম আসাম যুদ্ধ

এই সময়ে আসাম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী নরপতি সুখেন-ফা বা প্রতাপ সিংহ। ধর্মবিশ্বাসে শৈব হোলেও বৌদ্ধমতের প্রতি তাঁর

আন্তরিক নিষ্ঠা থাকায় জনসাধারণ তাঁকে বুদ্ধ সর্বনারায়ণ নামেও অভিহিত করত। আকবরের তিরোধানের এক বৎসর পরে ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করে তিনি দেখেন যে মোগল শক্তি যেভাবে এগিয়ে আসছে তাতে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকা উচিত হবে না। তাদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য তিনি নিজের সামরিক বল প্রভূতভাবে বাড়িয়ে তুলে রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর দুর্গশ্রেণী নির্মাণ করেন। এই সব ব্যবস্থার ফলে তাঁর শক্তি এতই বৃদ্ধি পায় যে আশপাশের সকল নরপতি স্বেচ্ছায় তাঁকে অধিরাজ বলে মেনে নেন এবং মোগল নিগৃহীত সকল ব্যক্তির আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায় আসাম।

অনুরূপ এক আশ্রয়প্রার্থী ছিলেন কামরূপরাজ পরীক্ষিতনারায়ণের কনিষ্ঠ সহোদর বলিনারায়ণ। কাসিম খাঁ তাঁর ভ্রাতাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক বন্দী করলে তিনি আসামে চলে গিয়ে রাজা প্রতাপ সিংহের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আসামরাজ সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে তাঁকে ধর্মনারায়ণ উপাধি দেন ও দড়ং জেলায় একটি জায়গীর প্রদান করেন। এই সংবাদ ঢাকায় কাসিম খাঁর কাছে পৌঁছালে তিনি বলিনারায়ণের বহিষ্কারের জন্য প্রতাপ সিংহের কাছে অনুরোধ পাঠান। কিন্তু সে অনুরোধ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা হয়।

কামরূপে তখন আগুন জলছে। কাসিম খাঁ রেজিমেন্টের পর রেজিমেন্ট সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করতে পারছেন না। ঠিক সেই সময়ে আসাম রাজধানীতে জনৈক মুসলমান গুপ্তচর বৃত্তির জন্য ধরা পড়ায় রাজা প্রতাপ সিংহের আদেশে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এমনি কত গুপ্তচরকে যে আসামে পাঠান হয়েছিল তা জানা যায় না, কিন্তু তার পরই সুবাদার কাসিম খাঁর আদেশে সৈয়দ আবু বাকর ও সৈয়দ হাকিমের নেতৃত্বে এক শক্তিশালী মোগল বাহিনী আসাম জয়ের জন্য যাত্রা করে। আরাকান থেকে পরাজিত হয়ে যে ফৌজ ঢাকায় ফিরে আসছিল তাকেও এই বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ভূষণার নূতন সামন্ত মুকুন্দরায়ের পুত্র শত্রুজিৎও তাদের সঙ্গে যান। এই যুদ্ধ ১৬১৫ খৃষ্টাব্দের জুন মাস থেকে সুরু হয়ে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত চলে। মোগল অভিযাত্রী বাহিনীর সম্মুখীন হবার জন্য রাজা প্রতাপ সিংহ তিন লক্ষ পদাতিক, সাত শত হস্তী ও কয়েক শত যুদ্ধজাহাজ নিয়োজিত করলেও গোড়ার দিকে তাঁর অফিসাররা সুবিধা করতে না পারায় তিনি সেনাপতিসহ

কয়েকজন অফিসারকে পদচ্যুত করেন। তারপর মোগল বাহিনী ব্রহ্মপুত্র ও ভারেলি নদীর সঙ্গমস্থলে শ্যামধারায় গিয়ে উপনীত হোলে তিনি হাতী বড়ুয়া, রাজখোয়া ও খাগাড়িয়া ফুকনের নেতৃত্বে আমরণ সংগ্রাম চালাবার জন্য সৈন্যদের প্রতি আদেশ পাঠান।

সেই যুদ্ধে অহমদের প্রচণ্ড আক্রমণে মোগল বাহিনী ছিন্নভিন্ন হয় ও তাদের সমস্ত রণসম্ভার ও হস্তীযূথ শত্রুহস্তে পড়ে। সেনাপতি সৈয়দ আবু বাকর এবং জামাল খাঁ মাস্কালি প্রমুখ সকল প্রতিষ্ঠাবান সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হন। মীর্জা নাথান বলেন, কেবলমাত্র এই একটি রণক্ষেত্রে ৫ হাজার মোগল সৈন্য নিহত ও ৯ হাজার সৈন্য অহমদের হাতে বন্দী হয়। রাজা শত্রজিতের পুত্রসহ বহু বন্দীকে রাজা প্রতাপ সিংহ নিজেদের চিরন্তন প্রথানুযায়ী দেবী কামাখ্যার সম্মুখে বলিদানের আদেশ দেন। বলির পর নিহত বন্দীদের মাথার খুলিগুলি পুঞ্জীভূত করে দেবী মন্দিরের সম্মুখে একটি মিনার নির্মিত হোলে আসামরাজ নিজ রাজধানীতে চলে যান। সেখানে মহা সমারোহে রিথ্‌খিবন উৎসব পালিত হয়।

কাসিম খাঁ গিয়েছিলেন আসাম জয় করতে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আসামরাজই তাঁর সৈন্যবাহিনী ধ্বংস করে কামরূপের অর্দ্ধাংশ মুক্ত করেন। বলিনারায়ণকে এই মুক্ত অঞ্চলের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়।

1 **Mirza Nathan** *Baharisthan-i-Ghayibi, Eng. tran. p. 163-75*
2 **Barua P. G.** *Assam Buranji, p. 123-32*
3 **Gait E. A.** *History of Assam, p. 110-16*

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

ইব্রাহিম খাঁ ফতে-জং

বাদশাহ বড় না বেগম বড় ?

বাংলার নূতন স্থবাদার ইব্রাহিম খাঁ পূর্বে ছিলেন বিহারের শাসনকর্তা। সেই সময়ে খোকরার রাজা বৈরিশালকে যুদ্ধে পরাজিত করে সেখানকার মূল্যবান হীরকের খনি অধিকার করায় জাহাঙ্গীর তাঁর মনসব বাড়িয়ে ফতে-জং উপাধি প্রদান করেন। অবশ্য এই কৃতিত্ব না দেখালেও মনসব বাড়ত, কারণ তিনি ছিলেন বাদশাহর শ্যালক—বেগম নূরজাহানের ভ্রাতা! ১৬১৭ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে কাসিম খাঁকে পদচ্যুত করে বাদশাহ তাঁকে বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত করলে তিনি এখানে এসে দেখেন, সেই স্থবাদার পদচ্যুত হোতে একেবারেই নারাজ। কাসিম খাঁর যুক্তি এই যে শুধু তাঁর সঙ্গে নয় সমগ্র চিস্তি পরিবারের সঙ্গে যখন বাদশাহর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তখন বাংলার স্থবাদারী থেকে তাঁকে হঠায় কে? দেওয়ান মুকলিশ খাঁর চক্রান্তে তাঁর দুষমনরা বাদশাহকে দিয়ে একটা ফরমানে দস্তখত করিয়েছে বটে, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে বাদশাহ সে সময়ে সরাব খেয়ে কিছুটা বেহুঁস হয়ে পড়েছিলেন! তাই সেই ফরমানের কোন মূল্য নেই। ইব্রাহিম খাঁকে তিনি মানবেন না, তাঁর সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য নিজস্ব সৈন্যবাহিনী নিয়ে যাত্রাপুরে শিবির স্থাপন করলেন।

কাসিম খাঁ যদিও বাদশাহর বাল্যবন্ধু ইব্রাহিম খাঁও বেগম নূরজাহানের সহোদর। বাদশাহর বন্ধু বড়, না বেগমের ভাই বড়? এই নিয়ে বিতর্কে সময় না কাটিয়ে কাসিম খাঁকে তাঁর হিতৈষীরা বললেন: বাড়াবাড়ি কোরো না খাঁ সাহেব, ভুলে যেও না ইব্রাহিম খাঁ যে সে লোক নন—স্বয়ং নূরজাহান বেগমের ভাই। বাদশাহ তো সমস্ত রিয়াসৎই তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। তাঁর ভাইয়ের

দিকে একটা গুলি ছুঁড়লে মোগল সাম্রাজ্যের কোথাও তোমার স্থান হবে না। তখন বাদশাহ ইচ্ছা করলেও তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না। হিতাকাঙ্খীদের এই কথায় নিরস্ত হয়ে কাসিম খাঁ রাজমহলের পথ ধরে আগ্রায় যাবার জন্য তৈরী হোতে লাগলেন।

দুই সুবাদারে যুদ্ধ

কাসিম খাঁকে বরখাস্ত করবার সঙ্গে সঙ্গে জাহাঙ্গীর কামরূপের সর্বাধিনায়ক আবদুল বাকিকেও পদচ্যুত করে হানসীর সর্দার কুলিজ খাঁর উপর ওই ফ্রন্টের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আবদুল বাকি নিজস্ব সৈন্যবাহিনীসহ কামরূপ থেকে ঢাকায় চলে এসে কাসিম খাঁর সঙ্গে যোগ দেন। তাঁকে পেয়ে কাসিমের বুকের বল বেড়ে যায়, তিনি আবার ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হন। ভগ্নিপতি জামাল খাঁর অধীনে নিজস্ব সকল হস্তী, তিন হাজার অশ্বারোহী ও পাঁচ হাজার বন্দুকীকে রাজমহলের দিকে পাঠিয়ে তিনি ইব্রাহিম খাঁর অগ্রগতি বন্ধের আয়োজন করেন। পুরাতন সুবাদাররা যে সব কামান সংগ্রহ করেছিলেন সেগুলি ও অনুগত ভূস্বামীদের নৌসৈন্য ব্যতীত বাদশাহী অস্ত্রাগারে রক্ষিত সমস্ত বারুদ ও সিসা তিনি হস্তগত করেন। কয়েকজন মনসবদারকেও সঙ্গে নেন।

এই বিপুল সামরিক বলসহ কাসিম খাঁ নদীপথে ঢাকা থেকে রওনা হয়ে ত্রিমোহানীতে পৌছে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ইব্রাহিম খাঁও সসৈন্যে সেখানে এসে নদীর অপর তীরে তাঁবু ফেলে কাসিমের কাছে বাদশাহী হস্তী, রণতরী ও অন্যান্য সমরসম্ভার চেয়ে পাঠান। সে দাবী কাসিম খাঁ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করায় ইব্রাহিম খাঁ তাঁর দুর্গের উপর আক্রমণ সুরু করবার জন্য আদেশ দেন।

কাসিম খাঁও প্রস্তুত। প্রাক্তন ও নবনিযুক্ত দুই সুবাদারের মধ্যে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের দুইটি ফৌজ পরস্পরের সঙ্গে ধ্বংস যজ্ঞে মেতে উঠল। কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলার পর কেউ কাউকে বশীভূত করতে পারল না; ইব্রাহিম খাঁ শেষ পর্য্যন্ত কাসিমের খাদ্য সরবরাহের সকল পথ বন্ধ করে দিলেন। তাতে দুশ্চিন্তার কারণ ঘটলেও কাসিম খাঁ কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে পথ শত্রু কবলমুক্ত করবার জন্য বীরবিক্রমে পাল্টা আক্রমণ সুরু করলেন। কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধা হোল না; রমজানের ঈদের দিন

ইব্রাহিমী ফৌজ কাসিমের দুর্গের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানতে সুরু করল। তাদের উপর আদেশ দেওয়া হয়েছিল যেভাবে হোক ওই দিন দুর্গ অধিকার করতেই হবে।

কাসিম খাঁর জহরব্রত!

একথা কাসিম খাঁর কানে পৌছালে তিনি ঘোষণা করেন যে খোদা না করুন দুষমন যদি শেষ পর্য্যন্ত দুর্গে প্রবেশ করে তাহোলে তিনি হিন্দু প্রথায় জহরব্রত পালন করবেন ; তাঁর মত বীর যোদ্ধার ক্ষে অনুরূপ ক্ষেত্রে জহরব্রতই প্রকৃষ্ট পন্থা। যে কথা সেই কাজ! অপরাহ্নের দিকে ইব্রাহিম খাঁর সৈন্যরা দুর্গের একটি প্রাকারে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করলে ভিতরে ভীষণ কলরবের সৃষ্টি হয়। শত্রু সেই ভাঙ্গনের ভিতর দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করছে দেখে কাসিম খাঁর এক ক্রীতদাস জাঙ্গী নিজ স্ত্রীর শিরচ্ছেদ করে ছিন্নমস্তক তাঁর সামনে এনে চেঁচিয়ে উঠল: নবাব সাহেব! আপনি দাঁড়িয়ে দেখছেন কি? আপনি কি চান যে মোগলরা এসে শেখজাদিদের ধর্মনাশ করুক? জহরব্রতের কথা আপনিই না তুলেছিলেন? অথচ তা পালন করলুম আমি!

জাঙ্গী তখন সুরাপানে কিছুটা বেহুঁস হোলেও তার কথার কাসিম খাঁর আত্মসম্বিৎ ফিরে এল। তুচ্ছ ক্রীতদাস হয়ে সে যা করতে পারে তিনি তা পারেন না? চিন্তা করবার সময় আর নেই, হারেমের মধ্যে প্রবেশ করে কাসিম খাঁ নিজের প্রধানা বেগমদের মস্তক একে একে তরবারীর আঘাতে ছিন্ন করে ভ্রাতা ও আত্মীয়দের প্রতি তাই করবার আদেশ দিলেন। মোগলরা যেন কোন শেখজাদির অঙ্গ স্পর্শ করবার সুযোগ না পায়। আদেশ পেয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাঁরা সবাই নিজ নিজ বেগমদের মস্তক দেহচ্যুত করে সেখানে নিয়ে এলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে অস্ত্রাঘাতে শতাধিক নিরীহ হতভাগিনীর জীবনাবসান ঘটান হোল।

এই কাসিম খাঁর জহরব্রত! জহারাগ্নির পবিত্রতা এর মধ্যে ছিল না, ছিল নারকীয় বীভৎসতা। কোন বেগমই মাতৃভূমির স্বাধীনতা বা নিজের ধর্ম রক্ষার জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্বর্গসুলভ সেই অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দেবার বাসনা প্রকাশ করেন নি, পদচ্যুত সুবাদারের নির্দেশে তাঁদের স্বামী বা ভ্রাতারা

চরম নৃশংসতার সঙ্গে তাঁদের শিরচ্ছেদ করেন। আর এই দানবীয় হত্যাযজ্ঞকে কাসিম খাঁ হিন্দুর মহাপবিত্র জহরব্রত জ্ঞানে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন।

যজ্ঞের হোতা কিন্তু নিজের গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত কাটেন নি। ইব্রাহিম খাঁর সৈন্যগণ দুর্গে প্রবেশ করলে তিনি এক গোপন পথ দিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গগণ-সহ সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আগ্রার দিকে রওনা হন। সেখানে পৌঁছে দেখেন, এ বাদশাহ সে বাদশাহ নন। বাদশাহী কারাগারে তাঁর জন্য একটি কক্ষ নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে, বাদশাহর নামে একটি আদেশও রয়েছে। তার বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করে কারাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হোল। সবাই বুঝল আদেশটি আসলে নূরজাহান বেগমের !

বিদ্রোহীদের কাছে নতি স্বীকার

কাসিম খাঁর নিষ্ক্রমণের পর ইব্রাহিম খাঁ ঢাকায় পৌঁছে দেখেন যে বাংলা এক প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আসাম ও আরাকানের সঙ্গে যে যুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে তার জের এখনও মেটে নি। ত্রিপুরা ও কাছাড়ের মতিগতি ভাল নয়। রাঢ়ের বীর হাম্বীর, বাহাদুর খাঁ প্রভৃতি ভূস্বামীগণ যথেষ্ট শক্তিমান। সবার চেয়ে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে কামরূপের গণবিদ্রোহ। সেখানে বাদশাহী ফৌজ কোন রাজার বিরুদ্ধে লড়ছে না, লড়াই চলছে সমগ্র জাতির সঙ্গে। সব কিছুর মূলে রয়েছে প্রাক্তন সুবাদার কাসিম খাঁর অদূরদর্শিতা। তিনি যদি কামরূপ ও কুচবিহারের অধীশ্বরদ্বয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা না করতেন তাহোলে সেখানকার জনসাধারণ এভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠত না। তিনি নির্ভর করেছিলেন সৈন্যবাহিনীর উপর, অথচ স্রোতের পর স্রোত সৈন্য পাঠিয়েও বিদ্রোহীদের দমন করতে পারেন নি। এখন আবার দক্ষিণাঞ্চল থেকে যে সব খবর আসছে তা আশাপ্রদ নয়। প্রতাপাদিত্যের নিধনের পর সেখানে যে গণবিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল এখন তা বিদ্রোহের আকারে প্রকাশ পাচ্ছে, পর্তুগীজরা এসে বিদ্রোহীদের শক্তি জোগাচ্ছে। সদ্যগঠিত সুবার সর্বত্র যদি এরূপ গণবিক্ষোভ চলতে থাকে তাহোলে সাম্রাজ্যের সংহতি স্থাপন কি করে সম্ভব হবে ? বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবে কে ?

সকল দিক বিবেচনা করে ইব্রাহিম খাঁ ফতে-জং জাহাঙ্গীরকে লিখলেন যে

বাংলার সমস্যা সামরিক নয়—রাজনৈতিক। সৈন্যবলে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করলে কোন দিনই তা সম্ভব হবে না, বরং বিদ্রোহীরা রক্তবীজের মত বেড়ে উঠে চারি দিকে আগুন জ্বালাবে। সেই অগ্নিতে ইন্ধন যোগাবে আসাম, ত্রিপুরা ও আরাকান। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সকল বিরোধী পক্ষের সঙ্গে একটা আপোষ মীমাংসা না করলে হয় তো শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত বাংলা আমাদের হস্তচ্যুত হবে।

শ্যালক-সুবাদারের এই অভিমত গ্রহণ করে জাহাঙ্গীর আগ্রায় অন্তরীণ কুচবিহারাধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণকে বিনা সর্তে মুক্তি দিয়ে নিজ রাজ্যে ফেরবার অনুমতি দিলেন। একজন উচ্চপদস্থ মোগল অফিসার তাঁর প্রতি রাজোচিত মর্য্যাদা দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে চললেন। কামরূপে তখনও বিদ্রোহ পূর্ণমাত্রায় চলছিল বলে সেখানে নিজের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য বাদশাহ রাজা পরীক্ষিতনারায়ণের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার আদায় করলেন যে তাঁকে নিজ সিংহাসনে পুনরাধিষ্ঠিত করা হবে বটে, কিন্তু তিনি প্রতিদানে বাদশাহকে সাত লক্ষ টাকা পেশকাশ পাঠাবেন। প্রতাপাদিত্যের যে দুই পুত্র উদয়াদিত্য ও সংগ্রামাদিত্য আগ্রার অন্তরীণ ছিলেন তাঁরা পিতৃরাজ্যে পুনরাধিষ্ঠিত না হোলেও উভয়কে সসম্মানে দেশে পাঠিয়ে একটি জায়গীর দেওয়া হোল।

হিজলী বিদ্রোহ

তিন বৎসর পূর্বে কাসিম খাঁ বিষ্ণুপুরের বীর হাম্বীর, মানভুমের সামস খাঁ, হিজলীর বাহাদুর খাঁ ও চন্দ্রকোনার বীর ভানুর বিরুদ্ধে শেখ কামাল ও মীর্জা মাকির অধীনে দুইটি সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। কিছু দিন পরে আরাকানী আক্রমণের সম্মুখীন হবার জন্য তাঁদের সেখান থেকে আরাকান সীমান্তে সরিয়ে আনলে সেই চারজন জমিদার শুধু যে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পান তা নয়, নূতন করে শক্তি সংগ্রহ করেন। এর উপর কামরূপ বিজয়ী মোকারম খাঁ তাঁর পিতৃব্য-সুবাদার কাসিম খাঁর প্রতি আক্রোশবশতঃ গোপনে হিজলীর বাহাদুর খাঁকে সাহায্য পাঠাচ্ছিলেন। পর্তুগীজরাও তাঁকে সাহায্য করছিল। এদের বলে বলিয়ান হয়ে বাহাদুর খাঁ নিজেই নিজেকে মসনদ-ই-আলা উপাধিতে ভূষিত করে অন্য তিনজন ভূস্বামীর সঙ্গে একযোগে মোগল শক্তিকে অস্বীকার করেন।

বেগম নূরজাহানের অপর এক আত্মীয় মহম্মদ বেগ অবকাশ তখন বর্দ্ধমানের ফৌজদার। উপরে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ থেকে সুরু করে মহম্মদ বেগের ন্যায় নূরজাহানের আরও কয়েকজন আত্মীয় নীচের স্তরে অবস্থান করে সে সময়ে সুবা বাংলা শাসন করছিলেন। মহম্মদ বেগের কাছে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ আদেশ পাঠালেন: যে ভাবে হোক হিজলী অধিকার করো। আদেশ তো তিনি দিলেন, কিন্তু বাহাদুর খাঁকে বশে আনা এত সহজ নয়। তাঁর নিজস্ব ফৌজ ছাড়া কিছু পর্তুগীজ সৈন্য ও মোকারম খাঁর দেওয়া এক হাজার অশ্বারোহী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাদের নিয়ে তিনি কিছু দিন ধরে মহম্মদ বেগের আক্রমণ প্রতিহত করেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তিন লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

চন্দ্রকোনার বীর ভানুকেও অনুরূপভাবে দমন করা হয়।

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে সার্থক অভিযান

ঠিক সেই সময়ে ইব্রাহিম খাঁর কাছে খবর এল যে ত্রিপুরাধীশ যশোমাণিক্য বৈষ্ণবমতে দীক্ষা নিয়ে অহিংসাব্রত গ্রহণ করেছেন। তাঁর পাকশালায় আমিষাহার প্রস্তুত নিষিদ্ধ; প্রজাদেরও জীবহত্যায় বিরত থাকবার জন্য তিনি প্রতিনিয়ত উপদেশ দিচ্ছেন। এরূপ সুযোগ তুর্কী, আফগান বা মোগল কোন মুসলমান শক্তি ইতিপূর্বে পায় নি। তারা যখনই ত্রিপুরার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে দুর্দ্ধর্ষ ত্রিপুরী বাহিনী তাদের পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে বাধ্য করেছে। বিভিন্ন ত্রিপুরাধীশের নির্দেশে অসংখ্য যুদ্ধবন্দীকে চতুর্দশ দেবতার সম্মুখে বলী দেওয়া হয়েছে। বৈষ্ণব মতে দীক্ষিত ত্রিপুরায় এখন আর সেরূপ কিছু ঘটবার সম্ভাবনা নেই বলে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ওই রাজ্য অধিকার করবার জন্য একটি অভিযাত্রী বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন।

বাদশাহী ফৌজ দুই অংশে বিভক্ত হয়ে প্রথম অংশ উত্তর-পশ্চিমে বালিয়া-চঙের পথ ধরে ত্রিপুরার অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করল, দ্বিতীয় অংশ মেহেরকুল হয়ে রাজধানী উদয়পুরের দিকে এগিয়ে চলল। তাদের সঙ্গে সমান্তরালে মোগল নৌবহর গোমতী নদীর উপর দিয়ে অগ্রসর হোতে লাগল। রাজা যশোমাণিক্য এত দিন স্বপ্নরাজ্যে বাস করছিলেন। মোগল ফৌজের আগমন সংবাদে সে স্বপ্ন

ভেঙে গেল, তিনি ব্যূহ বিন্যাসের আদেশ দিলেন। দীর্ঘ কাল ধরে সকল সক্ষম যুবকের পক্ষে সামরিক বৃত্তি বাধ্যতামূলক হওয়ায় ত্রিপুরার সৈন্য সংখ্যা কিছু কম ছিল না। কিন্তু রাজা যশোমাণিক্য অহিংসাব্রত গ্রহণ করবার পর থেকে তাদের সকল শৌর্য্য শুকিয়ে গেছে, অস্ত্রাগারে যে বিপুল পরিমাণ আয়ুধ সংরক্ষিত ছিল সেগুলিতে মরিচা পড়েছে। শত্রু রাজধানীর দিকে এগিয়ে আসছে শুনে তিনি জপের মালা সিন্দুকে তুলে রেখে যুদ্ধের আদেশ দিলেন; তাঁর সৈন্যবাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই সীমান্তের দিকে রওনা হোল। নৌবহরও এগিয়ে চলল। কিন্তু কোথাও তারা আক্রমণকারীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারল না, রাজধানী উদয়পুরসহ ত্রিপুরার সকল সমতল অঞ্চল মোগলের অধিকারে চলে গেল। যশোমাণিক্য আরাকানে পালাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু মোগল সৈন্য তাঁকে বন্দী করে আগ্রায় পাঠিয়ে দিল।

জাহাঙ্গীর ও যশোধর

বন্দী যশোমাণিক্যকে জাহাঙ্গীরের দরবারে নিয়ে আসা হোলে বাদশাহ দেখেন এক মুণ্ডিতমস্তক গৈরিক বেশধারী সন্ন্যাসী তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে মৃদু হাস্য করেন, কিন্তু আঙ্গুল চলতে থাকে জপমালার উপর। জাহাঙ্গীর তাঁকে বললেন: মহারাজ! যদি আপনি মোগলের বশ্যতা স্বীকার করে বৎসরে কয়েকটি হস্তী রাজস্ব হিসাবে দিতে সম্মত হন তাহোলে আপনার রাজ্য আপনাকে ফিরিয়ে দেবার কথা বিবেচনা করতে পারি। মুহূর্তের জন্য মালা জপা বন্ধ হয়ে গেল, যশোধর উত্তর দিলেন: শাহানশাহ বাদশাহ! আপনি হিন্দুস্থানের বাদশাহ, ত্রিপুরারও বাদশাহ হোন। সেখানকার প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলের দায়িত্ব নিজের মাথায় তুলে নিয়ে আমাকে মুক্তি দিন। আমি রাধামাধবের পাদপদ্মে জীবন উৎসর্গ করি।

রাজা যশোধরের কথায় একটি নারীর মুখ জাহাঙ্গীরের চক্ষের সম্মুখে ভেসে উঠল। তিনি ছিলেন তাঁর প্রথম জীবনের সহচরী যোধাবাঈ। মুসলমান বাদশাহজাদার সাথে বিবাহ হোলেও যোধাবাঈ নিজের ধর্ম ত্যাগ করেন নি, আরাধ্য দেবতার পূজা বন্ধ রাখেন নি। আগ্রা প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিজস্ব মহলে সেই দেবতাকে স্থাপন করে তিনি সকাল সন্ধ্যায় তাঁর পূজা করতেন। তখনও সেখানে মোতি

মসজিদ নির্মিত হয় নি, কিন্তু যোধাবাঈয়ের মন্দিরে সকাল সন্ধ্যায় বাজত কাঁসর ঘণ্টা, পুরোহিতরা পাঠ করতেন বেদমন্ত্র। শাহজাদা সেলিম তন্ময় হয়ে তাই শুনতেন বাদশাহ আকবরও শুনতেন। মুসলমান হয়েও দুজনের কেউ ভোলেন নি যে তাঁরা চেঙ্গিস খাঁর বংশধর—ভোলেন নি যে সেই বোধিসত্ত্বের রক্ত তাঁদের ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে। চেঙ্গিস চিত্তের প্রসারতা তাঁদের প্রতিনিয়ত অনুপ্রাণিত করত। তাই আকবর কোন দিনই পুত্রবধূকে ডেকে বলেন নিঃ মা তুমি মুসলমান হও—স্বামীর ধর্মে নিজেকে দীক্ষিত করো। বরং আগ্রা প্রাসাদে তাঁর জন্য সুরম্য দেবালয় নির্মাণ করিয়েছিলেন, তাঁর যমুনায় যাবার জন্য মর্মরে বাঁধা সুড়ঙ্গ পথ তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেই পথ ধরে পুত্রবধূ যখন পুষ্পচন্দন হস্তে যমুনায় যেতেন আকবর তখন মুগ্ধনেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন; তিনি যখন আরাধ্য দেবতার সম্মুখে আরতি করতেন তখন বাইরে দাঁড়িয়ে তাই দেখতেন।

নূরজাহান এখন জাহাঙ্গীরের হৃদয় অধিকার করে থাকলেও যোধাবাঈকে তিনি ভোলেন নি। রাজর্ষি যশোধর মাণিক্যকে দেখে তাঁর সেই স্বর্গীয় মহিষীর কথা নূতন করে মনে উঠল। উজিরকে ডেকে আদেশ দিলেনঃ এই সন্ন্যাসী যেখানে যেতে চান তাঁকে সেখানে সসম্মানে পৌঁছে দাও। তিনি হবেন মোগল সাম্রাজ্যের মুক্ত পথিক। কেউ যেন তাঁর পথে বাধার সৃষ্টি না করে, কেউ যেন তাঁর ধর্ম সাধনায় বিঘ্ন না ঘটায়। তিনি যেখানে যাবেন সবাই যেন তাঁকে রাজোচিত সম্মান দেখায়। উজির! ঘোষণা করো বাদশাহ জাহাঙ্গীরের এই আদেশ।

যশোধর আগ্রা থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন বৃন্দাবনে। তারপর বিভিন্ন বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন করে তিনি ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

আবার আরাকানী আক্রমণ

বৎসরাধিক পূর্বে প্রাক্তন সুবাদার কাসিম খাঁ চট্টগ্রাম আক্রমণ করতে গিয়ে কিভাবে মগদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন সে কথা পূর্বে বলেছি। ত্রিপুরা যুদ্ধের পর ইব্রাহিম খাঁর কাছে খবর এল যে আরাকান আবার চঞ্চল হয়ে উঠেছে, রাজা মিন-খামং সন্দ্বীপ অধিকার করে মেঘনা নদীর উত্তর তীরে লুঠপাঠ চালাতে

চালাতে বাকচরে এসে উপস্থিত হয়েছেন। মোগল ফৌজ কোথাও তাঁকে বাধা দিতে পারে নি। এখন তিনি বাখরগঞ্জ অধিকার করে ঢাকায় আসবার আয়োজন করছেন। এই বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য ইব্রাহিম খাঁ সকল অঞ্চল থেকে সৈন্যদের আহ্বান কবে শত্রুর দিকে ধাবিত হোলেন।

বিজয়ের আনন্দে উৎফুল্ল আরাকানী বাহিনী তখন দূরদূরান্তরে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যে রাজা মিন-খামংএর পক্ষে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে মোগলের সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব হয়ে উঠল। দুর্বিপাক এড়াবার জন্য তিনি যুদ্ধ পরিহার করে অতি সুসম্বদ্ধভাবে পশ্চাদপসরণ সুরু করলেন। ইব্রাহিম খাঁরও একই সমস্যা। যে সব বিচ্ছিন্ন ফৌজ নিয়ে তিনি মগদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন তারা এখনও ভাল করে সঙ্ঘবদ্ধ হোতে পারে নি। তাই শত্রু পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলেও তার অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল না; যুদ্ধ অসমাপ্ত রেখে ঢাকায় ফিরে এলেন। সেখানে কয়েক মাস ধরে প্রস্তুতির পর তিনি ১৬২১ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে সীমাবদ্ধ লক্ষ্য নিয়ে আরাকান আক্রমণ করেন। ওই দেশ তাঁর চাই না, কেবল সরকার চট্টগ্রাম পেলে সুখী হবেন। বন্দরটির ওপারে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সীমারেখা চিহ্নিত করে তিনি ঢাকায় ফিরে আসবেন। তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে মোগল ফৌজ সেই লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলল, কিন্তু সম্মুখ সমরে সাহস পেল না। সীমান্তরক্ষী আরাকানী ফৌজের যে হিসাব ইব্রাহিম খাঁ পেয়েছিলেন তাতে সম্মুখ যুদ্ধে সুবিধা হবে না বুঝে তাদের পাশ কাটিয়ে তিনি ত্রিপুরার পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হোতে লাগলেন। কিন্তু পথে হাজার হাজার সৈন্য খাদ্যাভাবে ও রোগে প্রাণ হারানয় তাঁর পক্ষে আর লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হোল না—ঢাকায় ফিরে আসতে হোল। এবারও কোন যুদ্ধ হোল না।

প'বর্তী অধ্যায়ে আক্রমণের সুযোগ গ্রহণ করেন র'জা মিন-খামং। বর্ষা নামবার সঙ্গে সঙ্গে এক শক্তিশালী বাহিনীসহ তিনি দক্ষিণ সাহাবাজপুরের পথ ধরে মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। ইব্রাহিম খাঁও বিরাট নৌবহরসহ সেদিকে এগিয়ে যান। কিন্তু এবারও যুদ্ধ হোল না। কারণ, আরাকানরাজ তাঁর অধিকাংশ সৈন্যসহ স্বরাজ্যের বাইরে চলে গিয়েছেন শুনে তাঁর চিরশত্রু ব্রহ্মরাজ দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্ত থেকে আরাকান আক্রমণ করেন।

সেই বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য মিন-খামং ত্রস্তব্যস্তে স্বরাজ্যে ফিরে যান।

মোগল ও মগে এই লুকোচুরি খেলা আরও কিছু কাল চলে।

উদার রাজনীতিক

এই সব বহিরাক্রমণ ও অন্তর্বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবার লোকের অভাব ছিল না। কিন্তু অস্ত্রবলে তাদের দমন করবার পরিবর্তে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ উদার ব্যবহার দ্বারা জনগণের হৃদয় জয় করেন। গোড়া থেকেই তিনি রাজনীতিকে সামরিক বলের ঊর্দ্ধে স্থান দিয়েছিলেন। কুচবিহারাধিপতি লক্ষ্মীনারায়ণ প্রমুখ যে সব নরপতি ও ভূস্বামীকে পূর্বতন দুই সুবাদার বন্দী করে আগ্রায় পাঠিয়েছিলেন তাঁর সুপারিশে জাহাঙ্গীর তাঁদের মুক্তি দেন। মুসা খাঁ প্রমুখ যে সব আফগান সর্দার ঢাকায় নজরবন্দী হয়ে বাস করছিলেন তাঁদের মুক্তি দেন তিনি নিজে। তাঁর এই সব উদারতার ফলে সকল রাজা ও ভূস্বামী স্বেচ্ছায় মোগলের প্রাধান্য মেনে নেয়, বহু দিন পরে বাংলায় শান্তির হাওয়া বইতে থাকে। কিন্তু জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহাজাহান এসে আবার তাকে আবিলতাময় করে তোলেন।

1 Mirza Nathan *Baharisthan-i-Ghayibi, Eng. tr., p. 419-26*
২ বানেশ্বর ও শুক্রেশ্বর, রাজমালা
3 Hall D. G. E. *A History of South-east Asia, p. 370-73*

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

বিদ্রোহী শাহজাহান

জাহাঙ্গীরের উচ্ছৃঙ্খল জীবন

পীর সেলিম চিস্তির বরে পুত্র সন্তান লাভ হওয়ায় আকবর তার নাম রেখেছিলেন সেলিম। কিন্তু সেই আদরের পুত্র তাঁকে শেষ জীবনে কম অশান্তি দেয় নি। মদ্যপায়ী ও আফিংখোর বাদশাজাদা করতে পারতেন না এমন কোন হীন কাজ ছিল না। আবুল ফজলের ন্যায় মনীষীকে তিনি হত্যা করেন এবং অতি তুচ্ছ কারণে এক নিরীহ ব্যক্তির জিহ্বা ও এক অসহায়া রমণীর স্তনদ্বয় কেটে নেন। নিজের জীবন চরিতে তিনি প্রথমা মহিষী যোধাবাঈয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, অথচ সেই মহীয়সী নারী বিষপানে আত্মহত্যা না করা পর্য্যন্ত সর্বপ্রকারে তাঁর মনে অশান্তি সৃষ্টি করেন। আকবরের মৃত্যুর পর তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে মসনদে আরোহণ করবেন জেনেও স্নেহময় পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে তাঁর বাধে নি। সেই বৃদ্ধের মৃত্যু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোল না, এক বিদ্রোহ দমনের জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যে গিয়েছেন শুনে সসৈন্যে আজমীর থেকে রওনা হয়ে আগ্রা অধিকার করতে যান। সেবার তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করতে না পারলে আকবরকে হয় তো পুত্রের হাতে বন্দী হয়ে আগ্রা দুর্গে বাকি জীবন কাটাতে নতুবা শূলবিদ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করতে হোত।

সেলিমের এই সব উচ্ছৃঙ্খলতায় উত্যক্ত হয়ে আকবর তাঁকে পাশ কাটিয়ে পৌত্র খসরুকে মসনদ প্রদানের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে পুত্র এসে মার্জনা ভিক্ষা করায় তাঁর পিতৃহৃদয় গলে যায়। তারপর তিনি জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করলেও বুঝতে বাকি থাকে না যে

স্নেহময় পিতাকে তিনি যে অস্ত্রে আঘাত করেছিলেন সেই অস্ত্রই খসরুর হাত দিয়ে বুমেরাং হয়ে তাঁকে বিদ্ধ করবে। বিশেষ করে স্বয়ং মান সিংহসহ কয়েকজন বিশিষ্ট ওমরাহ যখন খসরুর সমর্থক। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস তাঁর হয় নি, কিন্তু পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করে তিনি সিংহাসন নিষ্কণ্টক করেন। হয় তো সেই অন্ধকার কন্দরে হতভাগ্যের জীবনাবসান হোত, কিন্তু ছয় মাস পরে তিনি সুকৌশলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন।

স্চ চালনীকে ডেকে বলে, তার জঠর ছিদ্রে ভরা! জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন; খসরু বরাবরই এরূপ পিতৃদ্রোহী। আমি যখন শাহজাদা ছিলাম সেই সময়ে তার জননী যোধাবাঈ পুত্রের দুর্বিনীত ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। সেই মহীয়সীর গুণের কথা আমি কিভাবে বর্ণনা করব! তাঁর মত বুদ্ধিমতী নারী কোথাও দেখা যায় না। আমার প্রতি তাঁর অনুরাগ এতই গভীর ছিল যে আমার একগাছি কেশের জন্য তিনি হাজার হাজার পুত্রকে বলি দিতে পারতেন। তিনি প্রায়ই খসরুকে পত্র লিখে আমার গভীর স্নেহের কথা স্মরণ করাতেন। কিন্তু সবই বৃথা! যখন তিনি বুঝলেন যে পুত্র একেবারে জাহান্নমে যাচ্ছে তখন তাঁর রাজপুত গর্ব আহত হয়, আমি একবার শিকারে গেলে আমার সেই শাহ্‌বেগম অত্যধিক আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুতে আমি এতই মর্মাহত হই যে আমার আর বেঁচে থাকবার অভিলাষ পর্য্যন্ত লোপ পায়। আমার জীবনের সকল আনন্দ চিরতরে মুছে যায়।

শুধু সন্দেহের বশে জাহাঙ্গীর পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেও বাইরে তাঁর সমর্থকের অভাব ছিল না। তাদের সাহায্যে পিতৃ কারাগার থেকে পালিয়ে এসে তিনি মোগল সাম্রাজ্য কাঁপিয়ে তোলেন। তাঁর বিরাট বাহিনীকে সৈন্যাধ্যক্ষদের দ্বারা পর্য্যুদস্ত করা সম্ভব হবে না বুঝে জাহাঙ্গীর নিজে সসৈন্যে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকেন। শেষ পর্য্যন্ত যখন তাঁকে পরাজিত করে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় পিতার সম্মুখে আনা হয় তিনি বিদ্রোহী পুত্রের প্রাণদণ্ড না দিলেও তাঁর পাঁচজন সঙ্গীকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। এছাড়া তাঁর চক্ষের সম্মুখে তাঁর সাত শত অনুচরকে শূলবিদ্ধ করে বধ করা হয়।

শাহজাহানের পিতৃপদে পদক্ষেপ

খসরুর অকালমৃত্যু হওয়ায় সকলেই জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র খুররমকে মোগল সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী বলে ধরে নিয়েছিল। অপর এক হিন্দু মহিষীর গর্ভজাত এই পুত্রের প্রতি বাদশাহর স্নেহ ছিল যথেষ্ট। মেবার যুদ্ধে বীরত্ব দেখানয় তিনি তাঁকে শাহজাহান উপাধি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাধ সাধলেন বেগম নূরজাহান। বাদশাহর কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ার ছিলেন তাঁর বিশেষ অনুগ্রহভাজন, তাঁর সঙ্গে পূর্ব স্বামী শের আফগানের ঔরসজাত কন্যার বিবাহ দিয়ে তাঁকে সাম্রাজ্যের ভাবী অধীশ্বর মনোনীত করে রেখেছিলেন। একথা দাক্ষিণাত্যে শাহজাহানের কানে পৌছালে তিনি পিতৃ পদাঙ্ক অনুসরণ করে সসৈন্যে আগ্রার দিকে রওনা হন। তাঁর সুবিধাও ছিল যথেষ্ট। পারস্যরাজ শাহ্ আব্বাস তখন ইরাকী ও খোরাসানী সৈন্য নিয়ে মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করায় জাহাঙ্গীরের দৃষ্টি সেদিকে নিবদ্ধ ছিল। তাই শাহজহান প্রায় বিনা বাধায় রাজধানীর কাছাকাছি চলে আসেন। এ সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর লিখছেন: আসফ খাঁ আমাকে এক পত্রে জানালেন যে এই অকৃতজ্ঞ পুত্র সভ্যতার মুখোস খুলে ফেলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে।......এ খবর পেয়ে আমি সুলতানপুরে নদী পার হয়ে সেই সিয়া-বক্তকে শাস্তি দেবার জন্য অগ্রসর হোলাম। আদেশ জারী করলাম, এখন থেকে সে আর শাহজাদা নয়—তাকে বলা হবে বে-দৌলত।

'ইতিবর খাঁর কাছ থেকে খবর এল যে আমি রাজধানী রক্ষার ব্যবস্থা করবার পূর্বে শাহজাহান সেখানে এসে পৌছাবার জন্য তীর বেগে এগিয়ে আসছিল; কিন্তু ফতেপুরে পৌছে যখন দেখল যে তার দিবাস্বপ্ন ভেঙে গেছে তখন থমকে দাঁড়াল। দক্ষিণ ও গুজরাটের বহু আমীর তার সঙ্গে আসছিল।...... আমার বৃদ্ধ শিক্ষকও আসছিলেন।......আমি আগ্রার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। শিরহিন্দ পার হয়ে যখন দিল্লীতে পৌছালাম তখন এত সৈন্য সেখানে এসে আমার চারপাশে জমা হোল যে যেদিকে চাই সেদিকে শুধু সৈন্য আর সৈন্য।

'এই যুদ্ধে আমি মহবত খাঁকে সেনাপতি ও আবদুল্লা খাঁকে সশস্ত্র বাহিনীর অধ্যক্ষ নিযুক্ত করলাম। তাঁর কাজ হবে মূল বাহিনীর এক ক্রোশ আগে চলে

শত্রু শিবিরের সংবাদ সংগ্রহ ও পথ পরিষ্কার রাখা। নিয়োগের সময়ে আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে এই লোকটি বিদ্রোহী শাহজাদার এক পূর্বতন অনুচর।

'যুদ্ধ চলতে লাগল। আমার অভিষেকের অষ্টাদশ বার্ষিকী দিবসে, ১৬২৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে, খবর এল যে বিদ্রোহী পুত্র মথুরার কাছাকাছি এসে তাঁবু ফেলেছে। সুন্দর রায় তার দক্ষিণ হস্ত। আমার শিক্ষক খান-খানানের পুত্র দরাব নামেই বিদ্রোহীদের প্রধান সেনাপতি, আসল নায়ক এই সুন্দর রায়।······আমি আসফ খাঁর অধীনে পঁচিশ হাজার অশ্বারোহীকে তাদের বিরুদ্ধে পাঠালাম। আল্লাহ্ আমার সহায়, তাই বন্দুকের গুলিতে সুন্দর রায় ধরাশায়ী হোলে বিদ্রোহীরা যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল।······বিজয়লক্ষ্মী আমাদের পক্ষে এলেন।

'বিদ্রোহীদের দমন করবার জন্য আমার তৃতীয় পুত্র পারভেজকে সেনাপতি ও মহবৎ খাঁকে তার সহকারী নিযুক্ত করলাম। খান-ই-আলম, মহারাজা গজসিংহ, ফাজিল খাঁ, রাজা গিরধর, রাজা রামদাস প্রভৃতি প্রধান যোদ্ধারা তার সঙ্গে থাকবে। চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী ও সেই অনুপাতে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে পারভেজের সৈন্যবাহিনী গঠিত হোল। সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হোলে আমি আজমীরে গিয়ে আনা সাগর হ্রদের তীরে তাঁবু ফেললাম।

'বাদশাহী ফৌজ যখন চান্দার পাহাড় পার হয়ে মালবে প্রবেশ করেছে শাহজাহান তখন মাণ্ডু দুর্গ থেকে কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, ছয় শ' হস্তী ও বহু কামানসহ বেরিয়ে এসে তাদের আক্রমণ করল।······মহবতের কৌশলে তার বহু অনুচর এসে আমাদের পক্ষে যোগ দিল।······বিদ্রোহী তখন সেখান থেকে সরে গিয়ে নর্মদা নদীর তীরে কালিয়া গ্রামে শিবির সন্নিবেশিত করল।······ এখানেও রুস্তম প্রমুখ তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর তাকে ত্যাগ করে আমাদের পক্ষে চলে এলে আমি তাদের বাদশাহী দরবারে পাঠাবার জন্য আদেশ পাঠালাম। রুস্তমকে তার প্রভুভক্তির জন্য পাঁচ হাজারী মনসবদার ও মহম্মদ মুরাদকে এক হাজারী মনসবদার নিয়োগ করলাম; সেই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিলাম যে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।······তারপর খান-ই-খানানও এসে আমাদের পক্ষে যোগ দেওয়ায় বিদ্রোহী বুরহানপুরে চলে গেল।······সেখানে পারভেজ ও মহবৎ খাঁ তার পশ্চাদ্ধাবন করায় সে আমার অধিকারের বাইরে কুৎবুলমুলকের

রাজ্যে গিয়ে বিশ্রাম নিল।......সে মসলিপত্তমে পৌঁছালে কুৎবুলমুলক তাকে প্রচুর অর্থ ও খাদ্য দিয়ে সসম্মানে নিজ রাজ্যের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন।

'দেখতে দেখতে আর একটা বৎসর কেটে গেল। আমার ঊনবিংশতিতম অভিষেক দিবসে, ১৬২৪ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ, খবর এল যে বিদ্রোহী ফৌজ উড়িষ্যায় গিয়ে উপনীত হয়েছে। আমি পারভেজ ও মহবৎ খাঁকে সতর্ক করে ফরমান পাঠালাম, তারা যেন উড়িষ্যা ও সেই সঙ্গে এলাহাবাদ ও বিহারের নিরাপত্তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এই আদেশ পেয়ে পারভেজ বাদশাহী ফৌজ নিয়ে লালবাগের দিকে রওনা হোল, কিন্তু মহবৎ খাঁ বুরহানপুরে থেকে গেল।

'আমেদ বেগ খাঁর কাছ থেকে খবর এল যে গোলকুণ্ডার অধিপতি কুৎবুল-মূলকের সাহায্যে বিদ্রোহী উড়িষ্যায় প্রবেশ করেছে।......বর্দ্ধমানের ফৌজদার যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে।......বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ ভয় পেয়ে রাজমহলে আশ্রয় নিয়েছে।'

বাংলায় শাহজাহান

শাহজাহান যখন উড়িষ্যা পার হয়ে বাংলায় প্রবেশ করেন মীর্জা নাথান তখন এখানে উপস্থিত। তাই জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী ছেড়ে তাঁর বাহারিস্তান-ই-গৈবির পৃষ্ঠায় দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখি যে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ বাদশাহর কাছ থেকে এই মর্মে এক ফরমান পেয়েছেন যে শাহজাদা পারভেজ বাদশাহী দরবার থেকে রওনা হওয়ায় শাহজাহান বুরহানপুর ত্যাগ করে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন; তিনি এখন কোথায় সঠিকভাবে বলা না গেলেও উড়িষ্যা ও সেখানকার নূতন সুবাদার আহমেদ বেগ সম্বন্ধে যেন কিছু অবহেলা করা না হয়। সেখানকার কাজকর্ম এমনভাবে বন্দোবস্ত করতে হবে যাতে শাহজাহানের কোপানলে পড়ে বাদশাহী সম্পত্তির কোন ক্ষতি না হয়। সেই অনুসারে ইব্রাহিম খাঁ প্রতিনিয়ত আহমেদ বেগের কাছে উপদেশ পাঠাতেন এবং নিজে সমস্ত ঘটনাবলী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতেন। কিন্তু পিতা পুত্রের এই যুদ্ধ এমনই মর্মান্তিক যে না তিনি না আহমেদ আলী বেগ কেউ কোন সুনির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারছিলেন না। উভয়েই এই ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকলেন।

শেষ পর্য্যন্ত এক দিন শাহ্‌জাহান মসলিপত্তম থেকে গণ্টূরে এসে উপস্থিত হোলেন। এখানকার গিরিপথ এমনই দুর্গম যে মাত্র পাঁচ শ গোলন্দাজ তিন চার লক্ষ সুসজ্জিত সৈন্যকে অনায়াসে প্রতিরোধ করতে পারত। কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় আহমেদ আলী বেগ কোন কিছু না করায় শাহ্‌জাহান অক্লেশে উড়িষ্যায় প্রবেশ করলেন। *

তিনি যেখানেই থামলেন সেখানে যেন এক বিধ্বংসী ঝঞ্ঝা বহে গেল; ধ্বংস ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকল না। তাঁর ফৌজ খুরদায় এসে পৌঁছালে বৃদ্ধ রাজা পুরুষোত্তমদেব তাঁকে যথোচিত সম্মান দেখালেন। পর্তুগালের রাজার আত্মীয় ক্যাপ্টেন চান্‌কা, অর্থাৎ হুগলী পিপলী ও অন্যান্য স্থানের ফিরিঙ্গী সর্দার, তাঁর সঙ্গে দেখা করে কয়েকটি জলহস্তী ও এক লক্ষ টাকা পেশকাস দিয়ে গেলেন। তারপর তিনি বিনা বাধায় মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান হয়ে রাজমহলে গিয়ে পৌঁছালে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। তখন যুদ্ধ ব্যতীত অন্য কোন পথ খোলা থাকল না। গঙ্গাতীরে উভয় পক্ষে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় তাতে ইব্রাহিম খাঁ ফতে-জং নিহত হোলেন।

রাজা ভীমের উপর রাজমহলের ভার অর্পণ করে শাহ্‌জাহান ঢাকায় গিয়ে বিজিত বাংলার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁর এক বিশ্বস্ত অনুচর দরাব খাঁকে এই সুবার সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। রাজকোষে রক্ষিত চল্লিশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ও প্রভূত পরিমাণ সমরোপকরণ তাঁর হস্তগত হওয়ায় সামরিক বল যথেষ্ট বেড়ে যায়। এই বিপুল অর্থ দিয়ে তিনি নূতন নূতন সৈন্য সংগ্রহ করে পিতার সঙ্গে দ্বিগুণ বিক্রমে যুদ্ধ করবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন।

শাহ্‌জাহানের সাফল্যের সংবাদ আরাকানে পৌঁছালে সেখানকার রাজপুত্র ত্রিধারা ঢাকায় এসে তাঁকে এক লক্ষ টাকা পেশকাস দিয়ে জানালেন যে বাদশাহ জাহাঙ্গীর যখন উভয়েরই দুষমন তখন শাহ্‌জাহান ও আরাকানরাজ অবশ্যই পরস্পরের মিত্র। শাহ্‌জাহানের কাছ থেকে আহ্বান পেলে মগরাজা দশ লক্ষ সৈন্য, দশ হাজার রণপোত এবং কয়েক হাজার রণহস্তীসহ গিয়ে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ

*জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মজীবনীতে বলেন যে এই গিরিবর্ত্মে গোলকুণ্ডার দিকে বৃহৎ কামান সজ্জিত যে সুদৃঢ় দুর্গ ছিল কুৎবুলমুলকের সম্মতি ব্যতীত কারও পক্ষে সেটি উত্তীর্ণ হয়ে উড়িষ্যায় প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। তাঁর সক্রিয় সাহায্যের ফলেই শাহজাহান অক্লেশে উড়িষ্যায় চলে আসেন।

করবেন। এই উদার প্রতিশ্রুতির কথা শাহজাহান মন দিয়ে শুনলেন, কিন্তু খাল কেটে ঘরের মধ্যে কুমীর আনতে চাইলেন না। রাজকুমার ত্রিধারাকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানিয়ে তিনি বললেন যে আপাততঃ কোন সাহায্যের প্রয়োজন হবে না—ভবিষ্যতে হোলে তা চাইতে দ্বিধা করবেন না।

জাহাঙ্গীর শাসনের পুনঃপ্রবর্তন

এইভাবে উড়িষ্যা ও বাংলা অধিকার করে শাহজাহান পশ্চিম দিকে চলে গেলে বিহার প্রায় বিনা যুদ্ধে তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। সেখান থেকে আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে এলাহাবাদে পৌঁছে তিনি দেখেন যে পারভেজ ও মহবৎ খাঁর সৈন্যরা এসে তাঁর গতিপথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। এ সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর বলেন ঃ এখানে গঙ্গার দুই তীরে দুই সৈন্যবাহিনী পরস্পরকে আক্রমণ করবার জন্য যখন তৈরী হচ্ছে তখন শাহজাহান পক্ষীয় রাজা ভীম ও আবদুল্লা খাঁ তাঁকে পরামর্শ দেন যে তিনি যেন জৌনপুরের দিকে গিয়ে বারাণসী অধিকার করেন। সে পরামর্শ গ্রহণ করে শাহজাহান তাঁর পরিবারবর্গকে রোহটাস দুর্গে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে বারাণসীর দিকে অগ্রসর হোলেন। তিনি ওই নগরী অধিকার করেছেন শুনে পারভেজ ও মহবৎ খাঁ সেদিকে চলে যান এবং কয়েক দিন পরে উভয় পক্ষে যে ঘোরতর যুদ্ধ হয় তাতে শাহজাহানের একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হন এবং আর একজন বাদশাহী পক্ষে যোগ দেন।

সেই সময়ে দক্ষিণ থেকে জাহাঙ্গীরের কাছে খবর এল যে শাহজাহান পক্ষীয় ইয়াকুব খাঁ হাবসী দশ হাজার অশ্বারোহীসহ বুরহানপুরের দশ ক্রোশ দূরে গিয়ে পৌঁছেছে। সেখানেও উভয় পক্ষে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। কিছু দিন পরে শাহজাহান সেখানে গেলে স্থানীয় ফৌজদার তাঁকে সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইয়াকুব খাঁ হাবসীর কাছে বুরহানপুর লুণ্ঠনের জন্য আরও সৈন্য পাঠান। কিন্তু রাজা সরবুলন্দরায়ের বীরত্বের জন্য বার বার ওই নগরী আক্রমণ করেও শাহজাহান ব্যর্থকাম হন, নগরী রক্ষা পায়। এজন্য জাহাঙ্গীর সরবুলন্দরায়কে রামরাজা উপাধি দেন ও পাঁচ হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করেন।

পারভেজ ও মহবৎ খাঁ বাদশাহী ফৌজ নিয়ে বুরহানপুরে চলে গেলে শাহজাহান দেখেন যে তাঁর পক্ষে যুদ্ধ চালান আর সম্ভব নয়। তাই সন্ধির

প্রস্তাব করে পিতার কাছে এক মার্জনালিপি পাঠান। প্রত্যুত্তরে জাহাঙ্গীর তাঁকে স্বহস্ত লিখিত এক পত্রে জানান যে তিনি যদি, (১) তাঁর দুই পুত্র দারা স্বকো ও ঔরঙ্গজেবকে প্রতিভূস্বরূপ বাদশাহী দরবারে রাখেন ; (২) অধিকৃত সকল অঞ্চল বাদশাহকে প্রত্যর্পণ করেন এবং (৩) রোহটাস ও আসিরগড় দুর্গ থেকে নিজ সৈন্যদের সরিয়ে নেন তাহোলে তাঁর অপরাধ মার্জনা করে বালাঘাট অঞ্চলটি তাঁকে প্রদান করা যেতে পারে। এই সর্ত মেনে নিয়ে শাহজাহান পুত্রদ্বয়সহ বহু হস্তী, অস্ত্র ও দশ লক্ষ টাকা পেশকাস পিতার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং রোহটাস ও আসিরগড়ের দুর্গাধ্যক্ষদের কাছে আদেশ পাঠান তাঁরা যেন নিজ নিজ দুর্গ বাদশাহী অফিসারদের হাতে সমর্পণ করেন।

এইভাবে চার বৎসর ধরে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলবার পর ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে পিতা-পুত্রের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলায় শাহজাহানের স্ববাদার দরাব খাঁ জাহাঙ্গীর নিযুক্ত ফিদাই খাঁর কাছে কার্য্যভার বুঝিয়ে দেন।

1 *Memoirs of Jahangir*, *Susil Gupta ed.*, *p.* 42-79
2 Mirza Nathan *Baharisthan-i-Ghayibi*, *p.* 687-98

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

পর্তুগীজ উৎখাত, আসাম যুদ্ধ ও আরাকানী আক্রমণ

শাহজাহানের হুগলী অধিকার

চার বৎসর ধরে যুদ্ধ চালিয়ে শাহজাহান পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করতে না পারলেও তাঁর আত্মসমর্পণের দুই বৎসর পরে ১৬২৭ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর যখন শমন এসে সেই পিতাকে কোলে টেনে নিল তখন তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় তাঁর পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করলেন। সেই সঙ্গে বাংলা থেকে পিতৃনিযুক্ত ফিদাই খাঁকে বিদায় দিয়ে কাসিম খাঁ জুবানীকে সুবাদার করে পাঠালেন। ছোটবড় বহু অফিসারকেও বিদায় দেওয়া হোল।

পর্তুগীজদের উপর শাহজাহানের জাতক্রোধ ছিল। কারণ, পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে যখন তাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় তখন তিনি শোনেন যে পর্তুগালেরও এক সাম্রাজ্য আছে এবং আয়তনে তা মোগল সাম্রাজ্যের চেয়ে বড়; হুগলী সেই বিশাল পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের এক সুদূর উপনিবেশ। সে সময়ে সেই গর্বিত ফিরিঙ্গী বণিকরা তাঁর প্রতি মৌখিক আনুগত্য দেখালেও কোনরূপ সামরিক সাহায্য দেয় নি, তাঁর অভিষেকের সময়ে দূত বা উপঢৌকন পাঠায় নি। তাদের বেআদবী আরও আছে। হুগলী থেকে তারা চট্টগ্রামে যে সব পণ্যদ্রব্য পাঠাত তার একটা মোটা অংশ মোগলের চির শত্রু আরকানরাজের হাতে পড়ত। এর উপর তারা লোককে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে যথেষ্ট বিরক্তির সৃষ্টি করছিল। সকলের চেয়ে ভাবনার কথা এই যে পর্তুগীজরা যেক্ষেত্রে পরের সাম্রাজ্যের ভিতর চমৎকার দুইটি বন্দর নির্মাণ করেছে সেক্ষেত্রে বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের কোথাও নিজস্ব কোন বন্দর নেই।

এই রন্ধ্রপথ দিয়ে যে তারা বাংলা অধিকার করবে না এমন কথা কে বলতে পারে? সকল দিক বিবেচনা করে শাহজাহান কাসিম খাঁ জুবানীকে বাংলায় পাঠাবার সময়ে নির্দেশ দেন যে তিনি যেন হুগলী অধিকার করে পর্তুগীজদের হয় ইসলামে দীক্ষিত নয় ক্রীতদাসে পরিণত করেন।

এক শতাব্দী পূর্বে এক মহা বিপদের সম্মুখীন হয়ে গৌড়েশ্বর মামুদ শাহ পর্তুগীজদের কাছে সামরিক সাহায্যের আশায় হুগলী ও চট্টগ্রামের উপর অধিকার প্রদান করেছিলেন। সেই সুলতানের কাছ থেকে পাওয়া সনদের বলে এত দিন তারা ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছিল। তাতে মোগল সাম্রাজ্যের যথেষ্ট অর্থাগম হচ্ছিল বলে আকবর বা জাহাঙ্গীর তাদের কোন প্রকারে উত্যক্ত করেন নি। হুগলীতে মুষ্টিমেয় কুঠিয়াল ও পাদ্রী ছাড়া আর কোন পর্তুগীজ থাকত না বটে কিন্তু তারা শাসকশ্রেণীর চেয়ে জনসাধারণের কল্যাণকর কাজ বেশী করত। হিন্দু রাজত্বের অবসানের পর সেই যে বহির্বিশ্বের সঙ্গে গৌড়ের যোগ-সূত্র ছিন্ন হয় পর্তুগীজরা এসে তাতে নূতন করে গ্রন্থি সংযোগ করে, তাদের লেনদেনের ফলে লোকের হাতে যথেষ্ট অর্থাগম হয়। খৃষ্টধর্ম প্রচার ব্যপদেশে তারা বাংলা সাহিত্যের কিছুটা শ্রীবৃদ্ধিও করে। কোন তুর্কী বা মোগল বাদশাহর কাছ থেকে সেই হতভাগ্যগণ এরূপ কোন উপকার পায় নি। কিন্তু সে সব কথা বাদশাহ শাহজাহানের বিবেচ্য নয়, কাসিম খাঁ জুবানীকে নিয়োগের সময়ে তিনি পর্তুগীজদের উৎখাত করবার জন্য আদেশ দেন।

ভারতে মোগল ও পর্তুগীজ অধিকার একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হোলেও উভয় শক্তির মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ হয় এই প্রথম। পর্তুগীজদের বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য ও বিরাট নৌশক্তির কথা বিবেচনা করে কাসিম খাঁ জুবানী হুগলী অধিকারের জন্য যেরূপ আয়োজন করেন চীন আক্রমণও তাতে সম্ভব হোত। তিনি জানতেন যে হুগলী একটি অরক্ষিত নগরী হোলেও সেখানকার পর্তুগীজদের পিছনে রয়েছে চট্টগ্রামের স্বজাতীয়গণ ও গোয়ার পর্তুগীজ ভাইসরয়। তাদের অজেয় নৌবহর, শৃঙ্খলাবদ্ধ নির্ভীক সৈনিক ও আধুনিক অগ্নিবর্ষী কামান হুগলীতে এসে পৌছালে যুদ্ধজয় যে সহজসাধ্য হবে না সে কথা বুঝে নিয়ে ১৬৩২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কাসিম খাঁ তাঁর বিরাট বাহিনীর একাংশকে হুগলী ও সপ্তগ্রামের মধ্যবর্তী হলদিপুর গ্রামে ও অন্য অংশকে সাঁকরাইলে স্থাপন করে পর্তুগীজদের আক্রমণ করবার জন্য

আদেশ দেন। চট্টগ্রাম, গোয়া বা অন্যান্য উপনিবেশ থেকে যাতে তারা কোন সাহায্য না পায় সেই উদ্দেশে সমস্ত মোগল নৌবহর বেতড় থেকে বজবজের মধ্যে গঙ্গার উপর পরিক্রমা সুরু করে।

হুগলীতে পর্তুগীজদের ছিল মাত্র তিন শত ফিরিঙ্গী সৈনিক ও কিছু দেশী নাবিক। মোগলরা যখন ২২শে জুন ঐ নগরীর উপর আক্রমণ সুরু করে তখন সেই মুষ্টিমেয় সৈনিক ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে এমন প্রচণ্ডভাবে গোলা বর্ষণ করতে লাগল যে আক্রমণকারীদের মন তাতে এক অনির্বচনীয় শঙ্কায় অভিভূত হয়ে পড়ে। তা সত্বেও এরূপ অসম যুদ্ধ নিরর্থক বুঝে হোক বা চট্টগ্রাম ও গোয়া থেকে সাহায্যের আশা সুদূরপরাহত মনে করে হোক হুগলীর কয়েকজন নেতৃস্থানীয় নাগরিক মোগল সেনাপতির কাছে আপোষ মীমাংসার জন্য প্রস্তাব পাঠালেন। যেখানে স্বয়ং বাদশাহের আদেশে যুদ্ধ চলছে সেখানে তাঁর বিনা অনুমতিতে কোন-রূপ মীমাংসা করবার অধিকার কাসিম খাঁর না থাকলেও সেই সুযোগে কিছু কামিয়ে নেবার লোভে তিনি দাবী করলেন নগদ এক লক্ষ টাকা ও যে সব মুসলমানকে খৃষ্টান করা হয়েছিল তাদের প্রত্যর্পণ। হিংস্র ব্যাঘ্রকে পর্তুগীজরা রক্ত দিয়ে বশ করতে চাইল! মোগল সেনাপতির কথায় আস্থা স্থাপন করে তারা তাঁর দাবী কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিল, কিন্তু টাকাটা দেবার পরই দেখা গেল যে তিনি আরও সাত লক্ষ টাকা চান। এরপর যুদ্ধ চালান ছাড়া গত্যন্তর না থাকায় পর্তুগীজদের সামান্য যা সম্বল ছিল তাই দিয়ে আরও তিন মাস ধরে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাদ্যসরবরাহ বন্ধ হওয়ায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হোল। হুগলী মোগলের অধিকারে চলে গেল।

পর্তুগীজ সূত্র থেকে জানা যায় যে যুদ্ধশেষে সুবাদার কাসিম খাঁ জুবানী চার শ ফিরিঙ্গী স্ত্রীলোক ও পুরুষকে বন্দী করে আগ্রায় পাঠিয়ে দিলে শাহজাহান তাদের ইসলাম গ্রহণ অথবা জীবনব্যাপী কারাবাসের বিকল্প প্রদান করেন। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধর্মান্তর গ্রহণে সম্মত হোলেও অধিকাংশ বন্দী সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা বাদশাহের হারেমে স্থান পায়!

দ্বিতীয় আসাম যুদ্ধ

হুগলী অধিকারের কিছু দিন পরে শাহজাহান কাসিম খাঁ জুবানীর স্থানে আজিম

খাঁকে বাংলার স্থবাদার করে পাঠান। ঢাকায় পৌঁছে আজিম খাঁ দেখেন যে এত দিন ধরে আসামের সঙ্গে মোগলের যে সীমান্ত সংঘর্ষ চলছিল তা পূর্ণাঙ্গ সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। যে রাজা শত্রজিৎ সুখে দুঃখে মোগলের পাশে দাঁড়াতেন তাঁর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, তিনি মৃত কামরূপরাজ পরীক্ষিতনারায়ণের ভ্রাতা বলিনারায়ণকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য গোপনে উদ্বুদ্ধ করছেন। কামরূপ মোগলের অধিকারভুক্ত হবার পর থেকে বলিনারায়ণ যে আসামরাজ প্রতাপ সিংহের ছত্রছায়ায় বাস করছিলেন সেকথা পূর্বে বলেছি।

রাজা প্রতাপ সিংহ আগে থেকেই মোগলের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন ; শত্রজিৎ এসে প্রচ্ছন্ন আগুনে ইন্ধন জোগালেন। তাঁর গোপন নির্দেশে বলিনারায়ণ মোগলাধিকৃত কামরূপ আক্রমণ করলে সেখানকার ফৌজদার আবদুস সালাম পরাজিত হয়ে সাহায্যের জন্য ঢাকায় আবেদন পাঠান। আজিম খাঁ তখনও বাংলার স্থবাদার। তিনি আবদুস সালামের ভ্রাতা শেখ মহীউদ্দীনের অধীনে একটি শক্তিশালী বাহিনী কামরূপে পাঠান। মীর্জা সাল্‌হি, সৈয়দ জয়নাল আবেদিন প্রভৃতি প্রবীণ যোদ্ধারা তাঁর সঙ্গে যান। তাঁদের বলে বলীয়ান হয়ে আবদুস সালাম বলিনারায়ণকে নিজ দুর্গে অবরুদ্ধ করে বৃহত্তর যুদ্ধের জন্য তৈরী হোতে থাকেন। রাজা প্রতাপ সিংহের কাছে সে খবর পৌছালে তাঁর আদেশে আসাম বাহিনী এসে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পর মোগল ফৌজ তাদের সঙ্গে যুদ্ধে বার বার পরাজিত হয়—তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে।

আসামে মোগল বাহিনী ক্রমাগত পরাজিত হচ্ছে শুনে বাদশাহ শাহজাহান স্থবাদার আজিম খাঁকে অপসারিত করে ইসলাম খাঁ মহ্‌সদির উপর বাংলার দায়িত্ব অর্পণ করেন। ঢাকায় পৌঁছে স্থবাদার মহ্‌সদি নিজ ভ্রাতা মীর জয়নাল আবেদিনকে আসামে পাঠালে সম্প্রসারিত মোগল বাহিনী তড়িতাক্রমণে পাণ্ডুর সন্নিকটে অহমদের পরাজিত করে। কিন্তু প্রতাপ সিংহ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। নূতন নূতন সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে তিনি মোগলদের অগ্রগতি রোধ করেন। তারপর এক দিন তাঁর সৈন্যগণ রাতের অন্ধকারে শতশত রণপোতসহ শত্রুর উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের ছিন্নভিন্ন করে দেয়। সেই বিচ্ছিন্ন বাহিনীকে পুনর্গঠিত করে সেনাপতি আবদুস সালাম আবার যুদ্ধ স্থরু করলেও শেষ পর্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে সকল অফিসারসহ নিজে অহম সেনাপতির শিবিরে গিয়ে

আত্মসমর্পণ করেন। তিনি সেই অফিসারদের বন্দী করে শিলাপানিতে বসবাসের জন্য পাঠিয়ে দেন। সাধারণ সৈনিকগণকে প্রথামত কামাখ্যা মন্দিরে বলি দেবার পরিবর্তে বড়ুয়া, ফুকন প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের হাতে দেওয়া হয় ভৃত্যের কাজ করবার জন্য।

আবদুস সালাম আসাম বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলেও মীর জয়নাল আবেদিন গোপনে তাঁর ভ্রাতা সুবাদার ইসলাম খাঁ মহ্সদির কাছে সাহায্যের জন্য ঢাকায় লোক পাঠাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অহমগণ সমস্ত পথ এমন ভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল যে তা সম্ভব হয় নি। তখন তিনি নিজ ফৌজসহ বাংলায় পালিয়ে আসবার জন্য মরিয়া হয়ে যুদ্ধ সুরু করলে শত্রু তাঁর সমস্ত বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। তাঁর অসংখ্য কামান ও বন্দুক সমেত বিপুল পরিমাণ রণসম্ভার ও সাত শত অশ্ব অহমদের হস্তগত হয়।

যুদ্ধ অবশ্য সেখানে শেষ হয় নি। তারপরও কিছু কাল অহম ও মোগলগণ সুযোগ পেলেই পরস্পরকে আক্রমণ করে। বিজয়লক্ষ্মী বারবার পক্ষ পরিবর্তন করেন। এরই মধ্যে এক সময়ে মোগলরা শত্রুর স্থলবাহিনীকে বড়পেতায় ও নৌবাহিনীকে শ্রীঘাটে পরাজিত করে ছোটবড় পাঁচ শ নৌকা ও তিন শ কামান হস্তগত করে। কাজলী দুর্গও তাদের অধিকারে চলে যায়। কিন্তু কিছু দিন পরে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে অহমগণ সেটিকে পুনরুদ্ধার করে। পর বৎসর কুচবিহারের নূতন অধিপতি প্রাণনারায়ণ মোগল পক্ষে যোগ দেওয়ায় অহমদের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলেও মোগরাও রণক্লান্ত হয়ে পড়েছিল; তাই দুই পক্ষের মধ্যে যে সন্ধি সম্পাদিত হয় তাতে বড় নদী উভয় পক্ষের সীমান্ত বলে স্বীকৃতি লাভ করে।

আরাকানী আক্রমণ

মোগলরা যখন এইভাবে অহমদের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল সেই সময়ে আরাকানের মগরা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঢাকার দিকে এগিয়ে আসছিল। চট্টগ্রাম তখনও ওই দেশের অন্তর্ভুক্ত। আরাকানাধিপতি ত্রিসুধর্ম রাজার ১৬২২-৩৮) মৃত্যুর পর সেখানে যে প্রাসাদ বিপ্লব সুরু হয় সেই সময়ে চট্টগ্রামের শাসক মৃত রাজার ভ্রাতা মঙ্গত রায় সমস্ত আরাকান অধিকারের চেষ্টা করেন। তাঁর বিরোধীরা সে চেষ্টা ব্যর্থ করে দিলে তিনি ভুলুয়ার দিকে পালিয়ে

এসে জগদিয়ার থানাদারের কাছে আশ্রয় চান। সুবাদার ইসলাম খাঁ মহসদির কাছে এই সংবাদ পৌঁছালে তিনি মঙ্গত রায়ের সাহায্যের জন্য সঙ্গে সঙ্গে একটি সৈন্যবাহিনী ভুলুয়ায় পাঠান। যে সব আরাকানী জাহাজ মঙ্গত রায়কে ধরবার জন্য এগিয়ে আসছিল মোগলরা তাদের বিতাড়িত করে তাঁকে ঢাকায় নিয়ে আসে। তাঁর সমর্থক প্রায় নয় হাজার লোকও ঢাকায় আসে।

আরাকানের এই প্রাসাদ বিপ্লবের সময়ে চট্টগ্রামের পর্তুগীজরা মঙ্গত রায়কে সমর্থন করায় নূতন আরাকানরাজ তাদের উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে সদলবলে চলে যায় গোয়ার। কিন্তু জাহাজে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন বাংলায় পালিয়ে এলে তাদের ইসলামে দীক্ষিত করা হয়। এইভাবে চট্টগ্রামে পর্তুগীজদের কর্মজীবনের অবসান ঘটলে যে হাজার হাজার বাঙালীকে তারা সেখানে নিয়ে গিয়ে নিজেদের কুঠিতে নিয়োগ করেছিল তাদের অধিকাংশ বৃত্তিচ্যুত হয়ে স্বদেশে ফিরে আসে।

মঙ্গত রায়কে মোগল সুবাদার আশ্রয় দিয়েছিলেন বলে আরাকানরাজ পাঁচ শ জেলে নৌকা, পোনেরখানি ঘুরব ও পাঁচ জাহাজ অস্ত্রশস্ত্রসহ বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে ভুলুয়া হয়ে শ্রীপুরের দিকে এগিয়ে আসেন। তাঁর সম্মুখীন হবার জন্য ইসলাম খাঁ মহসদি নিজ ফৌজকে খিজিরপুর মোহানার নিকট সন্নিবেশিত করেন। কিন্তু আরকানরাজ সেই বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়েও এখন অসহায়। কারণ, যে পর্তুগীজ নৌযোদ্ধারা এত দিন তাঁর প্রধান অবলম্বন ছিল তারা এখন তাঁকে ছেড়ে গোয়ায় চলে গেছে। সেই কারণে তিনি মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করা সমীচীন বলে বিবেচনা করলেন না, সমস্ত সৈন্যবাহিনীসহ স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন।

আসাম ও আরাকান জয় করতে না পারলেও ইসলাম খাঁ মহসদি উভয় শক্তিকে নির্বীর্য্য করেছেন শুনে শাহজাহান তাঁর পদোন্নতি করে আগ্রায় ফিরিয়ে নিয়ে নিজের খাস উজীর নিযুক্ত করেন। বাংলার দায়িত্ব অর্পিত হয় বাদশাহর দ্বিতীয় পুত্র সুজার উপর।

1 *Travels of Fray Sebastian Manrique ii, edit. C. E. Luard, p. 394 95*
2 **Campos J. J. A.** ***History of Portuguese in Bengal, p. 212-17***
3 **Abdul Hamid Labori** ***Padshanama i, p. 439, 534***
4 **Gait A. E.** ***History of Assam, p. 110-21***
5 **Hall D. G. E.** ***History of South-east Asia, p. 372-75***

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

শাহজাদা সুজা

রাজমহলে রাজধানী অপসারণ

ঢাকায় এসে সুজা দেখেন যে স্থানটি নদীবেষ্টিত ও আবহাওয়া আর্দ্র। তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ এরূপ স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় অভ্যস্ত না থাকায় সকলের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ ও রূপলাবণ্য মলিন হোতে লাগল। অফিসারদের জিজ্ঞাসা করে জানলেন যে সবারই এক দশা, এখানকার জলহাওয়া কারও সহ্য হয় না। কেউ কেউ স্ত্রীপুত্র পশ্চিমে রেখে নিজেরা এই দোজখে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেন। অবশ্য সেরূপ অফিসার কম, অধিকাংশই পরিবারবর্গসহ এখানে বাস করছেন। কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়েরা পাল্টে পাল্টে রোগে পড়ে, সেজন্য তাঁদের প্রতিনিয়ত কবিরাজের দরজায় ধর্ণা দিতে হয়। সুজা ভাবলেন, যদি স্বাস্থ্য এভাবে খারাপ হয় তাহোলে সুবাদারী করবার সুখ কোথায়? পিতাকে লিখে পাঠালেন: আমাকে সমগ্র বিহার না হোক ওই সুবার কয়েকখানি গ্রাম দিন, ছেলেমেয়েদের সেখানে রেখে মনের শান্তিতে বাংলা শাসন করি। উত্তরে শাহজাহান লিখলেন: কয়েকখানা গ্রাম দেওয়া এমন কিছু শক্ত নয়, কিন্তু পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবনেও তো কোন শান্তি পাবে না। তার চেয়ে বলি কি, ঢাকায় যদি স্বাস্থ্য না টেকে তাহোলে রাজমহলে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে এসো। জায়গাটা বাংলায় হোলেও একেবারে বিহারের গা ঘেঁসে রয়েছে। আমি সেখানে গিয়েছি—জলহাওয়া খুবই ভাল।

পিতার এই পরামর্শ গ্রহণ করে শাহজাদা সুজা ঢাকা থেকে রাজমহলে রাজধানী অপসারণের আদেশ দিলেন। ঢাকায় যত সরকারী দফতর ছিল সেগুলি একে একে ওই নগরীতে স্থানান্তরিত করা হোল। রাজা মান সিংহ যে দুর্গ নির্মাণ

করেছিলেন জঙ্গী বিভাগ সেটিকে সম্প্রসারিত করল। তাঁর তৈরী পুরাতন প্রাসাদটিও ছিল, কিন্তু সুজা সেখানে বাস না করে একটি সুরম্য কাঠের প্রাসাদ নির্মাণ করালেন। তাঁর দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে আমীর ওমরাহরাও এক একটি কাঠের মঞ্জিল বানালেন। পরিত্যক্ত রাজমহল নূতন জীবন লাভ করল।

এই প্রথম এক মোগল রাজপুত্র বাংলা শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করায় সুজার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই সুবার রাজনৈতিক জীবন ও সামাজিক আব-হাওয়ায় আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল। ঢাকায় যে সুবাদারী দরবার বসত তা একেবারেই কৃত্রিম। একে কোন সুবাদারের দেহে রাজরক্ত ছিল না, তায় বিভিন্ন রাজ্যের সঙ্গে বিরামহীন সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় রাজধানীতে বাস করবার অবসর তাঁরা বেশী পেতেন না। পেলেও কিছু দিন পরে বাদশাহর হুকুমে হয় বরখাস্ত নয় বদলী হোতেন। কিন্তু শাহ সুজা বাদশাহজাদা —কারও সাধ্য নেই যে তাঁর উপর হুকুম চালায়। তার উপর তাঁর প্রকৃতি শান্ত, দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক গঠন আভিজাত্যপূর্ণ। তিনি বাদশাহর যোগ্য প্রতিনিধি —সাচ্চা বাঘের বাচ্চা! তাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে খানদানী লোকেদের আহ্লাদের সীমা থাকল না। বিপুল শান্ সওকাতের মধ্যে নূতন রাজধানীর প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হোল। শুধু বাংলা নয়, বিহার ও উড়িষ্যা থেকেও বহু গণ্যমান্য লোক রাজমহলে এসে আসর জমালেন। তাঁদের গাড়ীর ঘর্ঘর আওয়াজে, ঘোড়াদের পায়ের শব্দে ও বাবুর্চি খানসামাদের আনাগোনায় রাজমহলের পথঘাট প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। সবাই ধরে নিল, কাল হোক বা পরশু হোক রাজমহল নূতন আগ্রায় পরিণত হবে!

সুজার জনপ্রিয়তার সংবাদ শাহজাহানের কানে পৌছালে পুত্রগর্বে তাঁর বুক ফুলে উঠল। তিন বৎসর পরে উড়িষ্যাও তাঁর হাতে সমর্পণ করে লিখলেন: এখন থেকে বাংলার সঙ্গে উড়িষ্যা শাসনের দায়িত্ব তোমাকে দিলাম। তুমি যখন স্বাস্থ্যের জন্য রাজমহলে থাকতে চাও তখন ঢাকায় একজন ও কটকে একজন নায়েব-সুবাদার রেখে উভয় সুবা শাসন করো। ঢাকায় ও রাজমহলে বাস করে বাংলাকে ভাল করে জেনেছ

—উড়িষ্যাও জানা দরকার। সেজন্য কটক পর্য্যন্ত যাবার প্রয়োজন নেই, ওই সুবার সীমান্ত শহর মেদিনীপুরে গেলে সমস্ত সুবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় হবে। পথ কিছু দুর্গম নয়। রাজমহল থেকে রওনা হয়ে বর্দ্ধমানে যাবে; সেখান থেকে মেদিনীপুর চার দিনের পথ। যাবার আগে উড়িষ্যার অফিসারদের কাছে হুকুম পাঠাবে তারা যেন মেদিনীপুরে এসে আয়ব্যয়ের হিসাব বুঝিয়ে দেয়। সেখানকার কাজ শেষ হোলে আরামবাগ ও হুগলী হয়ে রাজমহলে ফিরে আসবে। যদি এই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করো তাহোলে নূতন সুবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ছাড়া দেশভ্রমণের আনন্দও উপভোগ করতে পারবে।

পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করে সুজা মেদিনীপুরে ঘুরে এলেন।

আসল তুমার জমা

অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্বে আকবরের আদেশে রাজা টোডরমল যে রাজস্ব তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন তাতে বাংলায় ছিল ১৯ সরকার ও ৬৮২ পরগণা। চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট তখনও আরাকানী ও আফগানদের অধিকারে থাকলেও টোডরমল পুরাতন নথির ভিত্তিতে উভয় অঞ্চলে দুইটি সরকার গঠন করেছিলেন। তারপর ওসমান খাঁ লোহানী ও বায়াজিদ কররানির পতনের ফলে শ্রীহট্ট মোগলদের হাতে এসেছে, কিন্তু চট্টগ্রাম তখন যেমন এখনও তেমনি আরাকানে রয়েছে। আবার টোডরমলের হিসাবে বাংলার রাজস্ব তালিকায় কামরূপ ও ত্রিপুরার স্থান না থাকলেও ইতিমধ্যে সুবাদার কাসিম খাঁ চিস্তি কামরূপ অধিকার এবং ইব্রাহিম খাঁ ফতে-জং ত্রিপুরার সমতল অঞ্চলের উপর মোগল আধিপত্য প্রসারিত করেছেন। এই সব সম্প্রসারণের কথা বিবেচনা করে সুজা বুঝলেন যে টোডরমলের তক্‌সিম জমা এখন অচল।

তাঁর আদেশে কামরূপ ও ত্রিপুরার বিজিত অঞ্চলগুলির রাজস্ব নির্দ্ধারিত হোলে সেগুলি টোডরমলের রাজস্ব তালিকার সঙ্গে যুক্ত করে যে সংশোধিত আসল তুমার জমা তৈয়ারি হোল তাতে সুবা বাংলার সরকারের সংখ্যা ১৯ থেকে বেড়ে দাঁড়াল ২৯ এবং রাজস্ব ১,৩১,১৪,৯০৭ টাকা।

বাহাদুর শাহর বাহাদুরী

এই আয় আকবরের সময়কার মত হিসাবের খাতার মধ্যে আবদ্ধ না রেখে যাতে নিয়মিতভাবে আদায় হয় সুজা তার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু বিপদ বাধালেন হিজলীর আফগান সর্দার বাহাদুর শাহ। বারো ভূঁইঞাদের আর সকলে বিদায় গ্রহণ বা বশ্যতা স্বীকার করলেও তিনি এখনও বেশ সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে সুবর্ণরেখা থেকে রূপনারায়ণ নদী পর্য্যন্ত ভূভাগের উপর রাজত্ব করছিলেন। এই অঞ্চলটি উড়িষ্যার রাজস্ব তালিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তাঁর সুবিধাও ছিল অনেক। বাংলার কোন সুবাদার তাঁর উপর খবরদারি করতেন না, উড়িষ্যার শক্তিশালী সামন্ত নরপতিদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করছিলেন। সেখানকার সুবাদারের প্রতি নামমাত্র আনুগত্য দেখিয়ে তিনি কতকটা স্বাধীন সুলতানের মত আচরণ করতেন—নিজেই নিজেকে মসনদ-ই-আলা উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর হাবভাব দেখে এক পর্তুগীজ মিশনারী তাঁকে সম্রাট বলে ধরে নিয়েছিলেন। হিন্দুস্থানে তখন নাকি দুজন সম্রাট—একজন দিল্লীর শাহজাহান ও অন্যজন হিজলীর বাহাদুর শাহ!

আসল তুমার জমা প্রস্তুতের সময়ে উড়িষ্যার রাজস্ব তালিকা পর্য্যালোচনা করে সুজা দেখেন, বাহাদুর শাহ তাঁর বিস্তৃত জমিদারীর জন্য যে রাজস্ব দেন তা না দেবারই সামিল। তাই তাঁর উপর কিছুটা বর্দ্ধিত হারে কর ধার্য্য করা হোলে তিনি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। সে খবর সুজার কানে পৌছালে তিনি উড়িষ্যার নায়েব-সুবাদারের কাছে হুকুম পাঠালেন: বাহাদুরকে গ্রেপ্তার করে রাজমহলে পাঠিয়ে দাও। সে আদেশ পালিত হোলে তিনি মসনদ-ই-আলাকে পাঠিয়ে দেন রাজমহলের কারাগারে।

কিন্তু বাহাদুর শাহ বাহাদুর ব্যক্তি—তাঁকে আটক রাখা সহজ কথা নয়। কিছু দিন পরে সুজা যখন নিজ ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন তখন তিনি সুযোগ বুঝে কারাগার থেকে বেরিয়ে হিজলীতে চলে আসেন। সেই ভ্রাতৃযুদ্ধের সময়ে কিছু কাল তাঁর দিন সুখে কাটলেও পরবর্তী সুবাদার মীর জুমলা তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে হিজলী অধিকার করেন। তার ফলে যে সব আফগান সৈনিক তাঁর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল তারা অভিভাবকহীন হয়ে কেউ বা কৃষিকর্ম, আবার কেউ বা রাজমিস্ত্রীর জীবিকা গ্রহণ করে। তারাই এখনকার মেদিনীপুরী মুসলমান।

ত্রিপুরা আক্রমণ

পূর্বের এক অধ্যায় বলেছি যে জাহাঙ্গীরের সময়ে ত্রিপুরেশ্বর যশোমাণিক্য বৈরাগ্য গ্রহণ করায় ইব্রাহিম খাঁ ফতে-জং অতি সহজে তাঁর রাজ্য অধিকার করেন। কিন্তু সেখানে স্থায়ী মোগল শাসন প্রতিষ্টিত হবার পূর্বে শাহজাহান পূর্ব ভারতে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেন সেই সময়ে যশোধরের উত্তরাধিকারী কল্যাণ মাণিক্য ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চল থেকে মোগলদের তাডিয়ে দিয়ে নিজ বংশের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। মোগলের তখন এত সমস্যা যে কল্যাণ মাণিক্যের বিরুদ্ধে কোন অভিযান পাঠান সম্ভব হয় নি। সুজা সেই ব্যবস্থা মেনে নিয়ে ত্রিপুরার বিজিত অঞ্চলে সরকার উদয়পুর নামে একটী নূতন সরকার গঠন করেন। এই সরকারকে নিজের সংশোধিত রাজস্ব তালিকা আসল তুমার জমার অন্তর্ভুক্ত করে দেখেন যে সেখানে অরাজকতা চলছে। ত্রিপুরী সৈন্যরা পার্বত্য দুর্গ থেকে নেমে এসে প্রজাদের কাছ থেকে কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব আদায় করে, আবার মোগল তহসিলদাররা রাজস্বের দায়ে তাদের স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি ক্রোক দেয়। এরূপ দ্বৈত শাসনের ফলে নিগৃহীত বহু প্রজা বাড়ী ঘর ছেড়ে পার্বত্য ত্রিপুরায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে।

এই অরাজকতার অবসান ঘটাবার জন্য সুজা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে একটি সৈন্যবাহিনী পাঠালে তারা অধিকৃত অঞ্চল থেকে ত্রিপুরী সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়ে সেখানে একটি স্থায়ী সামরিক ছাউনি প্রতিষ্ঠিত করে। মোগল ফৌজ এর বেশী অগ্রসর হয় নি, কারণ একে সুজা ছিলেন শান্তিপ্রিয় তায় তাঁর পিতামহ জাহাঙ্গীর যশোধর মাণিক্যকে যে কতখানি সম্মান দেখিয়েছিলেন সেকথা তাঁর জানা ছিল। তাঁর বিশ বৎসর সুবাদারীর মধ্যে এই একটি ব্যতীত আর কোন সামরিক অভিযানের নজীর পাওয়া যায় না।

বাদশাহ পরিবারের গৃহযুদ্ধ

পিতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জাহাঙ্গীর যে দৃষ্টান্ত তাঁর পুত্রদের সম্মুখে তুলে ধরে-ছিলেন শাহজাহান তা অনুসরণ করে পূর্ণ চার বৎসর ধরে তাঁর বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালান। তাঁর পুত্ররাই বা সেই পথে চলবে না কেন? বোধ হয় সেই সম্ভাবনা পরিহার করবার জন্য তিনি তিন পুত্রকে দূরবর্তী তিন সুবায়

পাঠিয়ে দিয়ে জ্যেষ্ঠ দারাকে রাজধানীতে নিজের কাছে রেখেছিলেন। কিন্তু পিতার এই ব্যবস্থা অপেক্ষা তাঁর আদর্শ তিন শাহজাদাকে বেশী অনুপ্রাণিত করে, তাঁরা ধরে নেন যে দিল্লীর মসনদের জন্য পিতাপুত্রে ও ভ্রাতায়ভ্রাতায় যুদ্ধ এক দিন হবেই হবে। অনাগত সেই দিনের জন্য তিন ভাই তিন সুবায় বেশ ভালভাবে প্রস্তুতি চালিয়ে যান। এক সময়ে শাহজাহানের নির্দেশে বাংলার সুবাদার সুজা ও দক্ষিণের সুবাদার ঔরঙ্গজেব কোনও বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য আফগানিস্থানে গিয়েছিলেন। শত্রুকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজ নিজ সুবায় ফেরবার পথে দুই ভাইয়ের সে কি অন্তরঙ্গতা! কয়েক দিন এক সঙ্গে বাস করবার সময়ে তাঁরা অহর্নিশি পিতার অবিচার ও দারার বেইমানির কথা নিয়ে আলোচনা করে শেষ পর্য্যন্ত স্থির করেন যে জ্যেষ্ঠাগ্রজ শাসন কেউ মানবেন না, পিতার মৃত্যুর পর তাঁকে খতম করে সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে আপোষে বাঁটোয়ারা করে নেবেন। তাঁর বিরুদ্ধে উভয়ের মনোভাব যাই হোক নিজেদের মধ্যে যে ভ্রাতৃস্নেহ অক্ষুণ্ণ রয়েছে তার প্রমাণ দেবার জন্য ঔরঙ্গজেব তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ সুলতানের সঙ্গে সুজার জ্যেষ্ঠা কন্যা গুলরুখের বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করেন। সেই থেকে সুজা ও ঔরঙ্গজেব শুধু ভাই নন—বৈবাহিকও বটেন!

বাহ্যতঃ এই মনের মিল সত্ত্বেও দুজনেই জানতেন যে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি চলছিল, শাহজাহানের পরলোক গমনের পর এই সমঝৌতার মূল্য কানাকড়িও থাকবে না। তাই তাঁরা নিজ নিজ রাজধানীতে ফিরে গিয়ে অনাগত যুদ্ধের জন্য সৈন্য ও অর্থবল বৃদ্ধি করতে লাগলেন। এখন প্রয়োজন শুধু পিতার মৃত্যুর! কবে সেই সংবাদ এসে পৌঁছাবে সেই আশায় তাঁরা দিন গণছেন এমন সময়ে খবর এল যে তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য দরবারে আমীর ওমরাহদের সামনে ঘোষণা করেছেন যে দিল্লীর সিংহাসনে তাঁর উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা সুকো। এইরূপ আশঙ্কাই তিন শাহজাদা করছিলেন। দারা পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র, দারা শাস্ত্রজ্ঞ, দারা সর্বজনপ্রিয়। সেই দারাকে শাহজাহান শুধু নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন নি সঙ্গে সঙ্গে সকল বাদশাহী ফরমানে দস্তখত করবার অধিকার দেন। সেই দিন থেকে বাদশাহর নামে যত ফরমান জারি হোতে লাগল তাতে দস্তখত থাকল

দারার। তাই দেখে তিন শাহাজাদা সন্দেহ করলেন যে শাহজাহান এন্তেকাল করেছেন, কিন্তু সে খবর চেপে রেখে দারা তাঁর নামে সাম্রাজ্য চালাচ্ছেন; কিছু দিন পরে সব দিক সামলে নিয়ে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। অর্দ্ধ-কাফেরের এই ধৃষ্টতা তাঁদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল—তিনজনই যুদ্ধের জন্য তৈরী হোতে লাগলেন।

দুই মাসের মধ্যে স্থজা রাজমহলে মহা আড়ম্বরের মধ্যে নিজেকে ভারত সম্রাট পদে অধিষ্ঠিত করে দ্বিতীয় তাইমুর ও তৃতীয় সিকান্দার উপাধি গ্রহণ করলেন (১৬৫৭, নভেম্বর)। কিন্তু শুধু অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করলেই সম্রাট হওয়া যায় না, আগ্রায় গিয়ে ময়ূর সিংহাসনে বসা চাই! তাই কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রস্তুতির পর তিনি জল ও স্থলবাহিনীসহ ওই নগরীর দিকে রওনা হোলেন। বিহার প্রায় বিনা যুদ্ধে তাঁর অধিকারভুক্ত হোল; সেখানে কয়েক দিন কাটিয়ে তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হোতে লাগলেন। বারাণসীর উপকণ্ঠে পৌছে দেখেন, দারার পুত্র সোলেমান ও মীর্জা রাজা জয় সিংহের অধীনে বাদশাহী ফৌজ এসে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উভয় পক্ষে কয়েক দিন ধরে খণ্ডযুদ্ধ চলবার পর এক দিন রাত্রিশেষে বাদশাহী ফৌজ স্থযোগ বুঝে স্থজার অশ্বারোহী ও পদাতিকদের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালালে তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। প্রধানতঃ চাউলভোজী বাঙালী সৈন্যদের নিয়ে গঠিত তাঁর বাহিনী, গমভোজী বাদশাহী সিপাহীদের তুলনায় ছিল দৈহিক শক্তিতে ক্ষীণ; তার উপর সবাই তখনও ঘুমে অচেতন। তাই ক্ষণমাত্র যুদ্ধের পর তারা রণে ভঙ্গ দিলে বাদশাহী ফৌজ তাদের তাড়া করতে করতে বিহার সীমান্ত পর্য্যন্ত চলে আসে (ফেব্রুয়ারী ১৪, ১৬৫৮)।

স্থলবাহিনীর এই দৌর্বল্য সত্ত্বেও নৌশক্তিতে স্থজা ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বস্তুতঃ বাদশাহী ফৌজের কোন নাওয়ারাই ছিল না। তারা যখন স্থজার শিবিরের উপর আক্রমণ স্থরু করে তখন তিনি সেখান থেকে সরে গিয়ে গঙ্গাবক্ষে মহলগিরি বা অনুরূপ এক বিলাসতরীতে আরোহণ করলে তার সম্মুখীন হবার মত কোন রণপোত সোলেমান বা জয় সিংহ সংগ্রহ করতে পারেন নি। তার ফলে স্থজার স্থলসৈন্যগণ যখন দিগ্বিদিকজ্ঞান-শূন্য হয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল তখন তিনি সমস্ত নাওয়ারা নিয়ে নির্বিঘ্নে মুঙ্গেরে

চলে আসেন। সোলেমান ও রাজা স্থলপথে সেখানে এসে তাঁকে দুর্গমধ্যে অবরোধ করেন।

তিন ভাইয়ের মধ্যে মোরাদ সর্বাপেক্ষা ব্যসনাসক্ত হোলেও তাঁর আত্মবিশ্বাস ছিল সকলের চেয়ে বেশী। রাজমহলে স্থজার অভিষেকের কয়েক দিন পূর্বে তিনি আহমেদাবাদে নিজেকে দিল্লীর মসনদে অভিষিক্ত করে আগ্রায় আসবার জন্য প্রস্তুত হোতে থাকেন। ঔরঙ্গজেবেরও লক্ষ্য এক হোলেও কোন অভিষেকের প্রহসন না করে তিনি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার আয়োজন করতে লাগলেন। মোরাদের ফৌজ যখন আগ্রার পথে মালব পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে সেই সময়ে তিনি তাঁকে স্তোকবাক্যে হাত করে উভয়ের সম্মিলিত বাহিনীসহ আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। ধর্মাট ও শ্যামগড়ের যুদ্ধে সেই সম্মিলিত বাহিনীর কাছে বাদশাহী ফৌজ পরাজিত হয়—দারার উপর সঙ্কট ঘনিয়ে আসে। এই সংবাদ বিদ্যুৎবেগে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়লে সোলেমান মুঙ্গের দুর্গে লোক পাঠিয়ে খুল্লতাত স্থজার সঙ্গে জোড়াতালি দেওয়া এক সন্ধি সম্পাদিত করে আগ্রার দিকে রওনা হন (মে ৭)।

কয়েক দিন পরে দেখা গেল যে সেই সন্ধি অর্থহীন হয়ে পড়েছে। কারণ, সোলেমান আগ্রায় পৌছাবার পূর্বে ঔরঙ্গজেব-মোরাদের সম্মিলিত বাহিনী আগ্রা অধিকার করে দারাকে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়; তিনি পাঞ্জাব ও সেখান থেকে সিন্ধুর দিকে পালিয়ে যান। তারপর ঔরঙ্গজেব ভ্রাতৃস্নেহের মুখোস খুলে ফেলে মোরাদকে কারারুদ্ধ করে নিজে বাদশাহী তখ্‌তে আরোহণ করেন। অথচ অন্য দুই ভাইয়ের মত তিনিও বলেছিলেন যে দারার কবল থেকে পিতাকে মুক্ত করা ছাড়া অন্য কোন লক্ষ্য তাঁর নেই! মোরাদের কারাবাসের পর দেখা গেল যে সেই পিতাকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছেন।

এখন বাকি থাকলেন স্থজা। পাঁচ বৎসর পূর্বে আফগানিস্থান থেকে ফেরবার পথে তাঁর সঙ্গে যে সমঝোতা হয়েছিল এক পত্রে তাঁকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ঔরঙ্গজেব লিখলেন যে বিহার তাঁকে দেবেন এবং তিনি আর যা কিছু চান সবই দেবেন, প্রতিদানে তিনি যেন ঔরঙ্গজেবকে স্নেহশীল ভাই ছাড়া আর কিছু মনে না করেন। স্থজা তাঁকে ভাল করে চিনেছিলেন! তাই সেই

পত্রের যথাযোগ্য উত্তর পাঠিয়ে দিল্লী অভিযানের জন্য সৈন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন।

দারা আগ্রা ছেড়ে পালালেও ঔরঙ্গজেবের পক্ষে ওই নগরী ও নিজস্ব সুবা দাক্ষিণাত্যের বাইরে আধিপত্য প্রসারিত করা সহজসাধ্য হয় নি। কারণ, অধিকাংশ সুবাদার ও প্রায় সকল দুর্গাধ্যক্ষ শাহজাহান-দারার পক্ষ ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। কারারুদ্ধ শাহজাহানের পক্ষে এই আনুগত্যের সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হয় নি বটে কিন্তু সিন্ধুতে যখন দারার কাছে খবর গেল যে সুজা তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ আগ্রার দিকে এগিয়ে আসছেন তখন তিনি সকল দুর্গাধ্যক্ষের কাছে আদেশ পাঠালেন, তাঁরা যেন নিজ নিজ দুর্গ সেই শাহাজাদার হস্তে সমর্পণ করেন। তার ফলে বিনা যুদ্ধে রোহ্‌টাস, চুনার, এলাহাবাদ প্রভৃতি শক্তিশালী দুর্গগুলি অধিকার করে সুজা একেবারে খাজুয়ায় গিয়ে উপনীত হন। আগ্রার পথ তাঁর সম্মুখে মুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর অদৃষ্ট মন্দ! তাই বাধ সাধলেন ঔরঙ্গজেবের পুত্র, তাঁর ভাবী জামাতা, মহম্মদ সুলতান। তিনি সসৈন্যে সেখানে এসে জ্যেষ্ঠতাতের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। কয়েক দিন পরে তাঁর পিতা নিজে সেখানে চলে এলে সুজা পরাজিত হয়ে বাংলার দিকে পালিয়ে আসেন।

গুলরুখের প্রতি মহম্মদ সুলতানের প্রেম

সুজাকে অনুসরণ করবার দায়িত্ব পুত্রের উপর অর্পণ করে ঔরঙ্গজেব আগ্রায় ফিরে গেলেন। তাঁর সহকারী নিযুক্ত হোলেন মীর জুমলা। খাজুয়ায় পরাজয়ের পর সুজার মনোবল এমনভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল যে তিনি পুনরায় ব্যূহ বিন্যাসের আদেশ দেবার পরিবর্তে ক্রমাগত পিছু হঠতে লাগলেন। তার ফলে চুনার, রোহটাস, পাটনা, মুঙ্গের প্রভৃতি দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি অতি সহজে মহম্মদ সুলতানের হস্তগত হোল। শেষ পর্য্যন্ত সুজা নিজ রাজধানী রাজমহলে চলে এলেন বটে কিন্তু সেখানেও নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারলেন না। নিজের ও আমীর ওমরাহদের পরিবারবর্গ, রাজকোষ, সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্র সব কিছু নৌকাযোগে নদীর ওপারে তাঁড়ায়* পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সেখানে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত

* তাঁড়া গৌড়ের ৪ মাইল পশ্চিমে

হোতে লাগলেন। ভাগীরথী হয়ে দাঁড়াল তাঁর ও ঔরঙ্গজেবের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কয়েক দিন পরে মহম্মদ সুলতান তাঁর সৈন্যবাহিনীসহ সেখানে এসে দেখেন যে তিনি সুজার রণকৌশলের কাছে আপাতদৃষ্টিতে পরাজিত হয়েছেন। বাংলার সুবাদারের হাতে যেক্ষেত্রে একটি বিরাট নৌবহর রয়েছে সেক্ষেত্রে তাঁর একখানি জেলে ডিঙ্গিও নেই। কেমন করে তাঁর বিরাট বাহিনীকে নদী পার করে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবেন? অসহায় মহম্মদ সুলতান রাজমহলে তাঁবু ফেললেন।

মীর জুমলা গোড়া থেকে লক্ষ্য করছিলেন যে তাঁর সর্বাধ্যক্ষ যুদ্ধ করলেও সর্বদা অন্যমনা, সদাই গভীর চিন্তায় মগ্ন। রাজমহলে পৌছেও তিনি নদী পার হবার কোন আয়োজন করছেন না, যেন ভাগ্যের উপর সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর মতামতের অপেক্ষা না রেখে মীর জুমলা চুঁচুড়া থেকে ওলন্দাজ ও কলকাতা থেকে ইংরাজদের কয়েকখানি বাণিজ্যতরীসহ ছোটবড় বহু নৌকা বাদশাহর নামে তলব করে গঙ্গা পার হবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর সর্বাধ্যক্ষের মনে কোন উৎসাহ নেই। এক তরুণীর মুখ তাঁর চক্ষের সম্মুখে সদাসর্বদা ভেসে উঠছে। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে সেই মুখ যেন তাঁকে আহ্বান জানিয়ে বলছেঃ মহম্মদ সুলতান তুমি এসো। যুদ্ধ থাকুক—যাদের যুদ্ধ তারা করুক। এসো—এসো নদীর এপারে। চলো এক নিভৃত কুঞ্জবনে আমাদের বাসরশয্যা রচনা করি। সামন দিয়ে গঙ্গার ঢেউ বহে যায়, আর মহম্মদ সুলতান দেখেন নদীর ওপার থেকে সেই তরুণীর আহ্বান অহরহ তাঁর কানে এসে মরমে প্রবেশ করছে। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না, তাঁবুতে ফিরে গিয়ে সেই তরুণীর উদ্দেশ্যে লিখলেন—

যুদ্ধের কোলাহল
অস্ত্রের ঝন্ ঝন্
মরণের হলাহল
কামানের গর্জন—
ওই দূরে শোনা যায়
সিপাহীর হুঙ্কার
বীর হৃদি নেচে ওঠে
শুনে রণ ঝঙ্কার,

তার মাঝে থেকে থেকে
ভেসে ওঠে কার মুখ ?
কে আমারে পিছু ডাকে ?
সে আমার গুলরুখ।

হত্যা আর যুদ্ধ
এই নিয়ে ইতিহাস
ভরা তার পাতাগুলি
মানুষের হাহুতাশ,
তবু হেথা আছে আশা
আছে কল কল্লোল
আছে কত প্রেমিকের
হৃদয়ের হিন্দোল।
সে কথা কাহারে বলি ?
কে বুঝিবে মোর দুখ ?
সে আছে হৃদয় জুড়ে
সে আমার গুলরুখ।

লিখলেন কবিতা মহম্মদ সুলতান। কিন্তু কার হাত দিয়ে পাঠাবেন গুলরুখের কাছে ? তাঁর আহার বন্ধ হোল, যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি লোপ পেল। হাজার হাজার সৈন্য তাঁর আদেশের অপেক্ষায় বসে রয়েছে, তাঁর মুখের একটি কথা পেলে তারা ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠবে, কিন্তু তিনি নির্বিকার—নিশ্চল। শেষ পর্য্যন্ত তাঁবুতে বাস করা অসম্ভব হোল, সেই বিরাট বাহিনীকে পিছনে ফেলে রেখে ৮ই জুন গভীর রাত্রে অতি সংগোপনে গঙ্গা পার হয়ে তিনি তাঁড়ায় চলে গেলেন। যেমন সবার অগোচরে সেখানে এসেছিলেন তেমনি সবার অগোচরে সুজার প্রাসাদে প্রবেশ করে বললেন : গুলরুখ ! আমি এসেছি। তুমি আমার বাগদত্তা বধূ—তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না। পিতা আমাকে ময়ূর সিংহাসনে অভিষিক্ত করে মক্কায় চলে যেতে চান—চাই না আমি সে সিংহাসন।

সমস্ত মোগল সাম্রাজ্যের তুলনায় তোমার মূল্য আমার কাছে হাজার গুণ বেশী। পৃথিবীর বিনিময়েও তোমাকে হারাতে পারবো না।

কন্যার প্রতি ভাবী জামাতার অনুরাগের পরিচয় পেয়ে সুজা মুগ্ধ হোলেন।* কয়েক দিনের মধ্যেই উভয়ের পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করে জামাতাকে নিযুক্ত করলেন নিজ সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ। এই সেদিন যে ছিল তাঁর শত্রু সৈন্যদের সেনাপতি আজ সে হোল তাঁর সর্বাধ্যক্ষ! এখন থেকে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সুজার যুদ্ধ নয়—ঔরঙ্গজেব পুত্রের সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের।

মহম্মদ সুলতান তাঁর পূর্বতন শত্রুর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে নিজেরই প্রাক্তন সৈন্য ও সৈন্যাধ্যক্ষদের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। যে বাহিনীকে তিনি আগ্রা থেকে রাজমহল পর্য্যন্ত নিয়ে এসেছিলেন তারা সহ্য করতে লাগল তাঁর প্রচণ্ড আঘাত। দেখতে দেখতে বর্ষা নামল, পথঘাট জলে জলময় হয়ে উঠল। তারই মধ্যে এক দিন, ২২শে আগষ্ট, মহম্মদ সুলতান গঙ্গা পার হয়ে বাদশাহী ফৌজকে এমন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করলেন যে তার বেগ সামলাতে না পেরে তারা রাজমহল ছেড়ে পালিয়ে গেল। ঔরঙ্গজেব পুত্রের নেতৃত্বে সুজার বাহিনী ঔরঙ্গজেবকে পরাজিত করল।

তাঁড়ায় গুলরুখের মনে নূতন আশা জাগল!

পিতার পর পুত্রকে বন্দী

এই পরাজয়ের সংবাদ আগ্রায় পৌছালে ঔরঙ্গজেব ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। কিন্তু কারও সামনে রাগ প্রকাশ করবার লোক ঔরঙ্গজেব ছিলেন না। প্রকাশ্য দরবারে আমীর ওমরাহদের সামনে আক্ষেপ করে বললেন: যে পুত্রকে মসনদে বসিয়ে আমি মক্কায় যাবার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম সে কিনা আজ আমার দুষমনের দলে যোগ দিয়ে আমাকে খতম করতে আসছে! এতই নির্বোধ সে? নিজের মসনদ সে নিজের দোষে অন্যের হাতে তুলে দিচ্ছে?

ঘটনাস্রোত সত্যই সেদিকে গড়াতে লাগল। দিন যতই এগোল যুদ্ধ

* এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পূর্ব বৎসর ১০৬৬ হিজিরাব্দের ১৮ই জুমাদা তারিখে গোলকুণ্ডার অধিপতি কুৎবুলমুলকের কন্যার সঙ্গে মহম্মদ সুলতানের বিবাহ হয়েছিল। এই উপলক্ষে কুৎবুলমুলক ১০ লক্ষ টাকা যৌতুক দিয়েছিলেন। Inayat Khan, *Shah Jahan-nama, Elliot's trans. p. 119*

ততই ঔরঙ্গজেবের প্রতিকূলে চলল। তাঁর সৈন্যবাহিনীকে পিছু হটাতে হটাতে মহম্মদ সুলতান আগ্রার দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব ঔরঙ্গজেব! যে চাতুর্য্য দিয়ে তিনি মোরাদের মাথা ঘুরিয়েছিলেন, পিতাকে বন্দী করেছিলেন, সেই চাতুর্য্য এখন পুত্রের উপর প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হোলেন। তাঁর হস্তলিখিত একখানি গোপন পত্র নিয়ে এক বিশ্বস্ত অনুচর মহম্মদ সুলতানের তাঁবুতে চলে গেল। কিন্তু পত্রখানি পুত্রের হাতে না পৌঁছে পড়ল সুজার হাতে! সেখানি পড়ে জামাতার অভিসন্ধি সম্বন্ধে সুজার মনে সন্দেহের উদ্রেক হোল; তিনি বুঝলেন যে মহম্মদ সুলতানের যুদ্ধজয় অলীক—আসলে সে পিতৃব্য-শ্বশুরকে এক মরণ ফাঁদের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সর্বনাশের সময় এমনিই হয়। মাত্র কয়েক দিন পূর্বে যে জামাতা ঔরঙ্গজেবের ফৌজকে পরাজিত করেছিল, তিনি বুঝলেন, সে আসলে পিতার গুপ্তচর ব্যতীত আর কিছুই নয়। হবেই তো! জলের চেয়ে রক্ত চিরদিনই গাঢ়। হোক মহম্মদ সুলতান জামাতা, যুদ্ধের সময়ে শত্রুর পঞ্চম বাহিনীকে বরদাস্ত করা চলে না। পত্রখানি পড়বার পর থেকে সুজা জামাতার গতিবিধির উপর এমন প্রখর দৃষ্টি রাখতে লাগলেন যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর পক্ষে শ্বশুরের শিবিরে বাস করা আত্মসম্মানের পক্ষে হানিকর হয়ে উঠল। তাই তিনি যেমন গোপনে সেখানে এসেছিলেন তেমনি গোপনে এক দিন সেখান থেকে বিদায় নিয়ে নিজ শিবিরে চলে গেলেন।

মীর জুমলা তাঁকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানালেও সুনজরে দেখতে পারলেন না। এই সেদিন যে শাহাজাদা পিতৃশত্রুর হয়ে যুদ্ধ করেছেন তিনি যে আজ গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য এখানে আসেন নি তার নিশ্চয়তা কোথায়? খবরটি যথারীতি ঔরঙ্গজেবের কাছে পাঠালে তিনি বুঝে নিলেন যে তাঁর ওষুধে কাজ হয়েছে। মীর জুমলাকে লিখে পাঠালেন: যুদ্ধের সময়ে শত্রুর কোন গুপ্তচরকে নিজ শিবিরে রাখা যায় না। হোক মহম্মদ সুলতান আমার পুত্র, তবু আমি ভুলতে পারি না যে সে শত্রুর দলে যোগ দিয়ে আমাদের ফৌজকে পিছু হটাতে হটাতে এত দূরে চলে এসেছে। সে শত্রুর গুপ্তচর ছাড়া আর কিছু নয়। মৃত্যুদণ্ড তার উপযুক্ত শাস্তি। কিন্তু তত দূর না গিয়ে আমি তাকে আজীবন গোয়ালিয়র

দুর্গে কারারুদ্ধ করে রাখবার আদেশ দিচ্ছি। তাকে বন্দী করে সেখানে পাঠিয়ে দাও।

আগ্রায় পিতা ও গোয়ালিয়রে পুত্রকে কারারুদ্ধ রেখে ঔরঙ্গজেব ইসলামের সেবা করতে লাগলেন!

সুজার ভারত ত্যাগ

পরের ঘটনাবলী সংক্ষিপ্ত। মহম্মদ সুলতান তাঁর পূর্ব শিবিরে ফিরে গিয়েছেন শুনে সুজা দিশাহারা হয়ে পড়েন, তাঁর যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি লোপ পায়। মীর জুমলা তাঁকে পিছু হটাতে হটাতে একেবারে রাজমহল পর্য্যন্ত চলে আসেন। তার পর নিজের সম্মিলিত নৌবহরের সাহায্যে সৈন্যদের গঙ্গা পার করে তাঁড়া আক্রমণ করলে সুজা পরাজিত হয়ে ঢাকার দিকে পালিয়ে যান। তাঁর রাজধানী রাজমহল বিনা যুদ্ধে মীর জুমলার অধিকারভুক্ত হয় (জানুয়ারী ১১, ১৬৬০)। এই সুসংবাদে উল্লসিত হয়ে ঔরঙ্গজেব মীর জুমলার কাছে এক উৎসাহলিপি ও নূতন এক ডিভিসন সৈন্য পাঠিয়ে দেন।

সুজার সামনে বিপদ ঘনিয়ে আসতে লাগল। শত্রুর সামরিক বল যেখানে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছিল তাঁর সৈন্যসংখ্যা সেখানে ক্রমাগত হ্রাস পেতে লাগল। তাঁড়ার পরও কয়েকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত হোতে দেখে বহু অফিসার তাঁর পক্ষ ত্যাগ করে ঔরঙ্গজেবের পক্ষে চলে গেলেন। শেষ পর্য্যন্ত ঢাকায় পৌছে নূতন সৈন্য সংগ্রহের জন্য তিনি সর্বত্র জমিদারদের কাছে লোক পাঠালেন, কিন্তু তাঁরা সবাই একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে পাশ কাটাতে লাগলেন। এদিকে মীর জুমলা এগিয়ে আসছেন, তাঁর সম্মুখীন হবার মত সম্বল সুজার আর নেই; আবার পালাবার মত জায়গাও মোগল সাম্রাজ্যের কোথাও দেখা গেল না। নিরুপায় সুজা আরাকানরাজ সন্দসুধর্মের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এক পত্র পাঠালেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই রাজা সন্দসুধর্ম সেই পত্রের জবাব পাঠিয়ে জানালেন, যে মহান সুবাদারের বিশ বৎসর বাংলা শাসনের সময়ে মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে আরাকানের কোন সীমান্ত সংঘর্ষ পর্য্যন্ত হয় নি তাঁকে নিজ দেশে অতিথিরূপে পেলে সকল আরাকানবাসী নিজেদের ধন্য মনে করবে। বাদশাহ শাহজাহানের

পুত্র, বাংলার সুবাদার, শাহ সুজাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তারা সব সময়ে প্রস্তুত থাকবে। তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ এই দেশে এসে যাতে শান্তিতে বাস করতে পারেন সেজন্য আয়োজনের কোন ত্রুটি করা হবে না। আরাকানের প্রবেশদ্বার তাঁর সম্মুখে সদাই উন্মুক্ত।

এই পত্র পাবার পর সুজা ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ৬ই. মে পরিবার পরিজন ও চল্লিশজন অশ্বারোহীসহ আরাকানের দিকে রওনা হোলেন। তাঁর সৈন্যসামন্ত, কামানবন্দুক, হয়হস্তী, নৌবহর, রাজকোষ সব কিছু পিছনে পড়ে রইল। কুড়ি বৎসর ধরে একাদিক্রমে যে সুবা তিনি শাসন করেছিলেন তার সীমান্ত অতিক্রম করবার সময়ে তিনি একবার পিছন ফিরে তাকালেন—তাঁর চক্ষের কোণ থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

গোবিন্দ মাণিক্য ও সুজা

ত্রিপুরায় ইতিমধ্যে বিরাট রাস্ট্রবিপ্লব হয়ে গেছে। রাজা কল্যাণ মাণিক্যের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসনে বসলেও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নক্ষত্র রায়ের বিরোধীতার জন্য তাঁকে নানা সমস্যার সম্মুখীন হোতে হয়। ইসলাম খাঁর মত জবরদস্ত সুবাদার সে সময়ে বাংলা শাসন করলে এই ভ্রাতৃদ্বন্দ্বের সুযোগে ত্রিপুরা গ্রাস করতেন, কিন্তু সুজা সেরূপ কিছু না করে কূটনীতির পথ ধরে নক্ষত্র রায়ের কাছে সাহায্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁর বলে বলীয়ান হয়ে নক্ষত্র রায় গোবিন্দ মাণিক্যকে দূরীভূত করেন। মতান্তরে, ভ্রাতৃশোণিত পৃথিবী কলুষিত করবার পরিবর্তে রাজা গোবিন্দ মাণিক্য স্বেচ্ছায় সিংহাসন ছেড়ে আরাকানরাজের আশ্রয়ে চলে যান।

মৃত্যুর পরে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না! গোবিন্দ মাণিক্য এখন মৃত—সুজাও মৃত। উভয়েই রাজ্যহারা। একজন আরাকান রাজের আশ্রয়ে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করছেন, অপরজন আশ্রয়ের জন্য আরাকানের পথে চলেছেন। সুজার আগমনবার্তা পেয়ে গোবিন্দ মাণিক্য তাঁর কাছে এক পত্র পাঠিয়ে অনুরোধ জানালেন কয়েক দিনের জন্য তাঁর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করবার জন্য। সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে সুজা ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙামাটি হয়ে পার্বত্যপথে আরাকানে প্রবেশ করেন। গোবিন্দ মাণিক্যের বাসভবনে অবস্থানের সময়ে

সিংহাসনচ্যুত দুই নরপতি নিজেদের অতীত জীবন ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে আলোচনায় সময় কাটান। অতিথিকে বিদায় দানের পূর্বে গোবিন্দ মাণিক্য তাঁকে একখানি নিমচা ও একটি হীরাঙ্গুরীয় উপহার দেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেগুলি গ্রহণ করে সুজা আরাকানের রাজধানী ম্রহংএর এর পথে রওনা হন।

আরাকানে শাহ সুজা

আরাকান রাজধানীতে উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে। ভারত সম্রাট শাহজাহানের পুত্র, সুবা বাংলার একচ্ছত্র অধিনায়ক, শাহ সুজা আজ এই নগরীতে আসবেন—এই দেশ হবে তাঁর বাকী জীবনের আশ্রয়স্থল। নগরীর প্রবেশদ্বারে পত্রপুষ্পে আচ্ছাদিত সুসজ্জিত তোরণ নির্মিত হয়েছে, রাজা সন্দসুধর্ম মন্ত্রী ও সভাসদবর্গসহ সেখানে অপেক্ষা করছেন মহান অতিথিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। কিছুক্ষণ পরে পরিবার পরিজনসহ সুজা সেখানে এসে উপস্থিত হোলে দুর্গপ্রাকার থেকে তোপধ্বনি করা হোল, বাদ্যকররা বাজনা বাজাল, সকল বৌদ্ধ বিহারে ভিক্ষুগণ অতিথির মঙ্গল কামনায় সূত্র পাঠ করতে লাগলেন। এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পেয়ে বহু দিন পরে সুজার মুখে হাসি ফুটল, যে প্রাসাদ তাঁর জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়েছিল সেখানে পৌঁছে তাঁর মহিষী পরিবানু সেতারযোগে গান ধরলেন।

এই পরিবানুই দ্বিজেন্দ্রলালের অমর নাটক সাজাহানের নায়িকা পিয়ারা। অনিন্দ্য সুন্দরী সদা হাস্যময়ী পিয়ারা গানে বর্ণে রঙে সুজার জীবন ভরিয়ে রেখে-ছিলেন। তাঁর উপস্থিতির জন্য রাজমহলের সুবাদার প্রাসাদ বিশ বৎসর ধরে হাস্যোজ্জ্বল হয়েছিল। এই মহীয়সী নারীর মানসিক গঠন সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল যে চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে অতিরঞ্জন বিশেষ নেই। তিনি ছিলেন সুজার সঙ্গের সাথী, কর্মের প্রেরণা, দুঃখের অংশভাগিনী।

সুজা জ্যেষ্ঠাগ্রজ দারার মত উদারধর্মী না হোলেও ঔরঙ্গজেবের মত ধর্মান্ধ বা মোরাদের মত স্খলিতচরিত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন একেবারে শান্তিপ্রিয় গৃহানুরাগী শাহাজাদা। ঘটনাচক্রে তাঁকে ভ্রাতৃযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে না হোলে তিনি পিয়ারা ও সন্তানদের নিয়ে স্বচ্ছন্দে জীবন কাটিয়ে দিতেন। বিরাট ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পর আরাকানে এসে আর একবার সেরূপ জীবনের আস্বাদন পেয়ে

তাঁর দিন সুখে কাটতে লাগল—রাজ পরিবার ও সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে সামাজিক আদান প্রদানে জীবনতরী মন্দাক্রান্তা তালে বহে চলল। কিন্তু এক দিন তাঁর মাথার উপর যে দুর্যোগ নেমে এল তা ভ্রাতৃযুদ্ধের চেয়ে কম ভয়াবহ নয়।

পিয়ারার জহরব্রত

সেদিন তিনি গিয়েছিলেন সন্দসুধর্মের প্রাসাদে সামাজিক নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বেগম পরিবানু ও তিন কন্যা। এক কন্যার রূপের জ্যোতিতে তরুণ সন্দসুধর্মের চক্ষু ঝলসে যায়—মনে রঙের নেশা লাগে। কয়েক দিন চুপচাপ কেটে গেল। তারপর রাজপ্রাসাদ থেকে এক পদস্থ কর্মচারী সুজার গৃহে এসে জানালেন যে আরাকানরাজ তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থী।

প্রস্তাবটি শুনে সুজার প্রাসাদে প্রবল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল - সন্দসুধর্ম বৌদ্ধ বলে হোক বা আশ্রয়দানের মূল্য হিসাবে এই দাবী করেছেন মনে করে হোক সুজা সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। দুই রাজ পরিবারের মধ্যে এত দিন ধরে যে মধুর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল সেই থেকে তা শূন্যে মিলিয়ে গেল। আশ্রয়দাতা হয়ে উঠলেন শরণার্থী নরপতির শত্রু।

আরাকানরাজ তাঁর মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, এই প্রস্তাবের মধ্যে আপত্তির কারণ যে কি থাকতে পারে তিনি ত বুঝতে পারছেন না। অতীতে চেঙ্গিস খাঁর সময় থেকে মোগল রাজ পরিবারে বহু ভিন্নধর্মীয় ও ভিন্ন জাতীয় তরুণী বধূ হয়ে প্রবেশ করেছে। আবার বহু মোগল তরুণীরও অনুরূপ অসবর্ণ বিবাহ হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই বিবাহের প্রস্তাবে সুজার আপত্তির কারণ কোথায়? সামাজিক মর্য্যাদা? তিনি একটি সার্বভৌম দেশের অধীশ্বর, আর সুজা রাজ্যবিতাড়িত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ব্যতীত তো আর কিছু নন! কন্যাদের তিনি বিবাহ দেবেনই বা কোথায়?

সন্দসুধর্ম সুজাকে সন্দেহ করতে লাগলেন। তাঁর মনে হোল যে সেই সুবাদারের আশ্রয়গ্রহণ একটি অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁর পিতামহ জাহাঙ্গীরের সময় থেকে মোগলরা বারবার আরাকান আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়েছে বলে তাঁর ভ্রাতা দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেব তাঁকে আশ্রয়প্রার্থীর ছদ্মবেশে এই দেশে পাঠিয়েছেন। এক সময়ে সুযোগ বুঝে মোগল ফৌজ আরাকান আক্রমণ

করলে তিনি নিজ রূপে আত্মপ্রকাশ করবেন। এরূপ ছদ্মবেশী শত্রুকে কোনরূপ সুবিধা দেওয়া উচিত নয়—ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে ফেলাই কর্তব্য। কিন্তু বৌদ্ধ তিনি, আশ্রয়প্রার্থীর রক্তপাত করতে পারেন না।

এই ধর্মানুরাগ যখন রাজা সন্দসুধর্মকে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলছিল সেই সময়ে তাঁর জননী পুত্রকে সতর্ক করে দিয়ে বললেন ঃ ভুলে যেয়ো না, শাহ সুজা একজন সাধারণ নাগরিক নন—দিল্লীশ্বর শাহজাহানের পুত্র। তাঁর রক্তে যদি ধরাবক্ষ কলুষিত করো তা হোলে তোমার প্রজারাও রাজরক্তের সন্ধান পাবে, তোমার রক্তে তাদের অভিযোগগুলি চরিতার্থ করবার চেষ্টা করবে। সন্দসুধর্ম জননীর কথা শুনলেন, ধর্মানুরাগ ও চিত্তবৃত্তির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে এক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে আদেশ দিলেন বিনা রক্তপাতে সুজাকে হত্যা করতে। প্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করে কর্মচারিটি গুজব রটাল যে শরণার্থী শাহাজাদা বিশেষ দুরভিসন্ধি নিয়ে আরাকানে এসেছেন, রাজপ্রাসাদ অধিকার করবার চক্রান্ত চালাচ্ছেন। তাতে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়—সুজার অনুচরদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে। তাঁর প্রাসাদও আক্রান্ত হয়। সেই সময়ে কর্মচারীটি সুজাকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রমোদ ভ্রমণের অছিলায় নৌকায় তুলে নিয়ে মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে মারে (১৬৬১, ফেব্রুয়ারী ৭) !

পরিবানু এখন একা। সম্রাট শাহজানের পুত্রবধূ, শাহাজাদা সুজার সহধর্মিনী পরিবানুর, দ্বিজেন্দ্রলালের পিয়ারার, আপন বলতে সারা বিশ্বে আর কেউ নেই ! তাঁর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, কণ্ঠের সঙ্গীত স্তব্ধ হোল। তিনি এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেললেন না, হা হুতাশ করলেন না—দাসীকে আদেশ দিলেন জহরের আগুন তৈরী করতে। তাতে ঝাঁপ দেবার পূর্বে তিনি গাইলেন—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল।
সখি রে, কি মোর করম লেখি,
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু,
ভানুর কিরণ দেখি।

নিচল ছাড়িয়া উচলে উঠিতে
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে দারিদ্র বেড়ল
মাণিক হারানু হেলে
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাস কহে; কানুর পীরিতি
মরণ অধিক শেল।

1. Sarkar Sir Jadunath *History of Aurangzeb*
2. Hall D. G. E. *History of South-east Asia, P. 377*
3 Gerrit Van Voorburg *in Daghregister for 1660*
৪ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সাজাহান

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

মীর জুমলা

পূর্ব জীবন

পারস্যের ইস্পাহান শহরের অধিবাসী মীর জুমলার অধিকাংশ জীবন কাটে ভারতে। অল্প বয়সে ইরাণ থেকে গোলকুণ্ডায় এসে এই ভাগ্যান্বেষী যুবক হীরক ব্যবসায়ীদের দালালের কাজ নিয়ে জীবন স্বরু করেন। তাতে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ধীরে ধীরে কিছু মূলধন সংগ্রহ করে তিনি নিজ নামে একটি কারবারের পত্তন করেন। দেখতে দেখতে কারবারটি ফুলে ফেঁপে ওঠে, অর্থাগমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। কালক্রমে গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী স্বলতান আবদুল্লার সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হয়। স্বলতান দরবারে প্রতিষ্ঠালাভের জন্য ব্যবসায়ের দায়িত্ব পুত্র আমিনের হাতে ছেড়ে দিয়ে তিনি সামরিক বিভাগে যোগ দেন। সেই সময়ে পরপর দুইটি যুদ্ধে তাঁর রণদক্ষতার পরিচয় পেয়ে স্বলতান আবদুল্লা তাঁকে প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত করেন, কিন্তু তিনি দেখেন যে তাতে সম্মান ও ক্ষমতা যথেষ্ট থাকলেও অর্থলাভ বিশেষ নেই। তাই চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে আবার ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। এবার এত বেশী অর্থাগম হোতে লাগল যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তিনি কিছু সৈন্য রাখবার অধিকার স্বলতানের কাছে প্রার্থনা করেন। স্বলতান আবদুল্লা সরল বিশ্বাসে সে অধিকার মঞ্জুর করলেও কিছু দিন পরে দেখেন যে মীর জুমলা পূর্ণ এক রেজিমেণ্ট সৈন্য সংগঠিত করে তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাচ্ছেন। তাঁর কোপানল থেকে বাঁচবার জন্য মীর জুমলা গোলকুণ্ডা ছেড়ে দক্ষিণের মোগল স্বাদার ঔরঙ্গজেবের কাছে পালিয়ে যান।

স্বলতান আবদুল্লা পূর্বে যদি বা সেই বিশ্বাসঘাতকের প্রতি কিছুটা কোমলতা

দেখাচ্ছিলেন তিনি মোগলের শরণাপন্ন হয়েছেন শুনে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে পুত্র আমিনকে কারারুদ্ধ করেন। আশ্রিতবৎসল ঔরঙ্গজেব তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে গোলকুণ্ডা আক্রমণ করলে আবদুল্লা পরাজিত হন ও মীর জুমলার সমস্ত দাবী মেনে নিয়ে ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে সন্ধি করেন। এই সাহায্যের জন্য মীর জুমলা বাদশাহ শাহজাহানের কাছে একটি বৃহৎ হীরকসহ বহু মূল্যবান দ্রব্য উপহার পাঠালে তিনি ঔরঙ্গজেবের সুপারিশক্রমে তাঁকে ছয় হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করেন। যে ব্যক্তি এই সেদিন নিজ প্রভুর রাজ্য অপহরণ করবার জন্য চক্রান্ত চালাচ্ছিল তাকে এইভাবে সম্মানিত করবার প্রস্তাবে শাহাজাদা দারা আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের জেদের জন্য সে আপত্তি টেকে নি।

এই ঘটনার কিছু কাল পরে সুরু হয় বাদশাহ পরিবারের গৃহযুদ্ধ। তাতে ঔরঙ্গজেবকে বুদ্ধি যোগান মীর জুমলা। সুজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তিনি পুত্র মহম্মদ সুলতানকে নিয়োগ করলেও শেষ দায়িত্ব অর্পিত হয় এই নূতন সুহৃদের উপর। মীর জুমলার আক্রমণে সুজা দেশছাড়া হোলে তাঁকে ধরবার জন্য তিনি চুঁচুড়া থেকে একখানি ওলন্দাজ জাহাজ আরাকানে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু সেই পরিকল্পনা বেশী দূর অগ্রসর হবার পূর্বে আরাকানরাজ হতভাগ্যকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে সরিয়ে দেন।

কুচবিহারে ব্যর্থ অভিযান

বাদশাহ পরিবারের সেই গৃহযুদ্ধের সময়ে কুচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণ তাঁর মন্ত্রী ভবনাথ কারজীর নেতৃত্বে কামরূপ আক্রমণ করলে গৌহাটির মোগল ফৌজদার লুৎফুল্লা সিরাজী তাঁর কাছে পরাজিত হয়ে ঢাকায় পালিয়ে আসেন। আসামও সেই গৃহযুদ্ধের সুযোগ নেবার জন্য গৌহাটিতে সৈন্য পাঠালে ভবনাথ কারজী সেখান থেকে নিজ সৈন্যদের সরিয়ে নিয়ে অহম সেনাপতির সঙ্গে একটা সমঝৌতা করে ফেলেন। কামরূপের পশ্চিমার্দ্ধের উপর কুচবিহার ও পূর্বার্দ্ধের উপর আসামের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার কিছু দিন পরে সুজার পতন হোলে মীর জুমলা বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হয়ে ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর বিরাট এক সৈন্যবাহিনীসহ কুচবিহার আক্রমণ করেন। গভীর জঙ্গল কেটে অগ্রসর হওয়ায় তাঁর অগ্রগতি খুব মন্থর হোলেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি

কুচবিহার রাজধানীতে পৌঁছে শোনেন যে রাজা প্রাণনারায়ণ রাজ্য ছেড়ে ভুটানে পালিয়েছেন। তার ফলে বিনা যুদ্ধে কুচবিহার অধিকার করে মীর জুমলা নিজ প্রভুর নামে রাজধানীর নাম রাখেন আলমগীরনগর। প্রভু যে ইসলামের দীন সেবক সেকথা স্মরণ করে তিনি সমস্ত হিন্দু মন্দিরকে মসজিদে পরিণত করেন। নারায়নদেবের বিরাট মন্দিরে যে দেববিগ্রহ ছিল সুলতান মামুদের মত নিজ হস্তে সেটি ধ্বংস করে মুসলমান সিপাহীদের প্রতি আদেশ দেন তারা যেন ছাদে উঠে আজান দেয়।

এইভাবে কুচবিহারের উপর মোগল আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর সৈয়দ মহম্মদ মদককে সেখানকার সুবাদার ও ইসফিয়ান্দার বেগকে ফৌজদার নিয়োগ করে মীর জুমলা আসাম জয়ের জন্য যাত্রা করেন। রাজা প্রাণনারায়ণের দেশত্যাগের পর থেকে কুচবিহারের সর্বত্র যে গণবিপ্লব সুরু হয়েছিল তিনি তা উপেক্ষা করলেও তাঁর প্রস্থানের পর সেই বিপ্লব এমনই প্রবল হয়ে দেখা দেয় যে ইসফিয়ান্দার বেগের পক্ষে তা দমন করা অসম্ভব হয়। বিদ্রোহীরা তাঁকে কোণঠাসা করে ভূটানে রাজা প্রাণনারায়ণের কাছে আহ্বান পাঠায় নিজ রাজ্যে ফিরে আসবার জন্য। যে আহ্বান পেয়ে তিনি ইসফিয়ান্দার বেগের কাছে এক পত্র পাঠিয়ে আদেশ দেন তিনি যেন পত্রপাঠমাত্র কুচবিহার ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। পত্রখানি পেয়ে ভীতসন্ত্রস্ত ফৌজদার কুচবিহার ত্যাগ করে সমস্ত সৈন্যসহ মীর জুমলার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য রওনা হল। কিন্তু সেই সুবাদারের নিজের ভবিষ্যৎ তখন সংশয় দোলায় দোদুল্যমান; আসামে ভীষণভাবে পরাজিত হয়ে তিনি ক্ষুণ্ন মন ও ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে ঢাকার দিকে ফিরে আসছিলেন! সেই সময়ে কুচবিহারত্যাগী ইসফিয়ান্দার বেগ বারিতলায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তিনি কোনরূপ সাহায্য দানে অপারগ দেখে ইসফিয়ান্দার বেগ ভিন্ন পথ ধরে ঢাকার পথে রওনা হন। কুচবিহার যেমন স্বাধীন ছিল তেমনি স্বাধীন থেকে যায়।

আসাম বিপর্য্যয়

বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও ভূগোল সম্বন্ধে ঔরঙ্গজেবের কোন জ্ঞান ছিল না। আসাম ও আরাকানের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পিতা ও পিতামহ

বারবার পরাজিত হয়েছেন জেনেও তিনি মীর জুমলাকে বাংলার সুবাদার নিয়োগের সময়ে লেখেন যে আসাম, আরাকান প্রভৃতি 'বাংলার জমিদাররা' মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছে বলে সংবাদ আসছে; সুতরাং তাদের যেন উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হয়। চীন সম্রাট মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছে এরূপ কোন সংবাদ না পাওয়ায় মহামান্য বাদশাহ্ আলমগীর বাংলার সেই জমিদারটির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য মীর জুমলাকে আদেশ দেন নি!

কাঠমোল্লা বাদশাহর কাঠমোল্লা সুবাদার কুচবিহারে গিয়ে সমস্ত হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে ইসলামের সেবা করেন, কিন্তু মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। মীর্জা ইসফিয়ান্দার বেগকে সেখানে রেখে তিনি ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী আসাম জয়ের জন্য রওনা হন। এই উদ্দেশ্যে রসিদ খাঁর অধীনে যে বিশাল বাহিনী পূর্বাহ্নে ধুবড়ীর দিকে পাঠিয়েছিলেন তাতে মোগল, তুর্কী, আফগান, রাজপুত ও হিন্দুস্থানী ছাড়া পর্তুগীজ, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় সৈন্যও বড় কম ছিল না। সেই বিশাল বাহিনীর রেশন জোগাবার জন্য তিনি বাংলার সকল অঞ্চল থেকে এত বেশী খাদ্যশস্য সংগ্রহ করেছিলেন যে তার ফলে এই সুবার স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। রসিদ খাঁ সেই সৈন্যদের নিয়ে ধুবড়ীতে পৌঁছালে আসাম বাহিনীর দুজন ফুকন ওই নগরী ত্যাগ করে মোনাস নদীর ওপারে চলে যান। তাঁদের কাপুরুষতার সংবাদে বিস্ময়বিমূঢ় রাজা জয়ধ্বজ সিংহ উভয় অফিসারকে কারাগারে পাঠিয়ে বাদুলি ফুকনকে নূতন সেনাপতি নিযুক্ত করেন। শত্রুর গতিরোধের জন্য মোনাস নদীর মুখে যোগীঝোপা দুর্গ সম্প্রসারিত ও সন্নিহিত ব্রহ্মপুত্রের উপর নূতন একটি দুর্গ নির্মাণ করে তিনি রসিদ খাঁকে আসাম ছেড়ে চলে যাবার জন্য এক আদেশ লিপি পাঠান। লিপিটি যখন মীর জুমলার হাতে গিয়ে পৌঁছাল তখন তিনি প্রধান সৈন্যবাহিনীসহ কুচবিহার থেকে ধুবড়ীর পথে রওনা হয়েছেন। রসিদ খাঁ এগিয়ে এসে রাঙামাটিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু কামরূপের সকল জমিদারকে নিজ নিজ ফৌজসহ আসবার জন্য পূর্বাহ্নে আদেশ পাঠান সত্ত্বেও একজনকেও সেখানে দেখা যায় নি। আসামে মোগল ফৌজ যে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হবে সে সম্বন্ধে তাঁদের কারও মনে সন্দেহ ছিল না।

মীর জুমলা যখন তাঁর সম্মিলিত ফৌজসহ যোগীঝোপা দুর্গের সম্মুখে গিয়ে

উপস্থিত হন তখন সেখানে ১২ হাজার অহম সৈন্য অবস্থান করছিল বটে কিন্তু দুর্গাভ্যন্তরে মহামারী দেখা দেওয়ায় সবাই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তার উপর বিরাট মোগল বাহিনীকে আসতে দেখে সকল সৈন্য ভীতসন্ত্রস্ত মনে দুর্গ ত্যাগ করে শ্রীঘাট ও পাণ্ডুতে চলে যায়। এই সংবাদ রাজা জয়ধ্বজ সিংহের কাছে পৌছালে তিনি উভয় স্থানে নূতন কয়েক ডিভিসন সৈন্য পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তারা গন্তব্যস্থলে পৌছাবার পূর্বেই মোগল ফৌজ গিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। তাদের সঙ্গে কয়েকখানি ঘুরবসহ তিন চার শত রণতরী। প্রায় সকল ঘুরব পর্তুগীজ অফিসারের নেতৃত্বে পরিচালিত এবং প্রতিটিতে ১৪টি ভারী কামান এবং তদুপযুক্ত গোলন্দাজ সৈনিক। এই বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হবার মত সম্বল অহমদের না থাকায় তারা আর একবার পশ্চাদপসরণ স্থুরু করলে মীর জুমলা ১৪ই ফেব্রুয়ারী বিনা যুদ্ধে শ্রীঘাট ও গৌহাটি দখল করে নেন। বেলতলা দুর্গও প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাঁর হস্তগত হয়।

এই বিপর্যয়ের সংবাদ কাজালিতে পৌছালে সেখানকার সৈন্যগণ সকল রণসম্ভারসহ ভারেলি নদীর তীরে শ্যামধারায় চলে যায়। এখানে মোগলের গতিরোধ করবার জন্য অহম বাহিনী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে এক ভাগ বড়-গোঁহাইএর অধীনে নদীর উত্তর তীর ও অন্য ভাগ ভিতারা গোঁহাই ও বড়-ফুকনের অধীনে দক্ষিণ তীর রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। নূতন একটি বাহিনী এসে শ্যামধারা ও ভারেলির বিপরীত তীরে অবস্থিত সিমলাগড় দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব নেয়।

এদিকে মীর জুমলা গৌহাটিতে তিন দিন বিশ্রামের পর আসাম রাজধানী গহরগাঁও অভিমুখে রওনা হয়ে ২৮শে ফেব্রুয়ারী সিমলাগড় দুর্গে গিয়ে উপনীত হন। দুর্গরক্ষী সৈন্যরা কয়েক দিন ধরে তাঁকে প্রবলভাবে বাধা দিলেও তিনি শেষ পর্যন্ত সেই দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করেন। বহু ভারী কামানসহ প্রভূত পরিমাণ রণসম্ভার পিছনে ফেলে সকল অহম সৈন্য দুর্গ ছেড়ে স্থানান্তরে চলে যায়।

সিমলাগড়ের পতনের পর যে শ্যামধারা রক্ষা করা সম্ভব নয় সেকথা বুঝে নিয়ে নদীর উত্তর তীরে বড়গোঁহাই সেই দুর্গ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে সমস্ত সৈন্য ও রণসম্ভারসহ পূর্ব দিকে রওনা হন। তাঁর আদেশে পথের উভয় পার্শ্বে সমস্ত

গ্রামবাসীকে সকল খাদ্যশস্যসহ দূরদূরান্তরে চলে যেতে বাধ্য করা হয়। মোগলরা এসে যেন একটি দানাও না পায়! বড়গোঁসাইয়ের বিরুদ্ধে মীর জুমলা যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন তারা বিনা যুদ্ধে শ্যামধারা অধিকার করলে তিনি নিজে তাদের সঙ্গে সমান্তরালভাবে মূল বাহিনীসহ নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর অগ্রসর হন। মোগল নৌবহরও সেই সঙ্গে সমান্তরালে নদীপথ ধরে এগিয়ে চলে। কোলিয়াবরে পৌঁছে মীর জুমলা দেখেন, নদীতীর পর্বতময়; তাই তিনি স্থল বাহিনীকে বেশ কিছুটা দূরে সরিয়ে এনে সমতল ভূমির উপর দিয়ে পরিচালিত করেন। নৌবাহিনী তাঁর সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ঠিক সেই সময়ে আসাম নৌবহর কোথা থেকে এসে তাদের আক্রমণ করলে উভয় পক্ষে সারা রাত ধরে তুমুল যুদ্ধ চলে। প্রভাতে মীর জুমলার স্থলবাহিনী সেখানে এসে উপকূল থেকে কামান দাগতে স্থরু করলে আসাম নৌবহর যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যায়।

উপর্যুপরি এই ব্যর্থতার সংবাদে জয়ধ্বজ সিংহ উভয় তীরের সৈন্যাধ্যক্ষদের কাছে আদেশ পাঠান তাঁরা যেন ব্রহ্মপুত্র ও ডিহিং নদীর সংযোগস্থলে লাখুগড়ে এসে সমবেত হন। সম্মিলিত বাহিনীর সকল প্রচেষ্টা সত্বেও সেই নূতন দুর্গে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হোল না, ৯ই মার্চ মীর জুমলা সেখানে এসে পৌঁছালে সংখ্যাল্পতার জন্য তারা নামমাত্র প্রতিরোধের পর ব্রহ্মপুত্রের অপর তীর ধরে উত্তর-পূর্ব সীমান্তের দিকে রওনা হয়। এখানে নদী ছিল অগভীর, তাই বৃহদাকার মোগল ঘুরবগুলির পক্ষে আর এগোন সম্ভব না হওয়ায় মীর জুমলা তাঁর সমগ্র নৌবাহিনী সেখানে রেখে স্থলবাহিনীসহ গহরগাঁওএর দিকে এগিয়ে যান। চতুর্থ দিবসে গাজপুরে পৌঁছে তিনি শোনেন যে রাজা জয়ধ্বজ সিংহ রাজধানী ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন।

জয়ধ্বজ সিংহের রাজধানী ত্যাগ

মীর জুমলা যখন আরও অগ্রসর হয়ে লাখুগড়ে এসে পৌঁছান আসামরাজ তখন বুড়াগোঁহাইয়ের হাতে রাজধানীর দায়িত্ব অর্পণ করে বড়বড়ুয়া ও বড়ফুকনসহ চরাইদেও এবং সেখান থেকে তরাইসে অভিমুখে যাত্রা করেন। রাজকোষ, রণসম্ভার ও সরকারী কাগজপত্র নিয়ে এক হাজার নৌকা তাঁর সঙ্গে চলে। রাজধানী ত্যাগের পর তিনি সন্ধির প্রস্তাব করে মোগল সেনাপতির

কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য হয়। তখন আসামরাজ আরও পশ্চাদপসরণ করতে করতে শেষ পর্য্যন্ত রাজ্যের শেষ প্রান্তে নামরূপ পাহাড়ে গিয়ে নূতন নীতিতে যুদ্ধ চালাবার আয়োজন করেন। সেখানকার পার্বত্য আশ্রয় থেকে তিনি তিরায় বড়গোঁহাইয়ের কাছে ও অন্যত্র সকল অফিসারকে মাজুলী নদীর তীরে শত্রুর সম্মুখীন হবার জন্য নির্দেশ পাঠান।

এদিকে মীর জুমলা আসাম রাজধানীতে প্রবেশ করে বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের নামে খুৎবা পাঠ ও সিক্কা প্রচার স্বরু করেন। কুঁচবিহারের মত বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়, তবে বাদশাহর নামে রাজধানীর নূতন নামকরণ করা হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। তাঁর এই বিরাট সাফল্যের সংবাদ আগ্রায় ঔরঙ্গজেবের কাছে পৌছালে তিনি বিশেষভাবে উল্লসিত হন। যে মহাবীর স্বজাকে ভারত ছাড়া করে কুচবিহার ও আসামে বিজয় পতাকা উড়িয়েছে তাকে পুরস্কৃত করা অবশ্যই কর্তব্য। মীর জুমলার মনসব বাড়িয়ে দিয়ে ঔরঙ্গজেব তাঁকে মোয়াজ্জিম খাঁ উপাধি প্রদান করেন। বাংলার স্ববাদারীর উপর বিজিত কুচবিহার ও আসামের দায়িত্বও মোয়াজ্জিম খাঁর হাতে প্রদান করবার কথাও তিনি ভাবছিলেন, কিন্তু বিধাতা অন্তরীক্ষে বসে হাসছিলেন! না ঔরঙ্গজেব না মীর জুমলা কেউ জানতেন না কি বিরাট ঝঞ্ঝা তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছিল।

মোগল বাহিনী ধ্বংস

বিজিত আসামে মোগল আধিপত্য প্রসারের জন্য মীর জুমলা বিভিন্ন স্থানে থানা প্রতিষ্ঠিত করে প্রয়োজনীয় ফৌজসহ দায়িত্বশীল অফিসারদের সেখানে পাঠাতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাজ্যের রাজস্ব তালিকা প্রণয়ন করে যে সব অফিসার যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়েছিলেন তাঁদের যথাযোগ্য জায়গীর প্রদান করা হোল। এসব কাজ শেষ করতে বর্ষা এসে গেল—মাঠ-ঘাট জলে জলময় হয়ে উঠল। চারি দিকে জল আর জল! লোকে বাড়ী থেকে বেরোতে পারে না, বাজার হাট সব বন্ধ হয়ে গেল। ঠিক এই দিনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন রাজা জয়ধ্বজ সিংহ। তাঁর সৈন্যবাহিনী ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করেছিল বটে কিন্তু বিলুপ্ত, এমন কি ক্ষয়প্রাপ্ত, হয় নি। শত্রুর কাছে মাথা হেঁট করবার কথা কোন সৈনিকের মনে

ওঠে নি। যথেষ্ট রণসম্ভার মোগলের হাতে পড়েছিল সত্য, কিন্তু অধিকাংশ ছিল অটুট। আসামরাজ পিছু হঠতে হঠতে শত্রুকে এত দূর টেনে এনেছিলেন তার গলায় বরমাল্য দেবার জন্য নয়—ধ্বংস করবার জন্য। এখন স্বনির্বাচিত স্থানে তাকে এনেছেন এবং উপযুক্ত সময়ও এসেছে। তাই তিনি এক দিন আদেশ দিলেন: প্রত্যাক্রমণ সুরু করো। সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার অহম সৈন্য মোগলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

প্রথম আঘাত পড়ল গাজপুরের মোগল রেজিমেণ্টের উপর। অহমদের প্রচণ্ড আক্রমণে রেজিমেণ্টটি এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হোল যে হেড কোয়ার্টারে খবর পৌঁছে দেবার জন্য একজন লোক পর্য্যন্ত অবশিষ্ট রইল না। অন্য সূত্র দিয়ে মীর জুমলার কাছে সে খবর পৌঁছালে তিনি সরন্দাজ খাঁ ও মহম্মদ মোরাদকে সেখানে পাঠালেন। কিন্তু তাদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন ছিল না। এক দিনের নৈশ আক্রমণে অহমগণ উভয়ের ফৌজকে নিশ্চিহ্ন করে দিল। সেখানকার সমগ্র মোগল নৌবহর তাদের হাতে পড়ল ও নৌসৈনিকদের সকলেই নিহত হোল। দেওপানিতেও অহমরা মোগল ফৌজকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে এনেছিল—নূতন একদল সৈন্য এসে তাদের উদ্ধার করে। দিলির খাঁর এক হাজার আফগান সৈন্যের মধ্যে মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রাণে বেঁচে যায়।

মীর জুমলা এত দিন সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন, এখন সাধারণ নাগরিকরাও এসে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। সবাই তাঁর শত্রু; সবাই তাঁর ধ্বংস চায়। সমগ্র জাতি তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। ধনীর প্রাসাদ থেকে শুরু করে দরিদ্রের কুটীর পর্য্যন্ত যে যেখানে ছিল সবাই নিজ নিজ পদ্ধতিতে শত্রুর উপর আঘাত হানতে লাগল। তাদের অনাহারে মারবার জন্য সবাই খাদ্যশস্য পাহাড়ে জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিল, জলাশয়ে আবর্জনা ফেলে পুতিগন্ধময় করে তুলেছিল গহরগাঁও অধিকারের পর মোগল সেনাপতি বেশ কয়েক গোলা শস্য পেয়েছিলেন বটে কিন্তু সেগুলি নিঃশেষ হোলে দেখা গেল যে তাঁর শিবিরে খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে; সৈন্যদের জন্য গম ও চাউল এবং ঘোড়াদের জন্য ঘাস ও দানা সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। নুনের দাম উঠল সের প্রতি ৩০ টাকা, মাখনের দাম তোলা প্রতি ১৫ টাকা। এই দামেও যখন খাদ্যদ্রব্য পাওয়া অসম্ভব হোল তখন মীর জুমলা ফরহাদ খাঁকে লাখুগড়ে পাঠালেন সেখানকার

নৌসৈনিকদের কাছ থেকে কিছু খাবার আনবার জন্য। কিন্তু পথে শত্রু ফরহাদের ফৌজকে নির্মূল করে দেওয়ায় সে আশাও নিঃশেষ হয়ে গেল। বিশাল মোগল শিবিরে খাদ্যদ্রব্যের চিহ্নমাত্র থাকল না।

এই যুদ্ধে মীর জুমলার সহচর ছিলেন ঐতিহাসিক সিহাবুদ্দিন তালিস। মোগলদের এই দুরাবস্থার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, অন্য খাবার যখন কিছুতেই সংগ্রহ করা গেল না তখন সৈন্যরা যে সব ঘোড়া ও উট সঙ্গে করে এনেছিল তাদের মাংস খেয়ে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচাতে লাগল। তাদের দুর্দশা কাহিনী বর্ণনায় প্রসঙ্গে তালিস লিখছেন যে দিল্লীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোন সৈন্যবাহিনী কখনও এরূপ অসহনীয় অবস্থার মধ্যে পড়ে নি। ছয় মাস ধরে বারো হাজার অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক বর্ষার জন্য গহরগাঁওয়ে আটক থাকায় অহমরা তাদের ঘেরাও করে ক্রমাগত আঘাত হানতে লাগল। কিন্তু তারা একেবারেই অসহায়! কোন স্থান থেকে একটি দানাও তাদের কাছে এল না। অফিসাররা দিল্লীর দিকে তাকিয়ে রইলেন, সিপাহীরা স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে মিলনের জন্য অস্থির হয়ে উঠল।

অহমদের এই সামগ্রীক আক্রমণে দিশাহারা হয়ে মোগল সৈনিকরা সকল থানা থেকে রাজধানী গহরগাঁও ও তার অদূরে মথুরাপুরে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। শেষ পর্য্যন্ত মথুরাপুরও যখন হাতছাড়া হয়ে গেল তখন গহরগাঁওয়ের বাইরে দাঁড়াবার আর কোন জায়গা রইল না। যুদ্ধ চলতে লাগল—পরিকল্পনা অনুযায়ী অতি সুশৃঙ্খলভাবে চলতে লাগল। রাজা জয়ধ্বজ সিংহ যখন দেখলেন যে তাঁর অপূর্ব রণনীতির ফলে সমগ্র আসাম মুক্ত হয়েছে তখন তিনি রাজধানী অধিকারের জন্য পার্বত্য আশ্রয় থেকে নেমে এসে গহরগাঁওয়ের কয়েক মাইল দূরে শিবির স্থাপন করলেন। তাঁর সৈন্যদের আক্রমণে গহরগাঁও শেষ পর্য্যন্ত মোগলদের হাতছাড়া হবার আশঙ্কা দেখা দিল। এক দিন তারা ওই সহরে প্রবেশ করে বহু মোগল ছাউনি জ্বালিয়ে দিল এবং আর এক দিন তাদের বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করে সহরের অর্দ্ধাংশ অধিকার করে নিল। এই প্রচণ্ড আক্রমণে জীবন যখন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে সেই সময়ে মীর জুমলার কাছে খবর এল যে কুচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণ স্বরাজ্যে ফিরে এসে মোগলদের তাড়িয়ে দিয়েছেন। পরাজয়ের পর পরাজয়ের গ্লানিতে তাঁর দেহমন অবসন্ন

হয়ে পড়ল, তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হোলেন। যে কয়েকজন অফিসার তখনও জীবিত ছিলেন তাঁরা ঢাকায় ফেরবার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু আসামে প্রবেশ পথ যত সুগম ছিল নিষ্ক্রমণ পথ তত ছিল না।

মীর জুমলা যখন ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের আয়োজনে ব্যস্ত সেই সময়ে রাজা জয়ধ্বজ সিংহ তাঁর প্রধান সেনাপতি বাদুলি ফুকনকে কাপুরুষতার অপরাধে শিবির থেকে দূরীভূত করে কঠোর দণ্ড দেন। রাজরোষ থেকে বাঁচবার আর কোন পথ না দেখে বাদুলি ফুকন মোগলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে মীর জুমলা তাঁকে রাজকীয় সমাদরে নিজ শিবিরে আহ্বান জানিয়ে পূর্ব আসামের সুবাদার নিযুক্ত করেন। যে আসামে তাঁর নিজের দাঁড়াবার জায়গা ছিল না এক ভাগ্যহীন আশ্রয়প্রার্থীকে তার এক অঞ্চলের সুবাদার নিযুক্ত করে তিনি ঢাকার দিকে রওনা হোলেন। তাঁর জীবনীলেখক সিহাবুদ্দিন তালিস বলেন যে আসামরাজ অতি অসম্মানজনক সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়ায় তিনি ওই দেশ ছেড়ে চলে আসেন। কিন্তু একথার কোন ভিত্তি নেই। যে আক্রমণকারী পুরাপুরি পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছে বিজয়ী নরপতি তাঁর সঙ্গে অসম্মানজনক সন্ধিতে আবদ্ধ হবেন কেন?

মীর জুমলা যে বিশাল বাহিনী নিয়ে আসামে গিয়েছিলেন তার অর্দ্ধাংশও তখন অটুট নেই। তাঁর শক্তিশালী নৌবহরের প্রায় সবটাই হয় ধ্বংস নয় শত্রুর অধিকারে চলে গেছে। দিনের পর দিন অহমদের আঘাত সহ্য করে তাঁর নিজের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়েছিল। সেই ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে তিনি গহরগাঁও থেকে লাখুগড় পর্য্যন্ত পাল্কীতে, লাখুগড় থেকে কালিয়াবর পর্য্যন্ত নৌকায়, কালিয়াবর থেকে কাজালী পর্য্যন্ত আবার পাল্কীতে পথ চলেন। এই প্রত্যাবর্তনের সময় তাঁর সৈন্যদের দুর্দশার কোন অন্ত ছিল না। অনাহারজনিত দুর্বলতায় অনেকে পথিমধ্যেই প্রাণ হারায়। দিনের পর দিন নদী বা খালের দূষিত জল ছাড়া আর কোন খাদ্য বা পানীয় তাদের জোটে নি। যারা প্রাণে বেঁচেছিল তাদের সকলেই অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু দুর্যোগের সেখানে শেষ নয়। কাজালীতে পৌছে যখন তারা বিশ্রাম করছিল সেই সময়ে এক দিন প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি ও ভুমিকম্প দেখে তাদের হৃদয় কেঁপে ওঠে, সবাই বলাবলি করতে

থাকে যে বাদশাহ্ ঔরঙ্গজেবের গুনাহার জন্য তাদের মাথার উপর দোজখ নেমে এসেছে !

শেষ পর্যান্ত মীর জুমলা সমস্ত ফৌজকে সঙ্গে নিয়ে কাজালী থেকে ঢাকার দিকে রওনা হোলেন। কিন্তু তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছিল। ঢাকার প্রবেশ পথে তাঁর মৃত্যু হয় (১৬৬৩, মার্চ ৩১)।

1 Inayat Khan *Shah Jahan-nama, Elliot's tr. p. 117*
2 Shihabuddin *Talish Fathiyya-i-Ibratiyya trans. in French Theodore Pavi*
3 Gait E.A. *History of Assam, p. 131-46*
4 Barua P.G. *Assam Buranji, p. 172*

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়

নবাব সায়েস্তা খাঁ

নূরজাহানের পিতৃপরিবারের জয়যাত্রা

সিংহাসনে আরোহণের কিছু দিন পরে ঔরঙ্গজেব যখন দেখেন যে পূর্ব দিকে আসামরাজ জয়ধ্বজ সিংহ ও দক্ষিণে মারাঠা বীর শিবাজী মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দুইটি তীক্ষ্ণ শলাকা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তখন সেই দুষমনদের সম্মুখীন হবার জন্য দুজন যোগ্যতম সেনাপতি মীর জুমলা ও সায়েস্তা খাঁকে বাংলা ও দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করে পাঠান। আসামে গিয়ে মীর জুমলার শেষ পরিণতি যে কি হয়েছিল সে কাহিনী পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর বিরুদ্ধে সায়েস্তা খাঁ এর চেয়ে বেশী কিছু সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। আসামে মীর জুমলা যেমন গোড়ার দিকে শত্রুকে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন দাক্ষিণাত্যে সায়েস্তা খাঁও গোড়ার দিকে তাই করেছিলেন, কিন্তু এক দিন শিবাজী পুণা দুর্গের উপর নৈশ আক্রমণ চালিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করে দেন, তিনি কোনক্রমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসেন।

ঔরঙ্গজেব দেখলেন, দাক্ষিণাত্যে মোগলের অবস্থা খারাপ হোলেও পূর্বভারতে আরও খারাপ। মীর জুমলার মৃত্যুর পর তাঁর সহকারী দিলির খাঁকে বাংলার অস্থায়ী সুবাদার পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি আসাম বা কুচবিহারে পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়া তো দূরের কথা আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাও রক্ষা করতে পারছিলেন না। তাঁর অসুবিধাও কম ছিল না। পূর্বে যেসব কর্ম-নিপুণ অফিসার বাংলায় কাজ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশ হয় সুজার পক্ষে যুদ্ধ করে নয় আসাম অভিযানে গিয়ে লোকান্তরিত হওয়ায় সুবার শাসনযন্ত্র

ভেঙে পড়বার উপক্রম হয়েছিল। তাঁদের স্থান গ্রহণ করবার জন্য নূতনতর অফিসার বাহিনী আসে নি, আবার জুনিয়র অফিসারদের মধ্য থেকে উপযুক্ত লোক তৈরী করা সম্ভব হয় নি। সকল দিক বিবেচনা করে ঔরঙ্গজেব বৃদ্ধ সায়েস্তা খাঁকে বাংলায় পাঠিয়ে দিলির খাঁকে দাক্ষিণাত্যে বদলী করেন। সেখানকার আসল দায়িত্ব পড়ে রাজা জয় সিংহের উপর।

সায়েস্তা খাঁ ছিলেন খানদানী ঘরের লোক -নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর পুত্র। চার বৎসর ধরে শাহজাহান তাঁর পিতা ও সেই সঙ্গে নূরজাহানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও সিংহাসনারোহণের পর আসফ খাঁকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন। ওই পদে সমাসীন থাকবার সময়ে ১৬৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হোলে তাঁর পুত্র সায়েস্তা খাঁকে পিতৃপদে নিযুক্ত করা হয়। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহানের পুত্রগণ যখন পিতৃসিংহাসনের জন্য পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ স্থরু করেন সায়েস্তা খাঁ তখনও প্রধান মন্ত্রী। সেই যুদ্ধের সময়ে তিনি শ্যাম ও কুল দুইই রেখেছিলেন। শাহজাহানের মনোরঞ্জনের জন্য প্রকাশ্যে দারাকে সমর্থন করেন, আবার ভাগিনেয় ঔরঙ্গজেবকে গোপনে সাহায্য দেন। যেমন মামা তেমনি ভাগ্নে! উভয়েই ছিলেন সমান চতুর, সমান কূটনীতিজ্ঞ, সমান ধূর্ত। মাতুলের আবার ছিল অর্থের জন্য একটু বেশী রকমের লালসা!

মসনদে আরোহণের জন্য ঔরঙ্গজেব নিজ বংশকে প্রায় নির্মূল করলেও নূরজাহানের পিতা ইৎমদতুদ্দৌলার বংশের কেশস্পর্শও করেন নি। বরং তাঁর সময়ে তাঁরা সবাই মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বেশ জেঁকে বসেন। সায়েস্তা খাঁ ছাড়া এই বংশের আরও কয়েক ব্যক্তি সাম্রাজ্যের বহু গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন। বাংলায়ও সায়েস্তা খাঁ একা আসেন নি-চার পুত্রকে সঙ্গে এনেছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁ কিছুকাল এখানকার সামরিক বিভাগ পরিচালিত করে বিহারের স্থবাদার নিযুক্ত হন। দ্বিতীয় পুত্র আবু নাসের পিতার তত্বাবধানে উড়িষ্যার স্থবাদারের কাজ করেন। তৃতীয় ইরাদাৎ খাঁর জন্য সায়েস্তা খাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না; শেষ পর্য্যন্ত কুচবিহারে তাঁর একটা ব্যবস্থা করেন। চট্টগ্রাম জয় করে কনিষ্ঠ পুত্র জাফর খাঁকে নিযুক্ত করেন সেখানকার ফৌজদার। কয়েকজন ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভাগিনেয়কেও সঙ্গে এনেছিলেন। স্থবাদার পর্য্যায়ের কোন উচ্চ পদ তাঁরা কেউ আশা করেন নি,

কিন্তু সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত করে তাঁদের প্রতি দায়িত্ব পালন করেন সায়েস্তা খাঁ। নিজের বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেও দু একজনকে নিয়োগ করেন।

ব্যবসায়ী সুবাদার

উজিরী করুন আর সুবাদারী করুন অর্থোপার্জন ছিল সায়েস্তা খাঁর জীবনের একমাত্র কামনা। প্রৌঢ় বয়সে (৬৩) বাংলায় এসে দেখেন যে এখানে তার সুযোগ যতখানি আছে পূর্বে তিনি কোথাও তা পান নি। এই সুবার হুগলী, চন্দননগর, চুঁচুড়া ও কলকাতায় বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি ভারতীয় পণ্য নিয়ে যেরূপ কেনাবেচা করত মোগল সাম্রাজ্যের আর কোথাও তা ছিল না। তাদের সেই বাণিজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য তিনি বাদশাহর কাছ থেকে নিজস্ব জায়গীর হিসাবে হুগলী চেয়ে নেন। ওই শহর থেকে চন্দননগর ও চুঁচুড়ার ফিরিঙ্গী বণিকদের উপর প্রভাব বিস্তারের সুযোগ মেলায় তাঁর কোষাগারে যথেষ্ট অর্থাগম হোতে লাগল। নবাবের নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি লবণ, সুপারী, বাঁশ, জ্বালানী কাঠ, এমন কি ঘোড়ার ঘাসের উপরও একচেটিয়া অধিকার ভোগ করত। হিন্দু বণিকরা এই সব পণ্যের কেনাবেচা করলেও তাঁর কর্মচারীরা সর্বোচ্চ স্তরে বসে মোটা টাকা মুনাফা আদায় করতেন। আবার ফিরিঙ্গী বণিকরা এখান থেকে যেসব জিনিস চালান দিত সেগুলির কয়েকটির উপরও তাঁর একটা না একটা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের একচেটিয়া অধিকার ছিল। এই সব ব্যবসা থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ আমদানি হোত তার কানাকড়িও বাদশাহী কোষাগারে যেত না। বরং বাদশাহ থাকতেন দেউলিয়া হয়ে, সুবাদার তাঁর ব্যাঙ্কারের কাজ করতেন। মারাঠা যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য ঔরঙ্গজেবকে সুবাদার মাতুলের কাছ থেকে মাঝে মাঝে মোটা টাকা ঋণ গ্রহণ করতে হোত। রাজস্ব থেকে যখন ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব হোত না তখন মাতুল সেটা বাদশাহর পেশকাস বলে হিসাবের খাতা থেকে মুছে ফেলতেন। তাতে বাদশাহ খুসী—নবাবও খুসী! কারণ, পরিণামে তাঁর ব্যবসা আরও ফুলে ফেঁপে উঠত।

যিনি সুবার হর্তাকর্তাবিধাতা তিনি যদি বেনামে অধিকাংশ পণ্যের একচেটিয়া কারবার চালান তাহোলে লাভের অঙ্কের কোন সীমা থাকে না। সায়েস্তা খাঁর

এই অর্থোপার্জনের কথা উল্লেখ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী ষ্ট্রানাথান মাষ্টার লণ্ডনে তাঁর কোম্পানীর কাছে লেখেন, ভদ্রলোকের লোভ প্রতি দিনই বেড়ে চলেছে। তাঁর সুযোগ্য দেওয়ান অর্থোপার্জনের জন্য নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করছেন। এত অর্থ তিনি নিজের কোষাগারে জমিয়েছেন যে এখনকার দিনে সমস্ত পৃথিবীতে তার কোন তুলনা নেই। আমি বিশ্বাসযোগ্য লোকের মুখে শুনেছি, নবাব সায়েস্তা খাঁর সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ ৩৮ কোটী ও দৈনিক নিট আয় দুই লক্ষ টাকা। অসমীয়া সূত্র থেকেও এই সম্পদের সমর্থন পাওয়া যায়, তবে তাতে সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ কম—:৭ কোটী টাকা। একুশ বৎসর সুবাদারী করে তিনি এই পরিমাণ অর্থ নিজের জন্য সঞ্চয় করেছিলেন!

সে যুগে নোটের প্রচলন ছিল না, রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে বাণিজ্যিক লেনদেন চলত। নবাব সায়েস্তা খাঁর অর্থগৃধ্নুতার জন্য তাঁর কোষাগারে এত টাকা জমে উঠেছিল যে সর্বত্র টাকার টান দেখা দেয়। তাঁর কর্মচারীরাও প্রভুর দেখাদেখি লক্ষ লক্ষ টাকা নিজেদের কোষাগারে জমা করেন। তার ফলে টাকার অভাবে বাজারে লেনদেন ব্যাহত হয়—দ্রব্যমূল্য নিম্নমুখী হয়ে পড়ে। চাউল, ডাল প্রভৃতি সামান্য যে কয়েকটি পণ্য নবাবের একচেটিয়া কারবারের আওতার বাইরে ছিল সেগুলির দাম অত্যন্ত কমে যায়। চাউল বিক্রয় হয় টাকায় ৮ মণ হিসাবে।

চট্টগ্রাম অধিকার

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ ত্রিপুরা ও আরাকানের সঙ্গে যুদ্ধ করে চট্টগ্রাম অধিকার করলেও মোগল শক্তি ওই বন্দরের উপর কখনও স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। এই নিয়ে আরাকানের সঙ্গে তাদের কয়েকবার যুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু নৌশক্তির দুর্বলতার জন্য তাতে কোন সুবিধা হয় নি। বরং আরাকানীরা মাঝে মাঝে মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে বহু দূর পর্য্যন্ত ঢুকে পড়ে লুটপাঠ চালিয়েছে। মোগল ফৌজ কোন দিন তাদের গতিরোধ করতে না পারায় তারা অর্থ ও অন্যান্য সম্পদ ছাড়া দলে দলে নরনারীকে জাহাজে তুলে নিয়ে দেশে ফিরেছে। সেই হতভাগ্যদের এক অংশকে পর্তুগীজরা

বিদেশে চালান দিয়ে ক্রীতদাসের বাজারে বিক্রয় করত, বাকিদের মধ্যে যারা পুরুষ তাদের আরাকানীরা ক্ষেতখামারের কাজে লাগাত, যারা তরুণী তাদের দিয়ে বারবণিতার কাজ করাত। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে শুধু সাধারণ নাগরিক নয়, উচ্চস্তরের রাজপুরুষরা পর্য্যন্ত মগ ও ফিরিঙ্গীদের নাম শুনলে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ত। স্বয়ং সুবাদার খানাজাদ খাঁ ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে মগদের ভয়ে ঢাকা ছেড়ে রাজমহলে পালিয়ে আসেন।

এক দিকে আরাকান ও অন্য দিকে আসাম ও কুচবিহারের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য সায়েস্তা খাঁ রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী সরিয়ে আনলেও মীর জুমলার শেষ পরিণতির কথা স্মরণ করে আসামের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাবার সাহস পান নি। কিন্তু আরাকান সম্বন্ধে তাঁর ধারণা অন্যরূপ ছিল। ওই দেশের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধের আয়োজন করছেন দেখে ঢাকায় সবাই বলল যে সেখানে বিশেষ সুবিধা হবে না। কারণ, মগরা যেক্ষেত্রে মোগলদের বারবার পরাজিত করেছে মোগলরা সেক্ষেত্রে তাদের একবারও হটাতে পারে নি। তাদের কামান সংখ্যাতীত ও যুদ্ধ জাহাজ অসংখ্য ; পক্ষান্তরে, মোগলের যেটুকু নৌশক্তি ছিল তাও আসাম যুদ্ধে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একথা শুনে শায়েস্তা খাঁ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করেন নি।

আরাকান আক্রমণের জন্য তিনি সবেমাত্র একটি নৌবহর সৃষ্টির কাজ হাতে নিয়েছেন এমন সময়ে তাঁর কাছে খবর এল যে চট্টগ্রামে মগ ও পর্তুগীজদের মধ্যে কলহ সুরু হয়েছে, পর্তুগীজরা প্রাণভয়ে নিজেদের নৌবহরসহ বাংলায় পালিয়ে এসে নোয়াখালির মোগল ফৌজদারের কাছে আশ্রয় নিয়েছে। এতখানি সুযোগ কোন মোগল সুবাদার কোন দিন পান নি। নোয়াখালিতে একজন পদস্থ অফিসার পাঠিয়ে সায়েস্তা খাঁ সকল পর্তুগীজকে নিজের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত করলেন। তাদের অধ্যক্ষকে দেওয়া হোল নগদ দুহাজার টাকা ও মাসিক পাঁচ শত টাকা বেতন। অন্যান্য পর্তুগীজ অফিসাররাও উচ্চ বেতনে নিযুক্ত হোলেন।

এভাবে যে এক ঘৃণ্য মুরের অধীনে কাজ করতে হবে এমন কথা কোন পর্তুগীজ কোন দিন কল্পনা করে নি। কিন্তু চট্টগ্রামের মগ শাসনকর্তাকে শাস্তি দানের আর কোন উপায়ও তো নেই। তাই তাদের অধ্যক্ষ সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় চলে গিয়ে সায়েস্তা খাঁকে পরামর্শ দিলেন : যদি চট্টগ্রাম অধিকার করতে

হয় তবে এই তার সময়। ওই নগরী এখন অরক্ষিত, কেউ আক্রমণ করলে নগর-রক্ষীদের সাধ্য হবে না যে তার প্রতিরোধ করে। আজই সেখানে সৈন্য পাঠান। এই পরামর্শ গ্রহণ করে সায়েস্তা খাঁ তাঁর পুত্র বুজুর্গ উমেদ খাঁর অধীনে একটি ফৌজ চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে পর্তুগীজ নৌবহর ছাড়া একুশ-খানি কামান সজ্জিত ঘুরব ও দুই শতখানি কোসা নৌকা চলল। নৌবহরটি মীর ইবন্ হোসেনের অধিনায়কত্বে অর্পণ করা হোলেও বুজুর্গ উমেদের প্রধান ভরসা ছিল পর্তুগীজদের চল্লিশখানি রণতরী। নৌযুদ্ধের সকল ধাক্কা তারা সামলাবে।

১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর বুজুর্গ উমেদ ঢাকা থেকে রওনা হয়ে নোয়া-খালিতে গিয়ে সেখানে তাঁর আক্রমণের ঘাঁটি স্থাপন করেন। সকল আয়োজন সম্পুর্ণ হোলে ১৪ই জানুয়ারী তাঁর নৌবহর আরাকান সীমান্ত অতিক্রম করে। ২৩শে জানুয়ারী থেকে চট্টগ্রাম এলাকায় উভয় পক্ষে যে নৌযুদ্ধ সুরু হয় তাতে মগ অফিসাররা দেখেন যে তাঁদের পূর্বতন সহকর্মী বহু পর্তুগীজ নাবিক মোগলদের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে। তিন দিন ধরে সমুদ্রে ও সন্নিহিত খাড়িতে যে প্রচণ্ড জলযুদ্ধ চলে তাতে মগরা শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়—মোগল ফৌজ সমুদ্র সৈকতে অবতরণ করে চট্টগ্রাম দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গরক্ষীরা কয়েক ঘণ্টা বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালাবার পর আত্মসমর্পণ করায় বুজুর্গ উমেদ খাঁ ২৭শে জানুয়ারী বীরদর্পে চট্টগ্রাম শহরে প্রবেশ করেন। সেই দিন থেকে চট্টগ্রাম সুবা বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়।

শেষ ভুঁইয়ার মুক্তিলাভ

পূর্বে বলেছি যে হিজলীর আফগান জমিদার বাহাদুর শাহ মসনদ-ই-আলা ছিলেন বারো ভুঁইয়াদের মধ্যে সব চেয়ে চতুর ব্যক্তি। তাঁর সমসাময়িক মুসা খাঁ, ওসমান আফগান, বায়াজিদ কররানি প্রভৃতি ভুঁইয়া রাজগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে বিলীন হয়ে গেলেও তিনি বেশ মাথা উঁচু করে নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। সুজা তাঁকে অবাধ্যতার জন্য রাজমহল দুর্গে বন্দী করে রাখেন, কিন্তু সেই সুবাদার যখন ভ্রাতাদের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়েন সেই সময়ে তিনি কারারক্ষীদের হাত করে বাইরে চলে আসেন। এরূপ চতুর

ব্যক্তিকে বাংলায় রাখা বিপজ্জনক মনে করে মীর জুমলা সুবাদারী গ্রহণের পর তাঁকে পাঠিয়ে দেন সুদূর রণথম্ভোর দুর্গে। কিন্তু বাহাদুর শাহ এখন অশীতিপর বৃদ্ধ হোলেও তাঁকে আটকে রাখবে এমন সাধ্য কার? যখন তিনি শুনলেন যে নবাব সায়েস্তা খাঁ প্রায় তাঁরই মত বৃদ্ধ হোলেও অর্থসঞ্চয়ের দিকে তাঁর আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল তখন মুক্তিমূল্য হিসাবে তাঁকে এক লক্ষ টাকা প্রদানের প্রস্তাব পাঠালেন। এত বড় জীবনের মূল্য মাত্র এক লক্ষ টাকা! কিন্তু বহু দর কষাকষির পর সায়েস্তা খাঁ যখন বুঝলেন যে পাথরে যতই চাপ দেওয়া যাক না কেন আর রস বেরোবে না তখন টাকাটা হস্তগত করে মুক্তির আদেশ পাঠিয়ে দিলেন। রণথম্ভোর থেকে হিজলীতে ফিরে এসে বাহাদুর খাঁ আবার মসনদ-ই-আলা হয়ে বসলেন!

কুচবিহার খণ্ডিত

সিহাবুদ্দিন তালিস বলেন যে মীর জুমলার সময়ে কুচবিহারাধিপতি প্রাণনারায়ন নিজ রাজ্য থেকে মোগলদের তাড়িয়ে দিলেও সায়েস্তা খাঁর আগমনের পর যখন শুনলেন যে নূতন সুবাদার কুচবিহার আক্রমণের আয়োজন করছেন তখন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হয়ে তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। নগদ পাঁচ লক্ষ টাকা গ্রহণ করে সায়েস্তা খাঁ কুচবিহার সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে আনেন।

এই ঘটনার পর থেকে কুড়ি বৎসরের মধ্যে কুচবিহারেয় সঙ্গে মোগলের বিবাদের কোন কারণ না ঘটলেও সায়েস্তা খাঁ যখন শুনলেন যে ওই রাজ্যে বহুবিধ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা চলছে তখন সেদিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ ছাড়া তাঁর নিজস্ব প্রয়োজনে কুচবিহার গ্রাস করা অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছিল। দুই পুত্রকে তিনি বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার এবং আর এক পুত্রকে চট্টগ্রামের ফৌজদারের পদে বসিয়েছিলেন বটে, কিন্তু চতুর্থ পুত্র ইরাদাৎ খাঁর জন্য কিছু করে উঠতে পারেন নি। কোথাও কোন সুযোগ না পেয়ে বেচারী রাঙামাটির থানাদার হয়ে মুখ বিষণ্ন করে বেড়াত! এই পুত্রের মুখ চেয়ে সায়েস্তা খাঁ এক দূত পাঠিয়ে নূতন কুচবিহাররাজ মোদনারায়ণের কাছে দশ লক্ষ টাকা পেশকাস দাবী করেন এবং তিনি তা দিতে অসম্মত হোলে তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠান। রাজা মোদনারায়ণ বেশ কিছু দিন ধরে লড়লেন, কিন্তু

শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়ে জঙ্গলবহুল অঞ্চলে গিয়ে আশ্রয় নেন। তাঁর রাজ্যের বাকি অংশ মোগল ফৌজ অধিকার করলে সেই অংশের সুবাদার নিযুক্ত হন ইরাদাৎ খাঁ (১৬৮৫, এপ্রিল)। এইভাবে এখনকার রংপুর ও বগুড়া জেলায় আধিপত্য স্থাপন করে মোগলরা কুচবিহারের অভ্যন্তরভাগে অনুপ্রবেশ করতে করতে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে বোদা পাঠগ্রাম পর্য্যন্ত নিজেদের অধিকার সম্প্রসারিত করে।

ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ

পর্তুগালের তারকা তখন নীচের দিকে নেমে গেলেও ইউরোপ থেকে নূতন নূতন জাতি এসে ইতিমধ্যে বাংলায় ব্যবসা সুরু করেছিল। ইংরাজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে বালেশ্বরে ও ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে হুগলীতে দুইটি কুঠি স্থাপন করে পূর্ব ভারতের সঙ্গে লেনদেন চালাচ্ছিল। গোড়ার দিকে তাদের ব্যবসা উৎসাহজনক না হোলেও ধীরে ধীরে সুদিন দেখা দেয়, ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তারা বাংলা থেকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মাল বিদেশে রপ্তানী করে। তাদের এই স্বচ্ছলতা মোগল রাজপুরুষদের, বিশেষ করে হুগলীর শুল্ক সংগ্রাহক বালচাঁদের, চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়। ইংরাজদের তারা এত রকমে হয়রানি করতে থাকে যে শেষ পর্য্যন্ত কাজকর্ম্ম চালান অসম্ভব হয়ে পড়ে। মাদ্রাজ থেকে অনুজ্ঞা পেয়ে বাংলায় কারবার গোটাবার পূর্বে শেষ চেষ্টা হিসাবে কোম্পানীর এজেণ্ট উইলিয়ম হেজেস প্রতিকারের আশায় ঢাকায় গিয়ে সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু যে ভূত সর্ষের মধ্যে বাস করছে কোন সর্ষে দিয়েই তাকে তাড়ান যায় না। হেজেস নবাবের কাছে সৌজন্য পেলেন যথেষ্ট, কিন্তু কতকগুলি অর্থহীন প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছুই আদায় করতে পারলেন না। নবাব কথা দিয়েছিলেন যে ইংরাজরা যাতে বাদশাহর কাছ থেকে ফরমান পায় সেজন্য তিনি সাধ্যমত চেষ্টা করবেন, কিন্তু হেজেস হুগলীতে ফিরে এসে দেখেন যে তাঁর কর্ম্মচারীরা শুল্ক আদায়ের জন্য ইংরাজের জাহাজ থামিয়ে মাল আটক করেছে।

মোগল রাজপুরুষদের এই সব হায়রানিতে উত্যক্ত হয়ে হেজেস লণ্ডনে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে লেখেন যে বাংলায় ব্যবসা করতে হোলে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য সব সময়ে তৈরী থাকতে হবে। তাতে ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ মোগল সাম্রাজ্য বিশাল হোলেও তার

অন্দরে কন্দরে ঘুণ ধরেছে। বহিঃশত্রুরাও যথেষ্ট প্রবল। আমরা যদি সাহস করে তার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াই তা হোলে দেখব, যে মরণকে ভয় করছি সে মরণ আমাদের চেয়ে বেশী ভীরু। ডিরেক্টররা হেজেসের এই যুক্তি গ্রহণ করে ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় জেমসের দরবার থেকে এই অনুমতি আদায় করলেন যে কোম্পানী নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজন হোলে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবে। অনুমতি পাবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে লাগল। বৈশ্যের হাতে উঠল ক্ষত্রিয়ের তরবারি! ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে ভারতের দুই উপকূলে কয়েকখানি সৈন্যবাহী জাহাজ এসে উপস্থিত হোল—বাংলায় এল তিনখানি। ঢাকায় সায়েস্তা খাঁর কাছে যথা-রীতি সে সংবাদ পৌছালে তিনিও হুগলীতে নূতন এক ডিভিসন সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন।

এক দিকে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য ও অন্য দিকে মুষ্টিমেয় ইংরাজ বণিক। রাজশক্তির অর্থগৃধ্নুতার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে দুই শিবিরে যে বারুদের স্তূপ জমা হচ্ছিল তাতে প্রথম অগ্নি সংযোগ করেন হুগলীর ফৌজদার আবদুল গণি। অতি তুচ্ছ কারণে তিনি ইংরাজদের কুঠীতে আগুন ধরিয়ে গঙ্গাবক্ষে তাদের যে সব বাণিজ্যতরী ছিল সেগুলির উপর গোলাবর্ষণ সুরু করেন। কিন্তু নবীন উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ বণিক যখন ঘুরে দাঁড়াল ফৌজদার আবদুল গণিকে তখন খুঁজে পাওয়া গেল না। ক্ষিপ্র গতিতে তাঁর ফৌজকে পর্য্যুদস্ত করে ইংরাজরা হুগলী সহরের অর্দ্ধাংশ জ্বালিয়ে দিল—তাঁর কামানগুলিও অধিকার করল। আবদুল গণি অনন্যোপায় হয়ে চুঁচুড়ায় পালিয়ে এসে ওলন্দাজদের মারফৎ সন্ধির কথাবার্তা সুরু করলেন। কিন্তু ইংরাজরা জানত যে তাঁর পিছনে রয়েছে সুবাদার সায়েস্তা খাঁ এবং তাঁরও পিছনে স্বয়ং বাদশাহ ঔরঙ্গজেব। সেই কারণে তাঁর চাতুরীতে বিভ্রান্ত না হয়ে তারা সমস্ত মালপত্রসহ চব্বিশ মাইল দক্ষিণে সুতানুটি গ্রামে এসে নূতন করে কুঠী স্থাপন করল। আবদুল গণির প্রার্থিত সৈন্যরা যখন ঢাকা থেকে হুগলীতে এসে পৌছাল তখন সেখানে একজনও ইংরাজ নেই!

সুতানুটিতে এসে কোম্পানীর নূতন এজেন্ট জব চার্ণক সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে আর একবার মীমাংসার চেষ্টা করলে তিনি সাফ জবাব দিলেন যে ইংরাজদের

বাংলা থেকে চিরদিনের মত বিদায় লওয়া ছাড়া অন্য কোন সর্তে তিনি সম্মত হোতে পারেন না। এর পর সুতানুটিতে থাকাও নিরাপদ হবে না বুঝে ইংরাজরা আরও দক্ষিণে সরে এসে মেটিয়াব্রুজ ও হিজলীতে দুটি নূতন কুঠি স্থাপন করল। একটি ইংরাজ রেজিমেণ্ট বালেশ্বরে গিয়ে সেখানকার মোগল দুর্গ দখল করে সহরটি জ্বালিয়ে দিল।

সায়েস্তা খাঁ চুপচাপ বসে ছিলেন না। হিজলী থেকে ইংরাজদের তাড়াবার জন্য তিনি বারো হাজার সৈন্যসহ আবদুল সামাদকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। ইংরাজরা একে সংখ্যায় নগন্য তায় ম্যালেরিয়ার আক্রমণে তাদের অধিকাংশ সৈন্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবু তারা আক্রমণকারীদের প্রবলভাবে বাধা দিল, রসুলপুর নদীর দুই তীর থেকে উভয় পক্ষ পরস্পরের উপর গোলা বর্ষণ করতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মোগলরা নদী পার হয়ে হিজলীতে প্রবেশ করলে যে মুষ্টিমেয় ইংরাজ সেখানে ছিল তারা বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালায়, কিন্তু কোন আশা নেই দেখে শেষ পর্য্যন্ত জাহাজে উঠে ওই বন্দর ত্যাগ করে (১৬৮৭, ১১ই জুন)।

মোগলের পক্ষে সময়টি ছিল অত্যন্ত দুর্য্যোগপূর্ণ। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সাম্রাজ্যের সকল সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে—পার্বত্য মুষিকরা বাদশাহকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলছে। সেই কারণে সায়েস্তা খাঁ এই নূতন শত্রুর সঙ্গে কলহ আর বেশী দূর গড়াতে না দিয়ে উলুবেড়িয়ায় কুঠি নির্মাণ করে ব্যবসা চালাবার অধিকার দিলেন। তাঁর কাছ থেকে আহ্বান পেয়ে জব চার্ণক সুতানটিতে ফিরে এলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে পশ্চিম উপকূলে ইংরাজের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ বাধায় নবাব তাদের উপর আবার খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। জব চার্ণককে আবার কলিকাতা ত্যাগ করতে হয়।

এই বিপত্তি সত্বেও ইংরাজদের হতোদ্যম হবার কারণ হয় নি। মারাঠা যুদ্ধের অবস্থা তখন রীতিমত দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ময়ূর সিংহাসন শূন্য রেখে ঔরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে গিয়ে নিজে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। সেই যুদ্ধের উপর অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকের ন্যায় ইংরাজদের দৃষ্টিও নিবদ্ধ রয়েছে। মারাঠাদের কৃতিত্বে বুকে বল পেয়ে তাদের নূতন এজেণ্ট ক্যাপ্টেন হিল সায়েস্তা খাঁর ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ২৯শে নভেম্বর

বালেশ্বর দুর্গ অধিকার করেন। তিনি তিন মাস পরে মাদ্রাজে চলে গেলেও এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন মোগল ফৌজ দুর্গটি অধিকার করবার জন্য সেখানে এল না—মারাঠা যুদ্ধের জন্য তাদের সেরূপ সামর্থ ছিল না। তার কিছু দিন পরে .৬৮৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে সায়েস্তা খাঁ পরলোক গমন করলে যিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আসেন তাঁর পক্ষেও ইংরাজদের বিরুদ্ধে কোন অভিযান পাঠান সম্ভব হোল না।

পশ্চিম উপকূলে ইংরাজদের সঙ্গে যে যুদ্ধ চলছিল ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তার উপসংহার হওয়ায় ঔরঙ্গজেব বাংলার নূতন সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে আদেশ পাঠালেন, তিনি যেন সকল ফিরিঙ্গী বণিককে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার সুযোগ দেন। কারণ, তাতে সাম্রাজ্যের আর্থিক লাভ হচ্ছিল যথেষ্ট। সেই আদেশ অনুযায়ী ইব্রাহিম খাঁ মাদ্রাজে ইংরাজদের কাছে এক পত্র লিখে জানান যে তারা বাংলায় ফিরে এলে ব্যবসা বাণিজ্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না। পত্রখানি পেয়ে জব চার্নক ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট আর একবার সুতানটিতে এসে অবতরণ করেন। নূতন কলকাতার ভিত্তি সেই দিন স্থাপিত হয়।

পর্তুগালের পতন

পূর্বের এক অধ্যায়ে বলেছি যে মোগলরা যখন ভারতের উত্তর-পূর্ব দ্বারপ্রান্তে এসে আঘাত হানছিল পর্তুগীজরা তখন এসে উপনীত হয় দক্ষিণ দ্বারপ্রান্তে কালিকট বন্দরে। ভাস্কো-ডা-গামা সেখানে পৌছান ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে এবং আলবুকার্ক গোয়া অধিকার করে সেখানে পর্তুগালের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন ১৫১৬ খৃষ্টাব্দে। সেই সময়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে পর্তুগীজদের যে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে আয়তনে তা মোগল সাম্রাজ্যের চেয়ে বড় এবং আয়ুতে অধিকতর দীর্ঘ হোলেও কাল হয়ে দেখা দেয় পর্তুগালের আর্থিক দুরবস্থা ও উৎকট মুর বিদ্বেষ। যে বিশাল সাম্রাজ্য তারা স্থাপন করেছিল তা নিয়ন্ত্রণের মত লোকবল পর্তুগালের ছিল না। তার উপর সকল মুসলমানকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় দক্ষ শ্রমিকের :অভাবে অর্থনীতিতে দারুণ বিপর্যয় দেখা দেয়।

কিন্তু সে দেশের শাসকশ্রেণী ঠেকেও শেখে নি। মুর বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে ভাস্কো-ডা-গামা যেমন মক্কায় গিয়ে হজরত মহম্মদের পবিত্র দেহ কবর থেকে তুলে আনবার দুরভিসন্ধি করেছিলেন রাজা স্যান স্যাবাষ্টাও তেমনি ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে মরোক্কোয় মুরদের বিরুদ্ধে ক্রুশেড চালাতে গিয়ে রাজ্যের আর্থিক সঙ্গতি একেবারে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেন। তার দুই বৎসর পরে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশ নিঃশেষ হয়ে গেলে স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ পর্তুগালের সিংহাসন দাবী করে বসেন এই কারণে যে তাঁর জননী ও পত্নী উভয়েই ওই দেশের রাজকন্যা। পর্তুগীজরা এ দাবী না মানলেও ফিলিপকে বাধা দেবার মত সামর্থ না থাকায় তাদের দেশ স্পেনের অধিকারে চলে যায়।

জন্মভূমি বিদেশীর হাতে চলে যাওয়ায় বাংলা ও আরাকানে যে সব পর্তুগীজ বাস করছিল তারা মূলহীন বৃক্ষে পরিণত হয়। কিছু দিনের মধ্যে সে মূল গেল শুকিয়ে, কিন্তু কাণ্ডটি শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে দাঁড়িয়ে রইল। এরূপ বৃক্ষ বাঁচবে কেমন করে? বাংলায় এই পর্তুগীজদের অনেকেই ছিল উচ্চ শিক্ষিত—ইউরোপের এক প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় কায়েমব্রায় শিক্ষা সমাপনের পর তারা এদেশে এসেছিল। তার উপর সামরিক ও নৌবিদ্যায় সারা বিশ্বে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না। কিন্তু স্পেনরাজ তাদের দেশ অধিকার করায় সেই সমুন্নত সম্প্রদায় দিশাহারা হয়ে পড়ে—নিজ নিজ নৌবহরসহ কেউ বা আরাকানের বৌদ্ধ নরপতি, কেউ বা বাংলার প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায়, রামচন্দ্র বসু প্রভৃতি হিন্দু ভূস্বামীদের কাঁধে ভর করে আত্মোন্নতির পথ খুঁজতে থাকে। কিন্তু তাতে শেষ পর্য্যন্ত সুবিধা না হওয়ায় এক শিক্ষিত গর্বিত ক্ষত্রিয় জাতি বোম্বেটে জলদস্যুতে পরিণত হয়!

উদীয়মান বৃটিশ সূর্য্য

আগে থেকেই আমেরিকা ও ইউরোপে স্পেনের বিশাল সাম্রাজ্য ছিল। তার উপর ছলেবলেকৌশলে পর্তুগাল অধিকার করে রাজা ফিলিপ দুর্দমনীয় হয়ে ওঠেন। বিজিত দেশের পরলোকগত নরপতি স্যান স্যাবাষ্টাওএর মত তিনি শুধু মুসলমান বা ইহুদী নয় ভিন্ন মতাবলম্বী খৃষ্টানদেরও সইতে পারতেন না। প্রোটেষ্টাণ্টদের পীঠস্থান ইংলণ্ড জয় করে সেখানে রোমান ক্যাথলিক

মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজের দুর্জয় আর্মাডা ওই দেশের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু বিধাতা অন্তরীক্ষে বসে হাসছিলেন! ইংরাজ এ্যাডমিরাল ড্রেকের বীরত্ব ও প্রবল ঝঞ্ঝাবাত্যায় শক্তিশালী রণতরী সম্বলিত সেই বিশাল আর্মাডা ধ্বংস হয়ে যায়—জলপথের উপর স্পেনের প্রাধান্য চিরতরে লোপ পায়।

এত দিন অ্যাটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর ছিল স্পেন ও পর্তুগালের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু স্পেনের কাছে পর্তুগালের পরাজয় ও তার ছয় বৎসর পরে স্পেনীয় আর্মাডা ধ্বংসের ফলে ইংলণ্ডের নৌবহর সেই স্থান অধিকার করে নেয়। ঠিক সেই সময়ে বিভিন্ন দেশ থেকে রোম্যান ক্যাথলিক ও মুসলমানদের হাতে নিগৃহীত প্রোটেষ্ট্যাণ্ট ও ইহুদীগণ দলে দলে এসে ইংলণ্ডে আশ্রয় নেওয়ায় ওই দেশের আর্থিক বনিয়াদ বেশ দৃঢ় হয়ে ওঠে। হলাণ্ড থেকে যে সব প্রোটেষ্ট্যাণ্ট এসেছিল তারা ইংরাজদের শেখায় কাপড় ও ঘড়ি তৈরী এবং ধাতুর কাজ; ফ্রান্সের প্রোটেষ্ট্যাণ্ট শরণার্থীরা শেখায় উল বোনা ও রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর কাজ। কৃষিপ্রধান ইংল্যাণ্ডে শিল্পায়নের বীজ এইভাবে উপ্ত হয়। মুসলমানদের অত্যাচারে যেসব ইহুদী কনষ্ট্যান্টিনোপ্‌ল থেকে পালিয়ে এসে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিল তারা শেখায় ব্যাঙ্কিং ও বৃহদাকার ব্যবসা সংগঠনের পদ্ধতি। ইংরাজ নাবিকদের বীরত্ব এবং এই সব শরণার্থী কারিগর ও ব্যবসায়ীদের কর্মদক্ষতায় ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জীবন নূতন রূপ নেয়। রাণী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্ব ওই দেশের স্বর্ণ যুগের সূচনা করে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

সেই রাণীর রাজত্বকালে প্রধানত ইহুদী শরণার্থীদের প্রেরণায় সপ্তদশ শতাব্দীর সমাপ্তি দিবসে শুভ গোধুলি লগ্নে কয়েকজন ইংরাজ বণিক প্রাচ্য জগতের সঙ্গে বাণিজ্য করবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে এক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর কোম্পানীটি যখন বিধিবদ্ধ হয় তখন তার অংশীদারের সংখ্যা ছিল ১২৫ এবং মূলধনের পরিমাণ ৭২ হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ কমবেশী ১২ লক্ষ টাকা। এই মূলধন দিয়ে নিজেদের

জাহাজ তৈরী করে তাঁরা আমেরিকা ও এশিয়ায় গিয়ে বাণিজ্য চালাবেন। কোম্পানীর প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত হন স্যার টমাস স্মিথ।

ঠিক সেই সময়ে বর্দ্ধমান জেলার উজানী গ্রাম থেকে ধনপতি সওদাগর ডিঙি ভাসিয়ে ব্যবসা করতে যাচ্ছিলেন সাগর পারে। জাহাজী ব্যবসায়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ইংরাজদের চেয়ে কম ছিল না, কিন্তু সমুদ্রপথের উপর আধিপত্য না থাকায় সকল প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়। ইংরাজদেরও পূর্বে সেরূপ আভিজ্ঞতা ছিল না, কারণ পর্তুগালের পতনের পর স্পেনরাজের বশম্বদ প্রজা হিসাবে হল্যাণ্ডের ওলন্দাজরা প্রাচ্য জগতের সকল বাণিজ্য অধিকার করে নিয়েছিল। তাদের সময়ে ইংলণ্ডের বাজারে মরিচের দাম হঠাৎ তিন শিলিং থেকে চড়ে গিয়ে আট শিলিংএ দাঁড়ানয় ইংরাজরা রুষ্ট হয়ে ওঠে এবং প্রধানতঃ ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংগঠন তরান্বিত করে।

রাণী প্রথম এলিজাবেথ কোম্পানীকে ১৫ বৎসরের জন্য উত্তমাশা অন্তরীপ ও ম্যাগেলান প্রণালীর ওপারে সকল দেশের সঙ্গে ব্যবসা করবার একচেটিয়া অধিকার প্রদান করেন এই সর্তে যে সেখানকার সওদা এনে কোম্পানী ইংলণ্ডের বাজারে ন্যায্য দামে বিক্রয় করবে এবং ইংলণ্ডের সওদা সে সব দেশে নিয়ে যাবে। এই ন্যায়সঙ্গত কাজে কেউ যদি বাধার সৃষ্টি করে তার জাহাজ ও পণ্য বাজেয়াপ্ত করবার অধিকার কোম্পানীর থাকবে। সর্তগুলি সুষ্ঠুভাবে পালিত হওয়ায় রাণী এলিজাবেথের উত্তরাধিকারী প্রথম চার্লস ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় সনদের মেয়াদ বাড়িয়ে চিরস্থায়ী করেন।

সনদ পেয়ে কোম্পানীর জাহাজ বাণিজ্য করবার জন্য আমেরিকায় যায় ও ভারতে আসে। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের বাইরে মসলিপত্তম সহরে তাদের প্রথম কুঠি স্থাপিত হয় ১৬১১ খৃষ্টাব্দে। উত্তর ও পূর্ব ভারতের সঙ্গে লেনদেনের পরিকল্পনা মোগল রাজপুরুষদের প্রতিবন্ধকতার জন্য ব্যাহত হচ্ছিল বলে কোম্পানীর ডিরেক্টদের অনুরোধে ইংলণ্ডেশ্বর রাজা জেমস ১৬১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্যার টমাস রোকে আগ্রায় জাহাঙ্গীরের দরবারে পাঠিয়ে দেন। সে যুগীয় দুর্বোধ্য ইংরাজীতে লিখিত টমাস রোর ডায়েরিতে সমসাময়িক ভারতের বহু বিচিত্র চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। তিনি জাহাঙ্গীরের শ্যালক-উজীর আসফ খাঁকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করেন। আসফ খাঁর ভগ্নী মেহেরুন্নিসা তখনও

নুরমহল—নুরজাহান হন নি। নুরমহলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে রো তাঁকে জাহাঙ্গীরের দাসী বলে ভুল করেছিলেন—পরে তাঁর অনুকম্পা লাভ করে বাদশাহর কাছ থেকে বালেশ্বর, হুগলী ও সুরাটে কুঠী নির্মাণের সনদ পান। কিন্তু বাদশাহী সনদ লাভ সত্বেও রাজপুরুষদের কাছ থেকে নানাভাবে বাধা আসছিল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অন্যান্য ইওরোপীয় কোম্পানী তাদের নানাভাবে হয়রানি করছিল বলে আত্মরক্ষার জন্য কোম্পানী একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থলের অন্বেষণ করে এবং শেষ পর্য্যন্ত ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে সেণ্ট জর্জ দুর্গ নির্মিত হয়।

অর্দ্ধ শতাব্দী বাণিজ্য চালাবার পর কোম্পানীর কারবারে মন্দা দেখা দেওয়ার কাজকর্ম গোটাতে হয়। তার পরই নূতন এক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে তার স্থান গ্রহণ করে। তার এগার বৎসর পরে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বর দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগালের রাজকুমারী ক্যাথারিনকে বিবাহ করে বোম্বাই বন্দর যৌতুক পেয়ে সেটি কোম্পানীকে উপহার দেন। কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মিত হয় তার অনেক পরে—১৭০১ খৃষ্টাব্দে।

1 Ghulam Husain Salim *Riyaz-us-Salatin, p. 223, 248*
2 Saqi Mustad Khan *Maasir-i-Alamgiri, p. 351, 369*
3 Master S. *Diary, i. 32. 55, 80, ii 268*
4 Bhuyan S. K. *Annals of Delhi Padshahatc*
5 Chatterton E. K. *The old East Indiaman, p. 112, 123*
6 Wilson C. R. *Early Annals of English in Bengal, p. 90-96*
7 Livermore H. V. *History of Portugal p, 289*
8 *Embassy of Sir Thomas Roe, ed. W. Foster, p. 394, 401, 411*

চত্বারিংশ অধ্যায়

মেদিনীপুর বিদ্রোহ

আসাম বিপর্যয় ও মারাঠা অভ্যুদয়ের প্রতিক্রিয়া

পিতাকে বন্দী, ভ্রাতাদের হত্যা ও পুত্রকে কারারুদ্ধ করে ময়ূর সিংহাসন অধিকার করলেও ঔরঙ্গজেব কোন দিন শান্তি পান নি। তখ্‌তে বসবার অল্প দিন পরে তাঁকে শুনতে হয় যে মীর জুমলার বিশাল বাহিনী আসামে গিয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে এবং সায়েস্তা খাঁ শিবাজীর কাছে পরাজিত হয়েছেন। মীর জুমলার পরাজয় আসাম যুদ্ধের সূত্রপাত—উপসংহার নয়। তাঁর পলায়নের পর রাজা জয়ধ্বজ সিংহ চেয়েছিলেন মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে, কিন্তু তাঁর আকস্মিক তিরোধানের ফলে সে পরিকল্পনা কয়েক বৎসরের জন্য স্থগিত থাকলেও পরিত্যক্ত হয় নি। গদাধর সিংহ (১৬৮১-৯৬) আসামের রাজদণ্ড হাতে নিয়ে মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বিরাট আকারে সমরসজ্জা সুরু করেন। সে সংবাদ যথারীতি ঔরঙ্গজেবের কাছে পৌঁছালেও তিনি নিরুপায়, কারণ পার্বত্য মূষিক তখন ব্যাঘ্র হয়ে তাঁকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে!

অহম বাহিনীর সম্মুখীন হবার জন্য সুবাদার সায়েস্তা খাঁ তাঁর পুত্র ইরাদাৎ খাঁসহ বহু সৈন্যাধ্যক্ষকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে ফিরে আসেন। তাঁদের সকল প্রতিরোধ চূর্ণ করে অহমগণ বাঁশবাড়ী ও কাজালী দুর্গ অধিকার করে গৌহাটীর দিকে এগিয়ে আসে। এখানেও মোগলরা পরাজিত হওয়ায় গৌহাটী, পাণ্ডু ও ধুবড়ীর উপর রাজা গদাধর সিংহের অধিকার দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই থেকে কামরূপের এই অংশ আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। প্রকৃত আসামের সুরু দড়ং জেলা থেকে।

এর চেয়েও ভয়ঙ্কর হয়ে দেখা দেয় মহারাষ্ট্রে শিবাজীর অভ্যুদয়। সেই

সৈনিকের প্রথম জীবন ভিন্ন রাজ্যে স্বরু হোলেও ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার জন্য তিনি মোগল সাম্রাজ্যে এসে লুঠপাঠ চালাতে থাকলে তাঁকে বশীভূত করবার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি হয় নি। কিন্তু সকল আয়োজন ব্যর্থ করে হিন্দুত্বের রক্ষক সেই মহাবীরের অভিষেক ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে সম্পন্ন হয়। তার পূর্বে তিনি বার বার মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন—পরেও করেছেন। প্রায় সকল যুদ্ধে বিজয়লক্ষ্মী তাঁর গলায় বরমাল্য দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেব যখন দেখলেন যে সত্মজাগ্রত মারাঠা শক্তি তাঁর সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে তখন তিনি রাজধানী ছেড়ে দাক্ষিণাত্যে চলে গিয়ে নিজে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলেন; বৎসরের পর বৎসর তাঁর জীবন পাহাড়ে প্রান্তরে অতিবাহিত হোল। তবু তিনি শিবাজীকে দমন করতে পারলেন না। রক্তহীনতায় তাঁর সাম্রাজ্যের আপাদমস্তক পাংশুবর্ণ ধারণ করল।

এই ঔরঙ্গজেব! সকল মানবতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে মসনদে আরোহণ করলেও তিনি আসামের জয়ধ্বজ সিংহ বা মহারাষ্ট্রের শিবাজীর সম্মুখে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না। আগ্রা দুর্গের এক নিভৃত কক্ষে পিতাকে কারারুদ্ধ রেখে পার্শ্ববর্তী দেওয়ান-ই-খাসে তিনি দরবার বসাতেন, কিন্তু জাতি মূক হোলেও তাঁকে ক্ষমা করে নি। ঘরে বাইরে সবাই তাঁকে ধিক্কার দিত। এরূপ এক সংকীর্ণমনা ব্যক্তির কাছ থেকে কোন সুশাসন আশা করা যায় না। ঔরঙ্গজেব ভুলে গেলেন যে তিনি শুধু মুসলমানের বাদশাহ নন—হিন্দু এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও বাদশাহ। ভুলে গেলেন যে প্রত্যেক প্রজাই তাঁর চক্ষে সমান। ছুৎমার্গগ্রস্ত ব্যক্তিরা যেমন শুচিতার গর্ব করে তিনিও তেমনি হিন্দু সমাজের উপর জঘন্য নিপীড়ন চালিয়ে নিজের ধর্মপ্রাণতার গর্বে গর্ব অনুভব করতে লাগলেন। হতভাগ্যদের উপর জিজিয়া কর বসল, তাদের মন্দির ভাঙ্গা হোল, তারা সবাই নেমে গেল মুসলমানদের জিম্মির স্তরে। কিন্তু কেউ নতজানু হয়ে সম্রাটের এই ধৃষ্টতা সহ্য করে নি, চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আসামরাজ এসে তাঁর সাম্রাজ্য থেকে একটি অংশ কেটে নিয়ে গেলেন, মারাঠারা তাঁকে পঙ্গু করে দিতে লাগল, রাজপুত গর্জে উঠল, পাঞ্জাব হুঙ্কার দিল। ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা, জয়ন্তিয়া ও মোরঙ্গ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতায় রুষ্ট হয়ে মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ করল। তিনি কোন দিক সামলাবেন?

কাঠমোল্লা বাদশাহ চেয়েছিলেন হিন্দুদের দাবিয়ে দিয়ে সারা ভারতে ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী ওড়াতে। তার ফলে সমস্ত হিন্দু সমাজ তাঁর উপর খড়্গহস্ত হয়ে ওঠে, অথচ কোন মুসলমান শক্তি এসে তাঁর পাশে দাঁড়ায় নি। মুসলমান জনসাধারণও দাঁড়ায় নি! নিজের ইসলাম নিয়ে তিনি নিজেই যুদ্ধ চালালেন, সকল হিন্দু তাঁর ধ্বংস কামনা করতে লাগল। যেভাবে তিনি তখত্-ই-তাউসে বসেছিলেন তাতে জনসাধারণের চক্ষে বাদশাহ পরিবারের মর্য্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, পরে তাঁর ধর্মান্ধতার জন্য তাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যে সিংহ বহু দিন পূর্বে ঘুমিয়ে পড়েছিল ঔরঙ্গজেব তাকে কশাঘাতে জাগিয়ে তোলেন। আসাম ও দাক্ষিণাত্যের দৃষ্টান্ত সমগ্র দেশকে উদ্দীপনা জোগায়।

এই দেশব্যাপী হিন্দু জাগরণের ঢেউ বাংলাকেও স্পর্শ করেছিল!

শোভা সিংহ

দক্ষিণে মারাঠারা যখন মোগল সম্রোজ্যের উপর প্রচণ্ডভাবে আঘাত হানছিল তখন মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল-চন্দ্রকোনা অঞ্চলে এক নগণ্য ভূস্বামী শোভা সিংহের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। এই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয় শোভা সিংহের বাসগ্রাম চেটো-বড়দা থেকে। মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তিনি মোগল থানাগুলি আক্রমণ করলে থানাদাররা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে অন্যত্র পালিয়ে যায়--আশপাশের গ্রামগুলি থেকে দলে দলে লোক এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের নিয়ে শোভা সিংহ সম্মুখপানে অগ্রসর হন—সমগ্র মেদিনীপুর জেলা তাঁর করতলগত হয়। শিবাজী তখন গতায়ু হোলেও তাঁর আদর্শ শুধু মারাঠাদের নয় সারা ভারতকে উদ্বুদ্ধ করছিল। শোভা সিংহ যতই এগিয়ে যান ততই তাঁকে নূতন শিবাজী জ্ঞান করে জনসাধারণ তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করে। যুদ্ধবিদ্যায় অশিক্ষিত সেই বিপুল সংখ্যক গ্রাম্য লোককে নিয়ে তিনি বর্দ্ধমানের উপকণ্ঠে গিয়ে উপনীত হোলে সেখানকার মোগল শাসনকর্তা রাজা কৃষ্ণরাম সসৈন্যে তাদের সম্মুখীন হন। কিন্তু নিছক সংখ্যার জোরে তাঁর সুশিক্ষিত সৈন্যদের পরাজিত ও তাঁকে নিহত করে শোভা সিংহ ওই শহর অধিকার করেন। (১৬৯৬, জানুয়ারি ৬)। রাজা কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম ঢাকায় পালিয়ে গিয়ে

সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে আশ্রয় নেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ও কন্যা শোভা সিংহের হাতে বন্দী হন।

বর্দ্ধমান জয় শোভা সিংহের কাছে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। সেখানে নিজের প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করে গ্রামাঞ্চল থেকে মোগলদের দূরীভূত করবার জন্য তিনি চারিদিকে সৈন্য পাঠালে সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ পশ্চিমবঙ্গের ফৌজদার নুরুল্লা খাঁকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দেন। হুগলীতে পৌছে নুরুল্লা দেখেন যে বিদ্রোহীদের পূর্বে তিনি যতখানি দুর্বল মনে করেছিলেন আসলে তারা তা নয়। একে তাদের সংখ্যা যথেষ্ট তায় সুরু থেকে মোগলদের বার বার পরাজিত করায় সাহস ও আত্মবিশ্বাস খুবই বেড়ে গেছে। দাক্ষিণাত্যের মারাঠাদের সঙ্গে তাদের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও সেখান থেকে তারা অহরহ প্রেরণা সংগ্রহ করছে। নুরুল্লা খাঁ তাঁর বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত হয়ে হুগলী দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা সেই দুর্গ অবরোধ করে এমন প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালাতে লাগল যে তাঁর পক্ষে সেখানে বেশী দিন অবস্থান করা সম্ভব হোল না। এক দিন রাতের অন্ধকারে তিনি দুর্গ ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গেলেন। হুগলী বিদ্রোহীদের অধিকারভুক্ত হোল।

এই পরাজয়ের সংবাদ ঢাকায় নবাব ইব্রাহিম খাঁর কাছে পৌছালে তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েন। তাঁর যা কিছু সম্বল ছিল তার প্রায় সবটাই দাক্ষিণাত্যে বাদশাহর কাছে পাঠিয়েছেন। কি দিয়ে তিনি বিদ্রোহীদের দমন করবেন? নিরুপায় ইব্রাহিম খাঁ সাহায্যের জন্য চুঁচুড়ায় ওলন্দাজদের শরণাপন্ন হোলেন। শোভা সিংহ হুগলী রক্ষার জন্য মাত্র দুই শত অশ্বারোহী ও তিন শত পদাতিক রেখে অন্যত্র চলে যাওয়ায় ওলন্দাজরা স্থলপথ ও জলপথে আক্রমণ চালিয়ে অতি সহজে ওই নগরী অধিকার করে নেয়। সে সংবাদ শোভা সিংহের কাছে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফিরে এসে ওলন্দাজ ও মোগলদের বহিষ্কৃত করে দেন। হুগলী আর একবার হাত বদলায়।

নূতন এক সহকারীর উপর হুগলীর দায়িত্ব অর্পণ করে অন্যান্য অঞ্চলগুলি মুক্ত করবার জন্য শোভা সিংহ মূল বাহিনীসহ উত্তর দিকে চলে গেলেন। সর্বত্র মোগল ফৌজ তাঁর কাছে পরাজিত হয় ও তিনি শেষ পর্য্যন্ত রাজমহলে পৌছে

নামমাত্র যুদ্ধের পর ওই নগরী অধিকার করেন। এই সেদিন পর্য্যন্ত রাজমহল ছিল বাংলার রাজধানী; সুজার পতনের পর থেকে সুবাদারগণ ঢাকায় বাস করলেও তার বৈভব তখনও বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় নি। তাই রাজমহল অধিকারের পর সেখানে প্রাক্তন সুবাদার প্রাসাদে নিজের প্রধান দফতর স্থাপন করে শোভা সিংহ অন্যত্র চলে গেলেন।

সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের উপর থেকে মোগল শাসনের অবসান ঘটল!

রহিম খাঁ

মোগলের চিরশত্রু আফগানরা এত দিন পরাজয়ের ফলে ম্রিয়মান ছিল। প্রতিনিয়ত মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস কামনা করলেও নিজেদের বাসনা চরিতার্থ করবার মত সঙ্গতি তারা সংগ্রহ করতে পারে নি। শোভা সিংহ সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ মুক্ত করেছেন শুনে উড়িষ্যার আফগানরা দলে দলে এসে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার বাসনা প্রকাশ করে। তিনি যখন বুঝলেন যে তাদের আনুগত্য সংশয়াতীত তখন সবাইকে নিজ দলে গ্রহণ করে তাদের সর্দার রহিম খাঁকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তারা যোগ দেবার পর তাঁর নিয়মিত সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় দশ হাজার অশ্বারোহী ও ষাট হাজার পদাতিক। গোড়ার দিকে কামান বন্দুক প্রভৃতি ভারী অস্ত্র বিশেষ ছিল না, কিন্তু বিভিন্ন মোগল ছাউনি অধিকার করে শোভা সিংহ সে অভাব বহুলাংশে দূর করেন। হুগলী, চন্দননগর ও চুঁচুড়ার ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকেও যথেষ্ট আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করেন।

এত দিন শোভা সিংহের কর্ম্মতৎপরতা গঙ্গার পশ্চিম দিকে সীমাবদ্ধ ছিল। উত্তরে রাজমহল থেকে দক্ষিণে হিজলী-কাঁথী পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগের উপর তিনি নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আফগানরা এসে তাঁর দলে যোগ দেওয়ায় রহিম খাঁকে গঙ্গার পূর্ব দিকে পাঠিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনার জন্য বর্দ্ধমান চলে যান। যদি তিনি ধর্মপথে চলে পূর্বের কর্ম্মতৎপরতা অব্যাহত রাখতেন তাহোলে দাক্ষিণাত্যে ছত্রপতি শিবাজী যে ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন পূর্বভারতে তিনিও তাই করতেন; অনেক বিষয়ে শিবাজীর চেয়ে তাঁর সুবিধা ছিল বেশী। তিনি এমন একটি অঞ্চলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সেখান থেকে অগ্রসর হয়ে পশ্চিমে বিহার ও দক্ষিণে উড়িষ্যা জয়

করা সহজসাধ্য হোত। মোগল শক্তি তখন মারাঠাদের সঙ্গে জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল বলে এই সকল অঞ্চল প্রায় অরক্ষিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু শিয়রে যার শমন দাঁড়িয়ে রয়েছে তাকে বাঁচাবে কে? বর্দ্ধমানে গিয়ে শোভা সিংহ নিহত ফৌজদার রাজা কৃষ্ণরামের বন্দিনী কন্যার রূপে উন্মত্ত হয়ে তাঁর উপর বলাৎকার করবার চেষ্টা করেন। ক্রুদ্ধা নাগিণী গর্জন করে ওঠল! দেহাবরণের তলায় লুকান ছোরা বার করে দুবৃত্তের বুকে বসিয়ে তার প্রাণ সংহারের পর সেই ছোরা নিজের বুকে বসিয়ে দিয়ে তিনি দেহত্যাগ করলেন। সেই সঙ্গে বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ডও ভেঙে গেল।

এইভাবে নারকীয় পরিবেশের মধ্যে একটি আদর্শবাদী যুবকের জীবনাবসান হয় এবং এক মহিয়সী নারী জীবনাহুতি দিয়ে নিজের সতীত্ব রক্ষা করেন!

সুবাদার পদচ্যুত

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা হিম্মৎ সিংহ বিদ্রোহীদের নায়ক নির্বাচিত হোলেও আসল দায়িত্ব পড়ে আফগান রহিম খাঁর উপর। স্থূলবুদ্ধি ও অলস হিম্মৎ সিংহের সামর্থ ছিল না যে বিরাট বিদ্রোহী বাহিনীকে পরিচালিত করেন। তাঁর উপর বিজিত অঞ্চলের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে রহিম খাঁ নদীয়ার পথ ধরে রাজধানী ঢাকার দিকে অগ্রসর হন। দু পাশের মোগল থানাগুলি অধিকার করতে করতে তিনি শেষ পর্য্যন্ত উপনীত হোলেন মকসুদাবাদে—মুর্শিদাবাদে। সেখানে পাঁচ হাজার বাদশাহী ফৌজ তাঁর সম্মুখীন হোলেও তাদের পরাজিত করে তিনি ওই নগরীর উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। কাছে ছিল ইংরাজের কুঠী কাশিমবাজার। সেটি লুণ্ঠনের পর বিদ্রোহীরা চারিদিকে লুঠপাট চালাতে চালাতে গঙ্গার ওপারে মালদায় গিয়ে উপনীত হয়। সেখানেও মোগল ফৌজ তাদের বাধা দিয়েছিল, কিন্তু তাদের পরাজিত করে ওই নগরী অধিকার করতে বিদ্রোহীদের অসুবিধা হয় নি (১৬৯৭, মার্চ)।

পশ্চিম বাংলার এই বিদ্রোহের সংবাদ ঔরঙ্গজেবের কাছে যথারীতি

পৌঁছাচ্ছিল। বাদশাহী ফৌজের উপর্য্যুপরি পরাজয়ে বিচলিত হয়ে তিনি শেষ পর্য্যন্ত ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করে নিজ পৌত্র আজিমউস্‌সানকে বাংলার সুবাদার নিযুক্ত করেন।

ইব্রাহিমের দুর্ভাগ্যের সংবাদ ঢাকায় পৌঁছালে তাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁ দিশাহারা হয়ে নূতন সুবাদার বাংলায় এসে কার্য্যভার গ্রহণ করবার পূর্বে সকল বাদশাহী ফৌজসহ মকসুদাবাদ আক্রমণ করেন। রহিম খাঁ তখন মূল বাহিনী-সহ ভগবানগোলায় অবস্থান করে বিভিন্ন অঞ্চলে সৈন্য পাঠাচ্ছিলেন। পদচ্যুত সুবাদারের জায়গায় নূতন সুবাদার না আসা পর্য্যন্ত বাদশাহী ফৌজ যে ভাল করে যুদ্ধ চালাবে না এরূপ অনুমান করে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। অকস্মাৎ জবরদস্ত খাঁর আবির্ভাবে বিস্মিত হয়ে তিনি হিম্মৎ সিংহকে মকসুদাবাদে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। জবরদস্ত খাঁ রীতিমত জবরদস্ত ব্যক্তি—শুধু যে সমগ্র মোগল বাহিনীকে সঙ্গে এনেছিলেন তা নয় বহু ফিরিঙ্গী সৈন্যও সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সেই সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে দু দিন যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়; হিম্মৎ সিংহ ও রহিম খাঁ নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী সরিয়ে নিয়ে চন্দ্রকোণার দিকে চলে যান।

জবরদস্ত খাঁর দুর্ভাগ্য এই যে শাহাজাদা আজিমউস্‌সান বাংলায় এসে তাঁর মত জবরদস্ত ব্যক্তির যোগ্যতার কোন মূল্য দিলেন না। তাঁকে ও তাঁর সুবাদার পিতাকে বাংলা ছেড়ে চলে যাবার জন্য আদেশ দেওয়ায় উভয়কে পরিবারবর্গসহ দিল্লীর দিকে রওনা হোতে হয়। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাঁকে চিনেছিল, তাঁর প্রস্থানের সংবাদ পেয়ে চন্দ্রকোণা থেকে ফিরে এসে আবার বাদশাহী ফৌজের বিরুদ্ধে আক্রমণ সুরু করে। হুগলী ও নদীয়া জেলার চারিদিকে পুঠপাট চালাতে চালাতে তারা আর একবার চলে যায় বর্দ্ধমানে।

দাক্ষিণাত্যের সঙ্কটজনক অবস্থার কথা বিবেচনা করে ঔরঙ্গজেব পৌত্রকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে বাংলার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যেন শান্তিপূর্ণ মীমাংসার চেষ্টা করা হয়। বর্দ্ধমানে রহিম খাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে আজিমউস্‌সান সেরূপ চেষ্টা করেন, কিন্তু তার মধ্যে মোগলের দুর্বলতার গন্ধ পেয়ে আফগান সর্দাররা দিবাস্বপ্ন দেখতে লাগলেন। আজিমউস্‌সান যখন বুঝলেন যে কোনরূপ

মীমাংসা সম্ভব নয় তখন সৈন্যদের প্রতি যুদ্ধ চালাবার আদেশ দিলেন। রহিম খাঁ প্রাণপণ শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হেলেন। মোগল সেনাপতির আদেশে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হোলে নায়কহীন বিদ্রোহীরা নিঃশব্দে নিজ নিজ গ্রামে ফিবে যায়। তাদের একাংশকে আজিমউস্‌সান মোগল বাহিনীতে নিযুক্ত করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের প্রতিষ্ঠা

ইংরাজের কাশিমবাজার কুঠী লুণ্ঠন ব্যতীত বিদ্রোহীরা ইউরোপীয় বণিকদের কোন ক্ষতি না করলেও তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ঢাকায় সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন পাঠিয়েছিল। কিন্তু কি সাহায্য তিনি দেবেন? স্বয়ং বাদশাহ যেখানে রাজধানী ছেড়ে পনেরো বৎসর ধরে দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেখানে কতটুকু সাহায্য দানের শক্তি তাঁর থাকতে পারে? ইব্রাহিম খাঁ সকল বিদেশী কোম্পানীকে বলে পাঠালেন তারা যেন নিজেদের রক্ষাব্যবস্থা নিজেরাই করে। তাঁর অনুমতি পেয়ে ইংরাজরা কলকাতা, ফরাসীরা চন্দননগর ও ওলান্দাজরা চুঁচুড়ার কুঠীগুলি সুরক্ষিত করে। এত দিন ইরোজদের সকল পণ্য সংরক্ষিত থাকত খড়ের ছাউনি দেওয়া বড় বড় গোলায়—এখন ইটের গুদামঘর তৈরী করা হোল। অফিসারদের জন্যও কোম্পানী কয়েকখানি পাকা বাড়ী নির্মাণ করলেন। হঠাৎ যদি বিদ্রোহীরা কলকাতায় এসে আবির্ভূত হয় তখন তাদের প্রতি-রোধ করবার জন্য সমস্ত কুঠিকে ঘিরে কতকগুলি প্রাকার নির্ম্মাণ করা হোল। সেগুলির উপর কামান সংস্থাপিত করে ইংলণ্ডেশ্বরের নামানুসারে নাম দেওয়া হোল ফোর্ট উইলিয়ম। শিশু জন্মাবার পূর্বে তার নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হয়ে গেল!

শুধু দুর্গ হোলে চলে না, তাকে ঘিরে একটি ভূখণ্ড চাই। চার বৎসর পরে সুবাদার আজিমউস্‌সানকে ১৬ হাজার টাকা নজরানা দিয়ে কোম্পানী স্থানীয় জমিদারদের কাছ থেকে উত্তরে সুতানটি, মধ্যে কলকাতা ও দক্ষিণে গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রাম কেনবার অধিকার আদায় করে নেয়। বেহালার সাবর্ণ চৌধুরীরা তাঁদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ভূখণ্ডের জন্য নিয়ে-

ছিলেন ১৩০৬৲ টাকা; অন্য জমিদাররা কে কত নিয়েছিলেন তা জানা যায় না।

এই তিনখানি গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় ইংরাজদের বাংলা প্রেসিডেন্সী। ক্ষুদ্র একটি বীজ বিরাট মহীরুহের আগমনবার্তা জানিয়ে দেয়! জব চার্ণকের বড় জামাই নিযুক্ত হন বাংলা প্রেসিডেন্সীর প্রথম প্রেসিডেণ্ট।

1 Salimullah *Tarikh-i-Bangla, Gladwin's trans., p. 215-18*
2 Ghulam Husain Salim *Riyaz-us-Salatin, tr. Abdus Salam, p. 231-43*
3 Wilson C. R. *Early Annals of English in Bengal p, 147-50*

একচত্বারিংশ অধ্যায়

মুর্শিদ কুলী খাঁ

সওদাগর শাহাজাদা

ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করে ঔরঙ্গজেব নিজ পৌত্র আজিমউস্‌সানকে বাংলার স্থবাদার নিযুক্ত করে পাঠালেন বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন একে অলস ও আরামপ্রিয় তায় অর্থগৃধ্নু। তাঁর পিতা বাহাদুর শাহ বাদশাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র হোলেও সেই বৃদ্ধের মৃত্যুর পর প্রথানুযায়ী যে গৃহযুদ্ধ স্থরু হবে এ বিষয়ে অন্য সবার মত তাঁর মনেও কোন সংশয় ছিল না। সেই অনাগত যুদ্ধের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন এবং তা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি সায়েস্তা খাঁর অনুকরণে বহু পণ্যদ্রব্যের উপর নিজের একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সওদা-ই-খাস থেকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ আমদানী হচ্ছে এবং কর্মচারীরা ফিরিঙ্গী বণিকদের কাছ থেকে নানা অছিলায় মোটা অর্থ আদায় করছে দেখে স্থবাদার আজিম-উস্‌সান মহা খুশী। দু দিন পরে যে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হবে তা চালাবার জন্য অর্থের অভাব হবে না!

ঔরঙ্গজেব নিজে গোঁড়া মুসলমান হোলেও পিতামহ ও প্রপিতামহর মত ইসলামের শ্রেষ্ঠতম দুষমন চেঙ্গিজ খাঁ সম্বন্ধে তাঁর মনে যথেষ্ট গর্ব ছিল। পৌত্র আজিমউস্‌সান বাংলায় গিয়ে মনের আনন্দে সওদা-ই-খাস নিয়ে মেতে রয়েছে শুনে তাঁকে লিখলেন: ভুলো না যে তুমি চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর। আমাদের পূর্বপুরুষরা চির দিন রাজ্য চালিয়েছেন, বেনিয়াদের মত মালপত্র নিয়ে কেনাবেচা করেন নি। এই জঘন্য কাজ তুমি শিখলে কোথা থেকে? কে তোমাকে শেখাল সওদা-ই-খাস? নিশ্চয় তোমার পিতা নয়—পিতামহ অবশ্যই নয়! আজই সকল ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে সুষ্ঠুভাবে রাজ্য শাসন করো।

আদেশ পাঠালেও ঔরঙ্গজেব দেখলেন যে তিন বৎসর ধরে আজিমউস্‌সান যেভাবে কোটী কোটী টাকা উপার্জন করেছে তাতে তাঁকে সংযত করা সহজ হবে না। অর্থের লোভ বড় লোভ! বৃদ্ধ পিতামহের হিতোপদেশে এই লোভ সে কিছুতেই ত্যাগ করবে না। অন্য সূত্র থেকে তাঁর কাছে খবর আসতে লাগল যে বাদশাহর আদেশ পাবার পর থেকে শাহাজাদা আজিমউস্‌সানের সওদা-ই-খাস যথেষ্ট সঙ্কুচিত হোলেও জায়গীরদারদের কাছ থেকে তিনি প্রচুর আবওয়াব আদায় করছেন এবং দেওয়ান জিয়াউল্লা খাঁকে হাত করে যথেষ্ট সরকারী অর্থ নিজের কোষাগারে সরাচ্ছেন। অন্য কেউ সুবাদার হোলে এই সব অপরাধের জন্য তাকে পদচ্যুত করা চলত, কিন্তু মাতুল সায়েস্তা খাঁর বেলায় ঔরঙ্গজেব তা করেন নি, পৌত্র আজিমউস্‌সানের বেলায়ও তা করতে পারলেন না। অনন্যোপায় সম্রাট তখন হায়দ্রাবাদের সুবাদার করতলব খাঁকে মুর্শিদ কুলী খাঁ উপাধি দিয়ে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। এখন থেকে আজিমউস্‌সান হবেন ওই সুবার নাজিম এবং মুর্শিদ কুলী খাঁ দেওয়ান। সুবাদারের পদ লোপ পেল।

ব্রাহ্মণ-মুসলমান

মুর্শিদ কুলী খাঁ আসলে ছিলেন দাক্ষিণাত্যবাসী এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। শৈশবে ছেলেধরার দল তাঁকে পিতৃগৃহ থেকে চুরি করে পারস্যে চালান দিলে এক ইস্পাহানী বণিক ন্যায্য মূল্যে কিনে নিয়ে নিজের গৃহকর্মে নিযুক্ত করেন। সেখানে বালকের দিন ভালই কাটছিল। সকল কাজে তার নিষ্ঠা ও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পেয়ে বণিকের মনে বিস্ময় জাগে। তাঁর পুত্ররা যখন ওস্তাদের কাছে পাঠাভ্যাস করত সে দূর থেকে তাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ব করে নিত। তাই দেখে বণিক তাকে ইসলামে দীক্ষিত করে নাম দেন হাদী। নিজ পুত্রদের সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগও দেন। বালকের প্রতিভা দেখে গুরু যেমন বিস্মিত হন তার মধুর ব্যবহারে প্রভু পরিবারের সকলের মনে তেমনি স্নেহের উদ্রেক হয়। কয়েক বৎসর পরে বণিক পরলোক গমন করলে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রগণ হাদীকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে স্বদেশে ফেরবার অনুমতি দেন।

দেশে ফিরে এসে মহম্মদ হাদী বহু অন্বেষণের পর চলে আসেন নিজ গ্রামে—পিতৃগৃহে। কিন্তু হারানো ছেলেকে বহু দিন পরে ফিরে পেয়ে উৎফুল্ল হবার

পরিবর্তে সবাই তাঁকে ধর্মত্যাগী বলে ধিক্কার দিতে লাগল—তাঁর চক্ষের সম্মুখে গৃহদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল। কেউ এক গ্লাস পানীয় জল পর্য্যন্ত দিতে রাজী হোল না দেখে ব্রাহ্মণপুত্র মহম্মদ হাদী ক্ষোভে ও ঘৃণায় পথে বেরিয়ে পড়লেন— ঘুরতে ঘুরতে চলে গেলেন বেরারে। কয়েক বৎসর পারস্যে বাস করবার সময়ে ফার্সী ভাষা ভাল করে আয়ত্ব করেছিলেন বলে সেখানকার সরকারী দফতরে নিম্নস্তরের একটি চাকুরী জুটে গেল—বহু দিন পরে একটি আশ্রয় মিলল। ঔরঙ্গজেব তখন সেখানকার সুবাদার। কিছু দিন পরে তরুণ হাদী যে হিসাব নিকাশের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তা দেখে উচ্চস্তরের অফিসাররা মুগ্ধ হন এবং ধীরে ধীরে সে খবর ঔরঙ্গজেবের কানে পৌছে দেন। শুনে ঔরঙ্গজেব তাঁর পদোন্নতির ব্যবস্থা করেন ও তিনি যে ব্রাহ্মণ থেকে মুসলমান হয়েছেন ও প্রত্যহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়েন একথা জেনে পুলকিত হন। ধীরে ধীরে হাদী ঔরঙ্গজেবের সান্নিধ্যে আসেন এবং অন্তর্নিহিত গুণাবলীর জন্য তাঁর একান্ত সচিবদের মধ্যে স্থান পান। সেই সুবাদার পরে তাঁর প্রতি এত বেশী প্রীত হন যে তাঁকে করতলব খাঁ উপাধি দিয়ে হায়দ্রাবাদের দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

মারাঠা যুদ্ধ যখন সঙ্কটজনক অবস্থা ধারণ করেছে সেই সময়ে বাংলায় শোভা সিংহের বিদ্রোহ ঔরঙ্গজেবকে যথেষ্ট ভাবিয়ে তুলেছিল। সেই বিদ্রোহ দমনে অক্ষমতার জন্য তিনি সুবাদার ইব্রাহিম খাঁকে পদচ্যুত করে পৌত্র আজিম-উস্‌সানকে এই সুবায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পৌত্র যখন শাসনকার্য্যে অবহেলা করে সওদা-ই-খাস নিয়ে মেতে রয়েছে তখন করতলব খাঁর মত কর্মনিপুণ অফিসার ছাড়া আর কেউ এখানে শৃঙ্খলা আনতে পারবে না ভেবে তিনি ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর তাঁকে মুর্শিদ কুলী খাঁ উপাধি দিয়ে বাংলার দেওয়ান ও মকসুদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত করে পাঠালেন।

সুবাদার-দেওয়ান সংঘর্ষ

আজিমউস্‌সান বয়সে তরুণ হোলেও করতলব খাঁকে ভাল করে চিনতেন। তাঁর মত কর্মনিপুণ ব্যক্তির চক্ষে ধুলা দিয়ে যে আগের মত অর্থোপার্জন সম্ভব হবে না সেকথা বুঝে নিয়ে তিনি মনে মনে গোমরাতে লাগলেন। আবার পিতামহকেও চিনতেন। তিনি বরং পৌত্রকে বরখাস্ত করবেন, কিন্তু নূতন

দেওয়ানকে বাংলা থেকে অন্য কোথাও বদলি করবেন না। সে ক্ষেত্রে নিজের হাতের লোককে দেওয়ান নিযুক্ত করতে হোলে মুর্শিদ কুলী খাঁর বিনাশ ব্যতীত কোন পথ শাহাজাদা আজিমউস্‌সান খুঁজে পেলেন না। সেই পথ বেছে নিয়ে তিনি বাহ্যতঃ দেওয়ানের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা দেখিয়ে একজন গুপ্তঘাতকের সন্ধান করতে লাগলেন।

সেরূপ ঘাতক কাছেই ছিল। অশ্বারোহী বাহিনীর জনৈক অফিসার আবদুল ওয়াহিব নাজিমের অভিসন্ধি জানতে পেরে তা পূরণ করবার জন্য সাগ্রহে এগিয়ে এল। বাদশাহর জন্য যুদ্ধে সিপাহীরা কত লোকের প্রাণ নেয় আর বাদশাহজাদার জন্য একজন দেওয়ানের প্রাণ নেওয়া এমন কি কঠিন কাজ! ঠিকমত কাঞ্চন মূল্য পেলে আবদুল ওয়াহিব খুশী মনে শাহাজাদার কাজ হাসিল করে দেবে। তার দাবীটা একটু বেশী হোলেও আজিমউস্‌সান তা মেনে নিয়ে কিছু টাকা অগ্রিম দিলে সে দেওয়ানকে হত্যার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগল।

এক দিন প্রাতঃকালে মুর্শিদ কুলী খাঁ নাজিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য পাল্কী চড়ে রাস্তা দিয়ে চলেছেন এমন সময় আবদুল ওয়াহিব এসে পাল্কী আটকে বাকি বেতনের জন্য সোরগোল স্থুরু করল—সামনে ও পিছনে কয়েকজন সশস্ত্র প্রহরী থাকায় সোজাসুজি আঘাত করতে সাহস পেল না। এমনি কিছু যে ঘটবে তীক্ষ্ণধী মুর্শিদ কুলী খাঁ আগে থেকে তা অনুমান করে একখানি তরবারি কাছে রেখে সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত হয়ে পথে :চলতেন। আবদুল ওয়াহিবের মতলব বুঝতে পেরে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পাল্কী থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রহরীদের প্রতি আদেশ দিলেন: অস্ত্রবলে পথ পরিষ্কার করো। তাই দেখে ঘাতক ভীতসন্ত্রস্ত মনে স্থান ত্যাগ করে পালিয়ে গেল।

নাজিমের কাছে পৌছে মুর্শিদ কুলী খাঁ সকল ঘটনা বিবৃত করে বললেন যে তিনি বাদশাহর অনুরক্ত হোলেও বাদশাহজাদার এই ধৃষ্টতা বরদাস্ত করবেন না। 'এভাবে লোক হাসবার চেয়ে আসুন আমরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে সকল বিবাদের মীমাংসা করি। নিন এই তরবারি—হয় আমি আপনাকে হত্যা করি, নতুবা আপনি আমাকে হত্যা করে নিজের পথ নিষ্কণ্টক করুন।'

আজিমউস্‌সান যখন দেখলেন যে তাঁর চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে তখন হতভম্ব হয়ে মুর্শিদ কুলী খাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ ও আবদুল ওয়াহিবকে ডেকে পাঠিয়ে

ভৎর্সনা করলেন। এই অভিনয় দেখবার পরে মুর্শিদ কুলী নিজ দফতরে ফিরে গিয়ে আবদুল ওয়াহিব ও তাঁর রেজিমেণ্টের বাকি বেতন চুকিয়ে দিয়ে রেজিমেণ্টটি ভেঙে দিলেন।

বাড়ী ফিরে এসে মুর্শিদ কুলী ওয়াকিনবিসকে ডেকে তাঁর জীবননাশের চক্রান্তের বিবরণ বিশদভাবে লিখে ঔরঙ্গজেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। সংবাদটি পড়ে বিস্মিত বাদশাহ পৌত্রকে এক পত্রে জানালেন যে একজন অনন্যসাধারণ কর্মনিপুণ অফিসারের জীবনাবসানের চক্রান্তের কথা শুনে তিনি যারপর নাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। মুর্শিদ কুলী খাঁ সাম্রাজ্যের সকল অফিসারের অগ্রগণ্য, বাংলায় অবস্থানের সময় কেউ যদি তাঁর একগাছা কেশও স্পর্শ করে সেজন্য খেসারৎ নেওয়া হবে নাজিমের কাছ থেকে। সেই সঙ্গে মুর্শিদ কুলীকে এক স্বতন্ত্র পত্রে আশ্বাস দিলেন যে ভবিষ্যতে নাজিমসহ বাংলার সকল অফিসার তাঁর প্রতি যথোচিত মর্য্যাদা দেখাবে; কেউ এই আদেশের ব্যত্যয় করলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে।

পত্রখানি পড়ে মুর্শিদ কুলী আপাততঃ আশ্বস্ত হোলেন বটে, কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না। আজিমউস্সান একে নাজিম তায় বাদশাহর পৌত্র। বাঘের সঙ্গে কলহ করে বনে বাস করা যায় কত দিন? মনের কথা মনে চেপে রেখে তিনি ঔরঙ্গজেবকে লিখলেন: মহামান্য বাদশাহ! আসাম, আরাকান বা ত্রিপুরার সঙ্গে যখন যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা আপাততঃ নেই তখন ঢাকায় রাজধানী রাখবার অর্থ হয় না। বাকী বাংলার সঙ্গে এই শহরের যোগাযোগ কতটুকু? তাছাড়া শোভা সিংহের বিদ্রোহ থেকে আমি এই শিক্ষা লাভ করেছি যে মেদিনীপুরকে উড়িষ্যায় না রেখে সুবা বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া সঙ্গত। তাতে ওই জেলার দুর্দ্ধর্ষ অধিবাসীদের শাসনে রাখা সহজ হবে। মেদিনীপুরের সঙ্গে ঢাকার কোন যোগাযোগ নেই, কিন্তু পশ্চিম বাংলার সকল অঞ্চলের সঙ্গে আছে। সকল দিক বিবেচনা করলে আমাদের সুবা বাংলার প্রথম রাজধানী রাজমহলে ফিরে যাওয়া উচিত। কিন্তু তারও বাধা কম নয়। রাজা মান সিংহ যখন সেখানে রাজপাঠ স্থাপন করেছিলেন তখন আমাদের দুষমনরা সরকার সিলেট ও সরকার চাটগাঁ বেদখল করে রেখেছিল। এখন আমরা হকের জিনিষ ফিরে পেয়েছি বটে কিন্তু উভয় সরকারই

রাজমহল থেকে বহু দূরে। সেই কারণে আমার মনে হয় যে সদাশয় বাদশাহ মেহেরবানি করে এই অধীনকে মকসুদাবাদ নামে যে জায়গীরটি দিয়েছেন সেখানে বাংলার নূতন রাজধানী স্থাপন করা সঙ্গত। জায়গাটি সম্প্রসারিত সুবার একেবারে কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এবং সকল অঞ্চলের সঙ্গে স্থলপথ ও জলপথে ভালভাবে যুক্ত; সব অঞ্চলের সঙ্গে ওই শহরের যোগাযোগ রয়েছে।

মুর্শিদ কুলী আরও লিখলেন: কিন্তু জায়গাটি খুবই ছোট—একেবারেই দেহাত। আমার মত মেহনতী লোক, যার একমাত্র কাজ বাদশাহর খিদমদ করা, তার সেখানে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু নাজিম আজিমউস্সান একে শাহাজাদা, তায় নওজোয়ান। তাঁর ও তাঁর হারেমের স্থান সঙ্কুলানের মত মঞ্জিল মকসুদাবাদে নেই। আমীর ওমরাহরা বাস করবেন কোথায়? দরবার বসাবার মত জায়গাই বা কই? নতুন করে এসব ব্যবস্থা করতে হোলে যে টাকা লাগবে তাতে মারাঠাদের বিরুদ্ধে এক ডিভিসন সৈন্য তৈরী করা যেতে পারে। সেই কারণে আমি বলি—নাজিম যেমন ঢাকায় আছেন তেমনি থাকুন, আমি মকসুদাবাদে বাস করে মন দিয়ে রাজস্ব আদায়ের কাজ চালাই।

মুর্শিদ কুলীর এই পত্রে ঔরঙ্গজেবের নিজের মনের কথা প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। আজিমউস্সানকে দেওয়ানের জীবনের জন্য দায়ী করে পত্র লিখলেও তাকে কোন বিশ্বাস নেই। হজরৎ মহম্মদ বলেছেন: কেউ যদি তোমাকে বলে যে পর্বত তার স্থান পরিবর্তন করেছে সে কথা বিশ্বাস করবে, কিন্তু যদি বলে যে কোন লোক তার প্রকৃতি পরিবর্তন করেছে সেকথা বিশ্বাস করবে না। আজিমউস্সানের প্রকৃতি পরিবর্তন?—তা কিছুতেই সম্ভব হবে না! সুযোগ পেলেই সে দেওয়ানকে আবার হত্যার চেষ্টা করবে। তাই দেওয়ানের ঢাকায় আটকে না থেকে মকসুদাবাদে বসে খুসী মনে কাজকর্ম চালান ভাল। তিনি সম্মতিসূচক পত্র পাঠিয়ে দিলে মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁর দেওয়ানী দফতর ও সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগের কর্মচারীদের নিয়ে মকসুদাবাদে চলে এলেন। অনুগত জমিদাররাও সেখানে এলেন।

এই ব্যবস্থার ফল ভালই হোল। মকসুদাবাদ থেকে দেওয়ানের কাজ বেশ সুশৃঙ্খলভাবে চলতে লাগল। মুর্শিদ কুলীর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ঔরঙ্গজেব পর বৎসর ২৩শে জুলাই তাঁকে মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের ফৌজদার ও ৪ঠা আগষ্ট উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। আরও কিছু দিন পরে তাঁকে উড়িষ্যার সুবাদারীও

দেওয়া হোল। এইভাবে তিনি বাংলা ও উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিনায়ক হয়ে বসলেন। সব কয়টি দায়িত্ব তিনি এমনই দক্ষতার সঙ্গে পালন করতেন যে বিস্ময়মুগ্ধ ঔরঙ্গজেব এক পত্রে তাঁকে লেখেন: একই ব্যক্তি বাংলা ও বিহারের দেওয়ান এবং উড়িষ্যার নাজিম ও দেওয়ান। দায়িত্বগুলি তুমি এমনই সুচারুরূপে পালন করছ যে, বলতে দ্বিধা নেই, আমি নিজে তা পারতাম না। কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহধন্য ব্যক্তির মধ্যে এরূপ অসাধারণ যোগ্যতা থাকা সম্ভব। মুর্শিদ কুলী সকল দায়িত্ব মকসুদাবাদে বসে পালন করতেন বলে বহু দফতর সেখানে স্থানান্তরিত হোল, হাজার হাজার অফিসারের আগমনে সেই নগণ্য স্থান একটি নগরীর রূপ ধারণ করল। বাদশাহর কাছ থেকে তিনি মুর্শিদ কুলী খাঁ উপাধি অনেক আগে পেয়েছিলেন; মকসুদাবাদের নাম সেই নামে পরিবর্তিত হয় অনেক পরে।

জমা কামেল তুমারি

বাংলায় প্রথম আগমনের পর মুর্শিদ কুলী খাঁ দেখেন যে এই সুবার রাজস্ব ব্যবস্থায় বহুবিধ বিশৃঙ্খলা চলছে। প্রায় অর্দ্ধেক ভূমি জায়গীরদারদের মধ্যে বণ্টিত হয়েছিল নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য। কিন্তু তাঁরা কাগজপত্রে যত সৈন্য দেখান হাতেকলমে তার সিকিও হাজির করতে পারেন না। হাতী, ঘোড়া ও হাতিয়ারের অবস্থাও তাই। তাঁদের এই অবহেলার জন্য শোভা সিংহ পূর্ণ দুই বৎসর ধরে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করে বসে রইলেন, কোন প্রতিবিধান সম্ভব হোল না। তাঁদের কাছ থেকে প্রার্থিত সৈন্য না পাওয়ায় তদানীন্তন সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তবু তাদের টনক নড়ে নি। জায়গীরদাররা তো বরাবরই এমনি করছে! তারা চুক্তিমাফিক সিপাহী ও হাতিয়ার রাখে না, আবার সময়মত রাজস্বও দেয় না। বাংলায় যে মুষ্টিমেয় বাদশাহী ফৌজ রয়েছে তাদের বেতনের টাকা প্রায়ই ভিন্ন সুবা থেকে আনতে হয়। অন্য পরে কা কথা, ঘোড়াঘাটের জায়গীরদার মহম্মদ রাজার ন্যায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও এই কদভ্যাস থেকে মুক্ত নন। এই সব মুসলমান জায়গীরদার ছাড়া আছেন হিন্দু জমিদারগণ। তাঁদের অনেকে খুবই প্রাচীন—সেন

যুগ থেকে জমিদারী ভোগ করবার দাবী পর্য্যন্ত কেউ কেউ করেন। সৈন্য জোগাবার দায়িত্ব তাঁদের নেই বটে, কিন্তু দিনের দিন রাজস্ব প্রদান করতে সকলেই বাধ্য। এঁদের সমস্যা অন্য রকম। জমিদারীগুলি একে ভাগাভাগিতে বিচ্ছিন্ন, তায় দীর্ঘকাল ধরে নির্বিঘ্ন আরাম ভোগ করে জমিদাররা একেবারেই উদ্যমহীন। নিজেরা ঠিকমত খাজনা আদায় করতে পারেন না, আবার সরকারে দেয় রাজস্ব দিনের দিন দেন না। এই ব্যবস্থার প্রতিবিধান করতেই হবে।

যাতে সাপ মরে, অথচ লাঠি না ভাঙে এমনভাবে কাজ করবার জন্য মুর্শিদ কুলী জায়গীরদারদের জমিগুলি সরকারের নিজস্ব খালসায় পরিণত করে তাঁদের প্রত্যেককে নূতন জায়গীর দিলেন উড়িষ্যায়। তাতে তাঁরা ক্ষুব্ধ হোলেও বিকল্প জায়গীর পেয়ে কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলেন। কিন্তু উড়িষ্যা নামেই মোগলের অধীন। মুর্শিদ কুলীর দেওয়া দানপত্র হাতে নিয়ে তাঁরা একে একে সেখানে গিয়ে দেখেন যে পরাক্রান্ত সামন্ত রাজারা তাঁদের একেবারেই আমল দিচ্ছেন না। শূন্য হস্তে মকসুদাবাদে ফিরে এসে মুর্শিদ কুলীর কাছে অভিযোগ করায় তিনি প্রত্যেক জায়গীরদারকে বেতনভুক সেনা-নায়কের কাজ করতে আদেশ দিলেন। হিন্দু জমিদারদের কাউকে বা ক্ষতি পূরণ দিয়ে জমিদারী খাস করলেন, আবার কাউকে বা স্বস্থানে বহাল রেখে এক বা একাধিক জমিদারীর উপর একজন করে ইজারাদার বসালেন। এই ইজারদাররা সবাই বাঙালী হিন্দু। প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় হোক বা না হোক তাঁরা নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব প্রদান করতে বাধ্য থাকলেন।

রাজস্ব ব্যবস্থায় এই পরিবর্তন রাতারাতি সাধিত হয় নি। বাংলায় পদার্পণ করেই মুর্শিদ কুলী খাঁ এ কাজ হাতে নিয়েছিলেন, কিন্তু সমাপ্ত হয় ১৭২২ খৃষ্টাব্দে। তাঁর এই জমা কামেল তুমারির হিসাব অনুসারে সমগ্র বাংলা ১৩ চাকলা, ৩৪ সরকার ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত হয়। ভূমি রাজস্ব দাঁড়ায় গোড়ার দিকে ১, ৮২, ৮৮, ১৮৬ টাকা; পরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। রাজা টোডরমল ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে যে তকসিম জমা প্রস্তুত করেছিলেন তাতে ছিল সরকার ১৯, মহল ৬৮২; ভূমি রাজস্ব ১,৪৯,৬১,৪৮২ টাকা। সুজার আসল

তুমার জমায় ছিল ২৯ সরকার ও ভূমি রাজস্ব ১,৬১,১৪,৯০৫ টাকা। মুর্শিদ কুলীর জমা কামেল তুমারিতে এই সর্বাঙ্গীন বৃদ্ধির কারণ মেদিনীপুর জেলার বঙ্গভুক্তি, বহু অনাবাদী জমির উদ্ধার ও উৎকৃষ্টতর আদায় ব্যবস্থা।

পূর্ববঙ্গে বর্ণহিন্দুর স্রোত

এই যুগান্তকারী ভূমি সংস্কারের ফলে বাংলার সমস্ত জমির উপর থেকে সকল প্রকার মধ্যস্বত্বভোগীর অধিকার লোপ পেয়ে বাদশাহর সরাসরি অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর মুর্শিদ কুলী সুবার সমস্ত জমি জরিপ করিয়ে পতিত, গোচর, শ্মশান, গোরস্থান প্রভৃতি বাদে অন্যান্য জমির উপর যথোচিত কর ধার্য্য করেন। পশ্চিমাঞ্চলে টোডরমলের জাপ্‌তি প্রথায় যেমন সকল কৃষি জমির জন্য চাষীর কাছ থেকে উৎপন্ন ফসল বা অর্থে রাজস্ব আদায় করা হোত বাংলার প্রজারা কোন দিন সেভাবে রাজস্ব প্রদানে অভ্যস্ত ছিল না বলে তিনি পুরাতন ও নূতনের সংমিশ্রণ করে দেশময় ইজারাদার নিয়োগ করতে লাগলেন। তাঁদের সৈন্য রাখবার কোন দায়িত্ব থাকল না, কিন্তু দিনের দিন সরকারের রাজস্ব প্রদানের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হোল। সূক্ষ্মদৃষ্টি দেওয়ান বুঝেছিলেন যে এই সুবার হিন্দুরা একাজে খুবই উপযুক্ত, তাই নিজে ঘোরতর হিন্দুবিদ্বেষী হয়েও ওই সম্প্রদায় থেকে ইজারাদার নিয়োগ করেন —মুসলমানদের আমল দেন নি।

পশ্চিমবঙ্গের জমিগুলি ইজারা নিয়েছিল স্থানীয় হিন্দুরা। উত্তরবঙ্গেও প্রার্থীর বিশেষ অভাব হয় নি। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় পূর্ববঙ্গ এবং কামরূপ ও ত্রিপুরার যে অংশ মোগল অধিকারে এসেছিল সেখানে। ভূভাগগুলি জলময় বলে তুর্কী ও মোগলরা যেমন তাকে পরিহার করতে চাইত বর্ণহিন্দুরাও তেমনি তার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাত। অতীতে পাল ও সেন যুগে শাসনকার্য্য ও চিকিৎসার জন্য রাঢ় থেকে কিছু সংখ্যক কায়স্থ ও বৈদ্য সেখানে গেলেও ব্রাহ্মণ বিশেষ যায় নি। বিশাল জনপদের মধ্যে কেবল শ্রীহট্ট ও কোটালিপাড়া অঞ্চলে বৈদিক ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল।

বখতিয়ার খিলজীর আগমনে সেন বংশ যখন বঙ্গে গিয়ে আশ্রয় নেয় সেই সময়ে ব্রাহ্মণসহ বর্ণ হিন্দুর এক বিরাট স্রোত তাঁদের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিল।

তারপর তাঁরা যে দীর্ঘকাল সেখানে রাজত্ব করেন সেই সময়ে আশ্রয়, জীবিকা ও আত্মোন্নতির সন্ধানে বহু হিন্দু সেখানে যায়। জলময় বঙ্গ তখন আর পাণ্ডব বর্জিত দেশ নয়! তাই বহু ব্রাহ্মণও যায় প্রধানতঃ যজনাদি ক্রিয়া করবার জন্য। বহু জমিদারও অনেককে ব্রহ্মোত্তর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঔপনিবেশিক বলে রাঢ়ীই থেকে যায়। বৈদ্য ও কায়স্থরা বঙ্গজে পরিণত হয়।

কয়েক শতাব্দী স্তিমিত থাকবার পর এই বর্ণ হিন্দুর স্রোত মুর্শিদ কুলী খাঁর সময়ে আবার নতুন করে সুরু হয়। তীক্ষ্ণধী নবাব দেখলেন যে জাহাঙ্গীরের সময় থেকে পূর্ববঙ্গের উপর মোগল অধিকার প্রসারিত হোলেও একটি উন্নত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর অভাবে সেখানকার রাজস্ব ব্যবস্থা কোনদিন সুসংহত করা সম্ভব হয় নি। এরূপ একটি শ্রেণীর সহযোগিতা না পেলে স্থানীয় ভূস্বামীরা পূর্বে যেভাবে প্রায়-স্বাধীনভাবে চলেছে নূতন দিল্লীকেন্দ্রীক শাসন ব্যবস্থায় তাদের সংযত করা সম্ভব হবে না। এ কথা বুঝে নিয়ে তিনি যেমন শাসনকার্য্যে নিজের একান্ত সচিব কিশোর রায় থেকে শুরু করে ছোটবড় সকল সরকারী কাজে বর্ণহিন্দু অফিসার নিয়োগ করেছিলেন তেমনি রাঢ় থেকে হাজার হাজার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যকে খালসা জমির ইজারা দিয়ে পূর্ববঙ্গের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। ইউরোপীয় বণিকদের কল্যাণে তাদের অনেকের হাতে যথেষ্ট অর্থাগম হওয়ায় ইজারা ডাকবার সামর্থও হয়েছিল। যেখানে ইজারা নেওয়ার মত যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায় নি মুর্শিদ কুলী সেখানে ব্রহ্মোত্তর দিয়ে অনেককে স্থাপন করেন। লক্ষ্মণসেনের নিষ্ক্রমণের পর সেই যে প্রথম বর্ণহিন্দুর স্রোতে রাঢ় থেকে বঙ্গে যায় তারপর প্রতাপাদিত্য, চাঁদ রায় প্রভৃতি ভুঁইঞা রাজগণ এই শ্রেণীকে স্বরাজ্যে নিয়ে গেলেও এত বড় স্রোত আর কখনও যায় নি। এই রাঢ়ীদের আগমনের ফলে মুর্শিদ কুলীর নূতন রাজস্ব ব্যবস্থা পূর্ববঙ্গে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জনসাধারণের কৃষ্টি জীবন নূতন রূপ ধারণ করে।

নূতন নূতন জমিদার বংশের উদ্ভব

মুর্শিদ কুলীর ভূমি ব্যবস্থার ফলে যে জমিদার বংশগুলি প্রাধান্য লাভ করে তাদের মধ্যে দুইটি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের অধিকারভুক্ত তাহেরপুর ও পুটিয়া

উল্লেখযোগ্য। তাহেরপুর জমিদারদের এক আত্মীয় রঘুনন্দন মুর্শিদ কুলীর দেওয়ানী দফতরে কাজ করবার সময়ে কর্মদক্ষতার গুণে ভূমি রাজস্ব বিষয়ে তাঁর প্রধান পরামর্শদাতার পদে উন্নীত হন। মুর্শিদ কুলী তাঁকে এতই স্নেহ করতেন যে তাঁকে খুশী করবার জন্য তাঁর ভ্রাতা রামজীবনকে কয়েকটি মৌজার ইজারা প্রদান করেন। এইভাবে নাটোর রাজবংশের উদ্ভব হয়। রাজা সীতারামের পতনের পর ভূষণা পরগণা লাভ করে নাটোর বাংলার বৃহত্তম জমিদারী বর্দ্ধমানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

সীতারামের নিধনের সময়ে নাটোর জমিদারীর এক তিলি গোমস্তা মুর্শিদ কুলীকে সাহায্য করেছিলেন বলে তাঁকে ভূমিদান করে উৎসাহ দেওয়া হয়। দীঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এই গোমস্তা। আবার নাটোর রাজের এক দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ কর্মচারী নড়াইল জমিদারীর পত্তন করেন। উভয় জমিদার বংশই রাঢ় থেকে বহু বর্ণহিন্দুকে নিজেদের জমিদারীতে নিয়ে যায়।

রাজসাহী জেলার কড়ইয়ের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ জমিদার শ্রীকৃষ্ণ হালদার মুর্শিদ কুলীর কাছ থেকে শেলবর্ষা পরগণা ইজারা নিয়ে তাঁকে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানে খুশী করে তলাপাত্র উপাধি ও মোমেনশাহী পরগণা লাভ করেন। অতীতে কামরূপ রাজ্যের অংশ এই বৃহৎ পরগণাটি ছিল অত্যন্ত অনগ্রসর। শ্রীকৃষ্ণ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে নিজ জমিদারিতে নিয়ে যাওয়ায় জনসাধারণের কৃষ্টি জীবন বিশেষভাবে উন্নত হয়। তাদের সহায়তায় জঙ্গল সাফ এবং বাঁধ ও পথঘাটের উন্নয়ন করায় এক আদিযুগীয় ভূভাগ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

এইভাবে মুর্শিদ কুলীর সময়ে কয়েকটি জমিদার বংশ নূতন রূপ পরিগ্রহ করে এবং বহু নূতন জমিদার বংশের উদ্ভব হয়। তাদের ইজারা চিরস্থায়ী না হোলেও কালক্রমে দেখা গেল যে কাউকে অপসারণ করা সহজ নয়। পরে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ তাদের সেই মর্য্যাদা স্বীকার করে নিয়ে নিজ নিজ জমিদারীর উপর চিরস্থায়ী অধিকার দেন। কয়েক বৎসর পূর্বে সেই ব্যবস্থার অবসান হোলেও বাংলার সমাজ জীবনে জমিদারদের প্রভাব যে কত ব্যাপক হয়েছিল সে কথা ভুললে চলবে না।

রাজা সীতারাম

ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে মুর্শিদ কুলী যে দুইজন প্রভাবশালী জমিদারের বিরোধীতার সম্মুখীন হন তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুপুররাজ দুর্জন সিংহের মল্ল বংশ অতি প্রাচীন—অষ্টম শতাব্দী থেকে একাধিকক্রমে ওই রাজ্য শাসন করেছে। এখনকার বাঁকুড়া, বর্দ্ধমান ও মানভূমের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত রাজ্যটি না বাংলা, না উড়িষ্যা, না বিহার কোন সুবার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় মল্লরাজগণের সুবিধা যথেষ্ট ছিল। প্রতাপও বড় কম ছিল না। জাহাঙ্গীরের সময়ে সুবাদার কাসিম খাঁ তাঁর শ্রেষ্ঠ সৈন্যাধ্যক্ষ শেখ কামালকে পাঠিয়েও এই রাজ বংশকে বশীভূত করতে পারেন নি। মুর্শিদ কুলী খাঁও সে চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থকাম হন। রাজা দুর্জন সিংহ দুর্গম অরণ্য প্রদেশে নিজ রাজধানী অপসারিত করে বিষ্ণুপুর শাসন করতে থাকেন।

উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ সীতারাম রায়ের ভূষণা জমিদারী প্রতিষ্ঠিত হয় ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে। তিনি বাংলার তদানীন্তন সুবাদারের কাছ থেকে নড়াইল পরগণা ইজারা নিয়ে আফগান বিদ্রোহী ও দস্যুদের দমন করায় তাঁর জমিদারী সম্যক উন্নতি লাভ করে। তাঁর কর্মদক্ষতায় খুসী হয়ে সুবাদার একের পর এক পরগণা তাঁর হস্তে সমর্পণ করেন এবং বাদশাহ ঔরঙ্গজেব তাঁকে রাজা উপাধি দেন। রাজা সীতারামের শৌর্য্যবীর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে বহু লোক ভূষণায় চলে আসে এবং তিনিও রাঢ় অঞ্চল থেকে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে এনে স্বরাজ্যে স্থাপন করেন। স্বধর্মনিষ্ঠ সীতারাম স্ব সমাজের প্রতি অনুরাগ ও মুসলমান সুবাদারের প্রতি আনুগত্যের সমন্বয় সাধন করবার জন্য নিজ সদর বাগজানিকে মহম্মদপুর নাম দিয়ে বহু হিন্দু মন্দিরে শোভিত করেন। বিদ্রোহী শোভা সিংহ যখন দুই বৎসর ধরে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করে রাখেন তখন দক্ষিণ বঙ্গের অর্দ্ধাংশ এই রাজা সীতারামের অধিকারভুক্ত ছিল। সে সময়ে তিনি মোগলের বিরুদ্ধাচারণ না করলেও পরে সুবাদার আজিমউস্‌সান ও দেওয়ান মুর্শিদ কুলী খাঁর কলহের সুযোগে স্বাধীন নরপতির মত আচরণ করেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যখন মোগল রাজ পরিবারে গৃহযুদ্ধ সুরু হয় তখন তিনি বাংলার নবাবকে পাশ কাটিয়ে হিন্দু সমাজের উন্নয়নের চেষ্টা করছেন শুনে হুগলীর ফৌজদার সৈয়দ আবু তোরাব তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। তারপর মুর্শিদ কুলী খাঁ নিজ আত্মীয় বক্স গোলাম

আলীকে এক বৃহত্তর বাহিনীসহ ভূষণায় পাঠিয়ে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস করেন।

বৈকুণ্ঠ!

বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য লেখনীতে রাজা সীতারামের বিরুদ্ধে মুর্শিদ কুলীর যে ধর্মীয় অত্যাচারের কথা বর্ণিত রয়েছে তাতে উপন্যাসসুলভ আতিশয্য থাকলেও কল্পনাবিলাস নেই। এমনিভাবে মুর্শিদ কুলী খাঁ ও তাঁর আমলারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালাতেন! তিনি যে হিন্দুদের মধ্যে সুবার সকল জমি ইজারা দিয়েছিলেন সে শুধু তাদের কর্মদক্ষতা ও আর্থিক সঙ্গতির জন্য— অনুরাগ বশতঃ নয়। ধর্মত্যাগী সকল হিন্দুর মত তিনিও পিতৃপিতামহের ধর্মের প্রতি চরম অসম্মান দেখাতেন। সলিমউল্লা বলেন: প্রতি মাসের সংক্রান্তির দিন মুর্শিদ কুলী খাঁ জমিদারদের কাছ থেকে শেষ দামটি পর্য্যন্ত আদায় করে নিতেন। এজন্য মুৎসুদ্দি, আমিল, কানুনগো ও অন্যান্য অফিসারদের কাছাড়ি বাড়ী বা মুর্শিদাবাদের দেওয়ানখানায় আটক রেখে যতক্ষণ না তারা পুরাপুরি হিসাব মিটিয়ে দিত ততক্ষণ খাদ্যপানীয় গ্রহণ এমন কি মলমূত্র ত্যাগ পর্য্যন্ত করতে দেওয়া হোত না।······যে সব জমিদার রাজস্ব পরিশোধ না করত নাজির আহমেদ তাদের পায়ে দড়ি বেঁধে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে চাবুক মারতেন।··· মুর্শিদ কুলীর রীতি ছিল ভিন্ন। তিনি যখন দেখতেন যে কোন আমিল বা জমিদার রাজস্ব প্রদানে অপারগ তখন তাঁকে স্ত্রীপুত্রসহ ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতেন।

তাঁর এক দৌহিত্রীর স্বামী সৈয়দ রাজী খাঁ বাংলার নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত হয়ে রাজস্ব আদায়ের জন্য এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করেন। মুর্শিদাবাদ সহরের মধ্যস্থলে এক মানুষের উচ্চতাবিশিষ্ট একটি চৌবাচ্চা নির্মাণ করিয়ে তিনি সেটিকে মানুষের বিষ্ঠায় পূর্ণ করিয়ে রাখতেন। যদি কোন জমিদার বা আমিল রাজস্ব অনাদায়ী রাখত তাকে ধরে এনে সেই চৌবাচ্চায় চোবান হোত। হিন্দুদের ভাষায় স্বর্গকে বৈকুণ্ঠ বলা হয় বলে সৈয়দ রাজী খাঁ সেই বিষ্ঠাপূর্ণ চৌবাচ্চার নাম দিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠ!

সুলেমান কররানির ব্রাহ্মণ-মুসলমান সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দুর মন্দির

ভেঙেছিলেন, ঔরঙ্গজেবের ব্রাহ্মণ-মুসলমান নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁ মন্দিরও ভাঙেন — সমাজও ভাঙেন।

মেদিনীপুরের বঙ্গভুক্তি

মেদিনীপুর বরাবরই ছিল উড়িষ্যার এক অঙ্গরাজ্য—সরকার জলেশ্বরের অংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অনঙ্গভীমদেবের সময় থেকে উড়িষ্যার সৈন্যবাহিনী গৌড়ের তুর্কী সুলতানদের বিরুদ্ধে যে সব সংগ্রাম চালিয়েছিল সেগুলির আক্রমণের ঘাঁটি ছিল এই মেদিনীপুর। সুলতান সুলেমান কররানি ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন উড়িষ্যা জয় করেন তখন মেদিনীপুর ছিল উড়িষ্যার উত্তর সীমান্ত। তার কিছু কাল পরে দাউদ কররানির পতনের পর উড়িষ্যা মোগল অধিকারে চলে গেলেও নূতন শাসকগণ কোন দিন তার অঙ্গহানি করেন নি। মেদিনীপুর পূর্বে যেমন উড়িষ্যায় ছিল তাঁদের সময়েও তাই থেকে গেল।

মুর্শিদ কুলী খাঁ দেখলেন যে মোগলরা উড়িষ্যা জয় করেছে বটে কিন্তু কোন দিন সেখানে নিজেদের শাসনব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। এই সুবার পরাক্রান্ত সামন্ত নরপতিগণ বরাবর মোগলের বি৷ দ্ধে সাথক প্রতিরোধ চালিয়েছেন। এরূপ এক অনিশ্চিত সুবার অংশ হয়ে থাকায় মেদিনীপুরে বিদ্রোহ লেগেই আছে। হিজলীর বাহাদুর শাহ উড়িষ্যার মোগল সুবাদারের কাছ থেকে গোপন সাহায্য লাভ করে একবার মোগল ফৌজকে পরাজিত করেছিলেন; পরে তাঁকে বন্দী করেও বশীভূত করা সহজসাধ্য হয় নি। তারপর কিছু কাল শান্ত থেকে মেদিনীপুরবাসীরা শোভা সিংহের নেতৃত্বে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করে মোগল সাম্রাজ্যকে কাঁপিয়ে তোলে। বাংলার মত শক্তিশালী সুবার অন্তর্ভুক্ত থাকলে এমনটি হোত না। সকল দিক বিবেচনা করে মুর্শিদ কুলী খাঁ ঔরঙ্গজেবকে পরামর্শ দিলেন, ভূভাগটিকে সুবা বাংলায় স্থানান্তরিত করবার জন্য। তাঁর কাছ থেকে সমর্থন এলে ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর বাংলার একটি জেলায় পরিণত হয়।

নবাবী লাভ

যে দিনটির জন্য শাহাজাদা আজিমউসসান ঢাকা ও পাটনায় বসে আকুল

আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন শেষ পর্য্যন্ত সেই দিন এসে গেল। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হওয়ার তখ্ত-ই-তাউস নিয়ে প্রথানুযায়ী বাদশাহ পরিবারে গৃহযুদ্ধ সুরু হোল। এক পিতৃব্য দিল্লী অধিকার করে নিয়েছেন শুনে আজিমউস্সান তাঁর বালক পুত্র ফারুকশায়ারকে বাংলায় রেখে সসৈন্যে দিল্লীর দিকে রওনা হোলেন। সেখানে প্রচণ্ড সংগ্রামের পর তাঁর ও তাঁর পিতা শাহ্ আলমের যুক্ত বাহিনী বিরোধীদের পরাজিত করবার পর বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে শাহ আলম মসনদে আরোহণ করেন। এই ঘটনার কিছু দিন পূর্বে ঔরঙ্গজেব মুর্শিদ কুলী খাঁকে বাংলার নায়েব-নাজিম পদে উন্নীত করেছিলেন। পিতার সিংহাসনারোহণের পর আজিমউস্সান দিল্লীতে সুস্থির হয়ে বসে পূর্ব শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হোলেন। নূতন বাদশাহের নামে এক ফরমান জারী করে তিনি মুর্শিদ কুলীকে দাক্ষিণাত্যের দেওয়ান পদে বদলী করলেন (১৭০৮)। সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় সুরু হোল বিশৃঙ্খলা—সুরু হোল হত্যা আর হানাহানি। তার এক অধ্যায়ে আজিমউস্সান নিযুক্ত নূতন দেওয়ান দুই বৎসর পরে মুর্শিদাবাদের প্রকাশ্য রাজপথের উপর নিহত হওয়ায় দেখা গেল যে মুর্শিদ কুলী ছাড়া এমন কেউ নেই যে বাংলাকে বাঁচাতে পারে। দিল্লী থেকে এক ফরমান পাঠিয়ে তাঁকে আবার বাংলার দায়িত্ব প্রদান করা হোল।

দিল্লীতে পাঁচ বৎসর অনিশ্চিত শান্তি বিরাজ করবার পর বাদশাহ পরিবারে আর একবার গৃহযুদ্ধ সুরু হয়। ১৭১২ খৃষ্টাব্দে বাহাদুর শাহর মৃত্যু হওয়ায় আজিম-উস্সান পূর্বে যেমন তাঁর হয়ে পিতৃব্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এখন তেমনি নিজের হয়ে ভ্রাতাদের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু করলেন। তাঁর পিতামহ ঔরঙ্গজেব যুদ্ধ করেছিলেন তিন ভাইয়ের সঙ্গে, পিতা বাহাদুর শাহ যুদ্ধ করেছিলেন তিন ভাইয়ের সঙ্গে, তিনি যুদ্ধে নামলেন চার ভাইয়ের বিরুদ্ধে! সেই যুদ্ধে তাঁকে ও অপর তিন ভাইকে হত্যা করে জাহান্দার শাহ মসনদে আরোহণ করলে তাঁর পুত্র ফারুক-শায়ার পাটনা থেকে সসৈন্যে দিল্লীর দিকে রওনা হন। এই পারিবারিক যুদ্ধে মুর্শিদ কুলী খাঁ নিরপেক্ষ থাকলেও তরুণ ফারুকশায়ার শেষ পর্য্যন্ত পিতৃব্যকে পরাজিত করে দিল্লীর মসনদ অধিকার করে দেখেন যে পূর্ব ভারতে নিজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হোলে তাঁর সহযোগিতা অপরিহার্য্য। তাই তাঁকে বাংলা

ছাড়া উড়িষ্যার নাজিম ও জাফর খাঁ উপাধি প্রদান করেন। পরে বিহারেরও নাজিমী প্রদান করা হয়। এইভাবে মুর্শিদ কুলী খাঁ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নাজিম ও দেওয়ান অর্থাৎ একচ্ছত্র নবাব বলে স্বীকৃত পান।

ইংরাজের কাছে বাদশাহের নতি স্বীকার

রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দিল্লীর মসনদ অধিকার করে ফারুকশায়ার দেখেন যে তাঁর দশা সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যুর মত। যে অস্ত্রে তিনি স্বগোত্রীয়দের নিধন করেছেন সেই অস্ত্র যে কোন দিন ফিরে এসে তাঁকে বিধ্বস্ত করতে পারে। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা ধরাধাম ত্যাগ করলেও তাদের স্বপক্ষীয়গণ বেশ সক্রিয় রয়েছে—চক্রান্ত চালাচ্ছে। ফারুকশায়ারের ঘরে শত্রু বাইরে শত্রু। মোগল রাজপরিবারে যখনই এইরূপ কোন দুর্বিপাক দেখা দিয়েছে তখন তাকে বাঁচিয়েছে রাজপুত শক্তি। রাজপুতদের ভিতর থেকে মান সিংহের মত কোনও শক্তিমান ব্যক্তিকে সহায়রূপে পাঠাবার আশায় ফারুকশায়ার রাজা অজিত সিংহের কন্যার সঙ্গে নিজের বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। এই নিয়ে কথাবার্তা চলছে এমন সময়ে তিনি হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় সব কথা যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন ইংরাজ দূত ডাক্তার হ্যামিল্টন এসে তাঁকে রোগমুক্ত করে তোলেন! হ্যামিল্টনের চিকিৎসায় খুশী হয়ে ফারুকশায়ার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি প্রদান করেন :—

১। ইংরাজরা তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য কলকাতার আশপাশে আরও ৩৮টি মৌজা ক্রয় করতে পারবে।

২। মুর্শিদাবাদ টাকশালে তাদের জন্য সপ্তাহে তিন দিন করে টাকা তৈরী হবে।

৩। বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার অধিকার কোম্পানীর থাকবে।

৪। যে সব লোক কোম্পানীর টাকা ফাঁকি দেবে বাংলার নবাবের কর্মচারীরা তাদের ধরে এনে কোম্পানীর হাতে সমর্পণ করবে।

এই বাদশাহী সনদ মুর্শিদ কুলী খাঁর গোচরে এলে তিনি তাজ্জব বনে যান। কিন্তু তিনি যতই শক্তিমান হোন বাদশাহের বিরোধিতা করতে পারেন না। আবার নিজে বাংলার ভাগ্যবিধাতা হয়ে মৌন দর্শকের ভূমিকা অভিনয় করাও

সম্ভব নয়। তাই সংশ্লিষ্ট জমিদারদের মুর্শিদাবাদে আহ্বান করে গোপনে মৌখিক নির্দেশ দিলেন তাঁরা যেন কোম্পানীকে জমি বিক্রয় না করেন।

দ্বিতীয় ঔরঙ্গজেব।

শৈশবে ধর্মান্তরিত না হোলে ব্রাহ্মণপুত্র মুর্শিদ কুলী খাঁ হয় তো বেদবেদান্ত পড়ে জীবন কাটিয়ে দিতেন ; ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ তাঁর অবশ্য করনীয় কাজ হয়ে দাঁড়াত। কিন্তু দাস ব্যবসায়ীরা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ায় সেই ধর্মপ্রবণতা ইসলামের সেবায় নিয়োজিত হয়। বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়ে তিনি প্রতি দিন স্বহস্তে কোরাণ নকল করে মক্কা-মদিনায় পাঠিয়ে দিতেন। তাঁর চিহিল-সাতুন প্রাসাদে মাঝে মাঝে অষ্টম প্রহর কোরাণ পাঠ হোত। পাচ ওয়াক্ত নমাজ পড়া তাঁর অবশ্যকর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঔরঙ্গজেবের মত তিনি বিলাস বাহুল্য পরিহার করেছিলেন, তাঁর চালচলনে সব সময়ে প্রভুর প্রভাব প্রতিফলিত হোত।

নাসেরবানু ছাড়া অন্য কোন নারীকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন নি। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের পক্ষে এই একনিষ্ঠতা বড় কম কথা নয়। কোরাণের অনুশাসন ও নৈতিক চরিত্রের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। কথিত আছে যে একমাত্র পুত্র কোন বিবাহিতা নারীর উপর বলাৎকার করায় তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেন।

হিন্দু ধর্মের প্রতি মুর্শিদ কুলীর বিরাগের অন্ত ছিল না। যখন বুঝলেন যে নিজের শেষ দিন ঘনিয়ে আসছে তখন কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য আশপাশের সমস্ত হিন্দু মন্দির ভেঙে নিজের সমাধি নির্মাণের আদেশ দেন। এভাবে উপকরণ সংগ্রহের আয়োজন দেখে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় হিন্দু মর্মাহত হয়ে তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাঁরা অপমানিত হন। তার ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর অভিশাপ কুড়িয়ে ব্রাহ্মণ সন্তান মুর্শিদ কুলী খাঁ ১৭২৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তাঁর বেহেস্তে গমন করেন।

1. **Inayetullah** ***Ahkam-i-Alamgiri, Rampur tr. p. 117, 155, 218, 220, 222***
2. **Salimullah** ***Tarikh-i-Bangla, Gladwin's trans. 213-15***

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

ইসলামের প্রসার

স্বর্গ হইতে বিদায়

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইসলামের প্রথম অভ্যুদয়ের সময় থেকে ভারতকে ওই ধর্মমতের প্রসার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু দীর্ঘ চার শত বৎসরের মধ্যে এই দেশ জয় করা সম্ভব না হওয়ায় পরিকল্পনাটি অপূর্ণ থেকে যায়। এই ব্যর্থতার পটভূমিকায় খলিফার রাজধানী বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকজন শক্তিশালী পীরকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়ে আর্য্যাবর্তের বিভিন্ন রাজ্যে পাঠান হয়। তাঁরা স্থানীয় অধিবাসীদের ভিতর থেকে কিছু সংখ্যক লোককে দীক্ষিত করে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করলে ইসলামের সৈন্যবাহিনী এসে অতি সহজে রাজ্যগুলি জয় করে নেয়। সেই ভ্রান্ত আদর্শবাদীরা ধরে নিয়েছিল যে বহিরাগতগণ সমাজ জীবন থেকে সকল আবিলতা দূর করে এই দেশকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করবে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের ধূলারাশি শূন্যে মিলিয়ে যাবার পূর্বেই সবাই ভয়ব্যাকুল নেত্রে দেখল যে তাদের কল্পনার প্রাসাদ ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে—তারা বিজেতাদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। তুর্কীরা তাদের পূর্বের উচ্চাসন থেকে নামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করল; নগরগুলির পূর্ব নাম লোপ করে মুসলমানী নাম দিল। মন্দিরগুলি মসজিদে পরিণত হোল; বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগারগুলি অগ্নিতে ভস্মীভূত হোল। শুধু কি তাই? তাদের অধিকাংশ ভূসম্পত্তি বিজয়ী সৈন্যাধ্যক্ষদের মধ্যে বণ্টিত হোল; সুন্দরী তরুণীরা তাদের হারেমে স্থান পেল। হিন্দুদের সে সময়কার অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল-বারুণী বলেন: জনৈক কাজীকে জিজ্ঞাসা

করায় তিনি উত্তর দিলেন যে তারা খিরাজ-গুজার—শুধু রাজস্ব প্রদানের অধিকার রাখে। তাদের কাছে রূপার টাকা চাইলে বিনা ওজরে সোনার টাকা দেবে—তহশীলদার মুখে থুতু ফেললে মুখব্যাদন করবে।

যে সব ভ্রান্ত আদর্শবাদীর সক্রিয় সাহায্যের ফলে দেশের রাষ্ট্রশক্তি বিদেশীদের হাতে চলে গিয়েছিল নিজেদের কৃতকর্মের এই ফল দেখে তারা বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কিন্তু যে সোনার স্বর্গ থেকে তারা অতল গহ্বরে নেমে এসেছিল সেখানে তখন ফিরে যাবার পথ আর নেই!

বিজয়ীদের ব্যর্থতা

যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য সত্ত্বেও তুর্কীরা যে এই দেশকে সামগ্রীকভাবে দীক্ষিত করতে সমর্থ হয় নি তার প্রধান কারণ এই যে তাদের সাফল্য ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। মহম্মদ ঘোরী ও বখতিয়ার খিলজী আর্য্যাবর্তের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করেছিলেন সত্য, কিন্তু সমগ্র ভারতের তুলনায় তা কতটুকু? দেশের সর্বত্র শক্তিশালী হিন্দু রাজ্যগুলি নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে প্রতিনিয়ত তুর্কীদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান জানাচ্ছিল।

বিজেতাদের আত্মকলহও কম প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে নি। ইসলাম প্রসারের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা বিস্তীর্ণ অঞ্চল জয় করলেও যুদ্ধশেষে লুঠের ভাগের জন্য এমনই কলহ শুরু করে যে ইসলাম তার নীচে তলিয়ে যায়। মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে বিভিন্ন আমীর কি ভাবে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেন তা আমরা পূর্বের এক অধ্যায়ে দেখেছি। গুপ্তহত্যা ও গৃহযুদ্ধ নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিবেশী হিন্দু নরপতিদের বিরুদ্ধে তাঁদের ঐক্য অক্ষুণ্ণ থাকলেও নিজেদের মধ্যে কলহের কোন অন্ত ছিল না। সুলতান বা বাদশাহ পরলোক গমন করলে পর্দার পিছনে বোরখাপরা বেগমদের কোন্দল এবং বাইরে শাহজাদাদের লড়াই ইসলামী শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। সে লড়াইয়ে আমীর ওমরাহরা কোনও না কোন পক্ষে যোগ দিয়ে গৃহযুদ্ধকে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দিতেন। শেষ যুদ্ধে যিনি জয়ী হোতেন প্রতিপক্ষ তাঁর কাছে নারকীয় ব্যবহার পেত। প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা, চক্ষু উৎপাটন অথবা অঙ্গ ছেদন করে নূতন সুলতান তখ্‌তে আরোহণ করতেন!

এই সর্বব্যাপী আত্মকলহের মধ্যে ইসলাম প্রসারে মন দেওয়া সম্ভব নয়। যে সব মৌলবী মোল্লা এই পুণ্য কাজে ব্রতী থাকতেন রাজশক্তির কাছ থেকে তাঁরা বেশী সাহায্য পেতেন না।

হিন্দুত্বের মরণজয়ী প্রাণশক্তি

সেই মহা দুর্য্যোগের দিনে হিন্দুরা আত্মরক্ষার জন্য কম বীরত্ব দেখায় নি। পরাজয়ের প্রথম ধাক্কা সামলে নিয়ে সমাজনেতারা প্রচার করতে থাকেন যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজয় সত্ত্বেও হিন্দুরা সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তারা আর্য্য—তাদের উপরে আর কে থাকতে পারে? যে কোনও মানদণ্ডে বিচার করা যাক না কেন বিজয়ীরা ম্লেচ্ছ—অস্পৃশ্য। তাদের স্পৃষ্ট আহার্য্য গ্রহণ করা তো দূরের কথা ছোঁয়া লাগলেও স্নান না করে শুদ্ধ হওয়া যায় না। তারা পশুবলে এ দেশ জয় করেছে বটে কিন্তু হিন্দুর ধর্মমন্দিরে তাদের প্রবেশাধিকার থাকতে পারে না—সেরূপ শুচিতা তাদের নেই। যদি তারা কোনও ধর্মস্থানে প্রবেশ করে তা হোলে গঙ্গাজলে সেই স্থান ধৌত করা বিধি।

সামাজিক স্তরে শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই আপোষহীন দ্বন্দ্ব সমস্ত মুসলমান যুগ ধরে চলে। ধর্মপ্রচারের জন্য না হোক এই বৈরী মনোভাবের জন্য বহু শাসক ছলেবলেকৌশলে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করবার চেষ্টা করেন। কোন হিন্দু ইসলাম কবুল করলে তাকে শাসক শ্রেণীর সমান মর্য্যাদা দেওয়া হোত—স্থলতান দুহিতার পাণি গ্রহণেও বাধা ছিল না। উচ্চতর চাকুরীর দ্বার তাদের সম্মুখে সব সময় উন্মুক্ত থাকত। আবার অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারীরা ইসলাম গ্রহণ করলে বেকসুর খালাস পেত। এই সহজ পথ ধরে বহু অপরাধী কাজীর বিচারে মুক্তি পেয়েছে। এরূপ ধর্মত্যাগীদের সংখ্যা যথেষ্ট হোলেও তারা সামগ্রিকভাবে হিন্দু সমাজকে টলাতে পারে নি। সকল প্রলোভন ও নিপীড়ন সহ্য করে সমাজ নিজ সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

এই দুঃসময়ে আত্মরক্ষার তাগিদে চারি দিকে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। এক দিকে শাস্ত্রকাররা কঠোর হস্তে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন, আবার অন্য দিকে শক্তিমান ধর্মাচার্য্যরা আবির্ভূত হয়ে জনসাধারণের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনেন। বাংলায় চৈতন্য, আসামে শঙ্করদেব; মহারাষ্ট্রে নামদেব,

পাঞ্জাবে নানক প্রভৃতি সাধকরা প্রাচীন দর্শনসমূহের ভিত্তিতে নূতন নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সেগুলির সম্মুখীন হবার মত শক্তি ইসলাম প্রচারকদের ছিল না।

বিরামহীন সংগ্রাম

ধর্মাচার্য্যদের এই সব কার্য্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাষ্ট্রনায়করা সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যান। নাগভট্ট, বাপ্পারাও প্রভৃতির প্রতিরোধের ফলে সিন্ধু জয়ের পর আরবগণ ভারতের অভ্যন্তরভাগে অগ্রসর হোতে অক্ষম হয়। বাপ্পারাও সসৈন্যে বহির্ভারতে চলে গিয়ে খোরাসানে এবং কাশ্মীরাধিপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় বোখারায় সার্থক অভিযান চালান। সোমনাথের মহামন্দির ধ্বংস করে সুলতান মামুদ যখন গজনীতে ফিরে যাচ্ছিলেন সেই সময়ে হিন্দুরা তাঁকে পথভ্রান্ত করে বিনাশ করবার চেষ্টা করে। সে আয়োজন ব্যর্থ হোলেও তাঁর হিন্দু সেনাপতি তিলক বন্ধুত্বের ছদ্মবেশে তাঁর সাম্রাজ্য ধ্বংস ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হত্যা করেন।

মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বিরাজের কাছ থেকে দিল্লী অধিকার করেছিলেন বটে কিন্তু হিন্দুরা তাঁকে রেহাই দেয় নি। এক দিন যখন তিনি শতদ্রু নদীর তীরে নমাজ পড়ছিলেন তখন জনৈক ব্রাহ্মণের নেতৃত্বে গরুড় সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দুরা তাঁকে হত্যা করে। পৃথ্বিরাজ রসৌ রচয়িতা চাঁদ কবি অবশ্য বলেন যে বন্দী পৃথ্বিরাজ তাঁকে শব্দভেদী বাণ নিক্ষেপ করে হত্যা করেছিলেন।

শেষ এখানে নয়। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে পৃথু নামক এক যোদ্ধার নেতৃত্বে অযোধ্যার হিন্দুরা নিজেদের ভূভাগ থেকে তুর্কী শাসনের অবসান ঘটায়। মিনহাজ-উস-সিরাজ বলেন, সেই সময়ে তারা লক্ষাধিক মুসলমানের প্রাণ সংহার করেছিল। তার ফলে দিল্লীশ্বর আলতামাসকে নূতন করে অযোধ্যা জয় করতে হয়। কিন্তু স্থায়ী শান্তি তিনি আনতে পারেন নি; তাঁর কন্যা সুলতান রাজিয়াকে হত্যা করে হিন্দুরা।

এই সর্বব্যাপী সংগ্রামে গৌড় নির্লিপ্ত ছিল না। বখতিয়ার খিলজীর অশ্বারোহীদের তড়িৎ আক্রমণে নবদ্বীপের পতন হোলেও এখানকার হিন্দুরা নিশ্চেষ্ট বসে থাকে নি। কালীকাক্ষেত্রের—কালীঘাটের—তন্ত্রাচার্য্যদের নেতৃত্বে জনসাধারণ খড়্গ হস্তে এগিয়ে গিয়ে ওই নগরী পুনরুদ্ধার করে।

কালক্রমে এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে উত্তর ভারতে মেবার, পূর্বে আসাম ও উড়িষ্যা এবং দক্ষিণে বিজয়নগর সাম্রাজ্য। আলাউদ্দীন খিলজী মেবার আক্রমণ করে যুদ্ধে জয়ী হয়েও ওই রাজ্য অধিকার করতে অক্ষম হন। রাণা কুম্ভ (১৪০৯-৬৯) সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেন গুজরাট ও মালবের সুলতানদের পরাজিত করে। রাণা সঙ্গের নেতৃত্বে সম্মিলিত রাজপুত শক্তি খানুয়ার প্রান্তরে বাবরের সম্মুখীন হয় (১৫২৭)। রাণা প্রতাপ সিংহের বীরত্বকাহিনী কিম্বদন্তীতে পরিণত হয়েছে। রাণা রাজ সিংহ ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ চালিয়েছিলেন।

মেবারের বীরত্ব কাহিনী সারা ভারতের হিন্দুদের প্রেরণা যোগায়। উড়িষ্যা তুর্কী-আফগান যুগের শেষভাগ পর্য্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যায়। সুলেমান কররানি এই রাজ্য জয় করলেও কোন মুসলমান শাসক এখানকার পরাক্রান্ত সামন্ত নরপতিদের দমন করতে পারেন নি। দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগর সাম্রাজ্য বহু দিন ধরে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করে। সম্রাট কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-৫০) বাহমনী রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে বারবার সার্থক অভিযান চালান।

এই সব শক্তিশালী রাজ্যগুলি অধিকৃত অঞ্চলের হিন্দুদের প্রেরণা জোগায়।

নারীর আত্মোৎসর্গ

হিন্দু নারীরাও এই আত্মরক্ষার সংগ্রামে নিশ্চেষ্ট থাকে নি। সুলতান মামুদের আক্রমণের সময়ে হাজার হাজার নারী নিজেদের মাথার বেণী কেটে সৈন্যবাহিনীর কাছে পাঠিয়েছিলেন এই উদ্দেশ্যে যে তারা যেন স্মরণ রাখে দেশ, ধর্ম ও নারীর মর্য্যাদা রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করে যুদ্ধ করতে হবে। যুদ্ধে পরাজয় হোলে নারীদের জহরব্রত পালন সাধারণ রীতি হয়ে দাঁড়ায়। রাজা দাহিরের পতনের পর মহারাণী রাণীবাঈয়ের নেতৃত্বে ষোল শ' সিন্ধুবালা জহরের আগুনে আত্মাহুতি দেন। পদ্মিনীলাভের জন্য আলাউদ্দীন খিলজী মেবার ধ্বংস করলেও যুদ্ধশেষে সেই রাজবধূ হাজার হাজার তরুণীর সঙ্গে জহরাগ্নিতে ঝাঁপ দেন। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে।

শুধু যুদ্ধজয়ের পর নয় স্বাভাবিক সময়েও মুসলমানরা যাতে হিন্দু তরুণীদের হস্তগত করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে রজঃস্বলা হবার পূর্বে তাদের পাত্রস্থ করা

বিধি হয়ে দাঁড়ায়। তখন স্বামী তাদের রক্ষক। কিন্তু স্বামী গতায়ু হোলে কে তাদের রক্ষা করবে? শাস্ত্রকাররা বিধান দিলেন, স্বামীর অবর্তমানে নিঃসন্তান যুবতীর জীবনে প্রয়োজন কি? সে যদি সতী হয় তা হোলে স্বামী ব্যথিত হোলে ব্যথিতা হবে, হৃষ্ট থাকলে হৃষ্টা হবে, বিদেশে গেলে হবে মলিনা, গতায়ু হোলে হবে মৃতবৎ—

আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥

মহাভারতের একটি শ্লোকের বিকৃত অর্থ করে বলা হয় যে পাণ্ডুর পরলোক গমনের পর মাদ্রী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। সে যুগে সতীদাহের অন্য কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। তার অব্যবহিত পরেও পাওয়া যায় না। মুসলমান আগমনের পূর্বে সেন যুগে গৌড়েশ্বর বিজয়সেনের প্রাঢবিবাক জীমূতবাহন বিধান দেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর সাধ্বী রমণী ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করে প্রাতঃস্নানের পর স্বামী, শ্বশুর ও আর্য্যশ্বশুরের তিলতর্পণ ও ভক্তিপূর্বক পতিবোধে বিষ্ণুর আরাধনা করবে; বিলাসবিমুক্ত হয়ে শাস্ত্রোক্ত নানাবিধ উপবাসও তাকে করতে হবে—

মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যব্রতে স্থিতা।
স্নাতা প্রতিদিনং দদ্যাৎ সভর্ত্তে সতিলাঞ্জলীন॥
কার্য্যচ্চান্বদিনং ভক্ত্যা দেবতানাঞ্চ পূজনং।
বিষ্ণোরারাধনঞ্চৈব কুর্য্যান্নিত্যপুপোষিতা॥ দায়ভাগ-১২৬

এখন দিন বদলেছে। জীমূতবাহন যাই বিধান দিয়ে থাকুন বিদেশী অধিকারের ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার যেরূপ আমূল পরিবর্তন ঘটেছে তাতে তরুণী বিধবাদের অরক্ষিতা রাখা চলে না। তাই শাস্ত্রকাররা নূতন করে বিধান দিলেন যে স্বামীর সঙ্গে তার জীবন শেষ হয়ে গেছে -শেষই করতে হবে। যে সব অঞ্চলে মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যে সব অঞ্চলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল সেখানে উচ্চশ্রেণীর বিধবাদের পক্ষে সহমরণ অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। বাংলা, বিহার, অযোধ্যা, রাজপুতানা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে অনুরূপ বিধবারা দলে দলে স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে।

উড়িষ্যা, আসাম, কেরল প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যগুলিতে সতীদাহ কোন দিনই জনপ্রিয় হয় নি। প্রাক-গোবিন্দ যুগে শিখদের মধ্যে এই প্রথা ছিল না, কিন্তু তার পর থেকে তারা আত্মরক্ষা সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ায় সতীদাহ অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। সাগরপারে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে হিন্দুপ্রধান বালি ও লম্বক দ্বীপে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হয়।

ভারতে ইংরাজ ভাইসরয় লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আইন করে এই প্রথার বিলোপ সাধন করেন। কিন্তু তখন এর প্রয়োজন শেষ হয়েছে- সতীদাহের সংখ্যা প্রায় শূন্যাঙ্কে নেমে গেছে।

আত্মরক্ষার দুর্ভেদ্য বর্ম—জাতিভেদ প্রথা

রণাঙ্গনে পুরুষের ও জহরাগ্নিতে নারীর এই আত্মাহুতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজ ব্যবস্থাকে নূতন করে ঢেলে সাজান হয়। রঘুনন্দন প্রমুখ স্মার্ত পণ্ডিতগণ প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের ভিত্তিতে হিন্দুর জীবনযাত্রা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত করেন। সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদের তীব্রতা প্রভূতভাবে বেড়ে যায়। এই প্রথা বরাবর সমাজকে বহু প্রকোষ্ঠে ভাগ করে রেখেছিল, এই সময়ে প্রকোষ্ঠগুলিকে দৃঢ়তর করা হয়। নদীতে কূর্ম যেমন বিপদের সঙ্কেত পেলে নিজের কঠিন আবরণীর অন্তরালে দেহ লুকিয়ে ফেলে, ইসলামের সর্বাত্মক আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুসমাজ তেমনি জাতিভেদের অমোঘ বর্মের অন্তরালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। হিন্দুর মহাজাতি অসংখ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতিতে বিভক্ত হয়ে গেল!

সমাজনায়করা বললেন, রাষ্ট্রশক্তি বিধর্মীদের হাতে চলে গেছে বলে ভেঙে পড়লে চলবে না; সমাজের উপর যাতে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হয় সেজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। প্রত্যেক হিন্দু হোক স্বধর্ম্ম রক্ষার দুর্জয় সৈনিক, প্রত্যেকে নিজ প্রকোষ্ঠের মধ্যে বাস করে সাধারণ অট্টালিকার রক্ষণাবেক্ষণ করুক। প্রতিটি কক্ষের চারি দিক ঘিরে যে লক্ষ্মণের গণ্ডী কাটা রয়েছে তার ভিতর থেকে কেউ যেন বাইরে চলে না যায়—আবার অন্যকে যেন সেখানে প্রবেশ করতে না দেয়। বর্ণ বিভেদের এই ব্যবস্থা ভাল কি মন্দ তা নিয়ে কেতাবী আলোচনায় সময়ক্ষেপ করে লাভ নেই, প্রতি বর্ণের সমাজপতিদের লক্ষ্য রাখতে হবে নিজ নিজ আবেষ্টনীর মধ্যে সকল নরনারী যেন

সমান মর্য্যাদা পায়—কোন অবিচারের জন্য সমাজ থেকে বেরিয়ে যাবার প্রয়োজন অনুভব না করে।

বর্ণবিভেদের এই কঠোরতার ফলে মহাজাতি বহু ক্ষুদ্রতর জাতিতে বিভক্ত হয় বটে কিন্তু তার ফল ভাল ছাড়া খারাপ হয় নি। সেই দুর্যোগের দিনে এরূপ না করলে ইসলামের সর্বব্যাপী আক্রমণ থেকে হিন্দু ধর্মকে বাঁচান যেত না। যেখানে এক বর্ণ ছেড়ে অন্য বর্ণে, এক প্রকোষ্ঠ ছেড়ে অন্য প্রকোষ্ঠে, যাওয়া বা আহারাদি করা সম্ভব ছিল না সেখানে লোকে কি ভাবে নিজেদের বিরাট হর্ম্য ছেড়ে অন্যত্র চলে যেত?

এখন মুসলমান শাসনের অবসান হয়েছে—খৃষ্টান শাসনেরও। কোন বিধর্মী আর হিন্দু সমাজের উপর খবরদারি করে না। তাই বর্ণবিভেদ প্রথার কঠোরতার কথা ভেবে আমরা বিস্মিত হই। কিন্তু এ কথা যেন না ভুলি যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রাষ্ট্রশক্তিহীন হয়ে থেকেও যে সব কারণে হিন্দুসমাজ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছে সেগুলির মধ্যে এই প্রথার অবদান কিছু কম নয়। অন্য যে দেশগুলির উপরে ইসলামের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেগুলিতে জনসাধারণ নিজেদের প্রাচীন ধর্মমতকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য কম আত্মোৎসর্গ করে নি, কিন্তু কেবলমাত্র ভারত ও বালিদ্বীপে খলিফার দীর্ঘ বাহু যে পঙ্গু হয়ে যায় তার প্রধান গৌরব এই জাতিভেদ প্রথার।

ব্রাহ্মণ-মুসলমানদের কীর্তি

হিন্দুদের বহুমুখী প্রতিরোধের জন্য বহিরাগত ধর্মপ্রচারকরা বেশী লোককে দীক্ষিত করতে না পারলেও যে সব ব্রাহ্মণসন্তান ইসলাম গ্রহণ করেছিল তারা হিন্দু সমাজের উপর যেরূপ নিপীড়ন চালিয়েছিল তুর্কী, আফগান বা মোগল কোন বিদেশী শাসক সেরূপ করে নি। পঞ্চদশ শতাব্দীর সুরুতে চণ্ডীচরণাশ্রিত রাজা গণেশ জৌনপুর সুলতানের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য এক পীরের নির্দেশে পুত্র যদুকে সাময়িকভাবে ইসলামে দীক্ষা দিলেও পরে স্বর্ণধেনু যজ্ঞের দ্বারা তাকে শুদ্ধি করে নেন। সেই যজ্ঞে বহু ব্রাহ্মণ দান গ্রহণ করেছিল বটে, কিন্তু বৃহত্তর ব্রাহ্মণ সমাজ যদুকে সমাজে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। মনঃক্ষোভে যদুসেন পিতার মৃত্যুর পর

ইসলাম কবুল করে জালালুদ্দীন নাম নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। হিন্দুরা যেক্ষেত্রে তাঁকে সমাজচ্যুত করেছিল মুসলমানরা সেক্ষেত্রে তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করায় হিন্দুসমাজের বিরুদ্ধে তাঁর মনঃক্ষোভ উদ্দাম আগ্নেয়গিরির স্ফুলিঙ্গের তেজে বিস্ফোরিত হয়—উত্তপ্ত সেই লাভাস্রোতের তলায় সমস্ত হিন্দুসমাজ বিলীন হবার আশঙ্কা দেখা দেয়। হয় ইসলাম গ্রহণ করো নয় জাহান্নমে যাও—এই ছিল সুলতান জালালউদ্দীন-যদুসেনের অমোঘ আদেশ। যে সব ব্রাহ্মণ তাঁর পিতার স্বর্ণধেনু যজ্ঞে দান গ্রহণ করেছিল তাঁর আদেশে তাদের ধর্ম্মান্তরিত করে গোমাংস ভক্ষণ করান হয়। আদিযুগীয় আরবদের মত তাঁর সিপাহীরা এক হাতে কোরাণ ও অন্য হাতে তরবারি নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে লোককে ইসলামে দীক্ষা দেবার জন্য। তাদের বিরোধীতা করতে গিয়ে বহু হিন্দু জীবনাহুতি দেয়, বহু হিন্দু বনে জঙ্গলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা উড়িষ্যা, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি হিন্দু রাজ্যগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়।

কালাচাঁদ ভাদুড়ীও ছিলেন সুলতান জালালউদ্দীনের মত এক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে সুলতান সুলেমান কররানির কন্যা তুলারী তাঁর প্রতি অনুরাগ দেখালে তিনি সেই তরুণীকে শুদ্ধি করে হিন্দুমতে বিবাহ করতে উদ্যোগী হন, কিন্তু স্থানীয় পুরোহিতদের বিরোধীতার জন্য পুরীতে গিয়ে জগন্নাথদেবের প্রত্যাদেশ ভিক্ষা করেন। সেখানে পাণ্ডারা তাঁকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়ায় তিনি কালা পাহাড়রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। হিন্দুর সমাজ জীবনের উপর কোন আঘাত না হানলেও তাঁর হাতে বহু মন্দির ধ্বংস ও দেববিগ্রহ চূর্ণ হয়।

মুর্শিদ কুলী খাঁর লক্ষ্য এক হোলেও পন্থা ছিল ভিন্ন। এক নিষ্ঠাবান দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান মুর্শিদ কুলীকে শৈশবে ছেলেধরার দল যখন বাড়ী থেকে চুরি করে নিয়ে যায় তখন সমাজ তাঁকে বাঁচাতে পারে নি। তারুণ্যে তিনি যখন স্বগ্রামে ফিরে আসেন তখন ইসলাম গ্রহণের অপরাধে কেউ তাঁকে এক গেলাস জল পর্য্যন্ত দেয় নি। মনঃক্ষোভে সেই যে তিনি গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন তার দীর্ঘ দিন পরে তাঁর দেখা পাওয়া যায় দিল্লীশ্বর ঔরঙ্গজেবের দোসর সুবা বাংলার ভাগ্যবিধাতা মুর্শিদ

কুলী খাঁরূপে। সুলতান জালালউদ্দীনের মত তাঁরও লক্ষ্য ছিল সমস্ত হিন্দু সমাজকে ইসলামে দীক্ষা দেওয়া, কালাপাহাড়ের মত লক্ষ্য ছিল হিন্দুর মন্দিরগুলি ধ্বংস করা, কিন্তু অস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে তিনি কূটনৈতিক পন্থায় নিজের অভীষ্ট সাধনে অগ্রসর হন। কোন হিন্দু জমিদার নির্দিষ্ট দিনে রাজস্ব দিতে অপারগ হোলে তাঁকে অমানুষিক নির্য্যাতন অথবা ইসলাম গ্রহণের বিকল্প দেওয়া হয়। অনন্যোপায় হয়ে বহু প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করে হিন্দু সমাজকে দুর্বল করে দেয়।

পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানের পটভূমি রচনা

এই ব্রাহ্মণ-মুসলমানগণের উৎপীড়ন ও ইসলাম প্রচারকগণের নানাবিধ কেরামতি পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদিগকে প্রভাবিত না করলেও পূর্ব বাংলায় বিশেষ ফলপ্রসূ হয়। সেই কারণে পশ্চিম বাংলা যেক্ষেত্রে বিপুলভাবে হিন্দুগরিষ্ঠ সেক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। একই ভাষাভাষী ভূভাগের দুই অঞ্চলের এই সম্প্রদায়গত বৈষম্য চিন্তানায়কদের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। লাহোর ছেড়ে দেড় হাজার মাইল ঘনসন্নিবিষ্ট হিন্দু জনপদ অতিক্রম করবার পর ইসলাম কিভাবে পূর্ববঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করল ঐতিহাসিকদের মনে এ প্রশ্ন বার বার উঠেছে।

যে কামরূপ জাহাঙ্গীরের সময়ে বীর বিক্রমে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়েছিল তার রংপুর, বগুড়া ও ময়মনসিংহ বিভাগে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, অথচ তার যে অংশ আসামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে এবং যে অংশ পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় পরিণত হয়েছে সেগুলিতে হিন্দুরা সংখ্যাবহুল। স্বাধীন ত্রিপুরায় হিন্দুরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অথচ শাহাজাদা সুজা ওই রাজ্যের সমতল অঞ্চলগুলি অধিকার করবার পর সেগুলি ধীরে ধীরে মুসলমানপ্রধান হয়ে যায়। চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল আজও বৌদ্ধপ্রধান, কিন্তু বন্দর চট্টগ্রামের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির উপর সায়েস্তা খাঁর সময়ে স্থায়ীভাবে মোগল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে বৌদ্ধের সংখ্যা হ্রাস পেতে পেতে মুসলমানপ্রধান হয়ে যায়। কোন ভূভাগের উপর মুসলমানাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হোলেই যদি হিন্দুরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয় তাহোলে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা প্রভৃতি

অঞ্চলে সেরূপ হয় নি কেন? এগুলির উপর মুসলমান অধিকার তো বহু দিন পূর্ব থেকে চলছে।

রাষ্ট্রশক্তি বিদেশীর করায়ত্ত হবার পরও দেশের ধর্ম্ম ও কৃষ্টি রক্ষা করতে পারে আত্মিক বলে বলীয়ান পুরোহিত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়। কিন্তু মুসলমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার সময়ে কি কামরূপ, কি বঙ্গ, কি ত্রিপুরা সর্বত্র এই শ্রেণীর একান্ত অভাব ছিল। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা চিরদিনই বঙ্গকে আর্য্যবাসের অনুপযুক্ত স্থান বলে মনে করত—ব্রাহ্মণরা সেখানে গেলে প্রায়শ্চিত্ত না করে শুদ্ধ হোতে পারত না। বর্ম্ম ও খড়্গ বংশের রাজত্বকালে যাজনাদি ক্রিয়ার জন্য রাঢ় থেকে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণকে বঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু তাঁরা ওই পাণ্ডববর্জিত দেশে স্থায়ীভাবে বাস করেন নি। নবম শতাব্দীতে যখন রাঢী ব্রাহ্মণদের গাঞীমালার সৃষ্টি হয় তখন তাঁদের অধিকারভুক্ত একখানি গ্রামও বঙ্গ, কামরূপ বা ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

এই ঘটনার প্রায় দুই শতাব্দী পরে সুলতান মামুদের আক্রমণের সময়ে কান্যকুব্জ থেকে মহাপণ্ডিত গঙ্গাগতি বৈষ্ণব মিশ্রের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ শরণার্থী রাঢ়ে চলে আসেন। কিন্তু এখানে কোন সুবিধা না হওয়ায় তাঁরা আরও পূব দিকে অগ্রসর হয়ে বঙ্গেশ্বর শ্যামলবর্মার অধিকারের মধ্যে কোটালীপাড়া গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের আগমনের ফলে ওই অঞ্চলের কৃষ্টিজীবন বিশেষভাবে উন্নত হয় এবং সামাজিক জীবনে স্থানীয় হিন্দুরা শক্তিশালী নেতৃত্ব লাভ করে। সেই পাশ্চাত্য ব্রাহ্মণদের বংশধরগণের প্রভাবে ফরিদপুর জেলার ওই অঞ্চলটি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় পর্য্যন্ত হিন্দুপ্রধান ছিল।

আর একটি হিন্দুপ্রধান অঞ্চল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা। নবদ্বীপ পতনের পর সেন শক্তি যখন গৌড় থেকে সেখানে রাজধানী অপসারিত করে তখন রাঢ় ও বরেন্দ্রের বহু বর্ণহিন্দু তাঁদের সঙ্গ নেয়। পূর্বে বোধ হয় সেখানে কিছু কিছু বৈদ্য ও কায়স্থ ছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিল বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বঙ্গজ কায়স্থ ও বৈদ্য আছে, কিন্তু বঙ্গজ ব্রাহ্মণ নেই। সেই সময়ে গৌড় থেকে এখানে রাজধানী অপসারণের ফলে বহু বর্ণহিন্দুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের এই অংশের কৃষ্টিজীবন বিশেষভাবে উন্নীত হয়। তাঁরা শুধু যে স্থানীয় জনসাধারণকে নেতৃত্ব দেন তা নয় গুরু পুরোহিতের অভাব দূর হওয়ায়

সবাই শান্ত মনে ধর্মাচরণ করতে থাকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়েও যে ঢাকা জেলার এই অঞ্চল হিন্দুপ্রধান ছিল তার কারণ এই বর্ণহিন্দুদের প্রভাব।

রাজসাহী, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ যথেষ্ট ছিল বটে কিন্তু একে তারা অতিরিক্ত বিষয়াসক্ত হয়ে পড়েছিল তায় দীর্ঘকাল বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সংস্পর্শে বাস করায় সংস্কারবর্জিত হয়েছিল। যে ক্ষেত্রে রাঢী ব্রাহ্মণগণ কুচবিহার, কাছাড, আসাম প্রভৃতি স্বাধীন হিন্দু রাজ্যগুলিতে চলে গিয়ে স্থানীয় রাজশক্তিকে ধর্মরক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধ করছিল সে ক্ষেত্রে নিজেদের সীমাবদ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে জনসাধারণকে প্রভাবিত করবার শক্তি পর্য্যন্ত এই ব্রাহ্মণদের ছিল না। তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার মত অন্যান্য উচ্চশ্রেণীর অপ্রতুলতাও ছিল এই অঞ্চলে। তাই তাদের চক্ষের সম্মুখে দলে দলে হিন্দু ভিন্ন সমাজে চলে যেতে লাগল, আর তারা অসহায়ভাবে তাই দেখল।

এই বহুবিস্তৃত জনপদে ইসলামের সাফল্যের পিছনে ভৌগলিক প্রভাবও বড় কম ছিল না। এরূপ নদীবহুল জলময় ভূভাগ বোধ হয় সারা পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। সেই কারণে এখানকার জনসাধারণের প্রকৃতি স্বভাবতঃই কোমল ও ভাবপ্রবণ। ইসলামের সর্বগ্রাসী আক্রমণের সময়ে উচ্চশ্রেণীর, বিশেষ করে নিষ্ঠাবান পুরোহিতদের, নেতৃত্বের অভাব ঘটায় তারা কাণ্ডারীহীন নৌকার মত দিগভ্রান্ত হয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল—তাদের নেতৃত্ব দিলেন সহজিয়া গোঁসাইরা। নবাগতদের বহুমুখী আঘাত থেকে তাদের বাঁচাবার মত শক্তি সেই স্খলিতচরিত্র ধর্ম্মযাজকদের কতটুকু থাকতে পারে? তাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত জনসাধারণের মধ্যে বহুবিবাহ রীতি হয়ে দাঁড়ায়—সমাজ বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। বহুবিবাহ ইসলামপন্থীদের মধ্যেও ছিল, কিন্তু হিন্দু বিধবাদের পক্ষে পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে ও অন্য সময়ে দলে দলে স্বামীহারা নারী ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন আশ্রয় খুঁজে পায় না। এ ছাড়া ছিল রাজশক্তির প্ররোচনা এবং মোল্লা-মৌলবীদের নানাবিধ কেরামতি। তার ফলে অসংখ্য হিন্দু ধর্মত্যাগী হয়ে শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সময়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে!

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি

১

বৈষ্ণব কাব্যধারা

পূর্বের এক অধ্যায়ে দেখেছি কি ভাবে প্রাচীন গৌড়ী ভাষা বিবর্তিত হোতে হোতে পঞ্চদশ শতাব্দীর সুরুতে বাংলায় পরিণত হয়। মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় দিয়ে যে শিশুর যাত্রা সুরু হয়েছিল, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে সে পূর্ণতা লাভ করে। শ্রীচৈতন্যের তখনও আবির্ভাব হয় নি, তাই চণ্ডীদাসের পদাবলীর উপর তাঁর দর্শনের কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকলে যে সব সাহিত্যিক লেখনী ধারণ করেন তাঁদের ভাষার উপর চণ্ডীদাস-বিত্থাপতির ও ভাবধারার উপর চৈতন্যদর্শনের প্রভাব সুস্পষ্ট। চৈতন্যদেব প্রাচীন বৈষ্ণবমতের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার করায় এক দিকে যেমন একটি শুদ্ধসত্ব সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, তেমনি অন্য দিকে এই মতবাদ প্রচারের জন্য এক সুললিত সাহিত্য গড়ে ওঠে। চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব দর্শন অবলম্বন করে কত ভক্ত যে কত পদ সৃষ্টি করেন তার কোন ইয়ত্তা নেই। সেগুলির অধিকাংশকে সাহিত্যের মর্য্যাদা দেওয়া না গেলেও কতকগুলি বেশ প্রাঞ্জল ও মধুর। কীর্তনীয়াদের কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে সেই সব পদ জনসাধারণকে প্রভূত আনন্দ দেয়।

শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বন করে যে কয়খানি গ্রন্থ রচিত হয় সেগুলির মধ্যে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত সমধিক প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণদাসের জন্মস্থান বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়ার সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তরে ঝামটপুর গ্রামে। ওই সদ্‌গোপ প্রধান গ্রামে এখন

কোন বৈদ্যের বাস না থাকলেও সে সময়ে ছিল। তার একটি পরিবারে ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদাসের জন্ম হয়। নামটি শৈশবের কি বৈষ্ণবাশ্রমের তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তাঁর পিতার নামও অজ্ঞাত। অকৃতদার অবস্থায় বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু হওয়ায় বংশও লোপ পেয়েছে। চৈতন্যচরিতামৃত ব্যতীত তিনি গোবিন্দামৃত, কৃষ্ণকর্ণামৃত টীকা, স্বরূপবর্ণন, বৃন্দাবন ধ্যান প্রভৃতি আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তবে প্রথমোক্ত গ্রন্থই সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন ধামে গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়।

সংস্কৃত সাহিত্যে কৃষ্ণদাসের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। চৈতন্যদেবের তিরোভাবের কয়েক বৎসর পরে অন্যান্য ভক্তের অনুরোধে তিনি চৈতন্য-চরিতামৃতের রচনা স্নুরু করেন। তিন খণ্ড ও বাষট্টি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই মহাগ্রন্থে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে কবিত্বের, তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বের, ভক্তির সঙ্গে যুক্তির সুন্দর সমন্বয় দেখা যায়। তাঁর মতে চৈতন্যদেব রাধা ও কৃষ্ণের যুগ্ম প্রকাশ, জগন্নাথ মিশ্র নন্দ, শচীদেবী যশোদা, নিত্যানন্দ বলরাম, কেশব ভারতী অক্রুর ও তিনি নিজে তৃণাদপি হীন—

জগাই মাধাই হইতে মুঞি সে পাপিষ্ঠ।
পুরীষের কীট হইতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম শুনে যেই তার পাপ হয় ॥

বৃন্দাবন দাস বৈষ্ণবদের চক্ষে বেদব্যাস। অন্যের কাছে বেদব্যাসের মহাভারত যতখানি মূল্যবান বৈষ্ণবদের কাছে তাঁর চৈতন্য ভাগবতের মূল্য তাই। শুরুতে গ্রন্থখানির নাম ছিল চৈতন্য মঙ্গল, পরে পরিবর্তিত করে চৈতন্য ভাগবত রাখা হয়। গ্রন্থকার চৈতন্যের পার্ষদগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলেন বলে এর মূল্য সমধিক।

চব্বিশ পরগণা জেলার হালিসহরের সন্নিকটে নতি গ্রামে আনুমানিক ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। তাঁরও এই নাম বোধ হয় বৈষ্ণবাশ্রমের। মাতার নাম নারায়ণী—পিতার নাম অজ্ঞাত। বিধবা নারায়ণী যখন নিজের ও শিশুপুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য চিন্তাকুল সেই সময়ে জনৈক

চৈতন্যভক্ত বাসুদেব দত্ত নবদ্বীপের উপকণ্ঠে গঙ্গাতীরে একটি দেবালয় নির্মাণ করে তার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাঁর উপরে অর্পণ করেন। সেখানে শিশুর শিক্ষাজীবন সুরু হয় এবং শিক্ষা সমাপনের পর তিনি নিত্যানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য লাভ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতের পূর্বে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যভাগবত প্রকাশিত হয়। গ্রন্থখানি পাঠ করে কৃষ্ণ দাস চৈতন্যচরিতামৃতে লিখেছেন—

আরে মূর্খ লোক! শুন চৈতন্য মঙ্গল।
চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল॥
কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল॥
চৈতন্য-নিতাইএর যাতে জানিবা মহিমা।
যাতে জানি কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধান্তের সীমা॥
ভাগবতে যত ভক্তি সিদ্ধান্তের সার॥
লিখিয়াছেন ইথা জানি করিয়া উদ্ধার॥
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেও মহা বৈষ্ণব হয় ততক্ষণ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য॥
বৃন্দাবনদাস পদে কোটী নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহ করিলা সংসার॥

যে সময়ে গ্রন্থ দুখানি রচিত হয় বাংলা ভাষা তখনও সংস্কৃতের প্রভাব থেকে পুরাপুরি বেরিয়ে আসতে পারে নি। সেই কারণে সমসাময়িক ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের উপর ল্যাটিনের যত প্রভাব এই গ্রন্থ দুখানিতেও সংস্কৃতর ততখানি প্রভাব সুস্পষ্ট। সত্যিকারের সকল সাহিত্যের মত উভয় গ্রন্থে সে যুগের একটি সুস্পষ্ট আলেখ্য পাওয়া যায়।

এই দুজন জীবনীলেখক ছাড়া যে সব পদকর্তার রচনায় বৈষ্ণব সাহিত্য শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে তাঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বাসুদেব ঘোষ, রায় শেখর করম আলী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচিত পদগুলি দুইটি সুনির্দিষ্ট ধারা দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। কেউ বা বিদ্যাপতির অনুকরণে ব্রজবুলি মিশ্রণে আবার কেউ বা চণ্ডীদাসের অনুকরণে বিশুদ্ধ বাংলায় পদগুলি রচনা করেছেন। প্রথম সম্প্রদায়ের মধ্যে গোবিন্দদাস ও দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জ্ঞানদাস প্রধান। দুই সম্প্রদায়ের দুইটি পদের নমুনা এখানে দেওয়া হোল

শরদ চন্দ পবন মন্দ
বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথি
মত্ত মধুকর ভোরণি।

হেরত রাতি ঐছন ভাতি
শ্যাম মোহন মদনে মাতি
মুরলী গান পঞ্চম তান
কুলবতী-চিত-চোরণি॥

শুনত গোপী প্রেম রোপি
মনহিঁ মনহিঁ আপন সোঁপি
তাহি চলত যাঁহি বোলত
মুরলীক কল-লোলনি।

বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ
এক নয়নে কাজর-রেহ
বাহে রঞ্জিত কঙ্কন একু
একু কুণ্ডল ডোলনি॥

—গোবিন্দ দাস

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ
সদা নিয়ে রাখি বুকে॥

আনের আছয়ে অনেক জনা
আমারি কেবল তুমি।
আমার পরাণ হইতে শত শত গুণে
প্রিয়তম করি মানি॥

বঁধু শিশুকাল হইতে মায়ের সোহাগে
সোহাগিনী বড় আমি।
সখিগণ মানে জীবন অধিক
পরাণ-বঁধুয়া তুমি॥

আমার নয়নের অঞ্জন অঙ্গেরি ভূষণ
তুমি সে কালিয়া চাঁদা।
জ্ঞানদাস কহে কালিয়া পীরিতি
অন্তরে অন্তরে বাঁধা॥

—**জ্ঞানদাস**

শাক্ত সাহিত্য

বৈষ্ণবদের পদাবলী কীর্তনে যখন গৌড়-বঙ্গ প্লাবিত হচ্ছে তখন শাক্তরা নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না। তাদের মতবাদ কিছু নূতন নয়। পূর্বে পাল বংশের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে গৌড়ের সর্বত্র শাক্তমতের বন্যা বইত – শাক্তমতে বিশ্বাসী জনসাধারণ আর্য্যতারা, পর্ণশবরী, বজ্রবরাহী প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবীদের পূজা করত। ওই বংশের পতনের পর সেই বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের উত্তরসাধকগণ ধীরে ধীরে শৈব তান্ত্রিকে পরিণত হোলেও পূর্বের শক্তি উপাসনা ত্যাগ করে নি। কিন্তু এই মতের উচ্চ দর্শন সাধারণের বোধগম্য না হওয়ায়

তাঁরা কোথাও যথোচিৎ মর্য্যাদা পায় না। পাল বংশের উত্তরাধিকারী সেনরাজগণ ব্রাহ্মণ্যমতের পৃষ্ঠপোষক হোলেও এই তান্ত্রিকদের মতবাদের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে যে শক্তি পূজার প্রবর্তন করেন তার ফলে পূর্বতন দেবদেবীগণ দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি রূপ ধরে পুনরাবির্ভূত হন। কিন্তু তাঁদের অবস্থান অনেক উর্দ্ধে—দেবলোকে! নিম্নস্তরের দেবদেবী না হোলে দৈনন্দিন আপদবিপদ থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবে কে? সদা সর্পভয়ে ভীত নরনারী মনসাদেবীর সন্ধান পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল; হাম বসন্তের সময়ে শীতলা দেবীর প্রসাদ পাবার আশায় উৎফুল্ল হোল। এই সব দেবীদের নিয়ে রচিত হোল নূতন শাক্ত সাহিত্য।

মনসাদেবীকে মানুষের হৃদয়ে স্থান দেবার জন্য যিনি অগ্রণী হন তিনি কোন ব্রাহ্মণ নন - হরি দত্ত নামে একচক্ষুহীন জনৈক কায়স্থ সন্তান। চাঁদ সওদাগরের কাহিনী অবলম্বনে তাঁর পদ্মপুরাণ রচিত হয়। শিবভক্ত চাঁদ কি ভাবে দেবী মনসার কোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য শেষ পর্য্যন্ত পুত্রবধু বেহুলার অনুরোধে ওই দেবীর পূজা শুরু করেন তাই এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয়। হরি দত্তের পুস্তকখানি লোপ পেয়েছে বটে, কিন্তু পরবর্তী মনসাভক্ত বিজয় গুপ্ত তাঁর পদ্মপুরাণে লিখেছেন—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

সাহিত্য হিসাবে এই সব মঙ্গল কাব্যের মূল্য বেশী নয়। কিন্তু এর রচয়িতাদের ভিতর থেকে একজন শক্তিমান সাহিত্যিক আবির্ভূত হয়ে স্বীয় প্রতিভায় গৌড়-বঙ্গকে উদ্ভাসিত করেন। চণ্ডীদাসের সুললিত পদাবলী সদ্য-বিকশিত বাংলা সাহিত্যে যেরূপ মাধুর্য্য এনে দিয়েছিল শতাব্দীকাল পরে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী তাকে তেমনি প্রাণবন্ত করে তোলে। একাধিক মানদণ্ডে তাঁকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলা সঙ্গত। যে সব সাহিত্যিক নিজেদের লেখার মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকেন মুকুন্দরাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

বর্দ্ধমান জেলার সেলিমাবাদ থানায় দামুন্যা গ্রামে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে মুকুন্দরামের জন্ম হয়। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় যে পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র,

পিতা হৃদয় মিশ্র; মাতার নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। স্বগ্রামে শিক্ষা-জীবন অতিবাহিত হোলেও যৌবনে পদার্পণ করে তিনি দেখেন যে গৌড় সুলতানের পরোক্ষ সমর্থনে হিন্দুদের উপর যেভাবে উৎপীড়ন চলছে তাতে আত্ম-সম্মান নিয়ে এখানে বাস করা সম্ভব নয়। তাই তিনি স্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে নিয়ে গৌড় সীমান্ত পার হয়ে রাঢ়ী হিন্দুদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল উড়িষ্যায় চলে যান।

মেদিনীপুর তখন ওই স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত—জলেশ্বর জেলার একটি বিষয়। সেখানকার ব্রাহ্মণভূমি পরগণার আঁড়রা গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া-দেব মুকুন্দরামের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে পুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। এইভাবে একটি স্থায়ী আশ্রয় লাভ করে তিনি সাহিত্য সাধনায় মন দেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী থেকে চণ্ডী প্রকাশিত হয়। সেই পুস্তক পাঠে মুগ্ধ হয়ে জমিদার বাঁকুড়াদেব নতুবা উৎকলাধীশ তাঁকে কবিকঙ্কণ উপাধিতে ভূষিত করেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী পুরাণবর্ণিত চণ্ডী থেকে বহুলাংশে স্বতন্ত্র। বৈষ্ণবদের চক্ষে চৈতন্যদেব যেমন নারায়ণের অবতার, শাক্তদের চক্ষে মুকুন্দদাসের চণ্ডীও তেমন সাক্ষাত ভগবতী। চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য তিনি কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-শ্রীমন্তের কাহিনী তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বলিষ্ঠ ভাষায় রচনা করেন। এই গ্রন্থেও সে যুগের সামাজিক রীতি-নীতির একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। শিব, গৌরী, যক্ষ, কালকেতু, ফুল্লরা, ধনপতি সওদাগর, লহনা, খুল্লনা, ভাঁড়ু দত্ত প্রভৃতি কবিকঙ্কনের চণ্ডীর নায়ক নায়িকা। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মুসলমান, সদ্গোপ, বাগদী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বিবরণও তাঁর গ্রন্থে আছে। পশুপক্ষী, সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি প্রাণীদেরও তিনি বাদ দেন নি। দেবী চণ্ডী অবশ্য সবার উপরে। দেবী আপন পরিচয় প্রসঙ্গে বলছেন—

করালবদনি কালি কপালকুণ্ডলা।
কৃপামই মহামায়া কপোলের মালা॥
কলাবতি কাত্যায়নি কুমুদা ধরি নাম।
কৈলাস করিব বাসি পুরি তব কাম॥

খগেশ্বরি খড়্গধারি খঞ্জননয়নি।
খরতর বেস ধরি খল বিনাসিনি॥

খর্প্পরধারিনি য়ামি স্থন কালকেতু।
খাইল য়ম্বুরকুল য়মরের হেতু ॥

গড়ের নাদিনি য়ামি গনেসের মাতা।
গয়া গঙ্গা গোদাবরী য়ামি গোপস্থতা ॥
গোকুলে করিল পূজা গোপাল সকলে।
গহনে থাকিল য়ামি তোমা অনুকূলে ॥

ঘোররূপা ঘর্ম্মমুখা ঘর্ঘরনাদিনী।
ঘোরতর কারাগারে য়ামি সহাইনি ॥
ঘোরঘণ্টা নিনাদিনি য়ামি মহারণে।
ঘূর্ণিত য়ামার মায়া জানে জগজনে ॥

চণ্ডবতী চণ্ডরূপা য়ামি মহাতেজা।
চরাচরগতি য়ামি রণে চণ্ডভূজা ॥
চণ্ড চামুণ্ড য়ামি চাপ ধরি করে।
চঞ্চল না হবে বির রাখিব তোমারে ॥

ছত্রধারি ইচ্ছাবতী য়ামি মহামায়া।
ছত্র ধরাঞ্চা য়ামি তোরে কৈল দয়া ॥

জয়াবিজয়া য়ামি জগতজননি।
জয়করি জন্মজরা নাঞি য়ামি জানি ॥
জরাসিন্ধু মহারাজা পূজিল য়ামারে।
জিনিল য়নেক বার নন্দের কুমারে ॥

কৃত্তিবাস-কাশীরাম

হিন্দীতে তুলসীদাস (১৫৩২-১৬২৩) রামচরিতমানস রচনা করে যতখানি যশস্বী হয়েছেন বাংলায় কৃত্তিবাসের ততখানি সৌভাগ্য না হোলেও তাঁর রামায়ণের মূল্য কিছু কম নয়। কবি তাঁর রচনায় নিজের জন্মসময়ের কোন ইঙ্গিত না দেওয়ায় সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতদ্বৈধ থাকলেও তিনি যে তুলসীদাসের সমসাময়িক এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

নদীয়া জেলায় শান্তিপুরের অদূরে ফুলিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। এই ফুলিয়া গ্রাম থেকে রাঢ়ীশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণদের ফুলিয়া মেলের উদ্ভব হয়েছে। তবে কৃত্তিবাস কুলীন ছিলেন কিনা তা বলা যায় না। শৈশবে গ্রামের টোলে পাঠ সমাপনের পর তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বরেন্দ্রে যান এবং সেখানে এক পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পাঠ্য জীবনের শেষে জীবিকার সন্ধানে রাজধানী গৌড়ে অবস্থানের সময়ে তৎকালীন সুলতান তাঁর প্রতিভার কথা জানতে পেরে তাঁকে রামায়ণ অনুবাদে উৎসাহ দেন। তাঁর রামায়ণ বাল্মীকি রামায়ণ থেকে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র -হরিবংশ ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট উপাদান সংগৃহীত হয়েছে।

কাশীরাম দাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্দ্ধমান জেলায় সিঙ্গি গ্রামে এক কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কমলাকান্ত। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের ন্যায় এই পরিবারকে রাজনৈতিক আবর্তে ভাসতে ভাসতে উড়িষ্যা রাজ্যের মেদিনীপুরের অন্তর্গত কোনও গ্রামে গিয়ে বসতি স্থাপন করতে হয়। সেখানেই কাশীরাম মহাভারতের অনুবাদ করেন। কৃত্তিবাসের ন্যায় মূল মহাভারতের অনুসরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি—যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করতে হয়েছে।

সকল অনুবাদ সাহিত্যের যে দুর্বলতা উভয় গ্রন্থের মধ্যে তা পুরাপুরি আছে। কি প্লট, কি ভাব, কি ভাষা কিছুতেই গ্রন্থকারদ্বয় মৌলিকত্ব দেখাবার সুযোগ পান নি। তা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে যে কাশীরামের রচনাভঙ্গি বেশ পরিচ্ছন্ন ও প্রাঞ্জল। এই প্রাঞ্জলতার জন্য তাঁর অমৃত সমান মহাভারত যে কেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রতি ঘরে পঠিত হয়েছে নিচের ছন্দটি থেকে তা বোঝা যাবে—

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে স্মৃতি॥

অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচী করিয়াছে শোভা॥

সিংহগ্রীব বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥

২

বোধনে বিসর্জন

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিকাশের পর থেকে দুই শতাব্দীর মধ্যে এই যে অগ্রগতি তা এতই মন্থর যে তাতে উৎফুল্ল হবার কোন কারণ নেই। যে রাজনৈতিক শান্তি, সামাজিক স্বস্তি ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছল্য থাকলে সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমিকা রচিত হয় সেন বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তা শূন্যে মিলিয়ে গিয়েছিল। বল্লালসেন তখন দৃঢ় হস্তে শাসনদণ্ড পরিচালনা না করলে জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীর ঝঙ্কারে গৌড়ের আকাশ বাতাস মুখরিত হোত না; কবিক্ষ্মাপতি ধোয়ীর পবনদূত কোন বার্তা বহে আনত না। লক্ষ্মণসেনের নিষ্ক্রমণের পর থেকে যে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তায় দেশ আচ্ছন্ন হয় তাতে সাহিত্যিকের প্রতিভা বিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

একাদশ শতাব্দীর সুরুতে জাপানে রচিত হয় বিশ্ব সাহিত্যের সর্বপ্রথম উপন্যাস গেনজি মোনোগাতারি—গেনজির কাহিনী। লেখিকা শিকিবু মুরাসাকি এক বিশিষ্ট বংশের কন্যা—যৌবনে পদার্পণ করে সম্রাজ্ঞী আকিবোর সহচরী নিযুক্ত হন। তাঁর প্রেরণায় শ্রীমতী মুরাসাকি রাজকুমার গেনজির প্রেম কাহিনী অবলম্বন করে ১০০৮ খৃষ্টাব্দে যে বিরাট উপন্যাস সমাপ্ত করেন ভবিষ্যংকালে সকল দেশের কথা সাহিত্য তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই রূপসী রমণীর ডায়েরী মুরাসাকি শিকিবু নিক্কি ও কাব্যগ্রন্থ মুরাসাকি শিকিবু কাসু বিরাট প্রতিভার পরিচায়ক।

শ্রীমতী মুরাসাকি জাপানী সাহিত্যে যে উজ্জ্বল ঐতিহ্য স্থাপন করে যান তার পরিসমাপ্তি ঘটে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কামাকুরা যুগে। সেই সময় থেকে জাপানে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সূত্রপাত হয়—উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাহিত্য গিয়ে পড়ে বৌদ্ধ যাজকদের হাতে—জেনপন্থী বৌদ্ধদের প্রেরণায় গেমপেই সেইসুইকি শ্রেণীর কয়েকখানি সামরিক উপন্যাস ও বহু নো নাটক রচিত হোলেও উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি হয় নি।

ইংরাজী সাহিত্যের প্রথম বিকাশ হয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে জিওফ্রে চসারের (১৩৪০-১৪০০) Canterbury Tale দিয়ে। চসার পরিকল্পিত এই গল্পগুচ্ছের ত্রিশজন নায়ক নায়িকা পদব্রজে ক্যাণ্টারবেরির কোনও ধর্মমন্দিরে তীর্থ

ভ্রমণে যাবার সময়ে দৈবযোগে এক স্থানে মিলিত হয়ে স্থির করেন যে পথক্লেশ নিবারণের জন্য প্রত্যেকে চারটি করে গল্প বলে সকল তীর্থযাত্রীকে আমেজে রাখবেন। এই থেকে বোঝা যায় যে চসারের লক্ষ্য ছিল ১২০টি গল্প রচনা। শেষ পর্য্যন্ত তা সম্ভব না হোলেও যে একুশটি সম্পূর্ণ ও তিনটি অসম্পূর্ণ গল্প তিনি রচনা করেন সেগুলির ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে ইংরাজী সাহিত্যের গগনচুম্বী সৌধ।

চসারের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড ও দ্বিতীয় রিচার্ড তাঁকে প্রভূত আর্থিক সাহায্য ছাড়া রাজসম্মান প্রদান করেন। তিনি হয়ে ওঠেন উভয় নরপতির অন্তরঙ্গ সহচর। তাঁর তিরোধানের কিছু দিন পর থেকে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক জীবনে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তাতে সাহিত্যিকের প্রতিভা বিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সাহিত্য আশ্রয় নেয় গীর্জার অভ্যন্তরে—বাইবেল হয়ে দাঁড়ায় সাহিত্য বিকাশের প্রধান উৎস। যোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময়ে এই বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটলে সেক্সপীয়রের আবির্ভাব হয়ে ইংল্যাণ্ডের আকাশ চোখ ঝলসান আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

ভারতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দী সাহিত্যের প্রথম উন্মেষ হয় কবি চাঁদ বারদাইয়ের পৃথ্বিরাজ রাসৌ দিয়ে। দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজের জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগ্রন্থ। দিল্লীদান, কৈমাস যুধ প্রভৃতি অধ্যায়ের ভাষা খুবই সুললিত। এই গ্রন্থ রচনা করে চাঁদ কবি যে ঐতিহ্য স্থাপন করেন তুর্কী সুলতানদের ঔদাসিন্যের ফলে তা অঙ্কুরে শুকিয়ে যায়। দেশের ভাষা হিন্দীকে কোণঠাসা করে তাঁরা ফার্সীকে উৎসাহ দেওয়ায় শেখ সাদি, আমীর খসরু প্রমুখ বহু বিদেশী সাহিতিাক ভারতে চলে আসেন। ফার্সীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, কিন্তু হিন্দী যায় পেছিয়ে।

বাংলা সাহিত্যও একই বাধার সম্মুখীন হয়। মালাধর বসু, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও কৃত্তিবাস ওঝা সমসাময়িক সুলতানদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য সুলতানরা ছিলেন এই সাহিত্য সম্বন্ধে নিস্পৃহ। তাঁদের ঔদাসিন্যের জন্য প্রথম বিকাশের পর থেকেই বাংলা খঞ্জের মত পথ চলতে সুরু করে। কোন কোন সাহিত্যিক বৈষ্ণবদেব আখড়ায় গিয়ে আশ্রয় নেন, আবার কেউ বা ভিন্ন রাজ্যে চলে গিয়ে সাহিত্য-সাধনা করেন।

মরুভূমির উষরতা

কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রকাশের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে চলে শতাব্দীর পর শতাব্দীর শূন্যতা। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তখন কত প্রাণবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছিল, অথচ বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বিরাজ করছিল কবরের নিস্তব্ধতা। সুলতানদের আমলা সৃষ্টির জন্য মক্তবে মাদ্রাসায় কিছু কিছু ফার্সী পড়ান হোত, জমিদারদের সাহায্যপুষ্ট টোলে ও চতুষ্পাঠীতে পণ্ডিতরা সংস্কৃত পড়াতেন। এই পর্য্যন্ত! নূতন সাহিত্য সৃষ্টির কথা কারও মনে উঠত না—পাঠকরাও চাইত না।

এরূপ এক জীবন্মৃত জাতির জীবনে কতটুকু আনন্দ থাকতে পারে? আর আনন্দ না হোলে তো সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয় না। যাত্রা, কবিগান, তর্জা প্রভৃতি উৎসবের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু তার ভিতর থেকে এমন একখানি নাটক বা এমন একটি কাব্যগ্রন্থ সৃষ্টি হয় নি যাকে সাহিত্যের পর্য্যায়ে ফেলা চলে। রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী নিয়ে সীতাহরণ শ্রেণীর বহু পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছিল সত্য কিন্তু সেগুলির সাহিত্যমূল্য কানাকড়িও নয়। মাথুর প্রভৃতি কৃষ্ণযাত্রাগুলিরও একই অবস্থা। কবিগানে কবির লড়াই জমত, কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি হোত না। তর্জাগান কুৎসিত খিস্তিখেউড়ে পর্য্যবসিত হোত।

উপন্যাস নেই—নায়িকা কই? এই সুদীর্ঘ সময়ে উপন্যাস তো দূরের কথা একটি বড় গল্প পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নি। সকল উপন্যাসের মূল উপাদান নায়ক নায়িকার প্রেম কাহিনী। সুদূর অতীতে সেরূপ উপাদানের অভাব ছিল না বলে শকুন্তলা, মালাবিকাগ্নিমিত্র, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি অসংখ্য কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু আলোচ্য যুগে দেশের রাজনৈতিক জীবন অসাড় হয়ে পড়ায় মেয়েদের গৌরীদান অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। দশমবর্ষীয়া বালিকার হৃদয়ে প্রেমানুভূতি কতটুকু বিকশিত হয়? যে ফুলের কুঁড়ি ফোটবার আগে মাটিতে ঝরে পড়ে তাতে সৌরভ আসবে কোথা থেকে? গৌরীদানের মেয়েকে সতী বানান যায়, কিন্তু উপন্যাসের নায়িকা করা যায় না—তাই নায়িকা অভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে বাংলায় কোন উপন্যাস সৃষ্টি হয় নি। সর্বত্র বিরাজ করেছে মরুভূমির উষরতা!

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

সুজাউদ্দীন ও সরফরাজ খাঁ

মুর্শিদ কুলী খাঁ তাঁর কন্যা জিন্নৎউন্নিসার সঙ্গে সুজাউদ্দীন মহম্মদ খাঁ নামক এক উচ্চবংশীয় আফসার তুর্কীর বিবাহ দিয়ে জামাতাকে উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করেছিলেন। সুজাউদ্দীনের অন্যান্য বহুবিধ সদগুণ থাকা সত্ত্বেও চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য জিন্নৎউন্নিসার দাম্পত্য জীবন সুখের হয় নি। সেই কারণে মুর্শিদ কুলী খাঁ মৃত্যুর কিছু দিন পূর্বে বাদশাহর কাছে অনুরোধ পাঠিয়েছিলেন যে তিনি ইহলোক ত্যাগ করলে যেন তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। কথাটা সুজাউদ্দীনের কানে গেলে তিনি পরিকল্পনাটি বানচাল করবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। একাজে তাঁর প্রধান সহায় হন হাজি আহমেদ ও তাঁর ভ্রাতা আলীবর্দী খাঁ। উভয় ভ্রাতার পরামর্শ মত কাজ করে সুজাউদ্দীন এক দিকে মুর্শিদাবাদের ঘটনাবলীর সংবাদ রাখছিলেন ও অন্য দিকে বাদশাহী দরবারে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছিলেন। শেষ পর্য্যন্ত যখন তিনি শুনলেন যে মুর্শিদ কুলীর মৃত্যু আসন্ন, কবর পর্য্যন্ত তৈরী হয়ে গিয়েছে, তখন কালবিলম্ব না করে তাঁর অন্য এক বেগমের পুত্র মহম্মদ তকি খাঁর উপর উড়িষ্যার ভার অর্পণ করে সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হন। কিছু দূর অগ্রসর হবার পর তিনি খবর পেলেন যে মুর্শিদ কুলী কবরশায়ী হয়েছেন এবং আরও কিছু দূর যাবার পর তাঁর হাতে এসে পৌছাল বাদশাহর নিয়োগপত্র। যে স্থানে সেই অমূল্য কাগজখানি তাঁর হস্তগত হয় উৎফুল্ল সুজাউদ্দীন তার নাম মোবারক মঞ্জিল দিয়ে দ্রুতগতিতে মুর্শিদাবাদে গিয়ে উপস্থিত হন। কেউ তাঁকে কোন বাধা দিল না, তিনি নিজেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার ও সরফরাজকে দেওয়ান বলে ঘোষণা করলেন।

সুজাউদ্দীনের সিংহাসনারোহণের সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদ কুলী যুগের বর্বরতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। যে সকল জমিদারকে মুর্শিদ কুলীর দুজন যমদূত অফিসার নাজির আহমেদ ও মোরাদ ফরাস বাকি খাজনার দায়ে কারারুদ্ধ করে রেখেছিল তিনি তাদের মুক্তি দিয়ে সেই দুই নরপশুর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন ও মৃত্যুদণ্ড দেন। কারামুক্ত জমিদারদের কাছ থেকে বাকি খাজনার জন্য লিখিত মুচলেকা নিয়ে তাঁরা যাতে সসম্মানে নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারেন সেজন্য প্রত্যেককে উপযুক্ত খিলাত দেন। তাঁরাও মুক্তিদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য সম্মিলিতভাবে প্রায় দেড় কোটি টাকা নজরানা সংগ্রহ করে তাঁর কাছে পাঠান। সুজাউদ্দীন সেই অর্থ নিজে না রেখে দিল্লীতে পাঠালে বাদশাহ খুসী হয়ে তাঁকে মুতামান-উল-মুলক সুজাদ্দৌলা আসাদ জং উপাধি প্রদান করেন। পরে ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁকে বিহারের সুবাদারীও দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করলেও মুর্শিদ কুলি খাঁ ওই নগরীর নির্মাণকার্য্য শেষ করে যেতে পারেন নি। সে কাজ হাতে নিয়ে সুজাউদ্দীন নিজের জন্য একটি জমকাল প্রাসাদ ও বিভিন্ন সরকারী দফতরের জন্য অনেকগুলি ইমারৎ নির্মাণ করেন। সেগুলির মধ্যে দেওয়ানখানা, খিলাৎখানা, ফরমান বাড়ী, খালসা কাছারি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাষণ্ড নাজির আহমেদ গঙ্গার পশ্চিম তীরে যে মসজিদটির নির্মাণ সুরু করেছিল সুজাউদ্দীন সেটি শেষ করে বাগিচা, জলাশয়, পুষ্পোদ্যান প্রভৃতিতে সুসমার্মাণ্ডত করে তোলেন। দাহাপাড়া গ্রামের এই ফারাবাগ বা আনন্দ উদ্যানের মত সুরম্য মসজিদ বাংলায় নেই।

কর্মজীবনের সুরুতে সুজাউদ্দীন বেশ দক্ষতা দেখালেও শেষের দিকে অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হয়ে ওঠেন। নারীর প্রতি তাঁর বরাবর একটু বেশী রকমের আসক্তি ছিল। প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়ে তা আরও বৃদ্ধি পায়। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্য দেওয়ান হাজি আহমেদ নিত্য নূতন নারী সংগ্রহ করে আনতেন। তিনিও অধিকাংশ সময় হারেমে কাটিয়ে রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিলেন হাজি আহমেদ, রায়-ই-রায়ান আলমচাঁদ ও জগৎশেঠের উপর। হাজি আহমেদের কনিষ্ঠাগ্রজ আলীবর্দী খাঁকে পাটনার, নিজের কনিষ্ঠ পুত্র তকি খাঁকে উড়িষ্যার এবং জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খাঁকে ঢাকার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজ খাঁকে নিজের কাছে রেখেছিলেন।

ঢাকার নায়েব-নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খাঁ কাব্য রচনা ও চিত্রাঙ্কনে সময় কাটাতেন, শাসনকার্য্য চালাতেন তাঁর পেশকার মীর হবীব। সেই সময়ে ত্রিপুরাধীশের এক উচ্ছৃঙ্খল ভ্রাতুষ্পুত্র ঢাকায় এসে দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলীর কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করায় মীর হবীব তাঁর অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী নিয়ে ওই রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা প্রতাপ মানিক্য এরূপ অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত না থাকায় আক্রমণকারীরা অতি সহজে তাঁর রাজধানী চণ্ডীগড় অধিকার করে। তিনি পার্বত্য অঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। আগা সাদিক নামক এক সহকর্মীকে ত্রিপুরার ফৌজদার নিযুক্ত করে মীর হবীব ঢাকায় ফিরে এলে নবাব সুজাউদ্দীন ত্রিপুরার নাম বদলে রৌশনাবাদ রাখেন এবং মীর হবীবের জন্য দিল্লী থেকে বাহাদুর উপাধি আনিয়ে দেন।

১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে তকি খাঁর মৃত্যু হওয়ায় সুজাউদ্দীন দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খাঁকে উড়িষ্যায় বদলি করে জ্যেষ্ঠ পুত্র সরফরাজকে ঢাকার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করে পাঠান। কিন্তু তাঁর মুর্শিদাবাদের উপর বিশেষ আকর্ষণ থাকায় অধিকাংশ সময় সেখানে অবস্থান করে নিজের দেওয়ান গালিব আলী ও শৈশবের গৃহশিক্ষক যশোবন্ত রাওয়ের মারফৎ ঢাকায় শাসনকার্য্য চালাতে থাকেন। কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁর ভগ্নি নাফিসা বেগম নিজ পুত্র মোরাদ আলির সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রী— সরফরাজের কন্যার বিবাহ দিয়ে ঢাকায় পাঠিয়ে দিলে গালিব আলী পদচ্যুত হন। তাই দেখে যশোবন্ত রাও মানে মানে সরে পড়েন। কিন্তু মোরাদ আলীর শাসনকার্য্যে বিশেষ আগ্রহ ছিল না, তাঁর হয়ে কাজকর্ম চালাতেন বৈদ্য সন্তান রাজবল্লভ।

এইভাবে আরও পাঁচ বৎসর কেটে গেল। নবাব সুজাউদ্দীন নিয়মিতভাবে দিল্লীতে সওয়া এক কোটি টাকা পেশকাশ পাঠানয় সেখানকার দরবারে তাঁর মর্য্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। এই বিপুল অর্থ পাঠিয়েও তিনি রাজকোষ মণি-মাণিক্যে ভরিয়ে তুলেছিলেন জমিদারদের কাছ থেকে প্রচলিত রাজস্বের উপর নানাবিধ আবওয়াব আদায় করে। তাতে বৎসরে কুড়ি লক্ষ টাকা বাড়তি আয় হোত।

সুজাউদ্দীনের কর্মদক্ষতার ফলে দিল্লীর অনন্ত চক্রান্ত বাংলাকে স্পর্শ করতে পারে নি। কিন্তু ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করলে বাংলাই চক্রান্তের

পীঠভূমিতে পরিণত হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি পুত্র সরফরাজকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন দেওয়ান হাজী আহমেদ ও অন্যান্য অফিসারদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন। সরফরাজের জামাতা ও নিত্য সহচর ইউসুফ আলির লেখা থেকে দেখা যায় যে তিনি সেই অনুজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেও এক বৎসর পরে দেখা গেল যে হাজী আহমেদকে সুজাউদ্দীন যেরূপ বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেছিলেন তিনি তা নন।

1 Ghulam Husain Tabatabai *Siyar-ul mutakharin*, *Raymond's tr*, *p*, 325
2 Salimullah *Tarikh*-i-*Bangla*, *Gladwin's tr.*
3 Hunter W. W, *History of Orissa, ed. N. K, Sahu p. 173*
4 Yusuf Ali *Ahawal-i-Mahobat-Jang, Sarkar's tr. p. 33*
5 Holwell J. Z. *Interesting Historical Events, p. 75-77*

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

আলীবর্দী খাঁ

বেইমানের জাল

হাজী আহমেদ ও তাঁর ভ্রাতা মীর্জা মহম্মদ ছিলেন ঔরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র আজম শাহর এক তুর্কো-আরব জাতীয় প্রাসাদ-ভৃত্য শাহ কুলি খাঁর পুত্র। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে যে যুদ্ধ সুরু হয় তাতে আজম শাহ নিহত হওয়ায় উভয় ভ্রাতা পিতার সঙ্গে কটকে পালিয়ে এসে উড়িষ্যার তদানীন্তন নায়েব-নাজিম সুজাউদ্দীনের কাছে আশ্রয় নেন। নারীর প্রতি আশ্রয়দাতার অতিরিক্ত আসক্তি দেখে তাঁরা নূতন নূতন নারী সরবরাহ করে তাঁর মনোরঞ্জন করেন। কথিত আছে, নিজেদের বেগমদেরও তাঁরা মাঝে মাঝে সুজাউদ্দীনের হারেমে পাঠিয়ে দিতেন। তাদের এই প্রভুভক্তিতে খুসী হয়ে সেই নায়েব-নাজিম তাঁর শ্বশুর মুর্শিদ কুলী খাঁকে ধরে মীর্জা মহম্মদকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করেন এবং দিল্লী থেকে আলীবর্দী খাঁ উপাধি আনিয়ে দেন। মুর্শিদ কুলীর মৃত্যুর পর বাংলার মসনদ যখন সুজাউদ্দীনের হস্তগত হয় তখন আলীবর্দী খাঁ তাঁর দক্ষিণ হস্ত হয়ে বসেন। হাজী আহমেদ নিযুক্ত হন খাস দেওয়ান। ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে বিহারের সুবাদারী লাভ করে তিনি আলীবর্দীকে সেখানকার নায়েব-নাজিম করে পাঠান। তার ছয় বৎসর পরে ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ যখন মসনদে আরোহণ করেন আলীবর্দী তখনও বিহারের নায়েব-নাজিম এবং তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজ হাজী আহমেদ পূর্বের মত মুর্শিদাবাদে নবাবের উজীর। হাজী আহমেদের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ রাজা (নামান্তর নওয়াজিস মহম্মদ) ছিলেন মুর্শিদাবাদে ফৌজী দফতরের বক্সী,

দ্বিতীয় পুত্র আগা মহম্মদ সৈয়দ (নামান্তর সৈয়দ আহমেদ খাঁ) রংপুরের ফৌজদার এবং কনিষ্ঠ পুত্র মীর্জা মহম্মদ হাসিম (নামান্তর জৈনুদ্দীন আহমেদ) ফৌজী দফতরের উচ্চ অফিসার। এদের সবাইকে নিয়ে হাজী আহমেদ তরুণ নবাবের বিরুদ্ধে যে চক্রান্তজাল তৈরী করেছিলেন তা থেকে বেরিয়ে আসবার সাধ্য তাঁর ছিল না।

সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর এক বৎসর পরে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এক দিন প্রত্যুষে পাটনায় আলীবর্দী খাঁ জ্যেষ্ঠাগ্রজের কাছ থেকে এই মর্মে একখানি গোপন পত্র পেলেন যে সকল আয়োজন প্রস্তুত তিনি যেন সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে চলে আসেন। আলীবর্দীও প্রস্তুত! এর জন্য তিনি জামাতা আতাউল্লা খাঁকে রাজমহলের ফৌজদার নিযুক্ত করেছিলেন। আলীবর্দীর অভিযাত্রী বাহিনী সেখানে এসে পৌঁছালে আতাউল্লা শ্বশুরকে সাদর সম্ভাষণ জানান। উভয়ের সম্মিলিত বাহিনী যখন আরও অগ্রসর হবার জন্য যাত্রা করেছে সেই সময়ে সামগ্রীক পরিকল্পনার রচয়িতা উজীর হাজী আহমেদ মুর্শিদাবাদ থেকে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। রাজধানী থেকে রওনা হবার পূর্বে তিনি নবাব দরবারে খবরদারি করবার জন্য পুত্র নওয়াজিস মহম্মদকে রেখে এসেছিলেন। এইভাবে অন্দরে কন্দরে নিজের লোক বসিয়ে আলীবর্দী খাঁ যখন মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে আসছেন তখন তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা যে বৃথা সেকথা বুঝেও সরফরাজ খাঁ নিজ সৈন্যবাহিনীসহ এগিয়ে চললেন, কিন্তু গিরিয়ার প্রান্তরে তিনি পরাজিত হওয়ায় ১৭৪০ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদ আলীবর্দী খাঁর অধিকারে চলে গেল।

যে ব্যক্তি তাঁকে ও তাঁর ভ্রাতাকে গৃহভৃত্যের স্তর থেকে এতটা উপরে তুলেছিলেন তাঁর পুত্রকে এভাবে হত্যা করা যে উচিত হয় নি একথা বোঝবার মত বিবেকবুদ্ধি হয় তো আলীবর্দীর ছিল। হয় তো বা সুজাউদ্দীনের জনপ্রিয়তা তাঁকে শঙ্কাকুল করে তুলেছিল। কারণ যাই হোক, মুর্শিদাবাদে প্রবেশের পর আলীবর্দী খাঁ মৃত নবাবের আত্মীয় স্বজনকে অনেক সান্ত্বনার কথা শোনালেন। তাঁর ভগ্নি নাফিসা বেগমকে নিজস্ব জমিদারীর উপর মুর্শিদ কুলী খাঁর জমিদারীও দিলেন। ওই জমিদারীর বার্ষিক আয় এক লক্ষ টাকা। সুজাউদ্দীন পরিবারের আরও অনেকের জন্য নিয়মিত বৃত্তির ব্যবস্থাও করলেন আলীবর্দী খাঁ। রাজ-

কোষে যে নগদ পাঁচ কোটী টাকা ও চল্লিশ লক্ষ টাকা মূল্যের মণিমুক্তা জমা ছিল তার একটা অংশ সম্ভ্রান্ত লোকদের মধ্যে বিতরণ করলেন। এ সব বদান্যতায় মুগ্ধ হয়ে লোকে তাঁর জঘন্য কাজের কথা ভুলে গিয়ে জয়জয়কার করতে লাগল।

দিল্লীতে তখনও একজন মোগল বাদশাহ ছিলেন—মহম্মদ শাহ। কিন্তু তিনি নামেই বাদশাহ। এক দিকে মারাঠারা এসে তাঁকে নিজ প্রাসাদে প্রায় অবরুদ্ধ করে রেখেছে, অন্য দিকে তাঁর বিরুদ্ধে অন্তহীন প্রাসাদ চক্রান্ত চলছে। তিনি কোন দিক সামলাবেন? সেই কারণে তাঁর জ্ঞাতসারে তিনটি সুবায় এই যে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেল তাতে তিনি থাকলেন নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে—কোন কিছু করতে পারলেন না। কিন্তু ঐতিহ্যের মূল্য এমনি যে বাদশাহর স্বীকৃতি না পেলে লোকে আলীবর্দীকে নবাব বলে মানতে চায় না। তিনি নিজেও স্বস্তি বোধ করেন না। সেজন্য সরকারী ধনভাণ্ডার থেকে বাদশাহর কাছে এক কোটী চল্লিশ লক্ষ টাকা পেশকাশ ও তাঁর উজীর কামরুদ্দীন খাঁকে মর্য্যাদানুযায়ী উপঢৌকন পাঠিয়ে দিলে কয়েক দিনের মধ্যে স্বীকৃতি এসে গেল! সবাই আলীবর্দী খাঁকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলে মেনে নিল।

বঙ্গে বর্গী

দিল্লীর বাদশাহ আলীবর্দীকে স্বীকৃতি দিলেও নিহত সরফরাজের ভগ্নিপতি উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলী খাঁ ও তার দেওয়ান মীর হবীব তাঁর শাস্তি বিধানের জন্য ময়ূরভঞ্জরাজ রঘুনাথ ভঞ্জকে দলে টেনে নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেন। সেই সম্মিলিত ফৌজ পরাজিত হোলে আলীবর্দী এক ভ্রাতুষ্পুত্র-জামাতাকে উড়িষ্যার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করে মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হন। কিন্তু শাস্তি তাঁর অদৃষ্টে ছিল না, পথে খবর এল যে নাগপুরের মারাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলের সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত বিরাট এক সৈন্যবাহিনী নিয়ে বাংলার দিকে এগিয়ে আসছেন। তাদের সম্মুখীন হবার জন্য তিনি ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল বর্দ্ধমানে চলে গেলে ভাস্কর পণ্ডিত তাঁর ফৌজকে ঘিরে ফেলে রসদ সংগ্রহের সকল পথ বন্ধ করে দেন। তাঁর ফলে কয়েক দিনের মধ্যে শিবিরে নিদারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেওয়ায় আলীবর্দী মারাঠাদের হাতে বহু সৈন্যের জীবন

বলি দিয়ে কাটোয়ায় পালিয়ে আসেন। ভাস্কর পণ্ডিত সেখানেও এসে তাঁর অবস্থা শোচনীয় করে তোলেন।

উড়িষ্যায় মীর হবিব পরাজিত হোলেও প্রতিনিবৃত্ত হন নি। ভাস্কর পণ্ডিতের অভিযান যে সম্ভাবনাপূর্ণ সে কথা বুঝে নিয়ে তিনি মারাঠাপক্ষে যোগ দেন—আলীবর্দীর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে ওঠে। তাঁর নির্দেশে সাত শত অশ্বারোহীর এক মারাঠা ব্যাটেলিয়ান ১৭৪২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে আলীবর্দীকে পাশ কাটিয়ে মুর্শিদাবাদে পৌঁছে জগৎশেঠের ধনাগারসহ সমস্ত নগরী লুণ্ঠন করে। পরের দিন আলীবর্দী সেখানে এসে পৌঁছালে তারা কাটোয়ায় ফিরে যায়।

এই প্রাথমিক সাফল্য সত্বেও যে ভাস্কর পণ্ডিত আর অগ্রসর হোতে পারছিলেন না তার কারণ মারাঠাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব। তাঁর প্রভু রঘুজী ভোঁসলের সঙ্গে নূতন পেশোয়া বালাজী বাজী রাওয়ের তখন চরম মতান্তর চলছিল। উভয়ে উভয়কে ধ্বংস করবার সুযোগ খুঁজছিলেন, আবার উভয়েই মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক সম্রাট শাহুকে পাশ কাটিয়ে চলছিলেন। বিরাট শক্তি—অথচ সংহতির অভাবে নিজেই নিজেকে ক্ষয় করছিল। এই কারণে ভাস্কর পণ্ডিত গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ সমস্ত ভূভাগ অধিকার করে আর অগ্রসর হবার সাহস পাচ্ছিলেন না। বাংলার রাজধানী তাঁর আয়ত্বের মধ্যে এলেও তিনি তা অধিকারের চেষ্টা না করে কাটোয়ায় বসে দিন গণতে লাগলেন। তাঁর অশ্বারোহীদের সুপ্ত উদ্দীপনা বহিঃপ্রকাশের পথ না পেয়ে লুণ্ঠনে ব্যয়িত হোতে লাগল।

গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে গিয়ে এই বর্গিরা গৃহস্থের বাড়ী ঘর লুঠ করে, মাটির তলায় পোতা গুপ্তধন ওঠায়, স্ত্রীলোকদের দেহ থেকে অলঙ্কার কেড়ে নেয়, গৃহে অগ্নি সংযোগ করে, আর বলে—টাকা দাও, টাকা দাও, টাকা দাও। যারা দিয়েছে তাদের যথাসর্বস্ব হাতিয়ে নিয়ে যা নেই তার জন্য প্রহার করেছে, যারা না দিয়েছে তাদের উপর অকথ্য উৎপীড়ন চালিয়েছে। শিশু ও বৃদ্ধরা পর্য্যন্ত তাদের হাত থেকে রেহাই পায় নি, যুবতী নারীদের ধর্ষণ করতে তারা দ্বিধা করে নি। এই বর্গিদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ঘরবাড়ী ছেড়ে সপরিবারে ভাগীরথীর পূর্ব পারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, পশ্চিম তীরস্থ সকল অঞ্চলে

বাজার হাট বন্ধ হয়ে যায়, কৃষকরা হলকর্ষণে বিরত থাকে, জননী শিশু পুত্রকে ঘুম পাড়াবার সময়ে গান ধরে—

ছেলে ঘুমোল পাড়া জুড়োল বর্গি এল দেশে
চটাপাখীতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে ?
চটা রে ভাই চটি রে এবার বড় বান
উঁচু করে বাঁধ রে টিবি খুঁটে খাবি ধান।

পর্তুগীজ প্রতিভা যেমন বহিঃপ্রকাশের সুযোগ না পেয়ে বোম্বেটেগিরিতে নিঃশেষ হয়েছিল মারাঠা অশ্বারোহীদের উদ্দীপনাও তেমনি শাসকদের গৃহবিবাদের ফলে ব্যাহত হয়ে বাংলায় বর্গির হাঙ্গামা হয়ে দেখা দেয়।

ভাস্কর পণ্ডিতের দুর্গা পূজা

অথচ এই বর্গিদের নায়ক ভাস্কর পন্থ ছিলেন ছত্রপতি শিবাজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ। আলীবর্দীকে খতম করবার জন্য যে আরও কয়েক ডিভিসন সৈন্যের প্রয়োজন তা জানিয়ে তিনি নাগপুরে বারবার আবেদন পাঠিয়েও যখন কোন সাড়া পেলেন না তখন অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে --তারা চারিদিকে লুটপাট করে বেড়ায়। এই ভাবে কয়েক মাস সময় কেটে গেল, বর্ষা উত্তীর্ণ হয়ে শরৎ এল। মা জগজ্জননী আসছেন—তাঁকে আরাধনা করবার জন্য ভাস্কর পণ্ডিত ও অন্যান্য মারাঠা অফিসারদের মন চঞ্চল হয়ে উঠল। সেজন্য তাঁরা কাটোয়া শিবিরে মহা আড়ম্বরে দেবীপূজার আয়োজন করেন। ভাস্কর পণ্ডিতের আহ্বানে বাংলার যেখানে যত মারাঠা সৈন্য ছিল সবাই সেই মহাপূজায় যোগ দেবার জন্য কাটোয়ায় এসে সমবেত হোল। তাদের রণদামামার আওয়াজে কাটোয়ার মাঠঘাট মুখরিত হয়ে উঠল। নগ্নপদ সেনাপতিকে সম্মুখে রেখে হাজার হাজার সৈনিক সকাল সন্ধ্যায় কৃতাঞ্জলি পুটে দেবীর সম্মুখে অঞ্জলি প্রদান করে আর বলে—দুর্গা মাইকী জয় !

হিন্দুর এই মহাপবিত্র মাতৃপূজা ম্লেচ্ছ আলীবর্দীর বোধগম্য ছিল না; তাই আস্থাও ছিল না। এই সুযোগে শত্রুকে আঘাত হানবার জন্য তিনি কাটোয়ার পাঁচ মাইল উত্তরে উদ্ধারণপুর গ্রামে অতি ক্ষিপ্রগতিতে নিজের সমস্ত ফৌজকে গঙ্গা পার করলেন (১৭৪২, সেপ্টেম্বর ২৭)। সেখান থেকে

দ্রুত মার্চ করতে করতে পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত সেই সৈন্যগণ যখন পূজামণ্ডপে এসে উপনীত হোল তখন সকল মারাঠা সৈন্য দেবীর সম্মুখে নতজানু হয়ে অর্ঘ্য দিচ্ছিল। ধূপের ধোঁয়ায় ও পুষ্পচন্দনের গন্ধে পূজামণ্ডপে স্বর্গের সুষমা বিরাজ করছিল। তাদের বাদ্যযন্ত্র ও কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজে আলীবর্দীর অশ্বারোহীদের পদধ্বনি কারও কানে প্রবেশ করল না—কেউ জানতে পারল না যে হাজার হাজার শত্রুসৈন্য পূজামণ্ডপ ঘেরাও করেছে। তারা সবাই যেক্ষেত্রে আপাদমস্তক অস্ত্রসজ্জিত সেক্ষেত্রে মারাঠা সৈনিকরা সকল অস্ত্রশস্ত্র তাঁবুতে রেখে পূজামণ্ডপে এসে সমবেত হয়েছিল। আলীবর্দীর অতর্কিত আক্রমণে হাজার হাজার মারাঠা সৈন্য সেখানে নিহত হোল, হাজার হাজার সৈন্য প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল। পূজামণ্ডপের পবিত্রতা বিধর্মীর পৈশাচিক তাণ্ডবে কলুষিত হোল!

যে সব সৈনিক প্রাণে বেঁচেছিল তাদের নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত চলে গেলেন উড়িষ্যায়। কিন্তু মরা হাতীর দামও লাখ টাকা! কাটোয়ায় মারাঠারা পরাজিত হয়েছে জেনেও উড়িষ্যার নূতন নায়েব-নাজিম এমনই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে ভালভাবে সৈন্য সন্নিবেশ পর্য্যন্ত করতে পারলেন না। তাঁকে সহজে পরাজিত করে ভাস্কর পণ্ডিত উড়িষ্যা অধিকার করে নিলেন।

মারাঠায় মারাঠায় যুদ্ধ

ভাস্কর পন্থের ন্যায় সুপণ্ডিত যে এই বর্গিদের নেতৃত্ব করেছিলেন তার মূলে ছিল বাদশাহ মহম্মদ শাহরদু মুখো নীতি। নিজের অসহায়তার কথা বিবেচনা করে তিনি এক দিকে আলীবর্দী খাঁকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলে স্বীকৃতি দেন ও অন্য দিকে মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বাধিনায়ক শাহুকে তিনটি সুবার চৌথ গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন। সম্রাট শাহু সেই অধিকার নিজে না রেখে রঘুজী ভোঁসলের হাতে অর্পণ করায় ভাস্কর পণ্ডিত সসৈন্যে বাংলায় আসেন। আলীবর্দী যদি নিজ বাদশাহর চুক্তিনামার সম্মান দিতেন তাহোলে বর্গির হাঙ্গামা থেকে বাংলা রেহাই পেত। কিন্তু তিনি তা করেন নি, বরং মহানবমীর দিন দেবী মূর্তি কলুষিত ও হাজার হাজার নিরস্ত্র সৈনিককে পূজামণ্ডপে হত্যা করেন। এই সংবাদ নাগপুরে পৌছালে রঘুজী ভোঁসলে সেই পাপিষ্ঠের শাস্তি বিধানের জন্য ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে নিজে বাংলায় চলে আসেন।

চতুর আলীবর্দী দেখলেন যে পেশোয়ার ফৌজ এসে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হোলে বাংলা-বিহার তাঁর থাকবে না, আবার রঘুজী ভেঁাসলে বা বাদশাহ মহম্মদ শাহ এখানে দাঁত ফোটাতে পারবেন না। তাই তিনি বালাজি রাওয়ের সঙ্গে দেখা করে শপথ করলেন যে বাদশাহর প্রতিশ্রুত চৌথ পুরাপুরি দেবেন তবে রঘুজী ভোঁসলেকে নয়, সম্রাট শাহুকে। পেশোয়া যে সৈন্যবাহিনী নিয়ে এসেছিলেন তার ব্যয় বাবদ বাইশ লক্ষ টাকা দিতেও স্বীকৃত হোলেন।

পেশোয়া ও আলীবর্দীর মধ্যে এই মর্মে চুক্তিনামা সম্পন্ন হয়েছে শুনে রঘুজী ভেঁাসলে বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তার পর যখন তিনি শুনলেন যে উভয়ের যুক্ত বাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে তখন কাটোয়া ত্যাগ করে উত্তর দিকে চলে যান। কিন্তু পেশোয়ার ছিল তাঁর উপর জাতক্রোধ, মুখ্যতঃ তাঁকে পঙ্গু করবার জন্য তিনি এত দূর এসেছিলেন। তাই তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করতে করতে তিনি বীরভূম পর্য্যন্ত এগিয়ে গেলে বাংলার মাটিতে দুই মারাঠা শক্তির মধ্যে প্রচণ্ড সংগ্রাম সুরু হয়। তাতে রঘুজী পরাজিত হয়ে নিজ রাজধানী নাগপুরে চলে যান। বাংলা আপাততঃ মারাঠা আতঙ্ক থেকে মুক্ত হয়।

মারাঠা স্রোত যে এভাবে নিজেই নিজেকে নিঃশেষ করবে একথা কেউ বুঝতে পারে নি। ভাস্কর পণ্ডিতের প্রস্থানের পরই রঘুজী ভোঁসলে নিজে বাংলায় আসছেন শুনে কলকাতার ইংরাজরা ধরে নিয়েছিল যে আসন্ন মহাসমরে বাংলা তোলপাড় হয়ে যাবে। তাই তারা আত্মরক্ষার জন্য নিজেদের কুঠীর তিন দিক ঘিরে মারাঠা খাল খনন করে। কিন্তু এক মারাঠা শক্তি এসে অপর এক মারাঠা শক্তিকে দূরীভূত করায় অন্য সবার মত তারাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

শাহুর বণ্টননামা

বাদশাহ মহম্মদ শাহ নিজের প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের উপর যেরূপ আধিপত্য হারিয়েছিলেন মারাঠা শক্তির মধ্যমণি সম্রাট শাহুর ততটা হয় নি। বালাজী ও রঘুজীর মধ্যে যুদ্ধের সংবাদে ব্যথিত হয়ে তিনি উভয়কে নিজ দরবারে আমন্ত্রণ করে ভৎ'সনা করেন। করছো কি? ছত্রপতি শিবাজীর মহান আদর্শের কথা বিস্মৃত হয়ে তোমরা নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে মোগলের সুবিধা করে দিচ্ছ? আলীবর্দী খাঁ তোমাদের কে? তাব জন্য এই আত্মদ্বন্দ্ব কেন?

যে ব্যক্তি বেইমানী করে নিজ প্রভুর রাজ্য আত্মসাৎ করেছে তাকে বিন্দুমাত্রও কোমলতা দেখিও না। সে কথা স্বীকার করে উভয় মারাঠা নায়ক নূতন করে সম্রাট শাহুর প্রাধান্য মেনে নেওয়ায় তিনি ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে আগষ্ট আলীবর্দীর রাজ্য তাঁদের মধ্যে বণ্টন করে বালাজীকে দিলেন পাটনার পশ্চিম দিকস্থ সমস্ত ভূভাগ—রঘুজীকে দিলেন বাকি বিহার এবং বাংলা ও উড়িষ্যা। বালাজীর অংশে খুব কম পড়লেও তিনি এই বণ্টননামা মেনে নিলেন। ঠিক হোল যে উভয়েই নিজ নিজ অংশ থেকে চৌথ আদায় করবেন, কিন্তু কোন সুবার শাসনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করবেন না। তবে আলীবর্দী যদি এই ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা মানতে ইতস্ততঃ করেন তবে সম্রাট শাহুর অনুমোদন সাপক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করবার অধিকার তাঁদের থাকবে।

শ্মশানযাত্রী বাঙালীর উপর রাজদণ্ড পরিচালিত করছিলেন এক আরব ভাগ্যান্বেষী—এখন তাদের ধনসম্পদ বণ্টিত হোল দুই মারাঠা শক্তির মধ্যে!

সন্ধি বৈঠকে জহ্লাদ

আলীবর্দী দেখলেন যে গত বৎসর রাজকোষ শূন্য করে যে বিপুল অর্থ পেশোয়াকে দিয়েছিলেন তার প্রতিদানে কিছুই পেলেন না, বরং দুদিক থেকে দুই মহাজন এসে তাঁর দুই দরজায় করাঘাত করছে। বাদশাহ মহম্মদ শাহর কথা তাঁর মনে উঠল; কিন্তু তিনি করবেন কি? তাঁর সকল কূটনীতি ব্যর্থ করে মারাঠা শক্তি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। তাঁর সাধ্য নেই যে তাদের প্রতিনিবৃত্ত করেন। অসহায় আলীবর্দীর আহারনিদ্রা বন্ধ হয়ে গেল। ভাস্কর পণ্ডিতকে বাধা দেবার মত শক্তি তাঁর নেই, আবার চৌথ প্রদানের মত সঙ্গতিও নেই। বহু চিন্তা করে তিনি যেভাবে মসনদ অধিকার করেছিলেন সেইভাবে তার রক্ষার জন্য তৈরী হোতে লাগলেন।

সম্রাট শাহুর বণ্টননামা হাতে নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত পুনরায় বাংলায় এলে আলীবর্দী তাঁর শিবিরে দূত পাঠিয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি নিয়মিতভাবে চৌথ দেবেন, তবে সঠিক অর্থের পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য উভয়ের এক বৈঠকে মিলিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। একথার যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে মারাঠা সেনাপতি তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করায় তিনি বর্দ্ধমানের অদূরে মানকর গ্রামে

এক বিরাট তাঁবু খাটিয়ে মহান অতিথির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। বাংলার নবাবের তাঁবু—তাই তাতে আড়ম্বরের সীমা নেই। চিনাংশুক ও কিংখাপে ঢাকা তার চোখ ঝলসানো জৌলুসের মধ্যে কেউ বুঝতে পারল না যে একটি তাঁবুর তলায় আর একখানি তাঁবু খাটান রয়েছে—মাঝখানের ফাঁকা জায়গায় অপেক্ষা করছে আলীবর্দীর আফগান সৈন্যাধ্যক্ষ মুস্তাফা খাঁর ঘাতকগণ। রাতের অন্ধকারের মধ্যে এত সঙ্গোপনে তাদের সেখানে আনা হয়েছিল যে কেউ সে কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারে নি।

পর দিন প্রভাতে নিরস্ত্র ভাস্কর পণ্ডিত যখন তাঁর মুখ্য সহকারীদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে আলীবর্দীর সঙ্গে সম্ভাষণ বিনিময় করছিলেন ঘাতকগণ তখন তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তরবারির আঘাতে সকলের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণহীন দেহ লুটিয়ে পড়ে আলীবর্দী খাঁর কয়েক হাত দূরে (১৭৪৪, মার্চ ৩১)।

তারপর যা ঘটবার তাই ঘটল। নায়কহীন মারাঠা সৈন্যরা নামমাত্র যুদ্ধের পর বাংলা ছেড়ে চলে গেল। উড়িষ্যাও তাদের হস্তচ্যুত হোল।

দ্বিতীয় মারাঠা আক্রমণ

এই গুপ্তহত্যার জন্য আলীবর্দী আফগান নায়ক মুস্তাফা খাঁকে বিহারের নায়েব-নাজিম পদ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু কার্য্যোদ্ধারের পর দেখা গেল যে সেই প্রতিশ্রুতি পালনের ইচ্ছা তাঁর নেই। বারবার তাগাদা দিয়েও যখন কোন কাজ হোল না তখন মুস্তাফা খাঁ স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে মারাঠাদের কাছে আহ্বান পাঠালেন আলীবর্দীকে আক্রমণ করবার জন্য। আহ্বান না পেলেও রঘুজী নিশ্চেষ্ট থাকতেন না—প্রিয় সেনাপতির হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য তি ন তৈরী হচ্ছিলেন। তাঁর আক্রমণে কটকের পতন হোল এবং আলীবর্দী নিযুক্ত উড়িষ্যার নূতন নায়েব-নাজিম বন্দী হোলেন। তারপর সমগ্র উড়িষ্যা অধিকার করে রঘুজী বর্দ্ধমানে চলে এলে আলীবর্দীর ফৌজদার নামমাত্র প্রতিরোধের পর সেখান থেকে পালিয়ে গেলেন। আরও অগ্রসর হয়ে বীরভূম অধিকারের পর তিনি বিহারে চলে গেলে মুস্তাফা খাঁ সসৈন্যে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন।

আলীবর্দী নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। মারাঠারা ভোজপুর লুণ্ঠন করে পাটনার

দিকে এগিয়ে আসছে শুনে তিনি মুমিহ্-আলিপুর নামক স্থানে তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ান। এখানে চলে উভয় পক্ষের লুকোচুরি খেলা। আলীবর্দীর অগ্র-বাহিনীর সেনাপতি মীরজাফর মারাঠাদের আক্রমণ করলে তারা তাঁকে প্রতিহত করে রাজধানী মুর্শিদাবাদের দিকে চলে আসে। আলীবর্দীও তাদের পিছনে ধাওয়া করেন, কিন্তু মারাঠা ফৌজ এতই দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছিল যে তাদের অগ্রবাহিনী ওই নগরীর উপকণ্ঠে এসে উপনীত হোলেও মূল বাহিনী বহু পিছনে পড়ে থাকে। তাতে সুবিধা হয় আলীবর্দীর। তিনি সসৈন্যে সেখানে এসে পৌছালে মূল বাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন রঘুজী পিছু হটে কাটোয়ায় ফিরে যেতে বাধ্য হন। আর একবার মারাঠা শক্তি অতি অল্পের জন্য বাংলার রাজধানী অধিকার করতে অসমর্থ হয়!

রঘুজীকে সৈন্য সন্নিবেশের সুযোগ না দিয়ে আলীবর্দী খাঁ সঙ্গে সঙ্গে কাটোয়ায় চলে আসেন। উভয় পক্ষে মহাযুদ্ধের আয়োজন চলতে থাকে। কিন্তু সেই সময়ে নাগপুর থেকে অস্বস্তিকর সংবাদ আসায় মীর হবিবের উপর কাটোয়ার দায়িত্ব অর্পণ করে রঘুজীকে সেখানে ফিরে যেতে হয়। কাটোয়াকে কেন্দ্র করে চার মাস ধরে উভয়পক্ষে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চলবার পর আলীবর্দী মীর হবিবকে উড়িষ্যার দিকে তাড়িয়ে দিলেও সেই সময়ে তাঁর কাছে খবর আসে যে তাঁর দুজন সৈন্যাধ্যক্ষ রঘুজী ভোঁসলের সঙ্গে এই মর্মে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন যে মারাঠা সৈন্যদের সাহায্যে তাঁরা প্রভুকে বিতাড়িত করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবেন।

মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা

দিল্লীর বাদশাহর তখন ত্রিশঙ্কুর দশা। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধীশ্বর তিনি, অথচ আলীবর্দী খাঁ তাঁকে আমল দেন না। নিজ শক্তিতে তাঁকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব নয় বুঝে তিনি সম্রাট শাহুর সঙ্গে এই মর্মে নূতন করে এক চুক্তিনামা সম্পাদন করেন যে তাঁকে বাংলার জন্য বৎসরে পঁচিশ লক্ষ ও বিহারের জন্য দশ লক্ষ টাকা চৌথ দেবেন; প্রতিদানে তাঁকে তিন সুবার সার্বভৌম অধীশ্বর বলে স্বীকার করতে হবে। তিনি

চৌথ দিতে সম্মত হোলেও আলীবর্দী খাঁ তা মানবেন কেন? বাদশাহর চুক্তির উপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে তিনি উড়িষ্যা পুনরধিকারের জন্য সেনাপতি মীরজাফরকে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মেদিনীপুরের কোন স্থানে রঘুজীর পুত্র জানোজী ও মীর হবিব তাঁর গতিরোধ করে দাঁড়ালে তিনি ভীতসন্ত্রস্ত মনে বর্দ্ধমানে পালিয়ে আসেন। মারাঠারাও তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে সেখানে চলে আসে।

মীরজাফর যুদ্ধে যত পারদর্শী ছিলেন চক্রান্তে ছিলেন তার চেয়ে বেশী। আলীবর্দী বর্দ্ধমানে এসে মারাঠাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজ রাজধানীতে ফিরে এলে তিনি রাজমহলের নূতন ফৌজদার আতাউল্লার সঙ্গে এই মর্মে এক গোপন চুক্তি সম্পন্ন করেন যে উভয়ের সম্মিলিত উদ্যোগে আলীবর্দীকে হত্যা করা হবে। অথচ আলীবর্দী ছিলেন তাঁর শ্যালক—তাঁকে পথের ধূলা থেকে তুলে এনে নিজের বৈ-পিত্রেয় ভগ্নির সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন!

আফগান অধিকারে বিহার

আলীবর্দী নিজে অবশ্য বিশ্বাসঘাতকতায় কিছু কম ছিলেন না। প্রভু-পুত্র সরফরাজ খাঁকে হত্যা করে তিনি মসনদ অধিকার করেছিলেন, আবার এই সেদিন ভাস্কর পণ্ডিতকে নিজ তাঁবুতে আহ্বান করে ঘাতক দ্বারা হত্যা করান। বিশ্বাসঘাতকতা যার মজ্জার সঙ্গে মিশে রয়েছে তার কথার দাম কানাকড়িও নয়। ভাস্কর পণ্ডিতের হত্যার মূল্য হিসাবে গোলাম মুস্তাফাকে বিহারের নায়েব-নাজিম করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আলীবর্দী, কিন্তু বার বার তাগাদা সত্ত্বেও সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত না হওয়ায় আশাহত গোলাম মুস্তাফা ভাস্কর পণ্ডিতের প্রভু রঘুজী ভোঁসলের সাহায্যে তাঁর শাস্তি বিধানের জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন।

গোলাম মুস্তাফা একা ছিলেন না। তাঁর অধীনে ছিল নয় হাজার আফগান অশ্বারোহী ও প্রায় সমসংখ্যক পদাতিক। তাঁকে উৎসাহ দেবার জন্যই রঘুজী ভোঁসলে সমগ্র উড়িষ্যা এবং বাংলায় গঙ্গার পশ্চিম দিকস্থ সমস্ত ভূভাগ অধিকারের পর মুর্শিদাবাদে না এসে বিহারে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু অন্য

সীমান্তে তাঁর জরুরী কাজ থাকায় মীর হবিবের উপর এই রণাঙ্গনের দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি নাগপুরে ফিরে যান। তাতে আলীবর্দীর বিশেষ সুবিধা হয় নি। তিনি একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন শুনে গোলাম মুস্তাফার নির্দেশে দ্বারভাঙ্গা জেলা থেকে দলে দলে আফগান এসে বিহারের রাজধানী পাটনা আক্রমণ করে ও নামমাত্র যুদ্ধের পর ওই নগরী অধিকার করে নায়েব-নাজিম জৈনুদ্দীন আহমেদ ও তাঁর পিতা—আলীবর্দীর জ্যেষ্ঠাগ্রজ—হাজী আহমেদকে শমন সদনে পাঠিয়ে দেয়। জৈনুদ্দীনের স্ত্রী আমিনা বেগম আফগানদের হাতে বন্দী হন।

এই নিদারুণ সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছালে আলীবর্দী নিশ্চেষ্ট থাকতে পারলেন না। তিনি পাটনার দিকে রওনা হোলে উড়িষ্যার মারাঠারা দেখে যে পাটনার আফগানদের সমূহ বিপদ। তাদের শক্তি যোগাবার জন্য মীর হবিব চলে গেলেন পাটনার দিকে। আলীবর্দীও দেখলেন যে এই মারাঠা ফৌজ পাটনায় এসে পৌঁছালে সম্মিলিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করা সহজ হবে না। তাই তিনি ভাগলপুরের অদূরে মীর হবিবের গতিরোধ করে দাঁড়ালেন। মীর হবিব পরাজিত হওয়ায় তিনি পাটনায় গিয়ে অতি সহজে আফগানদের দূরীভূত করেন। বন্দিনী কন্যা আমিনাকে তাদের কারাগার থেকে মুক্ত করবার পর রাজা জানকীরাম সোমকে বিহারের নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করে তিনি মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন।

মহারাষ্ট্রে দুর্যোগ

বিহারের উপর নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হোলেও উড়িষ্যা মারাঠাদের দখলে থাকায় আলীবর্দীর মনে শান্তি নেই। কয়েক মাস প্রস্তুতির পর তিনি ওই সুবা পুনরুদ্ধারের জন্য অগ্রসর হোলে মীর হবিব মেদিনীপুরে এসে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ান। আলীবর্দী তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে পথের দুপাশে যে সব মারাঠা ছাউনি ছিল সেগুলি অধিকার করতে করতে কটকে গিয়ে উপনীত হন। তাঁকে বাধা দেবার মত কোন বিশিষ্ট মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ সেখানে উপস্থিত না থাকায় তিনি অক্লেশে ওই নগরী অধিকার করে সমগ্র উড়িষ্যার উপর নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু তিনি কটক ত্যাগ করবার কয়েক দিনের

মধ্যে মারাঠারা তাঁর ফৌজকে দূরীভূত করে ওই সুবা পুনরধিকার করে নেয় (১৭৪৯, জুন)।

মহারাষ্ট্রের আকাশে তখন দুর্যোগের কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছিল। যে বাদশাহ মহম্মদ শাহ মারাঠাদের পক্ষপুট আশ্রয় করে সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হোলে তারা রক্ষকের ছদ্মাবরণ ত্যাগ করে পেশোয়ার পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তর ভারত অধিকার করে নেয়। তার ফলে কাবুলের নূতন অধিপতি আহমেদ শাহ্ দুর্রানির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে। তাদের সর্বাধিনায়ক পেশোয়া বালাজী বাজীরাও প্রতিভাবান যোদ্ধা এবং হিন্দুত্বের রক্ষক হোলেও তাঁর উদ্ধত ব্যবহারের জন্য তিনি যেক্ষেত্রে রাজপুত রাজাদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন সেক্ষেত্রে আহমেদ শাহ দুর্রানিকে সাহায্য করেন সকল মুসলমান শাসক ও দলপতি। তাঁর চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবার জন্য পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠাদের যে সম্মিলিত ফ্রন্ট গঠিত হয় তাতে সিন্ধিয়া, হোলকার ও গাই-কোয়াড়ের সঙ্গে রঘুজী ভোঁসলেও যোগ দেন। তার ফলে আলীবর্দীর সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্য মীর হবিবের অধীনে মুষ্টিমেয় সৈন্য রেখে পূর্ব সীমান্ত থেকে সমগ্র মারাঠা ফৌজ সরিয়ে নেওয়া হয়। আলীবর্দী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

সিরাজউদ্দৌলার বিদ্রোহ

এই সময়ে আলীবর্দীর সম্মুখে বাইরের শত্রুর চেয়ে ভয়ের কারণ হয়ে দেখা দেয় ঘরের শত্রু। তিনি যখন মীর হবিবের সঙ্গে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য তৈরী হচ্ছেন সেই সময়ে পাটনার নায়েব-নাজিম জানকীরামের কাছ থেকে খবর আসে যে তাঁর বিংশতিবর্ষীয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা মাতামহের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন। অথচ সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন তাঁর নয়নের মণি! দুই বৎসর পূর্বে আফগানদের হাত থেকে বিহার উদ্ধার করে ওই সুবা তাঁকে না দিয়ে রাজা জানকীরাম সোমকে নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করায় সিরাজ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন— মাতামহর শাস্তি বিধানের জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

সে সুযোগ এখন এসেছে। মারাঠা ফৌজ যেভাবে মাতামহকে কোণঠাসা

করে ফেলেছে তাতে দৌহিত্রের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যে সম্ভব হবে না সে কথা বুঝে নিয়ে সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে নিজস্ব ক্ষুদ্র রেজিমেণ্ট নিয়ে পাটনায় চলে গেলেন। রাজা জানকীরামের কাছে দুর্গ সমর্পণের জন্য আদেশ পাঠালে তিনি জানিয়ে দিলেন যে নবাবের বশম্বদ ভৃত্য হিসাবে তাঁর দৌহিত্রের সম্মুখে দুর্গদ্বার খুলতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত, কিন্তু সেজন্য নবাবের অনুমতিপত্র চাই। কি! অনুমতিপত্র? বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভাবী অধীশ্বরের কাছে অনুমতিপত্র চায় এত বড় দুঃসাহস এই কামবখ্‌তের? সিরাজউদ্দৌলা তাঁর রেজিমেণ্টকে আদেশ দিলেন: যুদ্ধ করে দুর্গে প্রবেশ করো। কিন্তু তা সম্ভব হোল না, জানকীরাম তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে দুর্গ প্রাকারের বাইরে এক প্রাসাদে সিরাজের বসবাসের ব্যবস্থা করলেন।

নায়েব-নাজিমের কাছ থেকে দৌহিত্রের বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে আলীবর্দী তাঁকে এক পত্র পাঠিয়ে মুর্শিদাবাদে ফেরবার জন্য নির্দেশ দিলেন। এ তুমি করছ কি? আমার বয়স হয়েছে, দুদিন পরে আমি চক্ষু বুজলে তুমিই হবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধীশ্বর। কার বিরুদ্ধে তুমি বিদ্রোহ করেছ? পাগলামি ছাড়ো—মুর্শিদাবাদে ফিরে এসো। প্রত্যুত্তরে সিরাজউদ্দৌলা লিখলেন, মাতামহের স্তোকবাক্য তিনি অনেক শুনেছেন—আর নয়। বিহার যে তাঁর পিতার সুবা সেকথা ভুলে গিয়ে যখন অন্যকে সেখানকার তখ্‌তে বসান হয়েছে তখন যুদ্ধ করে তিনি নিজের দাবী আদায় করবেন। সে যুদ্ধের শেষে হয় তাঁর মস্তক মাতামহের পদপ্রান্তে বিরাজ করবে, নতুবা মাতামহের মস্তক তাঁর কোলে শোভা পাবে!

কারও মস্তক কারও শোভা বর্দ্ধন করল না! দৌহিত্রের পত্র পড়ে আলীবর্দী বুঝলেন যে তাকে বিহার না দিয়ে সত্যিই অবিচার করা হয়েছে। এই অন্যায়ের প্রতিকার করা প্রয়োজন। মীর হবিবের সঙ্গে যুদ্ধের দায়িত্ব মীরজাফর ও অন্যান্য অফিসারদের উপর ন্যস্ত করে তিনি পাটনায় চলে গেলেন। কয়েক দিন পরে মুর্শিদাবাদের সবাই দেখল যে নয়নের মণিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নদীপথে পাটনা থেকে রাজধানীতে ফিরে আসছেন।

সন্ধি

কিন্তু বিশ্রাম তাঁর অদৃষ্টে ছিল না। মেদিনীপুর ফ্রন্টের দায়িত্ব মীরজাফর ও রাজা জানকীরামের পুত্র দুর্লভরামের উপর ছেড়ে দিয়ে তিনি পাটনায় গিয়েছিলেন বটে কিন্তু উভয়েই মারাঠাদের ভয়ে এতই ভীত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁদের উপর আর আস্থা রাখা যায় না। তাই ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি মেদিনীপুরে চলে গেলেন।

মারাঠা পক্ষেরও একই দশা। আহমেদ শাহ দুর্রানির আক্রমণ তাদের কাছে রীতিমত বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই কারণে উভয় পক্ষ সন্ধির জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল, মীর হবিবের পাঠান খসড়া চুক্তিনামা নাগপুর দরবার সমর্থন করায় এই মর্মে সন্ধি সম্পাদিত হোল যে—(১) মীর হবিব আলীবর্দী খাঁর অধীনে উড়িষ্যার নায়েব-নাজিমের কাজ করবেন, কিন্তু ওই সুবার রাজস্ব থেকে একটি মারাঠা ফৌজের ব্যয় চালাতে হবে; (২) রঘুজী ভোঁসলে বাংলা থেকে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা চৌথ পাবেন; (৩) তিনি আর বাংলা আক্রমণ করবেন না।

চুক্তিনামায় রঘুজী ভোঁসলে সম্মতি দিলেও তাঁর পুত্র জানোজী খুসী হন নি। পর বৎসর ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তাঁর সৈন্যরা মীর হবিবকে হত্যা করায় উড়িষ্যা স্থায়ীভাবে মারাঠা সাম্রাজ্যের এক অঙ্গরাজ্যে পরিণত হয়।

যবনিকা পতন

আলীবর্দী খাঁ এখন ৭৬ বৎসরের বৃদ্ধ। সন্ধির সর্তানুযায়ী মারাঠারা আর তাঁর রাজ্য আক্রমণে বিরত থাকলেও বৎসরের পর বৎসর যুদ্ধ চালিয়ে তাঁর দেহমন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তার উপর পরিবারের কয়েক ব্যক্তির মৃত্যুতে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন। শেষ পর্য্যন্ত শোথ রোগে আক্রান্ত হয়ে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তিনি পরলোকে গমন করেন।

1 Yusuf Ali *Ahwal-i-Mahabat Jang*, tr. J. N. Sakar, p 26
2 Hill. S. C, *Bengal in 1756-57*, p. 129, 162
3 Holwell H. *Interesting Historical Events*, p. 61, 68-70, 95, 121-25
4 Karam Ali *Muzafar-namah*, tr. J. N. Sarkar, p. 84, 88
5 Salimulla *Tarikh-i-Bangla*, Gladwin's trans, p. 213-15

ষষ্ঠচত্বারিংশ অধ্যায়

সিরাজউদ্দৌল্লা

নররূপী দানব

আলীবর্দী খাঁর কোন পুত্রসন্তান না থাকায় তিন কন্যাকে জেষ্ঠাগ্রজ হাজী আহমেদের তিন পুত্র নওয়াজিস মহম্মদ, সৈয়দ আহমেদ ও জৈনুদ্দীন আহমেদের সঙ্গে হিবাহ দিয়ে ভ্রাতুস্পুত্র-জামাতাদের ঢাকা, পূর্ণিয়া ও পাটনার নায়েব-নাজিম নিযুক্ত করেছিলেন। সব চেয়ে আদরের কন্যা জ্যেষ্ঠা মেহেরউন্নিসা ওরফে ঘেসেটি বেগম স্বামীকে কোণঠাসা করে পর্দার আড়াল থেকে ঢাকার শাসনকার্য্য চালাতেন। এ বিষয়ে দেওয়ান হোসেন কুলী খাঁ ছিলেন তাঁর সহায়—আবার তাঁর বিশেষ আদর আপ্যায়নের পাত্র। হোসেন কুলীর সঙ্গে ঘেসেটির অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার কথা চারিদিকে জানাজানি হয়ে পড়লে তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নি আমিনার পুত্র সিরাজউদ্দৌলার রক্ত গরম হয়ে ওঠে; বংশের কলঙ্ক দূর করবার জন্য এক দিন হোসেন কুলী যখন মুর্শিদাবাদে এসে দরবারে উপস্থিত হয়েছেন তখন সেখানে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কিন্তু তা সম্ভব হোল না, উত্তেজিত দৌহিত্রকে একান্তে নিয়ে গিয়ে আলীবর্দী চুপি চুপি বললেন: দাদা, তুমি ভুলে গেলে কেন যে এটা বাংলার নবাবের দরবার? দেখছো না কত আমীর ওমরাহ বসে রয়েছেন। তাঁদের সামনে কাজটা না করে বাইরে কোন নির্জন জায়গায় করলে কারও কিছু বলবার থাকবে না। মাতামহের কথায় সিরাজ সেদিন নিরস্ত হোলেও কয়েক দিন পরে দেখা গেল যে তাঁর গুপ্তঘাতক প্রকাশ্য রাজপথের উপর হোসেন কুলীকে হত্যা করেছে (১৭৫৪, এপ্রিল)।

সিরাজউদ্দৌল্লা ছিলেন পাটনার নায়েব-নাজিম জৈনুদ্দীন আহমেদ ও

আমিনার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে ওই সহরে যখন তাঁর জন্ম হয় তখন থেকে আলীবর্দীর তারকা উর্দ্ধমুখী হোতে থাকে বলে সবাই ধরে নেয় যে শিশু খুব পয়মন্ত—তার পয়ার জোরে মাতামহ ধুলোমুঠি ধরলে তা সোনামুঠি হচ্ছে। মাতামহও তাকে অতিরিক্ত আদর দিতে থাকেন ও শেষ পর্য্যন্ত পোষ্যপুত্র নিয়ে পুত্রবৎ লালন পালন করেন। তার বিদ্যাশিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকও নিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু কিছু দিন পরে লক্ষ্য করলেন যে লেখাপড়া তার সহ্য হচ্ছে না—স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্যই যদি গেল তা হোলে লেখাপড়া দিয়ে কি হবে? তাই তিনি ওস্তাদকে বিদায় দিলেন—সিরাজও শিক্ষাগারের একঘেয়ে পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে বাছা বাছা ইয়ারদের নিয়ে চারিদিকে উপদ্রব করে বেড়াতে লাগল।

বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সুরা ও নারীর প্রতি তার আসক্তি অতিরিক্ত প্রকট হয় দেখা দেয়। এই ছুটি ভোগ্যবস্তু নিয়ে সে স্ফূর্তিতে দিন কাটাতে থাকে। তার এই জীবনযাত্রার কথা উল্লেখ করে ফরাসীদের কাসিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ জিন ল বলেন যে কামপ্রবৃত্তি ও নিষ্ঠুরতায় সিরাজউদ্দৌলার জুড়ি কেউ ছিল না। কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য সে করতে পারত না এমন কোন কাজ নেই। যে সব সুন্দরী হিন্দু যুবতী গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে আসত সে চর পাঠিয়ে তাদের সন্ধান নিত। পরে তার লোকজনরা গিয়ে বাঘের মত সেই হতভাগিনীদের ঘাড়ের উপর পড়ে তার প্রমোদকুঞ্জে নিয়ে আসত। বর্ষার সময়ে নদী যখন কানায় কানায় ভরে উঠত তখন তার অনুচররা প্রভুর নির্দেশে যাত্রীবোঝাই নৌকাগুলি জলে ডুবিয়ে দিত, আর সে অদূরে বসে সেই হত-ভাগ্যদের নিমজ্জনদৃশ্য দেখে উল্লাস অনুভব করত।

গোলাম হোসেন বলেন: সিরাজউদ্দৌল্লার অসঙ্গত ও মজ্জাগত কামশক্তির কাছে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সবাই বলি পড়তে লাগল।......শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াল যে তার পাপপুণ্যের ভেদাভেদ জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পেল। কামের চরিতার্থতার জন্য সে আত্মীয় কুটুম্বদেরও বাদ দিত না।......দূর থেকে তাকে দেখলে 'খোদা রক্ষা করো' বলে সবাই চীৎকার করে উঠত।

হীরা ঝিল

এই উচ্ছৃঙ্খল যুবক যে এক দিন বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ অধীশ্বর হবে একথা আলীবর্দী খাঁ প্রকাশ্য দরবারে ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই অশীতিপর বৃদ্ধের দেহত্যাগ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবার মত ধৈর্য্য তিনি দেখাতে পারেন নি। মাতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কি ভাবে বিহার অধিকারের চেষ্টা করেছিলেন সেকথা পূর্বে বলেছি। সেবার আলীবর্দী তাঁকে স্নেহ দিয়ে প্রতিনিবৃত্ত করলেও তাঁর প্রকৃতির পরিবর্তন করাতে পারেন নি। কোন দিন যে পারবেন এরূপ আশা মন থেকে লোপ পাওয়ায় তিনি শেষ পর্য্যন্ত তাকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দেন। পরিত্যক্ত গৌড় নগরীতে তখনও যেসব প্রাচীন হর্ম্যরাজি ছিল সেগুলি থেকে মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করে দৌহিত্রের জন্য ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে সুরম্য হীরাঝিল প্রাসাদ নির্মাণ করান। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতা বাস করবেন এই প্রাসাদে এবং এখানে নিজের অভিরুচি অনুযায়ী দিন যাপন করবেন!

যার জন্য এই প্রাসাদ তার জীবনযাত্রার ব্যয় যে কতখানি হোতে পারে তা অনুমান করে আলীবর্দী মনসুরগঞ্জ বাজারের সমস্ত রাজস্ব হীরাঝিলের জন্য বরাদ্দ করে তার উপর নজরানা মনসুরগঞ্জ নামে একটি আবওয়াব বসান। নিজস্ব জায়গীরের আয় ছাড়া এই সম্পত্তি থেকে সিরাজের চার লক্ষ টাকা বাড়তি আয় হওয়ার তিনি কায়ক্লেশে সেখানে দিন কাটাতে লাগলেন! হীরাঝিল হয়ে উঠল তাঁর বেহেস্ত। এখানে আনা হোত দূর দূরান্তর থেকে বাছা বাছা বাঈজী আর দামী দামী পানীয়। সন্ধ্যার পর থেকে তাঁর বয়স্যদের আনাগোনা আর বাঈজীদের নাচগানে হীরাঝিল মুখরিত হোত।

বঙ্গজননী অলক্ষ্যে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন!

দিল্লীতে নতর্কী বৈজুবাঈয়ের তখন খুব নামডাক। নগদ দু লক্ষ টাকা দিয়ে তাকে হাত করে সিরাজ হীরাঝিল সাজিয়ে ফেললেন। নর্তকী আরও ছিল, কিন্তু বৈজুবাঈ হয়ে উঠল পাটনর্তকী। বৈজু না থাকলে হীরাঝিলের সান্ধ্য আসর জমে না—বৈজু না এলে সবাই চোখে অন্ধকার দেখে। বয়স্যরা সদাসর্বদা তার তারিফ করে, তাই শুনে সিরাজের বুক ফুলে ওঠে। এক দিন নিয়মমাফিক শেষরাত্রে আসর বন্ধ হবার পর যখন বৈজুবাঈ গাড়ির

দরজা বন্ধ করে রাজপথ ধরে বাড়ী ফিরছিল কোতোয়ালের মনে সন্দেহ হয়, গাড়ী শুদ্ধ তাকে থানায় নিয়ে যায়। কথাটা সিরাজের কানে পৌছালে তিনি কোতয়ালের স্পর্দ্ধার কথা ভেবে অবাক হয়ে যান। এ বিষয়ে তাঁর নিজের কিছু করবার অধিকার না থাকায় মাতামহের কাছে অভিযোগ করে পাঠান। কিন্তু তিনি কি করবেন? কোতোয়ালকে কিছু বলবার মুখ তো তাঁর নেই! দৌহিত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁর আশঙ্কা আরও বেড়ে যায়।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে এত আদরের বাঈজী সিরাজউদ্দৌলার চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। তাঁর মনে সন্দেহ হোল যে সে অন্যের দিকে ঢলে পড়েছে। আর যায় কোথায়? বাঈজীকে ঘরের মধ্যে জীবন্ত কবর দিয়ে তিনি বৈজু পর্বের উপসংহার করেন!

এই হীরাঝিল! এই হীরাঝিলে সিরাজউদ্দৌলা তাঁর লীলাকুঞ্জ রচনা করে স্ফূর্তিতে দিন কাটাতেন। আবার এই হীরাঝিলে বসে তিনি দরবারের খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ করতেন। হীরাঝিল হয়ে ওঠে তাঁর প্রমোদের লীলাকুঞ্জ ও চক্রান্তের পীঠভূমি। বিশ্বস্ত চররা দরবার থেকে যে সব খবর সংগ্রহ করে আনত তা তিনি যাচাই করে দেখতেন। তাঁর দুই দুষমন বড় মাসী ঘেসেটি বেগম ও মেজ মাসীর পুত্র পূর্ণিয়া নবাবের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখত আরও কয়েকজন বিশ্বস্ত এজেণ্ট।

মতিঝিল

আলীবর্দী খাঁ সিরাজউদ্দৌল্লাকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেও তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘেসেটি বেগম তাতে খুসী হন নি। পিতার মত পরিবর্তন করাবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করে যখন সুবিধা হোল না তখন তিনি প্রকাশ্যে ও গোপনে সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত সুরু করেন। তাঁর প্রেমাস্পদ হোসেন কুলী খাঁর হত্যার পর থেকে এই বৈরিতার মাত্রা বেড়ে যায়—সিরাজের অপসারণ তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায়।

হোসেন কুলীর মৃত্যুর পর ঘেসেটি পিতাকে দিয়ে বিক্রমপুরবাসী বৈদ্য রাজা রাজবল্লভকে ঢাকার দেওয়ান নিযুক্ত করিয়েছিলেন এই আশায় যে তাঁকে সামনে রেখে নিজে পর্দার আড়ালে বসে পূর্ববঙ্গ শাসন করবেন। কিন্তু বিধি বাম!

এক বৎসর পরে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তাঁর স্বামী নওয়াজিস আহমেদ পরলোক গমন করায় তিনি দিশাহারা হয়ে পড়েন। যে ভেলায় চড়ে তিনি দিকে দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই ভেলা সরে যাওয়ায় তাঁকে ঢাকা ছেড়ে মুর্শিদাবাদে চলে আসতে হয়।

ঢাকায় বাসের সময়ে মাঝে মাঝে সেখানে এলে ঘেসেটি শহর থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে মতিঝিল প্রাসাদে বাস করতেন—এখন সেখানে তাঁর স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্ধারিত হোল। যে বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি সঞ্চিত করেছিলেন তার সবই সেখানে আনলেন। স্তাবকদেরও সঙ্গে আনলেন। সবাইকে নিয়ে তাঁর আসর ভাল করে জমে উঠল!

বৃদ্ধ আলীবর্দী যে শীঘ্রই এন্তেকাল ফরমাবেন সিরাজউদ্দৌলার মত ঘেসেটিও তা জানতেন। কিন্তু সিরাজ যখন নিজের জন্য মসনদ দাবী করবেন তিনি তখন কার জন্য করবেন? সিরাজের কনিষ্ঠাগ্রজ আক্রামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্র নিয়ে তার নামে রাজ্য শাসানের পরিকল্পনা ঘেসেটির ছিল, কিন্তু সেই হতভাগ্য অকালে ইহলীলা ত্যাগ করে তাঁকে পথে বসায়! তার পর থেকে তিনি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করতে লাগলেন—এমন কাউকে দেখতে পেলেন না যে তাকে ধরে সিরাজউদ্দৌলাকে হটিয়ে দেবেন। মধ্যমা ভগ্নির পুত্র সৌকৎ জং রয়েছে বটে, কিন্তু সেই বা আপনার কিসে? সে তো কোন দিন মাসীমা বলে কাছে আসে নি—তাঁকে আমল দেয় নি। কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে হোলে আর কার উপরই বা ভর করবেন? অনেক ভেবেচিন্তে অনেক হিসাব করে শেষ পর্য্যন্ত সৌকৎ জংকে সমর্থন করবেন বলে স্থির করলেন ঘেসেটি বেগম। পূর্ণিয়ায় একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে তাকে জানালেন যে আলীবর্দীর মৃত্যুর পরই সে যেন সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে চলে আসে। পিছনে তিনি আছেন!

সব খবরই হীরাঝিলে সিরাজের কাছে পৌঁছাচ্ছিল। আলীবর্দী খাঁর মহাপ্রয়াণের পরই তিনি মসনদ অধিকার করে এক রেজিমেণ্ট সৈন্য পাঠালেন মতিঝিলে। বড় মাসী যেন কিছু করবার সময় না পায়! ঘেসেটি বেগমেরও নিজস্ব সৈন্য ছিল। কিন্তু নূতন নবাবের ফৌজকে আসতে দেখে তাদের অস্ত্র ধারণ করবার শক্তি লোপ পেল। ঘেসেটির স্তাবক ও চাটুকারেরা

যে যেদিকে পারল সরে পড়ল! সিরাজের ফৌজ নির্বিঘ্নে তাঁকে ও তাঁর বিপুল ধনরত্ন নিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরে এল।

শরণার্থীর ভূস্বর্গ কলকাতা

ইংরাজদের সঙ্গে সিরাজউদ্দৌলার পূর্বে কোন সদ্ভাব ছিল না। একবার তিনি ইয়ারবন্ধুদের নিয়ে তাদের কাসিমবাজারের বাগানবাড়ীতে বেড়াতে যেতে চাইলে তারা মিথ্যা অছিলায় পাশ কাটায়। এই বেয়াদপির কথা সিরাজ ভোলেন নি—মনেমনে ঠিক করে রেখেছিলেন যে তখ্‌তে বসলে ফিরিঙ্গীদের দেখে নেবেন! তার উপর তাঁর অভিষেকের সময়ে তারা প্রথামত কোন খিলাৎ না পাঠানয় তাদের সন্দেহের চক্ষে দেখতে লাগলেন। সেই সময়ে এক অভাবনীয় ঘটনায় তাদের সঙ্গে যুদ্ধ অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে।

ঢাকার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ একে যথেষ্ট ধনশালী, তায় ঘেসেটি বেগমের হাতের লোক বলে সিরাজ কোন দিন তাঁকে সুনজরে দেখেন নি। আলীবর্দীর অন্তিম সময়ে অন্যান্য উচ্চস্তরের অফিসারদের মত তিনি মুর্শিদাবাদে এলে সিরাজউদ্দৌলা মিথ্যা তহবিল তছরুপের দায়ে তাঁকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। মৃত্যুপথযাত্রী আলীবর্দীর অনুরোধে তাঁর দণ্ড আপাততঃ স্থগিত রাখা হোলেও সিরাজ তাঁর সকল হিসাব পরীক্ষার আদেশ দেন এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও অস্থাবর সম্পত্তি মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসবার জন্য ঢাকায় লোক পাঠান। তার অব্যবহিত পরেই আলীবর্দী খাঁ পরলোক গমন করায় রাজবল্লভ প্রমাদ গণেন—ঢাকায় পুত্র কৃষ্ণবল্লভের কাছে গোপন নির্দেশ পাঠান যে নূতন নবাবের কোপদৃষ্টি এড়াবার জন্য তিনি যেন কলকাতায় এসে ইংরাজের কাছে আশ্রয় নেন। নির্দেশ পেয়েই কৃষ্ণবল্লভ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন।

সেই দিন—১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ—থেকে কলকাতা শরণার্থীদের আশ্রয়স্থল হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তার পর গত দুই শত বৎসরে পূর্ববঙ্গ ও বহির্ভারতের বিভিন্ন স্থানে যখন কোন বিপদ এসে অধিবাসীদের গৃহে অবস্থান অসম্ভব করেছে তারা আশ্রয়ের জন্য চলে এসেছে কলকাতায়। উড়িষ্যায় হয়েছে দুর্ভিক্ষ, বিহারে হয়েছে আকাল—দলে দলে নরনারী চলে

এসেছে কলকাতায়। ব্রহ্ম ও মালয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত হয়েছে—কাতারে কাতারে লোক এসেছে কলকাতায়। গরিষ্ট সম্প্রদায়ের ভয়ে হিন্দুরা পূর্ববঙ্গে অসহায় বোধ করেছে—চলে এসেছে কলকাতায়। নোয়াখালি দাঙ্গায় তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে—পরিত্রাণের জন্য ছুটে এসেছে কলকাতায়। তারা এসেছে, পাঞ্জাবী এসেছে, সিন্ধী এসেছে—সবাই এসেছে। কলকাতা সবাইকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ধন্য হয়েছে।

কলকাতা আক্রমণ

মসনদে আরোহণ করে সিরাজউদ্দৌলা যখন দেখলেন যে ইংরাজরা তাঁর প্রতি আনুগত্য দেখান দূরের কথা কৃষ্ণবল্লভকে আশ্রয় দিয়েছে তখন নারায়ণদাস নামে এক কর্মচারীকে কলকাতায় পাঠিয়ে তাদের উপর আদেশ দেন যে সেই রাজদ্রোহীকে যেন মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সে সময়ে ইওরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হয়েছিল বলে ইংরাজরা কলকাতায় কিছু কিছু রক্ষাব্যবস্থা নির্মাণ করছিল। সেগুলি সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবার জন্যও নবাব নারায়ণদাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। নারায়ণদাস চতুর লোক ; পাছে ইংরাজরা সব কিছু গোপন করে তাই তাদের রক্ষাব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখবার জন্য ১৬ই এপ্রিল ছদ্মবেশে কলকাতায় প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখলেও ইংরাজরা কি ভাবে তা জানতে পেরে তাঁকে গুপ্তচরবৃত্তির দায়ে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করে দেয়।

এই খবর নিয়ে নারায়ণদাস যখন সিরাজউদ্দৌলার কাছে গিয়ে পৌছালেন তিনি তখন মাসতুতো ভাই সৌকৎ জংএর সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য পূর্ণিয়ার দিকে এগিয়ে চলেছেন। রাজমহলে নারায়ণদাসের মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে তিনি তাজ্জব বনে যান। কি ! ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের এত বড় স্পর্দ্ধা ! তাঁর রাজ্যে বসে যারা তাঁর দূতকে অপমান করতে সাহস পায় তারা সৌকত জংএর চেয়েও বড় দুষমন। হয় তো বা দুই পক্ষে কোনও গোপন যোগসাজস রয়েছে ! ইংরাজদের সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য পূর্ণিয়া যাত্রা আপাততঃ স্থগিত রেখে তিনি মাঝ পথ থেকে কলকাতার দিকে রওনা হোলেন। পথে পড়ল তাদের কাশিমবাজার কুঠি, সেটি লুণ্ঠন করে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন তাঁর ফৌজ কলকাতায় উপনীত হোল।

কলকাতায় ইংরাজদের ছিল সর্বসাকুল্যে ২৭৫জন সৈনিক। তাদের মধ্যে আবার ৭০জন অসুস্থ ও ২৫জন মফঃস্বলে। বাকি ১৮০ জনের বেশীর ভাগ পর্তুগীজ। সকলের উপর একজন সেনাপতি অবশ্য ছিলেন; কিন্তু তিনি পূর্বে কোন দিন যুদ্ধ করেন নি—যুদ্ধ শেখেনও নি। সওদাগরী প্রতিষ্ঠানের সৈন্যদের নাকি যুদ্ধ শেখবার দরকার হয় না! এদের উপর ভরসা করে গভর্ণর ড্রেক নবাবের দূতকে অপমান করবার সাহস দেখিয়েছিলেন।

ইংরাজরা চির দিন জোট পাকাতে ওস্তাদ—যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখলে মিত্রের অন্বেষণ করা তাদের চিরন্তন রীতি। নবাব সসৈন্যে কলকাতায় আসছেন শুনে ড্রেক চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ ও চন্দননগরে ফরাসীদের কাছে লোক পাঠিয়ে বললেন: দেশে আমাদের সম্পর্ক যাই হোক এই সাত সমুদ্র তের নদী পারে আমরা সবাই ভাই ভাই। আমাদের বিপদ তোমাদের বিপদ—তোমাদের বিপদ আমাদের বিপদ! নবাব আসছেন আমাদের খতম করতে। সে কাজ শেষ হোলে তোমাদের ছেড়ে দেবেন না। এভাবে এক এক করে শেষ হবার চেয়ে এসো আমরা সবাই একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই। তোমাদের যার যা আছে নিয়ে কলকাতায় চলে এসো—আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। আমাদের সৈন্যের কোন অভাব নেই, শুধু যা বারুদ কিছু কম রয়েছে। যদি তোমাদের আসা একান্তই সম্ভব না হয় যতটা পার বারুদ পাঠিয়ে দাও। আমরা নবাবকে খতম করে দেব। সে ভার আমার!

ইংরাজদের এই আহ্বানে সাড়া দেবে এমন সাহস ওলন্দাজ বা ফরাসীদের ছিল না। তবু ড্রেক হতোদ্যম না হয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরী হোতে লাগলেন। শতাধিক ফিরিঙ্গীসহ আরও ২৫০জন লোক সংগ্রহ হোল—সৈন্যসংখ্যা দাঁড়াল সর্বসাকুল্যে ৪৩০ জন। এদের নিয়ে তিনি বাংলার নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন! জয়ের আশা অবশ্য নেই, কিন্তু যদি কয়েক সপ্তাহ নবাবকে ঠেকান যায় তা হোলে মাদ্রাজ কুঠি থেকে নূতন সৈন্য আসলেও আসতে পারে। ড্রেক সাহেব চাতক পাখীর মত মাদ্রাজের দিকে তাকিয়ে রইলেন!

১৬ই জুন নবাব সসৈন্যে কলকাতায় এসে তাঁবু ফেললেন। মীরজাফর প্রথম আক্রমণ সুরু করলেও তাঁর ফৌজ চীৎপুরে মারাঠা খাল পার হয়ে কলকাতায় প্রবেশের চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হয়। মুষ্টিমেয় ইংরাজ তাদের পিছু হটাতে হটাতে

একেবারে দমদম পর্য্যন্ত ঠেলে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের এই সাফল্য একেবারেই সাময়িক। পর দিন ১৭ই জুন নবাবের ফৌজ ইংরাজদের হটাতে হটাতে কলকাতায় এসে উপনীত হয়।

পরের দিন শুক্রবার। জ্যোতিষীরা যখন বলল যে আজ যুদ্ধ করলে ফল ভাল হবে তখন সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণের আদেশ দিলেন। জ্যোতিষীদের গণনা হাতে হাতে ফলল—তাঁর সৈন্যরা বিনা যুদ্ধে দেশী পাড়া দখল করে একেবারে লালবাজারে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সেখানে মেয়রস্ কোর্টে দাঁড়িয়ে ইংরাজরা নবাবের ফৌজের উপর কামান দাগছিল বটে কিন্তু তাদের আসল রক্ষাব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে। যুদ্ধারম্ভের কিছু পরে এক সহকারীর উপর কিছু ক্ষণের জন্য দায়িত্ব অর্পণ করে স্থানীয় সৈন্যাধ্যক্ষ জন হলওয়েল গভর্ণর ড্রেকের সঙ্গে পরামর্শের জন্য দুর্গে চলে গেলেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন, সব শেষ! নবাবের ফৌজ মেয়রস কোর্ট দখল করেছে—তাঁর সৈন্যরা কেল্লার দিকে পালিয়ে আসছে।

শনিবার সকাল থেকে কেল্লার উপর গোলাবর্ষণ সুরু হোল। কিন্তু পাল্টা গোলা ছুড়বে কে? ভয়ে কারও হাত উঠল না। তার উপর অল্পস্বল্প বারুদ যা ছিল তা ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে গিয়েছিল। সুরু হোল পলায়ন। প্রাণ বাঁচাবার জন্য অনেকে গিয়ে জাহাজে উঠল, অনেক হুড়োহুড়িতে জলে পড়ে গেল। গভর্ণর ড্রেক ও সেনাপতি মিনচিনও পালালেন! বাকি যে ১৭০ জন সৈন্য কেল্লায় থেকে গেল তারা হলওয়েলকে গভর্ণর মনোনীত করে যুদ্ধ চালাতে লাগল। যুদ্ধ আর কি? কেমন করে প্রাণ বাঁচিয়ে যুদ্ধের শেষ করা যায় সেই চিন্তা মাথায় নিয়ে যুদ্ধকে জিইয়ে রাখা! নিশাগমের সঙ্গে সঙ্গে গোলাগুলি ছোড়া বন্ধ করে কোম্পানীর সৈন্যগণ পলাতক অফিসারদের বাংলো থেকে ভাল ভাল মদ এনে প্রাণভরে পান করল।

পরের দিন রবিবার। সূর্য্যোদয়ের পর সৈন্যদের তদারক করতে গিয়ে হলওয়েল দেখেন, যে ৫৩ জন ওলন্দাজ কাল তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছিল তারা রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নবাবপক্ষে চলে গেছে। এখন দুর্গের উপর যারা কামান দাগছে তাদের মধ্যে সেই ওলন্দাজদের কয়েকজন রয়েছে বলে মনে হোল! তা সত্বেও হলওয়েল যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন,

দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত তাঁর ৭[illegible]জন সৈন্য হতাহত হোল। অপরাহ্ন সময়ে তাঁর প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় নবাবের সৈন্যরা দুর্গে প্রবেশ করল। সেই সঙ্গে কলকাতা যুদ্ধের অবসান ঘটল।

অন্ধকূপ হত্যা

আত্মসমর্পণের সময়ে হলওয়েলকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হোলেও তাঁর সৈন্যরা এই উদারতার অপব্যবহার করে। সন্ধ্যার পর তাদের কয়েকজন মাত্রাতিরিক্ত সুরাপানে বেহুস হয়ে দেশীয় লোকদের উপর উপদ্রব সুরু করে দেয়। এই খবর যথারীতি নবাবের গোচরে আনা হোলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন: ইংরাজরা এরূপ অপরাধীদের নিয়ে কি করে? উত্তরে কে একজন বলল, অন্ধকূপে আটকে রাখে। নবাব আদেশ দিলেন, ফিরিঙ্গীদের আজ রাতের মত সেখানে রেখে দাও। কাল বিচার করা যাবে।

এ সম্বন্ধে হলওয়েলের লেখা থেকে জানা যায়, ইংরাজপক্ষে তখন যে ১৪৬ জন সৈন্য সেখানে ছিল নবাবের আদেশে সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে ১৮ ফুট লম্বা ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি চওড়া সেই ঘরের মধ্যে পুরে দেওয়া হয়। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস, তায় দিনটি ছিল অস্বাভাবিক গরম। সেই উত্তপ্ত আবহাওয়া থেকে বাঁচবার জন্য দেশী লোকরা যখন ফাঁকা মাঠে চারপায়া পেতে ঘুমোচ্ছিল তখন শীতপ্রধান দেশের অধিবাসীদের সেই সঙ্কীর্ণ অন্ধকূপের মধ্যে গাদাগাদি করে পুরে দেওয়ার ফল যা হবার তাই হোল। অধিকাংশ বন্দী সর্দিগর্মি হয়ে মারা গেল, বাকী কয়েকজন অর্দ্ধমৃত হয়ে পড়ে রইল। সকালে যখন অন্ধকূপের দরজা খোলা হোল তখন প্রহরীরা দেখল যে ১২৩ জন গেছে মরে, ২৩ জন কোনক্রমে প্রাণে বেঁচে আছে।

অন্ধকূপ হত্যার এই কাহিনী মিথ্যা না হোলেও এর মধ্যে বেশ কিছুটা অতিরঞ্জন রয়েছে। এত অল্প পরিসর স্থানে ১৪৬ জন লোককে দাঁড় করিয়ে রাখতে চাইলেও তা সম্ভব নয়। যুদ্ধাবসানের সময়ে এত লোক দুর্গে ছিলও না। আসল কথা এই যে তার পূর্বেও যে সব ইংরাজ যুদ্ধে বা অন্য কারণে মারা গিয়েছিল হলওয়েল তাদের নামও অন্ধকূপ হত্যা তালিকার অন্তর্ভুক্ত করায় সংখ্যাটি একটু বেশী রকম ফুলেফেঁপে ওঠে। লালদীঘির উত্তর-পশ্চিম

কোণে দুই রাস্তার সঙ্গমস্থলে নির্মিত হলওয়েল মনুমেণ্টের উপর সেই নামগুলি খোদিত ছিল। হলওয়েল নিজে সৌধটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন সেটির পুনর্নির্মাণ করান, ১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র সেটিকে অপসারিত করেন।

অদূরদর্শী নবাব

সিরাজউদ্দৌলা পূর্বে শুনেছিলেন যে কলকাতায় ইংরাজদের বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা রয়েছে। সেই অর্থের জন্য তিনি হলওয়েলের উপর চাপ দিলেন— দুর্গ তছনছ করলেন। কিন্তু ৪১ হাজারের বেশী টাকা পাওয়া গেল না দেখে হলওয়েলকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে পাঠাবার হুকুম দিলেন; কলকাতার নাম বদলে মৃত নবাবের নামানুসারে আলীনগর রাখলেন। কোন্নগর নিবাসী রাজা মাণিকচাঁদ ঘোষ নিযুক্ত হোলেন আলীনগরের ফৌজদার।

কলকাতার যুদ্ধ শেষ হোল বটে কিন্তু কিভাবে তার ক্ষতিপূরণ হবে? সেটাই এখন সিরাজউদ্দৌলার কাছে বড় ভাবনা। ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের মধ্যে যে বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে একথা তাঁর জানা ছিল না—কোন দেশী লোকেরই জানা ছিল না। সব ফিরিঙ্গী এক—সব গোরাই এক জাতের। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা থেকে ফেরবার পথে চুঁচুড়া ও চন্দননগরে গিয়ে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ওলন্দাজ ও ফরাসীদের কাছ থেকে যথাক্রমে সাড়ে চার লক্ষ ও সাড়ে তিন লক্ষ টাকা আদায় করলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁর খরচ কতকটা উশুল হোল, ফরাসীরা ভাবল, সপ্তাহখানেক পূর্বে ইংরাজরা তাদের কাছে কোন মিথ্যা সতর্কবাণী পাঠায় নি!

ইংরাজরা কলকাতা ছাড়লেও বাংলা ছাড়ে নি। কয়েক মাইল দক্ষিণে ফলতায় সরে গিয়ে নূতন করে যুদ্ধের জন্য তৈরী হোতে লাগল। অথচ ফলতা সিরাজউদ্দৌলার রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত! একথা যথারীতি তাঁর কানে গেল; কিন্তু তিনি তা শুনেও শুনলেন না।

শত্রুকে এভাবে উপেক্ষা করে সিরাজউদ্দৌলা নিজের কফিনের উপর প্রথম শলাকা প্রোথিত করলেন!

সৌকৎ জংএর পতন

পূর্বে বলেছি যে কলকাতা যুদ্ধের পূর্বে সিরাজউদ্দৌলা তাঁর মাসতুতো ভাই পূর্ণিয়া নবাব সৌকৎ জংএর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন। আলীবর্দীর মৃত্যুর এক মাস পূর্বে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ এই সৌকৎ জং উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ণিয়ার গদি লাভ করে মাতামহের মৃত্যুর অপেক্ষায় বসেছিলেন। তাঁর উপর টেক্কা দিয়ে সিরাজ মসনদ দখল করে তাঁকে খতম করবার জন্য রওনা হোলেও ইংরাজদের সায়েস্তা করবার জন্য মাঝপথ থেকে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতা যুদ্ধের পর কিছু দিন বিশ্রাম নিয়ে তিনি ২৪শে সেপ্টেম্বর আবার সৌকৎ জংএর বিরুদ্ধে রওনা হন।

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই কথাটা যে কতখানি সত্য তা জানি না, কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে তাঁর মাসতুতো ভাইয়ের সব দিক দিয়ে অদ্ভুত মিল ছিল। দুজনেই ছিলেন সমান চপলমতি, সমান উচ্ছৃঙ্খল, সমান কামাসক্ত, সমান মদ্যপায়ী। এর উপর সৌকতের ছিল আত্মম্ভরিতা। তিনি মনে করতেন যে সিরাজ কোন দিক দিয়ে তাঁর সমকক্ষ নয় -কূটনীতিতে তো নয়ই। সেই পথে বাজী মাৎ করবার জন্য তিনি দিল্লীশ্বরের উজীর গাজিউদ্দীন ইমদাদ-উল-মুলক্‌কে খুসী করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী আদায় করে আনেন। বরুণ অস্ত্র দিয়ে সিরাজের অগ্নি অস্ত্র অকেজো করেছেন ভেবে এক পত্রে সিরাজকে লেখেন : এর পর তোমার মুর্শিদাবাদের মসনদ আঁকড়ে থাকবার অর্থ হয় না। তুমি আমার আত্মীয়, তাই তোমাকে প্রাণে মারব না! আমার দূত রায় রাসবিহারীর কাছে মসনদ ছেড়ে দাও, কথা দিচ্ছি তোমাকে দেখব। যদি চাও ঢাকার নায়েব-নাজিমী দেবার কথাও বিবেচনা করতে পারি। কিন্তু এই হিতোপদেশে সিরাজ কান দিলেন না, রাসবিহারী শূন্য হাতে পূর্ণিয়ায় ফিরে গেলেন।

ঘেসেটি বেগম আগে থেকেই সৌকৎ জংকে তাতাচ্ছিলেন। এবার মীরজাফর আসরে নামলেন। পূর্ণিয়ায় এক গোপন পত্র পাঠিয়ে জানালেন যে তিনি নিজে তো বটেই, রাজধানীর সকল আমীর ওমরাহ্ সৌকত জংএর পক্ষে আছেন। তিনি যদি মেহেরবানি করে মুর্শিদাবাদে আসেন সবাই তাঁকে নবাব বলে কুর্নিশ করবে। পত্রখানি পড়ে পূর্ণিয়া নবাব আনন্দে নৃত্য

করে উঠলেন। একে হাতে বাদশাহর ফরমান তায় ঘেসেটি-মীরজাফরের মত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মদদ্ দেবার প্রতিশ্রুতি। সিরাজের সাধ্য কি যে তাঁকে আটকায়! সেই দুষমনকে খতম করবার জন্য তিনি তৈরী হোতে লাগলেন, কিন্তু তাঁকে সেরূপ সময় না দিয়ে সিরাজ সসৈন্যে পূর্ণিয়ার দিকে এগিয়ে চললেন। জুন মাসেই দুই মাসতুতো ভাইয়ের মামলার শেষ ফয়সলা হয়ে যেত, কিন্তু গোল বাধাল কলকাতার যুদ্ধ। সে যুদ্ধ এখন খতম হওয়ায় উভয় নবাব নূতন উদ্যমে আসরে নামলেন। সিরাজউদ্দৌলার আদেশ পেয়ে বিহারের নায়েব-নাজিম রাজা রামনারায়ণ সসৈন্যে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন।

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর মনিহারীতে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হোল। একে সিরাজের সৈন্যসংখ্যা সৌকতের দ্বিগুণ, তায় তাঁর ব্যূহ বিন্যাস উৎকৃষ্টতর। মোহনলালের নেতৃত্বে তাঁর অগ্রবাহিনী পূর্ণিয়া ফৌজকে আক্রমণ করলে তারা প্রথম আঘাতেই পর্যুদস্ত হয়। তা সত্ত্বেও সৌকত জং হাতীর পিঠে বসে বীর বিক্রমে যুদ্ধ চালাচ্ছিলেন, কিন্তু বেলা বাড়লে দেহমন চাঙ্গা করে নেবার জন্য একটু বেশী মাত্রায় সরাব পানের ফলে তাঁর বাহ্যজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়ে যায়। সেই সময়ে একটি গুলি এসে তাঁর ইহলীলা সাঙ্গ করায় পূর্ণিয়া যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইংরাজদের প্রত্যাবর্তন

সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বা পূর্ণিয়া নবাবের যুদ্ধ চলছিল তখন দিল্লীতে একজন বাদশাহ ছিলেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সর্বোচ্চ অধীশ্বর তিনি। কিন্তু এসব ব্যাপারে তাঁর কোন হাত ছিল না। মারাঠারা তাঁকে কুক্ষিগত করে তাঁর সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য চালাচ্ছিল। সৌকত জংএর তিরোধানের পর আপাতদৃষ্টিতে সিরাজউদ্দৌলার কোন শত্রু না থাকলেও তাঁর মনে হোল যে বাদশাহ যতই কাঠের পুতুল হোন না কেন তাঁর কাছ থেকে একটা সনদ আদায় করতে পারলে বহু ঝঞ্ঝাটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। তিন কোটি টাকা পেশকাশের বিনিময়ে সেই সনদ পেয়ে তিনি মনের আনন্দে রাজত্ব করতে লাগলেন। আর তো কেউ তাঁকে বেদখলকারী বলে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় আহ্বান জানাতে পারবে না!

কিন্তু তাঁর শত্রু গোকুলে বাড়ছিল। কলকাতা যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ইংরাজরা ওই শহর ছাড়লেও তাঁর রাজ্য ছেড়ে চলে যায় নি। কিছু দক্ষিণে ফলতায় সরে গিয়ে নূতন করে যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছিল। ফলতা ছোট গ্রাম হোলেও সেখানে তাদের স্থানাভাব হয় নি। ওলন্দাজদের পরিত্যক্ত একটি কুঠিতে সকল উদ্বাস্তু ইংরাজ ঠাঁই পেয়ে গেল। ঢাকা ও কাশিমবাজারের কুঠিয়ালরা পরে সেখানে এসে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হোল। ওয়ারেন হেস্টিংস এলেন—হলওয়েল এলেন। তিনি গভর্ণরগিরির দাবী করলেন, কিন্তু ড্রেক পূর্বে যেমন গভর্ণর ছিলেন এখনও তেমনি রইলেন। একখানা জাহাজকে ফোর্ট উইলিয়াম নাম দিয়ে তার উপর কাউন্সিল বসতে লাগল।

সিরাজউদ্দৌলার কাছে সব খবরই পোঁছাচ্ছিল, কিন্তু তুচ্ছ বণিকদের তোয়াক্কা করা দরকার বলে তিনি মনে করলেন না। বরং তারা ভাল করে কাজ কারবার চালালে রাজকোষে মোটা টাকা আমদানী হবে ভেবে মনে মনে তাদের অবস্থান চাইলেন। কিন্তু এক দিন তিনি শুনে তাজ্জব বনে গেলেন যে সেই বেনিয়ারা নূতন করে কেনাবেচা করবার পরিবর্তে কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য সসৈন্যে এগিয়ে আসছে। খবরটার মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন নেই তো? একজন দ্রুতগামী অশ্বারোহী পাঠিয়ে সব কিছু যাচাই করে নেওয়া হোল।

ইংরাজরা সত্যই এগিয়ে আসছিল। ২৬শে ডিসেম্বর তাদের জাহাজ ফলতা থেকে রওনা হয়ে বজবজ ছাড়িয়ে মকোয়া থানা ও আলীনগরের মাঝামাঝি এক জায়গায় এসে নোঙ্গর করল। আলীনগরের নূতন ফৌজদার রাজা মানিকচাঁদের উপর এই অঞ্চলের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। তিনি দু হাজার সৈন্যসহ সেখানে গিয়ে দেখেন—এ ইংরাজ সে ইংরাজ নয়! তাদের নূতন সেনাপতি কার্ণল ক্লাইভের অদ্ভুত রণনীতির ফলে তাঁর বহু সৈন্য হতাহত হোল—চারজন অফিসার রণক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। তিনি নিজে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন।

বজবজের মাটির কেল্লায় নবাবের যে সব সৈন্য ছিল তারা ইংরাজের জাহাজের উপর গোলাবর্ষণ করতে থাকলেও প্রত্যুত্তরে যেসব গোলা এসে

কেল্লার উপর পড়ল তেমনটি এদেশে কেউ কখনও দেখে নি। কামান যে এত অগ্নিবর্ষী হতে পারে দুর্গরক্ষীরা পূর্বে তা জানত না। সেই কামানের ভয়ে সন্ধ্যা সমাগমের পর বহু সৈন্য যখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দুর্গ ছেড়ে চলে যাচ্ছে সেই সময়ে একজন ইংরাজ সিপাহী একাই দুর্গটি জয় করে নেয়। টমি ষ্ট্র্যাহাম মদের ঝোঁকে গড় পার হয়ে কেল্লার দেওয়ালের উপর উঠে এমন সোরগোল শুরু করে দেয় যে তখনও যে কয়জন সৈন্য সেখানে ছিল তারা দুর্গের পতন হয়েছে মনে করে দ্বিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে! ষ্ট্র্যাহামের চীৎকারে জাহাজের ইংরাজরা তীরে নেমে এসে বিনা বাধায় দুর্গটি দখল করে নেয়।

এই অভাবনীয় ঘটনায় ইংরাজ জাহাজের ধ্বংসশক্তি সম্বন্ধে এমন সব আজগুবি খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে যে নবাবের ফৌজ ভয়ে আর ক্লাইভকে বাধা দিল না। বিনা যুদ্ধে মকোয়া থানা অধিকার করে তিনি ২রা জানুয়ারী কলকাতায় এসে উপস্থিত হোলেন। অ্যাডমিরাল ওয়াটসন তাঁর নৌবহরসহ কয়েক ঘণ্টা পূর্বে সেখানে এসেছিলেন। দুজনে দুখানা স্বতন্ত্র ম্যানিফেষ্টো জারি করে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

কলকাতার দ্বিতীয় যুদ্ধ

অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ছিলেন রয়েল ষ্টাফ কলেজে শিক্ষিত ইংলণ্ডেশ্বরের কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার, আর রবার্ট ক্লাইভ রণবিদ্যা না শেখা কোম্পানীর কর্ণেল। এমনি একজন ভুঁইফোড় কর্ণেলকে অ্যাডমিরাল সাহেব নিজের সমকক্ষ বলে মেনে নেবেন কেন? তাই তিনি পৃথকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করবার পরও পদে পদে ক্লাইভকে বোঝাতে লাগলেন, তাঁর মর্য্যাদা কত উচ্চ। যাঁকে লক্ষ্য করে ওয়াটসনের এত লম্ফঝম্ফ তিনি কিন্তু নির্বিকার! যুদ্ধ তাঁর নবাবের সঙ্গে—ওয়াটসনের সঙ্গে নয়। তাই তিনি ওয়াটসনের হাতে কলকাতা ছেড়ে দিয়ে আরও উত্তরে বরানগরে গিয়ে ছাউনি ফেললেন। সেখানে এক সপ্তাহ প্রস্তুতির পর ১০ই জানুয়ারী হুগলী আক্রমণ করে ওই নগরী ধ্বংস করেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে সিরাজউদ্দৌলা সেখানে এলে বরানগরে ফিরে আসেন।

ক্লাইভের পশ্চাদ্ধাবন করে নবাব কলকাতায় এসে প্রতিষ্ঠাবান পাঞ্জাবী

বণিক আমীরচাঁদ বা উমিচাঁদের বাগানবাড়ীতে তাবু ফেললেন। তাঁর সঙ্গে ৪০ হাজার অশ্বারোহী ও ৬০ হাজার পদাতিক। পক্ষান্তরে ক্লাইভের ফৌজে মাত্র ৭৫০ জন পদাতিক। শক্তির এই বিরাট তারতম্য দেখে ক্লাইভ শঙ্কাব্যাকুল চিত্তে দেওয়ান দুর্লভরামের শরণাপন্ন হওয়ায় তাঁর সুপারিশে নবাব সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি দেন। এসম্বন্ধে কথাবার্তার জন্য দুজন ইংরাজ অফিসার ওয়ালস ও ক্র্যাফটন নবাব শিবিরে চলে আসেন। কিন্তু আলাপ আলোচনার শেষে তাঁরা যখন নিজেদের শিবিরে ফিরে যাচ্ছেন সেই সময়ে উমিচাঁদের মুখে শোনেন যে নবাবের কামানগুলি তখনও এসে পৌছায় নি।

সৈন্য আছে, অথচ আয়ুধ নাই! খবরটি পেয়ে ক্লাইভ বুঝলেন—এই সুযোগ! সেই দিনই রাত্রি প্রভাতের পূর্বে তিনি শত্রুকে আক্রমণ করলেন। নবাবের সৈন্যরা তখন ঘুমে অচেতন, তাই সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার উপর দিনটি ছিল অত্যন্ত দূর্য্যোগময়—গাঢ় কুয়াশায় সমস্ত পৃথিবী ঢেকে গিয়েছিল। পাঁচ হাত দূরের লোককেও চেনা যায় না—কে যে শত্রু আর কে যে মিত্র তা অনুধাবন করা অসম্ভব। তারই মধ্যে ক্লাইভ নবাবের ইরানী অশ্বারোহীদের আক্রমণ প্রতিহত করে একেবারে তাঁর তাঁবুর সামনে গিয়ে উপস্থিত হোলেন। পিছনে তাঁর কামানশ্রেণী মুহুর্মুহু গর্জন করতে লাগল।

যে আশঙ্কায় পূর্ব দিন তাঁর মন অভিভূত হয়েছিল সেই আশঙ্কা এখন সিরাজউদ্দৌলাকে অভিভূত করল। তিনি খিড়কি দরজা দিয়ে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের হাওয়া বদলাতে লাগল। সকাল ৯টা নাগাদ ক্লাইভ যখন দেখলেন যে আবহাওয়া পরিষ্কার হয়েছে ও নবাবের কামানগুলি এসে পৌচেছে তখন পিছু হটতে হটতে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গে এসে আশ্রয় নিলেন।

এই অসম যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে যেখানে ১৯৪ সৈনিক হতাহত হয়েছিল নবাব পক্ষে সেখানে হতাহত হয় ১৩০০ সৈন্য। ক্ষয়ক্ষতির এই হিসাব দেখে নবাব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেও তাঁর হতোদ্যম হবার কোন কারণ হয় নি। তিনি যদি সাহস করে এগিয়ে যেতেন তাহোলে তাঁর ৪০ হাজার অশ্বারোহীর খুরের আঘাতে ক্লাইভের বাকী ৫৫৬ জন পদাতিক গুঁড়ো হয়ে যেত—একজনও প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারত না। কিন্তু সেদিক দিয়ে চিন্তা পর্য্যন্ত না করে বিজয়ী

নবাব সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে ক্লাইভের কাছে দূত পাঠালেন। ক্লাইভ হতবাক! নবাবের তাঁবু ও ফোর্ট উইলিয়ামের মধ্যে কয়েকবার দূত যাতায়াতের পর যে চুক্তিনামা সম্পাদিত হোল তার সর্তানুসারে—

(১) ইংরাজরা তাদের সকল পুনর্নির্মাণ করে পূর্বের মত কাজ কারবার চালাতে পারবে।

(২) বাদশাহ ফারুকশায়ার কোম্পানীকে যে ফর্মান দিয়েছিলেন তার সকল সর্ত অক্ষুণ্ণ থাকবে।

(৩) পর পর দুইটি যুদ্ধে কোম্পানীর সে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে নবাব তার ক্ষতিপূরণ দেবেন।

(৪) কোম্পানী প্রয়োজনবোধে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করতে পারবে।

(৫) কলকাতায় টাঁকশাল স্থাপন করে কোম্পানী টাকা তৈরী করতে পারবে।

শত্রুকে পরাস্ত করা সত্বেও এই অপরূপ সর্তগুলি মেনে নিয়ে সিরাজউদ্দৌলা নিজের কফিনের উপর আর একটি শলাকা প্রোথিত করলেন!

হোলি উৎসবে সিরাজউদ্দৌলা

ক্লাইভকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেও কেন যে সিরাজউদ্দৌলা এভাবে তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন তা নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে আহমেদ শাহ দুররানী মথুরা লুণ্ঠন করে দিল্লীর দিকে এগিয়ে আসছিলেন বলে তিনি ইংরাজের সঙ্গে তিক্ততা সৃষ্টি যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন নি। এই অনুমানের কোনও ভিত্তি নেই। দূরের শত্রুর ভয়ে কে কবে পরাজিত শত্রুর কাছে এভাবে মাথা নত করেছে?

সমসাময়িক ঐতিহাসিক করম আলি এবিষয়ে বিতণ্ডার অবকাশ রাখেন নি। মুজাফরনামায় তিনি লিখেছেন, সেই যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সিরাজ মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হন এবং অতি দ্রুতগতিতে পথ চলে এক দিনের মধ্যে সেখানে পৌঁছে হোলি খেলায় মেতে ওঠেন। আমাদের ধারণা এই যে এই হোলি উৎসবে যোগদানের আকর্ষণে তিনি ব্যস্তসমস্ত হয়ে যুদ্ধ শেষ করেন।

করম আলি লিখেছেন, আলীবর্দী খাঁর সময় থেকে প্রতি বৎসর মতিঝিল প্রাসাদে মহা ধুমধামের সঙ্গে হোলি খেলা হয়ে আসছে। এজন্য দু'শটি চৌবাচ্চা লাল, বেগুনী ও জাফরানী রঙে ভর্তি করা হয় এবং পরীর মত সুন্দরী তরুণীরা নবাবজাদাদের সঙ্গে হোলী খেলে। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে পূর্ণিয়া নবাব সৌকত জং পিতামহ আলীবর্দী খাঁকে দেখবার জন্য মুর্শিদাবাদে এলে শাহমৎ জং এই প্রিয় ভ্রাতাকে হোলি খেলার জন্য আরও এক সপ্তাহ থেকে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। লেখক করম আলিরও সেই উৎসবে যোগ দেবার সৌভাগ্য হয়েছিল।

কলকাতার দ্বিতীয় যুদ্ধের এক দিন পরে হোলি। ফাল্গুন বহে যাচ্ছে—চারিদিকে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে। যুদ্ধের জন্য তরুণ নবাব যদি কলকাতায় বসে থাকেন তাহোলে একটা বৎসর বৃথা নষ্ট হবে! তাই তিনি মাঝপথে যুদ্ধ শেষ করে হোলি খেলবার জন্য ত্রস্তব্যস্তে মুর্শিদাবদের দিকে রওনা হন। তাঁর নির্দেশে দেওয়ান রায় দুর্লভ ও বক্সী মীরজাফর সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

ফরাসীদের নিষ্ক্রমণ

সাম্প্রতিক কালে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পরের মিত্র দেশে পরিণত হোলেও ইংরাজদের চিরন্তন ধারণা এই যে ফরাসীরা তাদের দুষমন ছাড়া আর কিছু নয়। ফরাসীদেরও ইংরাজ সম্বন্ধে একই ধারণা। মোঁপাসার মত প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিকও লিখে গেছেন যে ইংরাজ ছাড়া সারা পৃথিবীতে ফরাসীদের আর কোন শত্রু নেই। প্রাচ্যদেশে এসেও উভয় জাতির এই তিক্ত সম্পর্কের কোনও পরিবর্তন হয় নি।

কলকাতা পুনরুদ্ধারের পর এক দিন ইংরাজরা খবর পেল যে ইউরোপে ফরাসীদের সঙ্গে তাদের আবার যুদ্ধ সুরু হয়েছে। সেখানে চলবে যুদ্ধ আর এখানে থাকবে সম্প্রীতি এমন ব্যবস্থা কিছুতেই চলতে পারে না। ইউরোপের যুদ্ধ বাংলায় টেনে এনে ক্লাইভ এক ঢিলে দুই পাখী মারবার আয়োজন করলেন। ফরাসীদের পঙ্গু করলে সিরাজউদ্দৌলা তাঁর একমাত্র মিত্রকে হারাবেন—ক্লাইভের নিজের পথ হবে বাধামুক্ত। কিন্তু সে কাজ করতে হোলে সিরাজ-উদ্দৌলারই অনুমতি চাই, কারণ চন্দননগর তাঁর অধিকারের মধ্যে অবস্থিত।

ভরসা করে তাঁর কাছে এক পত্র পাঠিয়ে সেরূপ অনুমতি চাইলে তিনি দেওয়ান রায় দুর্লভকে আদেশ দেন সসৈন্যে চন্দননগরে যাবার জন্য।

এক তুচ্ছ বণিকের পত্রের জবাব বাংলার নবাব দেবেন কেন? কিন্তু তাঁর এই মৌনতাকে সম্মতি মনে করে ক্লাইভ তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে চন্দননগরের দিকে এগিয়ে চললেন। সংশ্লিষ্ট সরকারের রক্ষাব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারের উপর। কিন্তু ক্লাইভ তাঁকে এমনভাবে হাত করেছিলেন যে তিনি নিজে তো নিশ্চেষ্ট বসে রইলেনই উপরন্তু রায় দুর্লভের ফৌজকে সুকৌশলে প্রতিনিবৃত্ত করলেন। গুজব ছড়াল যে দশ হাজার টাকার বিনিময়ে তিনি ক্লাইভকে এই সাহায্য দিয়েছিলেন!

চন্দননগরে ফরাসীদের ছয় শত ফুট বর্গাকৃতি ফোর্ট-ডি-অর্লিনস ছিল নামেই দুর্গ। তার উপর গভর্ণর রেনোঁর না ছিল লোকবল না ছিল আর্থিক সঙ্গতি। তবু তিনি নিজের ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে ইংরাজদের প্রতিরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু তিন দিন যুদ্ধ চলবার পর তাঁর গোলন্দাজ সৈন্যদের অধিনায়ক নিজ সহকর্মীদের সঙ্গে কলহ করে শত্রুপক্ষে চলে যাওয়ায় তাঁর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেলার জন্য সেই অফিসারটি অনুশোচনায় আত্মহত্যা করলেও মৃত্যুর পূর্বে নিজেদের কয়েকটি গোপন তথ্য ক্লাইভকে জানিয়ে দেওয়ায় তিনি অতি সহজে দুর্গটি অধিকার করেন।

ক্লাইভের এই ধৃষ্টতা উপেক্ষা করে সিরাজউদ্দৌলা নিজের কফিনের উপর আর একটি শলাকা প্রোথিত করেন!

রবার্ট ক্লাইভ

এই সেদিন যে ইংরাজ প্রাণ নিয়ে কলকাতা থেকে পালিয়েছিল তারা যে আবার ফিরে এসে শুধু ওই নগর পুনরুদ্ধার নয় ফরাসীদের খতম করবে এমন কথা কেউ ভাবতেও পারে নি। যে সৈনিকের বীরত্বের ফলে এই অসম্ভব সম্ভব হয় সেই রবার্ট ক্লাইভ ছিলেন ইংলণ্ডের স্রপসায়ার জেলার মার্কেট ড্রেটনের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তাঁর পিতা এক সময়ে বৃটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন। বাড়ীতে নানা অসুবিধার জন্য জননী পুত্রকে নিজের কাছে না রেখে বিদ্যাশিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দেন এক ভগ্নীর কাছে।

সেখানে গিয়ে রবার্ট এক স্কুলে ভর্তি হয়, কিন্তু তার কাছে বই ছিল বিষ। পড়াশুনায় মন বসত না, স্কুল পালিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত। মাসিমা একের পর এক চারটি স্কুল বদল করলেন, কিন্তু বালক কোথাও পরীক্ষায় পাশ করতে পারল না। সে স্কুলে যায় ক্লাসের দুরন্ত ছেলেদের নিয়ে দল পাকায় -পাড়ায় পাড়ায় বাঁদরামি করে বেড়ায়। পয়সা না হোলে দল রাখা যায় না দেখে শেষ পর্য্যন্ত দোকানদারদের উপর একটি ট্যাক্স বসিয়ে বাঁধা আয়ের ব্যবস্থা করে নেয়! বেশী নয়—মাসে এক পেনী। যে এই ট্যাক্সটি না দিত কোনও না কোনও ফাঁক দিয়ে তার পণ্যদ্রব্য উধাও হয়ে যেত।

রবার্টের এই সব বাঁদরামির রিপোর্টে রুষ্ট হয়ে পিতা তাকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে এনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে রাইটারের—কেরানীর—চাকুরি জোগাড় করে দেন। বেতন খুবই কম, কিন্তু পড়াশোনার এক ঘেয়েমি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে ভেবে ক্লাইভের আনন্দ আর ধরে না! বন্ধুরা প্রতিনিবৃত্ত করবার চেষ্টা করল, কিন্তু শীঘ্রই ফিরে আসবার আশ্বাস দিয়ে তিনি একদিন মাদ্রাজে এসে উপস্থিত হোলেন।

ভারতমাতার প্রত্যাদেশ

যে ছেলের দৌরাত্ম্যে স্রপসায়ার তোলপাড় হয়েছিল এখন সে পরিণত বয়স্ক হোলেও কোম্পানীর দফতরে বসে কলম চালাতে মন সরবে কেন? কেরানী জীবনের একঘেয়েমি ক্লাইভের মনের উপর এমনই বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত লোপ পেল। কাজ নেই এ জীবনে—যে জীবনে সুখ নেই, আনন্দ নেই সে জীবনের প্রয়োজন কোথায়? বন্দুকে টোটা ভরে ক্লাইভ নিজের মস্তক লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লেন; কিন্তু এক অজনা শক্তি অন্তরীক্ষে বসে তাঁর বন্দুকের ঘোড়া চেপে ধরে বলল: এ ভাবে নিজেকে নিঃশেষ কোরো না রবার্ট—তোমার মূল্যবান জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিও না। তুমি জান না কি মহান দায়িত্ব নিয়ে ভারতের কূলে এসেছ! সে দায়িত্ব তোমাকে পালন করতেই হবে।

স্বরকে উপেক্ষা করে ক্লাইভ আবার বন্দুকের ঘোড়া টিপলেন, কিন্তু আবার গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল। স্বর অস্ফুট স্বরে বলে চলল: জানো রবার্ট, এই দেশ

কত প্রাচীন, কত মহান ! মানব সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হয়েছিল এই ভারতে—রচিত হয়েছিল বেদ-বেদান্ত রামায়ন-মহাভারত। সে সময়ে স্বয়ং ভগবান এখানে এসে গীতার বাণী শুনিয়েছিলেন—মহর্ষি কপিল সকল আধুনিক বিজ্ঞানের মূল সূত্র সাংখ্য-বিজ্ঞানের বীজ বপন করেছিলেন। সারা বিশ্ব তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন—গ্রীস ও রোম গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। তারপর এখানে এলেন গৌতম বুদ্ধ, মহাবীরস্বামী, শঙ্করাচার্য্য—এলেন কত মহামানব। কিন্তু আজ এদেশের কি দশা ! সিংহের অরণ্যে শিবাকুলের লম্ফঝম্ফ চলছে। এই দেশকে বাঁচাবার ভার আমি তোমার উপর অর্পণ করেছি। এই ব্রত উদ্‌যাপনের পূর্বে তুমি মরবে কি !

ক্লাইভ কান পেতে শুনতে লাগলেন। স্বর বলে চলল : বাংলা থেকে তুমি তোমার মুক্তিযজ্ঞ শুরু করবে রবার্ট। এক উচ্ছৃঙ্খল লম্পট মদ্যপায়ী যুবক সেখানকার রাজদণ্ড পরিচালনা করছে। কোটি কোটি নরনারীর জীবন নির্ভর করছে তার উপর ; কিন্তু তার ভয়ে সবাই ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। তাকে অপসারিত করবার মত শক্তি অনেকের আছে, কিন্তু সাহস নেই। সে দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।

—কিন্তু আমার কি আছে ? আমি তো কোম্পানীর একজন তুচ্ছ কেরাণী ছাড়া আর কিছু নই, বললেন ক্লাইভ।

—সাধ্য তোমারই আছে। তুমি পারবে এই দেশকে রাহুমুক্ত করতে। তোমার হাত থেকে মসী কেড়ে নিয়ে আমি দেব অসি। সেই অসিতে তুমি সিরাজউদ্দৌলাকে নিধন করবে, তারপর দেখাবে সারা ভারতে নূতন যুগের আলো। তোমার হাত দিয়ে এদেশে আসবে রেনেসাঁ—আসবে নূতন জীবন !

স্বর মিলিয়ে গেল। দু-দুবার আত্মহত্যার প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ায় ক্লাইভ বুঝলেন যে তিনি কোন মরু-মরীচিকা দেখেন নি। নিজের অজ্ঞাতসারে কোনও এক মহান দায়িত্ব পালনের জন্য এসেছেন বলে সেই অদৃশ্য শক্তি তাঁকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাঁচিয়ে রাখল। সেই থেকে শুরু হোল তাঁর জীবনের নূতন অধ্যায়—শুরু হোল নূতন চিন্তাধারা। গভর্ণরের গ্রন্থাগার থেকে রাশি রাশি পুস্তক এনে পাঠ করেন আর ভাবেন কেমন করে নিজেকে বিকশিত করবেন—কেমন করে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নিজের স্থান করে নেবেন।

অচিরাৎ সেরূপ সুযোগ মিলে গেল। ডুপ্লের অধীনে ফরাসীরা এদেশের রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করছে দেখে ইংরাজরাও তৈরী হবার প্রয়োজন বোধ করতে লাগল। ফরাসীদের সামরিক বল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাদের যে একটি ছোট রক্ষীবাহিনী ছিল তার সম্প্রসারণের জন্য রিক্রুটমেণ্ট শুরু হয়ে গেল। কিছুটা বাড়তি মাইনের লোভে কয়েকজন ছোকরা ইংরাজ কলম ছেড়ে বন্দুক হাতে নিল। ক্লাইভও নিলেন। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে ত্রিচিনপল্লীর যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখিয়ে তিনি কোম্পানীর প্রশংসা অর্জন করলেন। সেই যুদ্ধের সমাপ্তির পর ইংল্যাণ্ডে ফিরে গিয়ে তিনি দেখেন যে তাঁর বীরত্বের খ্যাতি সেখানে পৌঁছে গেছে। দেশের রাজনীতিতে নিজের জন্য স্থান করে নেবার উদ্দেশ্যে তিনি সকল রকমে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে সুবিধা না হওয়ায় ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আবার ভারতে চলে এলেন। এবার তিনি আর কোম্পানীর কেরানী নন—মাদ্রাজের লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর। যেদিন তিনি এসে ওই বন্দরে অবতরণ করেন ঠিক তার আগের দিন কলকাতার পতন হয়।

কলকাতা পুনরুদ্ধারের মত সাহস বা সম্বল মাদ্রাজের ইংরাজদের না থাকলেও হলওয়েলের উদ্দীপনাময়ী লেখায় অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ পড়ে তাদের রক্ত গরম হয়ে ওঠে—প্রতিশোধ নেবার জন্য কাউন্সিল ক্লাইভকে নির্দেশ দেয়। তাঁর সেই দৈববাণীর কথা মনে পড়ল, যে তাঁকে আত্মহত্যা থেকে বিরত করেছিল। তার প্রেরণায় মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে তিনি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতির সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য জাহাজে উঠলেন।

জগৎশেঠের ক্রোধ

বাংলায় এসে ক্লাইভ কিভাবে কলকাতা পুনরুদ্ধার ও ফরাসীদের উৎখাত করেন সেকথা পূর্বে বলেছি। এই দুটি কাজ তাঁর আশু লক্ষ্য হোলেও শেষ লক্ষ্য ছিল না। সিরাজউদ্দৌলাকে অপসারণ করবার জন্য তিনি মিত্রের সন্ধান করছেন এমন সময়ে নবাবের ব্যাঙ্কার জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদের কাছ থেকে একখানি গোপনলিপি তাঁর হাতে এসে পৌঁছাল। লিপিখানির মর্মার্থ এই যে কলকাতার দ্বিতীয় যুদ্ধে ক্লাইভ নবাবকে পর্যুদস্ত করায় সবাই সুখী হয়েছে; তিনি যদি সাহস করে আরও এগিয়ে আসেন তাহোলে বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁকে

সাহায্য করবেন। সবাই সিরাজউদ্দৌলার বিরোধী—প্রকৃত হিতৈষী তাঁর বেশী নেই।

যোধপুর রাজ্যের ক্ষুদ্র শহর নাগরের অধিবাসী এই মাড়োয়ারী জৈন পরিবারটির প্রতিষ্ঠাতা মানিকচাঁদ নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময়ে মুর্শিদাবাদে এসে ব্যাঙ্কিং ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর অর্থনৈতিক জ্ঞানের উপর মুর্শিদ কুলীর এতই আস্থা ছিল যে তাঁকে সরকারের ব্যাঙ্কার নিযুক্ত করে শেষ পর্যন্ত ট্যাঁক-শাল পরিচালনার দায়িত্ব দেন। তাঁর দেওয়া হুণ্ডি দিয়ে দিল্লী ও মুর্শিদাবাদের মধ্যে লেনদেন চলতে থাকে। বাদশাহ ফারুকশায়ার ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁকে শেঠ উপাধি দেন।

নিঃসন্তান মানিকচাঁদের মৃত্যু হোলে তাঁর দত্তকপুত্র সমান যোগ্যতার সঙ্গে ব্যবসা পরিচালনা করেন। দিল্লীর দরবারে তাঁর মর্যাদা এতই উচ্চ ছিল যে সেখানে সবাই বাংলার নবাবকে বলত সাহেব-এ-তহশীল বা রাজস্ব আদায়ের অধ্যক্ষ এবং তাঁকে বলত সাহেব-এ-তহবীল বা ধনরক্ষক। ১৭২২ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ মহম্মদ শাহ তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেন।

মসনদে আরোহণের পর সিরাজউদ্দৌলা যখন শুনলেন যে বাদশাহী সনদ লাভের জন্য পূর্ণিয়া নবাব সৌকত জং দিল্লীশ্বরের উজীরকে দেড় কোটি টাকা দিতে স্বীকৃত হয়েছেন তখন তিনি স্বয়ং দিল্লীশ্বরকে তিন কোটি টাকা প্রদানের প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু এত টাকা কোথায়?—জানালেন খাজাঞ্চী। নাই বা থাকল টাকা, জগৎশেঠ তো আছেন—বললেন নবাব। দায়ে-অদায়ে তিনি আলীবর্দীকে কোটি কোটি টাকা ঋণ দিতেন, এখনও দেবেন। প্রত্যাশিত ঋণের জন্য জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদকে দরবারে ডেকে সেকথা উত্থাপন করলে তিনি জানালেন যে তাঁর সব টাকা এখন লগ্নীতে আবদ্ধ রয়েছে বলে কিছু দেওয়া সম্ভব হবে না। কি! জগৎশেঠের টাকার অভাব? রাগে আত্মহারা হয়ে সিরাজউদ্দৌলা আমীর ওমরাহদের সামনে তাঁর গালে এক চপেটাঘাত করে দেওয়ানকে আদেশ দিলেন: বেয়াদবকে কয়েদ করো। দেখি টাকা বেরোয় কিনা!

দেওয়ান রায় দুর্লভ প্রভুর আজ্ঞা পালন করলেও মনে মনে স্তম্ভিত হোলেন। সবাই স্তম্ভিত হোলেন। মীরজাফর প্রকাশ্যে বললেন, নূতন নবাব যত দিন না দিল্লীশ্বরের কাছ থেকে সনদ আনবেন তত দিন তিনি তাঁর হয়ে যুদ্ধ করবেন না।

এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তির বিক্ষোভ লক্ষ্য করে সিরাজউদ্দৌলা কয়েক দিন পরে জগৎশেঠকে মুক্তি দিয়ে তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ করলেও তিনি পূর্ব অপমানের কথা ভুলতে পারেন নি—যবনিকার অন্তরালে বসে সিরাজউদ্দৌলার অপসারণের জন্য চক্রান্ত শুরু করেন। দেওয়ান দুর্লভরামকে বিনা কারণে পদে অবনমিত করায় তিনিও সিরাজের শত্রু হয়ে ওঠেন। এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিসন্ধির কথা নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কানে পৌছায়—অন্যান্য জমিদারদেরও কানে যায়। প্রত্যেকে জগৎশেঠকে জানিয়ে দেন যে সিরাজউদ্দৌলার অপসারণ সকলের কাম্য—সবাই তাঁর নিধন দেখবার জন্য উন্মুখ। মসনদে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যে তরুণ নবাব সকলকে এমনই উত্যক্ত করে তুলেছিলেন।

যবনিকার অন্তরালে

জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদ যখন অতি সঙ্গোপনে সিরাজ বিরোধীদের সঙ্ঘবদ্ধ করছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেন স্বয়ং দেওয়ান দুর্লভরাম ও ব্যবসায়ী উমিচাঁদ। উভয়েরই নবাবের বিরুদ্ধে তিক্ততার সঙ্গত কারণ ছিল। সকল বিরোধী তাঁদের আশা কেন্দ্রীভূত করেছিলেন পূর্ণিয়া নবাব সৌকত জংএর উপর। কিন্তু তিনি কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর ধরাশায়ী হওয়ায় তাঁরা নূতন মিত্রের অন্বেষণ করতে লাগলেন। কলকাতা যুদ্ধের পূর্বে কেউই ইংরাজকে তুচ্ছ বণিক ছাড়া কিছু মনে করতেন না। কিন্তু সেই ইংরাজ যখন ফিরে এসে শুধু ওই নগরী পুনরুদ্ধার করল না ফরাসীদের কাছ থেকে চন্দননগর ছিনিয়ে নিল তখন তাঁরা বুঝলেন যে সিরাজ নিধনের জন্য তারাই আসল বল।

কাশিমবাজার কুঠির অধ্যক্ষ উইলিয়াম ওয়াটসের দূতিয়ালির ফলে এই সিরাজ বিরোধীদের সঙ্গে কোম্পানীর যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং উভয় পক্ষ স্থির করে সিরাজউদ্দৌলাকে হটিয়ে কোনও যোগ্য ব্যক্তিকে মসনদে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। কিন্তু কে সে? ষড়যন্ত্রকারীরা হিন্দু হোলেও পাঁচ শতাব্দী দাসত্বের ফলে তাঁরা কেউ ভাবতে পারলেন না যে কোন হিন্দু বাংলার রাজদণ্ড চালাবার অধিকারী। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মত ব্যক্তির কথা পর্য্যন্ত কারও মনে উঠল না। এক গোপন বৈঠকে জগৎশেঠ প্রস্তাব করলেন, লুফ্‌ত ইয়ার খাঁর নাম। ভদ্রলোক নবাবের পদস্থ কর্মচারী হোলেও জগৎশেঠের হাতের লোক—আজ্ঞাবহ বললেও

চলে। একথা শুনে ক্লাইভ প্রস্তাবটি নাকচ করে অন্য কোনও দাবীদারের খোঁজ করছেন এমন সময়ে কে যেন বলল যে মীরজাফরের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেউ হোতে পারে না। সিরাজউদ্দৌলার নিকট আত্মীয়, অথচ সেজন্য কোন মমত্ববোধ নেই। একটা বড় ব্রিগেডের অধিনায়ক, অথচ সারা দিন আফিং খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকেন। গোখরো সাপ, কিন্তু একেবারে বিষহীন! মসনদ অধিকার করবার জন্য তিনি বারবার চক্রান্ত করেছেন; এখন যদি সুযোগ পান তার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়বেন না। যার পূর্ব রেকর্ড এমন চমৎকার তার দাবী সর্বাগ্রগণ্য বুঝে ক্লাইভ মীরজাফরকে সমর্থন করলেন। জগৎশেঠ করলেন—রায় দুর্লভ করলেন—উমিচাঁদও করলেন। সর্বসম্মতিক্রমে মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার ভবিষ্যৎ নবাব মনোনীত হোলেন।

শুভ সংবাদটি মীরজাফরের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিয়ে ওয়াটস মুর্শিদাবাদে গিয়ে অতি সঙ্গোপনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি সব শুনলেন, এত দিনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোতে চলেছে ভেবে পরম পুলক অনুভব করতে লাগলেন। এই নিয়ে ৪ঠা জুন তাঁর এবং ইংরাজপক্ষে ক্লাইভ, ওয়াটসন, ড্রেক ও ওয়াটসের স্বাক্ষর সমন্বিত যে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হোল তার মর্মার্থ এই যে সিরাজউদ্দৌলাকে অপসারণ করা সম্বন্ধে তাঁরা সবাই একমত; উভয় পক্ষের সহযোগীতায় সে কাজ সম্পন্ন হোলে জাফর আলি খাঁকে মুর্শিদাবাদের মসনদে অভিষিক্ত করা হবে এবং প্রতিদানে তিনি দুই যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজকোষের অর্থ কোম্পানী ও তার অনুগত ব্যক্তিদের মধ্যে এইভাবে বণ্টন করবেন—

(১)	ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী—	১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা
(২)	কোম্পানীর ইংরাজ অফিসারগণ—	৫০ লক্ষ টাকা
(৩)	„ নৌ সৈনিকগণ—	২৫ লক্ষ „
(৪)	„ স্থল সৈনিকগণ—	২৫ লক্ষ „
(৫)	কলকাতার দেশীয় বণিকগণ—	২০ লক্ষ „
(৬)	„ আর্মানী বণিকগণ—	৭ লক্ষ „

টাকার এই উদার তালিকা দেখে সেই জুণ্টার একমাত্র বাঙালী সদস্য দেওয়ান দুর্লভরাম যথেষ্ট আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু সে আপত্তি টেকে নি। বরং

মীরজাফর কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের সভ্যগণকে ১২ লক্ষ টাকা ও গোরা সৈন্যগণকে ৪০ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত প্রদান করবার জন্য এক স্বতন্ত্র অঙ্গীকারপত্র লিখে দেন। অতি সূক্ষ্মভাবে কালনেমির লঙ্কা ভাগ সম্পন্ন হয়। উমিচাঁদ পাকা ব্যবসায়ী- এত বড় লেনদেনে তাঁর কিছু মুনাফা হবে না? তিনি দাবী করলেন, রাজকোষের হীরা-জহরতের এক-চতুর্থাংশ এবং সমগ্র দেয় অর্থের শতকরা পাঁচ ভাগ। চুক্তিপত্রে তাঁর এই দাবী সন্নিবেশিত না হোলে ইনি সমস্ত ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেবেন বলে ভয় দেখালেন। ক্লাইভ মনে মনে বললেন—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। দুইখানা চুক্তিপত্র রচিত হোল—একখানা লাল ও একখানা সাদা!

উমিচাঁদের মুখ দিয়ে হোক বা অন্য সূত্র থেকে হোক চক্রান্তের কথা শেষ পর্য্যন্ত সিরাজউদ্দৌলার কাছে গোপন থাকে নি। তিনি মীরজাফরকে ডেকে পাঠালেন, কিন্তু সেই সেনানায়ক না আসায় নিজে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে এই কাজে বিরত থাকবার জন্য অনুরোধ জানালেন। মীরজাফর কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করলেন যে ইংরাজকে কোনরূপ সাহায্য দেবেন না।

একথায় বিশ্বাস স্থাপন করে নবাব সিরাজউদ্দৌলা নিজের কফিনের উপর আর একটি শলাকা প্রোথিত করলেন!

পলাশীর যুদ্ধ

বিশ্বাসঘাতকতা যার রক্তের মধ্যে মিশে রয়েছে তার সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির উপর নির্ভর করে রবার্ট ক্লাইভ এক বিশাল ভূখণ্ডের অধীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে অগ্রসর হোলেন। সঙ্গে মাত্র নয়টি কামান ও তিন হাজার মিশ্র সৈনিক—সকলেই পদাতিক। অশ্বারোহী একজনও নেই। এই নগণ্য ফৌজ নিয়ে নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাওয়া বাতুলতা; কিন্তু যে অদৃশ্য শক্তি এক দিন তাঁকে আত্মহত্যায় প্রতিনিবৃত্ত করেছিল সেই শক্তি মুর্শিদাবাদের দিকে টেনে নিয়ে চলল। তিনি যন্ত্রচালিতের মত এগোতে লাগলেন। পথে পড়ল নবাবের কাটোয়া দুর্গ; মেজর আয়ার কুটের ব্যাটেলিয়ান প্রায় বিনা বাধায় সেটি অধিকার করল। মূল বাহিনীসহ ক্লাইভ সেখানে গিয়ে দু'দিন অপেক্ষা করলেন, কিন্তু মীরজাফরের কাছ থেকে কোনও বার্তা এসে পৌছাল না। পূর্ব নির্দ্ধারিত সূচী অনুযায়ী

তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, অথচ যার ভরসায় এগোচ্ছেন তার দিক থেকে কোনও সাড়া নেই!—কেন? এই কয় দিনের মধ্যে কি তিনি মত বদলেছেন? ক্লাইভ রীতিমত ঘাবড়ে গেলেন, কিন্তু মেজর আয়ার কুটের জেদের জন্য ২২শে জুন সমগ্র বাহিনীসহ গঙ্গা পার হোলেন।

পথে বৃষ্টি নামল। তারই মধ্যে মার্চ করতে করতে ইংরাজ ফৌজ রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময়ে নদীয়া জেলার এক নগন্য গ্রাম পলাশীতে পৌছে শুনল যে অদূরে নবাব এসে তাঁবু ফেলেছেন। ক্লাইভও গ্রামের অপর প্রান্তে এক বৃহৎ আম বাগিচার মধ্যে তাঁবু ফেললেন। গাছের সংখ্যা যাই হোক নাম লক্ষবাগ—দৈর্ঘ্যে ৮০০ গজ ও প্রস্থে ৩০০ গজ। চারপাশে মাটির দেওয়ালে ঘেরা সেই বাগানের এধার থেকে ওধার পর্য্যন্ত অসংখ্য পুরাতন আম গাছ থাকায় সৈন্যদের পক্ষে ক্যামুফ্লেজের যথেষ্ট সুবিধা ছিল।

ক্লাইভের ফৌজে যেক্ষেত্রে ১১০০ গোরা ও ২০০০ ভারতীয় সিপাহী নবাবের ফৌজে সেক্ষেত্রে ছিল মোগল, হিন্দুস্থানী, ইরানী ও বাঙালী সৈনিক নিয়ে গঠিত ৫৫ হাজার যোদ্ধা। ক্লাইভের সিপাহীরা সবাই পদাতিক, কিন্তু নবাবের অশ্বারোহীর সংখ্যা ১৬ হাজারের অধিক। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে রচিত তাঁর দুই মাইল দীর্ঘ ব্যূহের বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন পাঁচজন জেনারেল—মীর-জাফর, ইয়ার লুফৎ খাঁ, রায় দুর্লভ, মীর মদন ও মোহনলাল। ক্যাপ্টেন সিনফ্রের অধীনে একটী ছোট ফরাসী ব্যাটেলিয়নও ছিল। এই অসম যুদ্ধে জয়লাভের আশা ক্লাইভ করেন নি, কিন্তু যেমন যন্ত্র চালিতের মত সেখানে এসেছিলেন তেমনি যন্ত্র চালিতের মত ব্যূহ বিন্যাস করতে লাগলেন।

পর দিন ২৩শে জুন বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় সিনফ্রের ফরাসী সৈনিকরা কামান দেগে যুদ্ধ শুরু করল। সঙ্গে সঙ্গে নবাবের গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ মীর মদন তোপ দাগবার হুকুম দিলেন। ইংরাজের কামানও গর্জন করে উঠল। উভয় পক্ষের কামান গর্জনে পলাশীর আম্র কানন মুহুর্মুহুঃ কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে ইংরাজের গোলায় নবাবের বহু সৈন্য হতাহত হচ্ছে, অথচ মীর মদনের কামানের গোলায় অসংখ্য আম ডাল ভেঙে পড়লেও ইংরাজ সৈন্যদের বিশেষ ক্ষতি হচ্ছে না। ফরাসীদের কথা স্বতন্ত্র; আধুনিক রণবিদ্যায় শিক্ষিত তাদের মুষ্টিমেয় সৈন্যের আক্রমণে ইংরাজরা অস্থির হয়ে পড়ল।

উভয় পক্ষে তিন ঘণ্টা ধরে একঘেয়ে কামান যুদ্ধ চলবার পর এক পসলা বৃষ্টি নামলে মীর মদন দেখলেন যে তাঁর সমস্ত বারুদ' জলে ভিজে গিয়ে কামান-গুলো অকেজো হয়ে পড়েছে। প্রতিপক্ষেরও একই দশা হয়েছে ভেবে তিনি সৈন্যদের তরবারি হস্তে অগ্রসর হবার জন্য আদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁর ধারণা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ইংরাজের গোলা এসে তাদের অগ্রসর হওয়া অসম্ভব করে তুলল। তিনি নিজে ধরাশায়ী হোলেন।

মীর মদনের পতন সত্ত্বেও মোহনলাল ও মানিকচাঁদ যথেষ্ট শৃঙ্খলার সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। প্রাধনতঃ রাজপুত ও মোগল পদাতিক দিয়ে গঠিত তাঁদের দুই ব্যাটেলিয়নের সৈন্যসংখ্যা ১২ হাজার—ক্লাইভের মোট সৈন্যের ৪ গুণ। সংখ্যার এই উৎকর্ষতা সত্ত্বেও তারা মান্ধাতা আমলের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে শত্রুর আধুনিক সমরাস্ত্রের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে কেন? ক্লাইভের প্রচণ্ড চাপে উভয় ব্যাটেলিয়ান দু ঘণ্টা যুদ্ধের পর পিছু হটতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত তাদের অধিনাকদ্বয় আহত হোলে সিরাজউদ্দৌলার চক্ষের সামনে অন্ধকার নেমে এল!

নবাবের বুদ্ধিভ্রম

এই ব্যাটেলিয়ন দুইটি ও ফরাসীরা যখন পূর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাচ্ছিল তখন তাদের বাম পার্শ্বে মীরজাফর; ইয়ার লুফৎ খাঁ ও রায় দুর্লভের ফৌজ তিনটি নিজ নিজ ব্যূহের উপর দাঁড়িয়ে নির্বিকার চিত্তে তাই দেখছিল। অধিনায়কদের কাছ থেকে কোনরূপ আদেশ না পাওয়ায় তাদের করবার কিছু ছিল না। মীরজাফরের সৈন্য সংখ্যা সবচেয়ে বেশী এবং জেনারেলদের মধ্যে তাঁর মর্য্যাদা সবার উপরে বলে নবাব তাঁকে নিজ তাঁবুতে আহ্বান করে বললেন: আপনি শুধু অফিসার নন, আমার নিকট আত্মীয়। আমার ইজ্জত আপনার হাতে। রাখলে আপনি রাখতে পারেন, মারলে মারতে পারেন। আমাকে বাঁচান! ভয়ার্ত নবাব নিজের মাথা থেকে উষ্ণীষ খুলে সেই ভৃত্যের সম্মুখে স্থাপন করলেন।

অথচ সেই রণক্ষেত্রে প্রধান সেনাপতি ছিলেন তিনি--মীরজাফর নন। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি সঙ্গে সঙ্গে পদচ্যুত করে নিজে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ—পদপ্রান্তে উষ্ণীষ রেখে করুণা ভিক্ষা নয়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা যদি তাই করতেন তাহোলে মীরজাফর, রায় দুর্লভ এবং ইয়ার লুফৎএর সৈন্যরা তাঁর নির্দেশে

প্রাণপাত করে যুদ্ধ চালাত। তাদের আঘাতে ক্লাইভের ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। এই স্বতঃসিদ্ধ পন্থা তিনি গ্রহণ না করলেও তাঁর যে সে অধিকার রয়েছে এইকথা পরোক্ষে স্বীকার করে মীরজাফর সুপারিশ করলেন, সে দিনের মত যুদ্ধ বন্ধ রাখবার জন্য -কোরাণ স্পর্শ করে শপথ করলেন যে পরের দিন সর্ব শক্তি দিয়ে যুদ্ধ করবেন।

নিয়তি সিরাজউদ্দৌলাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। তাই তিনি বিশ্বাসঘাতকের কথায় ভুললেন। তিনি যুদ্ধ বন্ধ করলেও যে ক্লাইভ করবেন না এই সোজা কথাটা তাঁর মনে উঠল না। অথচ মোহনলাল আহত হোলেও তাঁর সহকারীদের নির্দেশে তাঁর ফৌজ তখন নূতন উদ্যমে যুদ্ধ শুরু করেছিল। মানিকচাঁদের ফৌজও যুদ্ধ চালাচ্ছিল। তাদের জন্য কোথা থেকে টাটকা বারুদও এসেছিল। সংখ্যায় নগণ্য হোলেও ফরাসীরা তখনও সমানে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। এই সব প্রতিরোধের জন্য ক্লাইভ বিশেষ সুবিধা করতে পারছিলেন না। মীরজাফরের কথায় কান না দিয়ে নবাব যদি তাঁর তাঁবু থেকে বেরিয়ে সৈন্যদের সম্মুখে হাজির হোতেন তাহোলে যুদ্ধের মধ্যে নূতন প্রাণ সঞ্চার হোত। কিন্তু তিনি তেমন কিছু করলেন না।

ঠিক সেই সময়ে রায় দুর্লভ তাঁর তাঁবুতে এসে মীরজাফরকে সমর্থন করে বললেন: আজ যুদ্ধের মহড়া হয়ে গেল আসল যুদ্ধ কাল হবে। মহামান্য নবাবের সে সব গোলমালের মধ্যে না থেকে রাজধানীতে ফিরে যাওয়া ভাল। ফিরিঙ্গীদের সাগর পার করে আমরা সেখানে গিয়ে তাঁকে কুর্নিশ করব। এক বিশ্বাসঘাতকের পরামর্শে সিরাজউদ্দৌলা যুদ্ধ বন্ধের আদেশ দিয়েছিলেন, আর এক বিশ্বাসঘাতকের পরামর্শে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় একটি দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করলেন। তাঁর অর্দ্ধ লক্ষ সৈন্য অভিভাবকশূন্য হয়ে সেখানে পড়ে রইল!

যাঁর জন্য যুদ্ধ তিনি যদি পালিয়ে যান সে যুদ্ধ কতক্ষণ চলতে পারে? সিরাজউদ্দৌলার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ব্যূহের সর্বত্র চরম বিশৃঙ্খলা নেমে এল। যে সব সৈন্য তখনও যুদ্ধ চালাচ্ছিল তারাও হতোদ্যম হয়ে পড়ল। মীরজাফর এবার কর্মতৎপর হয়ে উঠলেন। নবাবের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে ক্লাইভকে এক গোপন পত্র পাঠিয়ে জানালেন: নবাব পালাচ্ছেন—এখনই এসে তাঁর তাঁবু অধিকার করুন।

এতখানি আশা ক্লাইভ নিজেও করেন নি। কিন্তু তাঁর মনে উঠল সেই অজ্ঞাত স্বর, যে এক দিন তাঁকে বলেছিল: এক মহান দায়িত্ব নিয়ে তুমি ভারতের কূলে এসেছ রবার্ট। সে দায়িত্ব তোমাকে পালন করতে হবে—এই সেই দায়িত্ব! ক্লাইভ এগোও, তোমার ব্রত উদ্‌যাপন করো! ভয় পেও না—দ্বিধা কোর না! আমি তোমার পিছনে আছি! আমি তোমার সহায়! আমি ভারতভাগ্যবিধাতা!

চিঠি পড়ে ক্লাইভ সসৈন্যে নবাবের তাঁবুতে গিয়ে উপস্থিত হোলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটল। তখন অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।

মৃত্যুদূতের হাতছানি

অর্দ্ধ লক্ষ যুযুধমান সৈন্যকে পলাশীর প্রান্তরে ফেলে রেখে সিরাজউদ্দৌলা যখন মুর্শিদাবাদে ফিরে এলেন রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। তখনও তাঁর সব আছে। বক্সার থেকে চট্টগ্রাম, ধুবড়ি থেকে ঝাড়খণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত ভূভাগের একচ্ছত্র অধীশ্বর তিনি। রাজ্য নয়—সাম্রাজ্য। এই বিশাল জনপদের সকল অধিবাসীর কাছে তাঁর কথা শেষ কথা—তাঁর আদেশ শেষ আদেশ। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। যেখানে যত দুর্গাধ্যক্ষ আছেন তাঁর কাছ থেকে আহ্বান পেলে সবাই এসে পাশে দাঁড়াবে। বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর চুপ করে থাকবেন না। সন্ধির সর্ত অনুযায়ী মারাঠারা সাহায্য পাঠাবে। কিন্তু সে সব কথা বিবেচনা করবার মত মনোবল সিরাজউদ্দৌলার ছিল না। আশৈশব উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার ফলে তুচ্ছ আঘাত তাঁর তরণীতে ফাটল ধরাল। তিনি ডুবতে লাগলেন!

প্রাসাদে ফিরে এসে যুদ্ধ চালাবার কথা চিন্তাও করলেন না নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা। জগৎশেঠকে ডেকে অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন যে কোনও পরিমাণ অর্থ উৎকোচ দিয়ে ক্লাইভকে প্রতিনিবৃত্ত করেন। কিন্তু এই অনুরোধের প্রতিক্রিয়া দেখবার মত ধৈর্য্য তাঁর ছিল না। প্রাসাদে তাঁর যে ৫০০ উপপত্নী বাস করছিল তাদের বিদায় দিয়ে পর দিন গভীর রাত্রে সবার অগোচরে এক রথে চড়ে তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন। কন্যাসহ সহধর্মিণী লুৎফুন্নেসা তাঁর সঙ্গ নিলেন। রথের সারথির পাশে একজন খোজা আসন গ্রহণ করল।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা চলেছেন নিজ রাজ্যের ভিতর দিয়ে। যেদিকেই তিনি দৃষ্টি ফেরান সবই তাঁর, কিন্তু সাহস নেই যে ভাল করে তাকিয়ে দেখেন।

সদাই ভয়, কে কোথা থেকে এসে চিনে ফেলবে! তাই থেকে থেকে বুক কেঁপে ওঠে। বিশ্বসংসারে তাঁর কোন বন্ধু নেই -হিতৈষী নেই। পরন্তু পলাশীতে দেখেছিলেন সিনফ্রের সওয়া দুই কুড়ি ফরাসী সৈন্য ইংরাজদের ভাবিয়ে তুলেছে। এই অভিজ্ঞতা থেকে মনে হোল যে যদি কেউ বাঁচাতে পারে তো সে এই ফরাসী। তাই তিনি চলেছেন ফরাসীদের পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ জিন লর কাছে।

পথে এক পসলা বৃষ্টি নামল—রথের চাকা কাদায় আটকে গেল। সারথী যত চেষ্টা করে চাকা তত বেশী করে মাটির মধ্যে বসে যায়। তাই দেখে গ্রামবাসীরা এগিয়ে এল তাঁকে সাহায্য করতে, কিন্তু আরোহীর ভয় হোল তারা চিনে ফেলবে। তাহোলে সর্বনাশ! কাছে ছিল একখানা ছ্যাকড়া গাড়ী; তাতে উঠে তিনি সেখান থেকে চম্পট দিলেন। বেগম লুৎফুন্নেসা সেই রথে পড়ে রইলেন। চির দিনের মত স্বামীর সঙ্গে হতভাগিনীর বিচ্ছেদ ঘটল!

যদিও নবাব রাজবেশ ত্যাগ করে জীর্ণবাস পরেছিলেন তবু তাঁর মনে হোতে লাগল, পথচারীরা হয় তো তাঁকে চিনতে পারছে। ছোট একখানি নৌকা পেলে সে ভয় থাকবে না—সবার অলক্ষ্যে নদীর উপর দিয়ে পাটনায় পৌছান যাবে। ভগবানগোলায় এসে দেখেন যে গাড়ী পদ্মাতীরে এক নদীর ঘাটে থেমেছে। সেখানে গাড়োয়ানকে বিদায় দিয়ে তিনি একখানা নৌকা ভাড়া করলেন। অনুকূল হাওয়ায় নৌকা তীরবেগে চলতে লাগল—মাঝি গলা ছেড়ে গান ধরল।

সেই যে মুর্শিদাবাদ ত্যাগের পূর্বে নবাব আহার্য্য গ্রহণ করেছিলেন তার পর থেকে ছয়টি দিন কেটেছে অর্দ্ধাশনে। কোন বেলা জুটেছে, কোন বেলা জোটে নি। নৌকা যখন রাজমহলের কাছাকাছি এসে পৌছাল তখন তিনি ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে মাঝিকে আদেশ দিলেন ঘাটে নৌকা ভেড়াতে, কিন্তু বাজারে বা লোকালয়ে নয়—শহরের বাইরে। সেখানে এক ফকিরের আস্তানায় পৌছে কয়েকখানি রুটি ও এক গেলাস জলের জন্য অনুরোধ জানালেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা।

তাঁর সুদিনে সাধু-ফকিররা পর্য্যন্ত তাঁর অত্যাচার থেকে রেহাই পায় নি। পরণে জীর্ণবাস সত্ত্বেও ফকির দানা শাহর চিনতে অসুবিধা হোল না যে এই সেই নবাব সিরাজউদ্দৌলা যার আদেশে এক দিন তাঁর নাককান কাটা

হয়েছিল। বার বার নিরীক্ষণ করে বুঝলেন যে তাঁর কোনও ভুল হয় নি। নবাবের পলায়ন সংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল বটে কিন্তু তিনি যে এভাবে তাঁর আস্তানায় এসে হাজির হবেন দানা শাহ সে কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি।

বুঝলেন, আল্লাহ্‌র অপার করুণা। তাই দোর্দণ্ডপ্রতাপ নবাব সিরাজউদ্দৌলা আজ তাঁর কাছে এসে দু টুকরো রুটি ভিক্ষা চাইছে। কিন্তু সে ভিক্ষা তিনি দেবেন না! যার জন্য তাঁর অঙ্গহানি সে যখন হাতের মধ্যে এসেছে তখন প্রতিশোধ নেবার সুযোগ ছাড়বেন না। নবাবকে স্তোকবাক্যে সেখানে বসিয়ে রেখে দানা শাহ চলে গেলেন শহরে— ফৌজদারের কাছে।

মীরজাফরের অভিষেক

এদিকে পলাশী যুদ্ধের পর দিন মীরজাফর মুর্শিদাবাদে এসে দেখেন যে চার দিকে একটা থমথমে ভাব। কি যে হয়ে গেল এবং কি যে হবে তা ঠিকমত অনু-ধাবন করতে না পেরে তিনি বাড়ীর মধ্যে চুপ করে বসে রইলেন। পর দিন শয্যাত্যাগের পর শোনেন যে শহরে ভীষণ হৈ চৈ শুরু হয়েছে—গভীর রাত্রে বেগমকে নিয়ে সিরাজউদ্দৌলা কোথায় চলে গেছেন। এই নিয়ে জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। কেউ বলছে, তিনি যুদ্ধ চালাবার জন্য গিয়েছেন ঢাকায়, আবার কেউ বা বলছে তিনি মুর্শিদাবাদে আছেন—যথা সময়ে আত্মপ্রকাশ করবেন। সঠিকভাবে কেউ কিছু বলতে পারছে না। নবাব পালিয়েছেন, অথচ ক্লাইভ আসেন নি। সেক্ষেত্রে বাংলা এখন কার? এই অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য সকলেই চিন্তান্বিত।

মীরজাফরের মনেও দুর্ভাবনায় অন্ত নেই। পলাশী যুদ্ধে জিতেছেন ক্লাইভ— তিনি নন। সেই কারণে ক্লাইভ এসে যদি তাঁকে উপেক্ষা করে নিজে মসনদে বসেন কিভাবে তাঁকে আটকাবেন? সত্য বটে, দিন পনেরো পূর্বে ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর এক গোপন চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, কিন্তু চুক্তিনামায় স্বাক্ষরকারী এক পক্ষের হাতে যেক্ষেত্রে এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী রয়েছে সেক্ষেত্রে তাঁর কিছু নেই। কিভাবে তিনি সেই চুক্তিকে কার্য্যকরী করবেন? এক অপরিচিত ফিরিঙ্গীকে এত বেশী বিশ্বাস করা উচিত হয় নি। মীরজাফরের মন অনুশোচনায় ভরে উঠল। সিরাজউদ্দৌলাকে তাড়ালেন, অথচ নিজে মসনদ পেলেন না!

পাঁচ দিন পরে ২৯শে জুন ক্লাইভ যখন তাঁর বিজয় বাহিনী নিয়ে মুর্শিদাবাদে এসে পৌছালেন জনসাধারণ পথের দুই পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতে লাগল। সবাই জানত যে তিনি নবাব প্রাসাদে গিয়ে উঠবেন এবং দরবার কক্ষে সমাগত খানদানি লোকদের সামনে মাথায় রাজমুকুট পরবেন। একজন পাদ্রী অবশ্য হাজির হয়ে বাইবেল থেকে মন্তর আওড়াবে! কিন্তু তাদের বিস্ময়বিমূঢ় করে ক্লাইভ নবাব প্রাসাদে না গিয়ে সন্নিহিত মোরাদবাগে নিজের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করলেন। তাতেও লোকের জল্পনা কল্পনা বন্ধ হোল না, সবাই বলাবলি করতে লাগল যে পাছে সিরাজউদ্দৌল্লা সসৈন্যে ফিরে আসেন সেই ভয়ে ক্লাইভ এখন কিছু করছেন না। কলকাতা থেকে আরও কিছু গোরা সৈন্য এসে পৌছালে মসনদে বসবেন। মুসলমান রাজত্বের অবসান হয়ে ঈশাই রাজত্বের সুরু হবে।

এই অভাবনীয়কে বাস্তবের মধ্যে এনে ক্লাইভ অপরাহ্ন বেলায় চলে গেলেন হীরাঝিলে। পূর্বাহ্নে তাঁর নির্দেশ পেয়ে রাজধানীর বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সেখানে এসে সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের সম্মুখে তিনি মীরজাফরকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজদণ্ড হাতে নেবার জন্য অনুরোধ করলে জাফর আলী বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে পড়েন। একি সত্য! ক্লাইভ কি সত্যই চুক্তিনামা অনুযায়ী কাজ করছেন? কথাটা ভালভাবে যাচাই করে নেবার জন্য তিনি বললেন যে কর্ণেল সাহেব যদি স্বহস্তে তাঁকে মসনদে বসিয়ে দেন তবেই তিনি এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন। তথাস্তু! তাই হোল। সমাগত রাজা-মহারাজা আমীর-ওমরাহদের সম্মুখে মহম্মদ জাফর আলী খাঁকে মসনদে বসিয়ে ক্লাইভ তাঁকে নবাব বলে কুর্নিশ করলেন।

বিধাতা অন্তরীক্ষে বসে হাসলেন!

সিরাজউদ্দৌল্লার শেষ পরিণতি

রাজমহলের ফৌজদার মীর দাউদ ছিলেন মীরজাফরের নিকট আত্মীয়। সেই সুবাদে সিরাজউদ্দৌলারও আত্মীয়। যত দিন তিনি স্বপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তত দিন মীর দাউদের মত কত ফৌজদার তাঁর অনুকম্পা লাভের আশায় কত কৌনিস করেছেন। কিন্তু নখরদন্তহীন সিংহকে কে গ্রাহ্য করে? তাকে পিঞ্জরাবদ্ধ করা

চিরন্তন রীতি বিবেচনা করে মীর দাউদ কয়েকজন সান্ত্রীসহ দানা ফকিরের আস্তানায় গিয়ে সিরাজউদ্দৌলাকে বন্দী করে আনলেন। রাজধানীর তখন যে কি অবস্থা তা তিনি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারছিলেন না; তবু বন্দীর দায়িত্ব নিজের উপর না রেখে সামরিক প্রহরাধীনে সেখানে পাঠিয়ে দিলেন। এই সেদিন সিরাজউদ্দৌলা যে রাজধানী স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে এসেছিলেন এখন সেখানে চললেন বিচারের জন্য!

২রা জুলাই রাত্রে যখন তাঁকে অতি সঙ্গোপনে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা হোল মীরজাফরের নবাবীর তখন তৃতীয় দিবস। বন্দীকে নিয়ে তিনি যে কি করবেন তা স্থির করতে না পেরে জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের হাতে অর্পণ করে অন্দর মহলে চলে গেলেন বিশ্রামের জন্য। মীরণের তখন অফুরন্ত উৎসব—পিতা সবেমাত্র মসনদ পেয়েছেন। সিরাজের বহু উপপত্নী এখন তাঁর হাতে। তিনি তাদের নিয়ে জীবন ভোগ করবেন—কোন ঝামেলার মধ্যে যাবেন না। প্রহরীর প্রতি আদেশ দিলেন: বেয়াদপকে খতম করো!

ঘাতক মহম্মদী বেগ কাছেই ছিল—ছোরায় সান দিতে লাগল। শৈশবে তাকে অনাথ দেখে সিরাজের পিতা আশ্রয় দিয়েছিলেন, যৌবনে তাঁর মাতা বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই উপকারের প্রত্যুপকার করবার জন্য সে পরম উৎসাহে বন্দীকে নিয়ে চলে গেল বধ্যভূমিতে। কিন্তু এত দুঃখের মধ্যেও সিরাজের মরবার ইচ্ছা ছিল না। ঘাতকের পায়ে পড়ে বহু কাকুতি মিনতি করলেন। বললেন, নূতন নবাবকে যেন জানান হয় যে তাঁর জীবন ভিক্ষা দিলে তিনি কোন নিভৃত গ্রামে গিয়ে বাকি জীবন সাধারণ প্রজার মত কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না, প্রার্থনার সময়টুকু পর্য্যন্ত না দিয়ে মহম্মদী বেগ অতি নিষ্ঠুরভাবে তাঁকে হত্যা করল!

মহাসতী লুৎফুন্নেসা বেগম

পর দিন সকালে সিরাজউদ্দৌলার মৃতদেহ হাতীর পিঠে তুলে নগর প্রদক্ষিণ করান হয়, যেন কারও মনে ঘুণাক্ষরে এ কথা না ওঠে যে তিনি ইহলোকে আছেন। নগর পরিক্রমার পর দেহ কবরস্থ না করে চক বাজারের সামনে প্রশস্ত রাজপথের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হোল; তার উপরে এক টুকরা আবরণ

দেওয়ায় প্রয়োজনও কেউ অনুভব করল না। অথচ এক সপ্তাহ পূর্বে পর্যন্ত তিনি ছিলেন দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা! বাজারের সম্মুখে সেই দেহকে ঘিরে যখন তাণ্ডব নৃত্য চলছিল তখন এক সহৃদয় ওমরাহ সেখানে এসে সেটিকে অপসারণের ব্যবস্থা করেন; তারপর খোসবাগে আলীবর্দী খাঁর কবরের পাশে কবরস্থ করা হয়।

ওমরাহর সঙ্গে যাঁরা গোরস্থানে গিয়েছিল সন্ধ্যাগমের পর তারা দেখে যে এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী প্রদীপ হস্তে কবরের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি সিরাজ মহিষী লুৎফুন্নেসা বেগম। সেই যে এক সপ্তাহ পূর্বে ভগবানগোলার পথে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটেছিল তার পর থেকে তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। সম্ভবতঃ অতি সংগোপনে মুর্শিদাবাদে ফিরে এস সবার অগোচরে তিনি পিতা ইরোজ খাঁর গৃহে অবস্থান করছিলেন। তাঁর স্বামীর অদৃষ্টে যে এমনি একটা কিছু ঘটবে মনের মধ্যে তিনি এরূপ আশঙ্কা বরাবর পোষণ করতেন। উচ্ছৃঙ্খল জীবন-যাত্রার শেষ পরিণতি তো চিরদিনই এই! এজন্য স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর যথেষ্ট অভিযোগ থাকলেও অনুরাগ একটুও কমে নি। স্বামী যখন শূন্য হস্তে প্রাসাদ ছেড়ে চলে যান তখন তিনি তাঁর সঙ্গ নেন, আবার পথে তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবার পর থেকে তাঁর নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানান। হে ঈশ্বর! হে আল্লাহ্! তুমি আমার স্বামীকে রাজ্যহারা করেছ, আমাকে পথের ধুলায় নামিয়েছ—সেজন্য আমার মনে একটুও ক্ষোভ নেই। কিন্তু এই থেকে যেন স্বামীর শিক্ষা হয়। হে জগদীশ্বর! হে প্রভু! সে যেন তোমাতে মনপ্রাণ সমর্পণ করে সংযত জীবন যাপন করে। তাকে সকল পাপ কাজ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করো দেব; সে যেন শতায়ু হয়ে শান্তিময় জীবন যাপন করতে পারে। দুঃখিনী লুৎফার আর কোন কামনা তোমার কাছে নেই প্রভু। এই আকুল আবেদনে দেবতার আসন টলে নি—সতীর সকল প্রার্থনা ব্যর্থ করে জল্লাদ তাঁর স্বামীকে হত্যা করে।

লুৎফুন্নেসা তাতে ব্যথিত হোলেও দয়িতের প্রতি কর্তব্য ভোলেন নি। সিরাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এ জন্মের নয়—জন্ম জন্মান্তরের। ইহলোকে তিনি তাঁর স্বামী ছিলেন—পরলোকেও তাই থাকবেন। এই বিশ্বাসে লুৎফুন্নেসা অটল। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে এক দিন মীরণ প্রেম নিবেদন করলেন—নিকাহ্ করবার জন্য

প্রস্তাব পাঠালেন। কিন্তু সে প্রস্তাব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করলেন লুৎফুন্নেসা বেগম।

মীরণ তখন জিজ্ঞাসা করে পাঠালেন, তিনি কি হিন্দু? পুনর্বিবাহে তাঁর আপত্তি কেন?

—নাই বা হোলাম হিন্দু, জানালেন লুৎফুন্নেসা, আমি নারী তো! যে হৃদয় একজনকে সমর্পণ করেছি সেখানে আর কারও স্থান হবে না। এত দিন সিংহের সঙ্গে বাস করেছি, গর্দভের পিঠে চড়ব না।

—ভুল করো না লুৎফুন্নেসা, বলে পাঠালেন মীরণ, তুমি বেগম ছিলে, আমাকে নিকাহ্ করলে বেগমই থাকবে। প্রাসাদ, হর্ম, মণিমানিক্য, ধনরত্ন সবই আগের মত ভোগ করবে।

—চাই না মণিমানিক্য, চাই না ধনরত্ন। আমার স্মৃতি আমার থাক, তাই বুকে নিয়ে আমি জীবন কাটাব—জবাব দিলেন লুৎফুন্নেসা।

এক পাষণ্ডের কাছে নেমে এসেছিল এই স্বর্গচ্যুতা দেবকন্যা। স্বামী গতায়ু হোলেও স্বামীর স্মৃতি নিয়ে তিনি বেঁচে থাকবেন। দেহ থেকে খুলে ফেললেন রত্নালঙ্কার. চীনাংশুক ছেড়ে পরলেন গ্রাম্য তাঁতীর বোনা মোটা থান কাপড়। প্রসাধন বন্ধ হোল—বিলাসদ্রব্য হোল বর্জিত। আমীষবিহীন খাদ্য হোল তাঁর আহার্য্য—জীর্ণ কম্বল হোল ভূমিশয্যা। পুরাপুরি হিন্দু বিধবার জীবন বেছে নিলেন লুৎফুন্নেসা বেগম।

তারপর থেকে তাঁর জীবনে তেত্রিশ বৎসর সময় অতিবাহিত হয়েছে। কত বর্ষা এসেছে, কত শীত চলে গেছে, কিন্তু তাঁর আড়ম্বরবিহীন জীবন-যাত্রায় ছেদ পড়ে নি। ভোরের আজান শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি শয্যা ত্যাগ করতেন, তারপর উজু শেষ করে পড়তেন নমাজ। স্নানাহারের পর সন্ধ্যার প্রতীক্ষায় বসে থাকতেন—তাঁর মন পড়ে থাকত খোসবাগের সেই কবরের দিকে। সেখানে তাঁর মক্কা—সেখানেই তাঁর মদিনা! সেই তাঁর কাশী—সেই তাঁর বারাণসী! দিনমণি অস্তাচলে গমন করলে তিনি সেখানে চলে যেতেন—স্বামীর কবরের উপর দীপ জেলে তাঁর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা জানাতেন। কত দিন পথে বৃষ্টি নেমেছে, কত দিন ঝঞ্ঝাবায়ু এসে গাছপালা উৎপাটিত করেছে, কিন্তু পতিব্রতা লুৎফুন্নেসার দীপ জ্বালান এক

দিনের জন্যও বন্ধ হয় নি। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি ইহলোকে ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে কত রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে—দেশের জীবনে কত পরিবর্ত্তন এসেছে, কিন্তু কোন ঘটনাই তাঁর মনের উপর বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে নি। জীবনের একমাত্র সম্বল মৃত স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে তিনি রাজধানীর এক প্রান্তে বাস করেছেন। যখন তিনি স্বামীহারা হন তখন তাঁর বয়স অল্প। তারপর তারুণ্য পার হয়ে যৌবন এসেছে, যৌবন পার হয়ে এসেছে প্রৌঢ়ত্ব—তবু তিনি স্বামীকে ভোলেন নি; স্বামীর স্মৃতি বুকে নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

পাঁচ শতাব্দী পূর্বে এমনি এক যুগ পরিবর্তনের সময়ে গৌড়ের ইতিহাসে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাবিদুষী বসুদেবী; এখন আর এক যুগ পরিবর্ত্তনের সময়ে দেখা দিলেন মহাসতী লুৎফুন্নেসা বেগম!

1 Edwards M, *Battle of Plasssy*, p. *81*-96
2 Hill S. C. *Bengal in 1756-57, i, 54-56, 70, 94, 148, iii. p, 51-62, 420*
3 Yusuf Ali *Ahwal -i-Mahabat jung, trans. Sir J. N. Sarkar, p, 137-63*
4 Salimulla *Tarikh-i-Bangla, Gladwin's trans.p. 214*

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়

মীরকাশিম

ক্লাইভের মনসবদারী লাভ

হলওয়েলের লেখনী ও ক্লাইভের শৌর্য্যের ফলে সিরাজউদ্দৌলার পতন হোলেও তার ফলে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত হয় নি। রাজ্য শাসনের অভিলাষ ইংরাজের ছিল না। তারা যে অন্ধকূপ হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে, নিজেদের ব্যবসা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে ও ফরাসীদের উৎখাত করেছে এই আনন্দে পরম আত্মপ্রসাদ অনুভব করে। ফরাসীদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে অবাধে বাণিজ্য চালাতে পারলেই তারা খুসী—আর কিছু চায় না। কিন্তু সেই দুষমন ফরাসীরা মরেও মরে নি, বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীরের কাছে গিয়ে অভিযোগ করে যে মীরজাফর কিছুই নয়—তাঁকে চালাচ্ছে ইংরাজ। কথাটা পুরাপুরি বিশ্বাস না করলেও দ্বিতীয় আলমগীর যখন দেখলেন যে মীরজাফর কোন পেশকাস পাঠালেন না তখন পুত্র শাহ আলমকে তাঁর বিরুদ্ধে পাঠিয়ে দিলেন।

ক্লাইভের চিন্তাধারাও একই পথ ধরে প্রবাহিত হচ্ছিল। আলীবর্দী যখন সরফরাজকে মেরে মসনদ অধিকার করেন তখন দিল্লী থেকে কোন বাধা আসে নি, তাঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা ও সৌকৎ জঙ্গ যখন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন তখনও দিল্লী নীরব, অথচ বৎসর পার হবার পূর্বে উভয়ের আত্মীয় মহম্মদ জাফর আলী খাঁ মসনদে বসেছেন শুনে সেখানে এত উষ্মা কেন? এর পিছনে নিশ্চয়ই ফরাসীদের গোপন হস্ত সক্রিয় রয়েছে। তারা যেখানে সুবিধা পাবে সেখানে ইংরাজের গায়ে ছোবল মারবে!

শাহজাদা শাহ আলম বাংলায় আসছেন শুনে বিহারের নায়েব-নাজিম

রাজা রামনারায়ণ তাঁর প্রতি আনুগত্য জানিয়ে পত্র পাঠালেন। উভয়ের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ান সম্ভব হবে না জেনেও মীরজাফর সসৈন্যে রাজমহলে চলে গেলেন। এ খবর পেয়ে ক্লাইভ প্রমাদ গণেন। মীরজাফরের পতন হোলে ফরাসীরা আসবে—ইংরাজ যাবে তলিয়ে। কিন্তু আসল বিপদ জাফর আলীকে নিয়ে! তিনি যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধ করেন না, যেখানে যুদ্ধের প্রয়োজন নেই সেখানে সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যান। এরূপ হটকারিতার প্রশ্রয় না দিয়ে ক্লাইভ মূল্যবান উপঢৌকনসহ পাটনায় গিয়ে শাহজাদাকে জানালেন যে তিনি তো বটেই জাফর আলীও বাদশাহর বশম্বদ ভৃত্য ছাড়া কিছু নয়; তাঁদের দুষমনদের কথা শুনে মহামান্য বাদশাহ যেন তাঁর কৃপা দৃষ্টি থেকে ভৃত্যদের বঞ্চিত না করেন।

ক্লাইভের এই দূতিয়ালীতে খুসী হয়ে শাহ আলম মীরজাফরকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নাজিম পদে বহাল রাখলেন ও পিতার কাছ থেকে অনুমতি আনিয়ে রবার্ট ক্লাইভকে সাবুৎ জঙ্গ উপাধি প্রদান করলেন। বাদশাহর আদেশে তাঁকে মোগল সাম্রাজ্যের একজন ছয়হাজারী মনসবদারও নিযুক্ত করা হোল। মনসবদারীর সঙ্গে মনসব প্রদান করা বিধি। শহর কলকাতা সাবুৎ জঙ্গকে মনসব দিয়ে শাহজাদা শাহ আলম অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন করলেন।

ওলন্দাজ নিধন

এই মনসব লাভের পরে ক্লাইভের সঙ্গে কোম্পানীর সম্পর্ক জটিল হয়ে ওঠে। তাঁরই উদ্যোগে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর মীরজাফর একটি ইংরাজ রেজিমেণ্টের ব্যয় নির্বাহের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কলকাতাসহ চব্বিশ পরগণা জেলাটি জায়গীর দিয়েছিলেন। শাহ আলম সেই জেলার একটি অংশ কেটে নিয়ে তাঁর নবনিযুক্ত মনসবদারকে প্রদান করায় কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিল যথেষ্ট ক্ষুব্ধ হয়। ক্লাইভ কোম্পানীকে বোঝাতে চাইলেন যে নবাব যখন বাদশাহর অধীনস্থ সামন্ত ছাড়া আর কিছু নন তখন কোম্পানী যেন বিনা দ্বিধায় কলকাতার অধিকার তাঁর হাতে ছেড়ে দেয়। এই নিয়ে কাউন্সিলের সঙ্গে তাঁর বিতণ্ডা চলছে এমন সময়ে খবর এল যে একটি ওলন্দাজ নৌবহর গঙ্গার উপর দিয়ে উত্তর দিকে এগিয়ে আসছে। সদ্যপ্রাপ্ত জায়গীরের প্রশ্ন

আপাততঃ বন্ধ রেখে ক্লাইভ তাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে গেলেন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ৫ই ডিসেম্বর ডায়মণ্ড হারবার ও ফলতার মাঝামাঝি জায়গায় উভয় পক্ষে ভীষণ জলযুদ্ধের পর ওলন্দাজরা আত্মসমর্পণ করায় তাদের চুঁচুড়া কুঠী ইংরাজদের হস্তগত হয়।

ওলন্দাজ নিধনের পরে বাণিজ্য ব্যাপারে ইংরাজদের প্রতিদ্বন্দ্বী বলতে আর কেউ রইল না। এতখানি সুবিধা সত্বেও কোম্পানী ক্লাইভকে পুরস্কার প্রদান দূরের কথা বাদশাহর দেওয়া জায়গীরটি পর্য্যন্ত সমর্পণ করতে রাজী না হওয়ায় তিনি হেড অফিসে গিয়ে দরবার করবার জন্য পর বৎসর ২২শে জানুয়ারী স্বদেশের দিকে রওনা হোলেন।

মারাঠা আক্রমণ

সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলা ও বিহারের নবাব—উড়িষ্যার নয়। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত সন্ধির সর্ত অনুযায়ী উড়িষ্যা তখন মারাঠা সাম্রাজ্যের একটি অঙ্গরাজ্য—রঘুজী ভোঁসলের প্রতিনিধি শিউ ভাটের শাসনাধীন। একই সন্ধি অনুসারে বাংলা ও বিহার মারাঠাদের করদ রাজ্য—বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথের বিনিময়ে মারাঠা শক্তি আলীবর্দী ও তাঁর বংশধরদের বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়েছিল।

সন্ধি সম্পাদনের দুই বৎসর পরে ইংরাজরা যখন সিরাজউদ্দৌলাকে আক্রমণ করে তখন শিউ ভাট তাঁকে কোন সাহায্য দেন নি এই কারণে যে পলাশীতে তেমন কোন যুদ্ধ হয় নি। আবার যুদ্ধ শেষে ক্লাইভের পরিবর্তে সিরাজেরই এক নিকট আত্মীয় মসনদে আরোহণ করায় তিনি সেই ফিরিঙ্গী সর্দারকে আক্রমণ-কারী বলে মনে করেন নি। নবাবদের এ সব ঘরোয়া বিবাদের মধ্যে তাঁর থাকবার দরকার কি? চৌথের টাকা ঠিকমত পেলে তিনি খুসী!—কিন্তু টাকা কোথায়? দেওয়ান দুর্লভরাম জানালেন যে চুক্তি অনুযায়ী ইংরাজদের বিপুল পরিমাণ অর্থ দেবার পর রাজকোষ প্রায় শূন্য। বাকি টাকার জন্য কোম্পানী ঘন ঘন তাগাদা পাঠাচ্ছে। নিরুপায় মীরজাফর কয়েকটি পরগণার রাজস্ব বরাত দিয়ে তাদের ঠেকিয়ে রাখলেন। কিন্তু তিনি কোন দিক সামলাবেন? সৈন্যরা বাকী বেতনের জন্য এক দিন তাঁর প্রাসাদ অবরোধ করে বসল। বেতন

না পেলে তারা সেখান থেকে উঠবে না। জামাতা মীরকাশিম সে যাত্রায় তাঁকে উদ্ধার করলেন।

সব খবরই কটকে শিউ ভাটের কাছে পৌছাচ্ছিল। কিন্তু তিনি আর অপেক্ষা করতে রাজী নন। দুই বৎসর চৌথের টাকা বাকি পড়েছে—আর বাকি ফেলবেন না। মীরজাফর অনেক অনুনয় করে পত্র লিখলেন, আর কয়েক মাসের সময় চাইলেন। সে কথায় কান না দিয়ে মারাঠা সৈন্যাধ্যক্ষ মেদিনীপুরের পথ ধরে মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। মীরজাফর দেখলেন, সর্বনাশ! সিরাজউদ্দৌলাকে তাড়িয়ে যে মসনদ তিনি অধিকার করেছেন তা বুঝি মারাঠাদের হাতে চলে যায়। তাদের প্রতিরোধ করবার জন্য তিনি সসৈন্যে বর্দ্ধমানে গিয়ে শিবির সন্নিবেশিত করলেন। কিন্তু যুদ্ধ হোল না—আংশিক টাকা পেয়ে শিউ ভাট কটকে ফিরে গেলেন।

মসনদে মীরকাশিম

এবারও মীরজাফরকে বাঁচালেন তাঁর জামাতা মীরকাশিম। বজ্রাঘাতে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের মৃত্যুর পর থেকে নেশাখোর ও রোগগ্রস্ত এই নবাবকে এক দিকে ইংরাজ ও অন্য দিকে জামাতা কোনক্রমে জিইয়ে রেখেছিলেন। তাঁর না ছিল রাজ্য শাসনের শক্তি, না ছিল কূটনৈতিক বুদ্ধি। ইংরাজরা তাঁকে নিয়ে রীতিমত বিব্রত বোধ করছিল। কিন্তু তিনি ক্লাইভের লোক বলে কেউ কিছু মুখ ফুটে বলতে পারছিল না। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে সেই ক্লাইভ ইংল্যাণ্ডে চলে গেলে মীরজাফরের খুঁটি গেল সরে। বাকি টাকার জন্য নূতন গভর্ণর হলওয়েল তাঁর উপর ক্রমাগত চাপ দিতে লাগলেন। মীরকাশিম দেখলেন এই সুযোগ, শ্বশুরভক্তির মুখোস খুলে ফেলে হলওয়েলকে নিজের উচ্চাকাঙ্খার কথা জানিয়ে দিলেন। তাঁর সম্বন্ধে ইংরাজদের ধারণা উচ্চ হোলেও তাঁকে মসনদে বসাবার প্রস্তাব সকলে একবাক্যে প্রত্যাখ্যান করল। কিন্তু টাকায় কি না হয়? ছয় মাস পরে হলওয়েলের জায়গায় হেনরী ভ্যান্সিটার্ট গভর্ণর হয়ে এলে দেখা গেল যে মীরকাশিম নবাব বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। জামাতার অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হোলেন মীরজাফর!

মসনদে আরোহণের পর মীরকাশিম শ্বশুরের মতই দেখেন যে রাজকোষ শূন্য।

টাকার অভাবে শাসনকার্য্য চালান যাবে না বুঝে তোষাখানায় তখনও যে সব মণিমাণিক্য ছিল সেগুলি বেচে দিলেন ও সোনারূপার বাসনপত্র গালিয়ে মুদ্রা প্রস্তুত করালেন। ইংরাজরা বুঝল যে উপযুক্ত লোকের হাতে রাজদণ্ড পড়েছে—তাঁর কর্মদক্ষতার উপর তাদের আস্থা জন্মাল। টাকা পেয়ে তারা খুসী হোল—টাকা পেয়ে ফৌজী দফতরের বিক্ষোভ কমল।

বাংলার রাষ্ট্রজীবনে ইংরাজের প্রভুত্ব মীরজাফর যতখানি বাড়িয়েছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী বাড়ালেন মীরকাশিম। তাদের সাহায্যে শ্বশুরকে বিতাড়িত করে তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে তারা এই রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা। তারা যাকে রাখবে সে থাকবে, যাকে মারবে সে মরবে। ভ্যান্সিটার্ট ও তাঁর সহকর্মীগণকে প্রচুর নগদ অর্থ ছাড়া কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব ইজারা দিতে তিনি বাধ্য হোলেন।

বাদশাহের বাংলা আক্রমণ

যে মীরজাফরকে দিল্লীশ্বর মাত্র এক বৎসর পূর্বে নবাব বলে মেনে নিয়েছিলেন ফিরিঙ্গী বেনিয়ারা তাঁকে সরিয়ে তাঁর জামাতাকে মসনদে বসিয়েছেন শুনে দিল্লী তাজ্জব বনে যায়। যথারীতি ঘৃতে অগ্নি সংযোগ করে ফরাসীরা। ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ জিন ল'কে সঙ্গে নিয়ে নূতন বাদশাহ শাহ আলম আবার বাংলার দিকে এগিয়ে এলেন। কিছু দিন পূর্বে তাঁর পিতা দ্বিতীয় আলমগীরের মৃত্যু হওয়ায় তিনি সবেমাত্র মসনদে আরোহণ করেছেন; সাম্রাজ্যের মধ্যে এরূপ বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবেন না। সেই উদ্দেশ্যে নিজে সসৈন্যে বিহারে চলে এলে ওই সুবার নায়েব-নাজিম রাজা রামনারায়ণ পূর্বের মত তাঁর প্রতি আনুগত্য জানালেন। পাটনার উপকণ্ঠে তাঁর তাঁবু পড়ল।

সে সময়ে ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল—দক্ষিণ ভারতেও চলছিল। এই উপলক্ষে সেই যুদ্ধ দ্রুতগতিতে উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মীরকাশিমকে সাহায্যের জন্য ইংরাজ ফৌজ পাটনার দিকে এগিয়ে যায়। মোহিনী নদীর তীরে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় তাতে জিন ল ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ কার্ণাকের হাতে বন্দী হওয়ায় ফরাসীদের পক্ষে যুদ্ধ চালাবার শক্তি লোপ পায়। সেই সঙ্গে ইংরাজদের পক্ষেও যুদ্ধ চালাবার প্রয়োজন শেষ হয়।

দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করবার তাগিদ ইংরাজদের ছিল না—সাহসও ছিল না। তাই ফরাসী বিজয়ী কার্ণাক সন্ধির প্রস্তাব করে সীতাব রায়কে বাদশাহর শিবিরে পাঠান। তিনি তাতে সম্মত না হওয়ায় যুদ্ধ চলতে থাকে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর ফৌজ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ায় সকলকে বিস্ময়বিমূঢ় করে তিনি নিজে সন্ধিপ্রার্থী হয়ে ইংরাজ শিবিরে পদার্পণ করেন।

মুর্শিদাবাদে মীরকাশিম নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। সুযোগ্য সহকারী তকি খাঁর উপর পশ্চাদ্ব্যূহ রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি যখন পাটনায় গিয়ে উপস্থিত হন বাদশাহী ফৌজ তখন পরাজিত হয়েছে। কিন্তু দিল্লীশ্বর দিল্লীশ্বর! ইংরাজদের মত তাঁরও সাহস ছিল না যে দিল্লীশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধের ধৃষ্টতা দেখান। তাই বাদশাহী ফৌজের ব্যর্থতার কথা শুনেও মূল্যবান উপঢৌকনসহ শাহ আলমের তাঁবুতে গিয়ে নতজানু হয়ে কুর্নিশ করেন। এই আনুগত্যে খুসী হয়ে শাহ আলম তাঁকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাবী পদে বহাল রাখেন ও আলীজা উপাধি দিয়ে দিল্লীতে ফিরে যান।

শৃঙ্খলাবদ্ধ অত্যাচার

বাদশাহর প্রত্যাবর্তনের পর মীরকাশিম তাঁর নামে খুৎবা পাঠের জন্য পাটনা দুর্গে গিয়ে দেখেন যে ইংরাজ সৈনিকরা দুর্গদ্বারে পাহারা দিচ্ছে। তাঁর সন্দেহ হয়, ফিরিঙ্গীদের এই অনধিকার প্রবেশের পিছনে নায়েব-নাজিম রাজা রামনারায়ণের গোপন হস্ত লুক্কায়িত রয়েছে। আপাততঃ তাঁকে কিছু না বলে তিনি কলকাতায় গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের কাছে এক অভিযোগলিপি পাঠিয়ে দেন। ভ্যান্সিটার্ট সঙ্গে সঙ্গে কর্ণেল কূট ও মেজর কার্ণাককে কলকাতায় ফেরবার জন্য নির্দেশ দিলে সুরু হয় রাজা রামনারায়ণের উপর উৎপীড়ন।

রাজা রামনারায়ণ ছিলেন বিহারী কায়স্থ—আলীবর্দী খাঁর আমলের অফিসার। তাঁর সুশাসনের গুণে বাংলার বিশৃঙ্খলা বিহারকে স্পর্শ করে নি। সে কথা বিস্মৃত হয়ে নবাব মীরকাশিম ইংরাজ ফৌজের প্রস্থানের পরই তাঁকে ও তাঁর সহকারীদিগকে কারারুদ্ধ করে নির্মমভাবে উৎপীড়ন করেন। ইংরাজের হয়ে বাদশাহর কাছে দূতিয়ালী করবার অপরাধে সিতাব রায়কে ধরবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনি গোপনে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন।

সেই থেকে সুরু হয় মীরকাশিমের হিন্দু নির্য্যাতন। পূর্বে তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন না, কিন্তু সিরাজউদ্দৌলার অপসারণের সময়ে ইংরাজরা সামনে দাঁড়ালেও আসল পরিকল্পনা যে হিন্দুরা রচনা করেছিল একথা তিনি ভোলেন নি। সেই হিন্দু জমিদাররা আছে—ইংরাজরাও আছে। চার বৎসরের মধ্যে কারও রং বদলায় নি। এক সঙ্গে উভয়কে পঙ্গু ও নিজের অর্থাভাব দূর করবার অভিপ্রায়ে তিনি জমিদারদের রাজস্বের হার বাড়িয়ে প্রায় দ্বিগুণ করে দেন। ছোটবড় কাউকে বাদ দেওয়া হয় নি।

নেপাল আক্রমণ

উৎপীড়িত জমিদারদের সামনে অন্ধকার নেমে এল। বাদশাহর কাছে আবেদন করে লাভ হবে না—মারাঠারা পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েছে। তাঁরা মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে দিন গণছেন এমন সময়ে গুজব উঠল যে কয়েকজন জমিদার গোপনে নেপালাধীশের সাহায্য ভিক্ষা করেছেন। গুজবটির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা না করে ক্রোধান্ধ মীরকাশিম ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নেপাল আক্রমণ করেন। অভিযাত্রী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হন তাঁর আর্মানী সেনাপতি গুরগণ খাঁ। এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত না থাকায় নেপালীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, গুরগণের ফৌজ ওই দেশের অভ্যন্তরভাগে বেশ কিছু দূর এগিয়ে যায়। মখবনপুরের যুদ্ধে জয়লাভের পর গুরগণ সরাসরি কাঠমাণ্ডুর দিকে যাবার আয়োজন করছেন এমন সময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কয়েকটি নেপালী ফৌজ এসে তাঁকে আক্রমণ করলে তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে মিথিলার সমভূমিতে পালিয়ে আসেন।

এই পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য মীরকাশিম ইংরাজদের সাহায্য চাইলে তারা যে শুধু প্রত্যাখ্যান করে তা নয় প্রতিনিয়ত তাঁকে উপেক্ষা করতে থাকে। পাটনায় ক্যাপ্টেন এলিস তাঁর এক বিশিষ্ট অফিসারকে অপমান করেন এবং বাণিজ্য ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট নবাবী কর্মচারীদের প্রতি কোম্পানী পদে পদে ঔদাসীন্য দেখায়। কোম্পানীর দেওয়া কর বহু ক্ষেত্রে আদায় করা অসম্ভব হয়।

বাংলার শেষ রাজধানী—মুঙ্গের

এই সব ঘটনা থেকে মীরকাশিম বুঝে নেন যে তাঁর শ্বশুর খাল কেটে যে কুমীর এনেছেন তার পিঠে চেপে তিনি মসনদে আরোহণ করেছেন বটে কিন্তু তাকে দূরীভূত করতে না পারলে জলাশয় আপদশূন্য হবে না। মারাঠারা তাদের তুলনায় অনেক বেশী শক্তিশালী, কিন্তু দিনের দিন চৌথের টাকা পেলে শাসন ব্যবস্থায় নাক গলায় না। অথচ তাঁরই অর্থে সৈন্য রেখে ইংরাজ কোম্পানী রীতিমত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে ভাবে হোক ফিরিঙ্গীদের দমন করতেই হবে। কিন্তু মুর্শিদাবাদে বসে তা সম্ভব নয়, কারণ এখানকার সকল খবর কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠী ও সেখান থেকে কলকাতায় চলে যায়। নবাব মীরকাশিম তাঁর রাজপাঠ মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে অপসারণের আদেশ দিলেন।

মুঙ্গেরের পুরাতন দুর্গটি সংস্কার করে তার ভিতরে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা হোল। তাঁর বেগম—মীরজাফরের কন্যা সেখানে গেলেন। খাজাখোজা দাসদাসী নফরবাঁদী সবাই গেল। একে একে সরকারী দফতরগুলি, গেল, সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরাও গেলেন। কিন্তু ক্ষুদ্র মুঙ্গেরে এত জায়গা কোথায়? বাড়ীর অভাবে বহু দফতরের কাজ তাঁবুর ভিতরে চলতে লাগল। বহু রাজপুরুষ সপরিবারে তাঁবুতে বাস করতে লাগলেন। সেনাপতি গুরগণ খাঁ শহরের উপকণ্ঠে তাঁবুর ভিতর তাঁর হেড কোয়ার্টার স্থাপন করলেন।

এত দিন সরকারী রাজস্ব জমা হোত মুর্শিদাবাদের তোষাখানায়। রাজধানী মুঙ্গেরে অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে তোষাখানাও সেখানে স্থানান্তরিত হোল। মীরকাশিম দেখলেন যে রাজপুরুষদের দিয়ে সেই বিপুল অর্থ সুসম বণ্টন সম্ভব নয়। বাণিজ্য ব্যাপারে হুণ্ডী না হোলে ব্যবসায়ীদের কাজকর্ম যেমন অচল হয় হুণ্ডী না হোলে রাজার লেনদেনও তেমনি সুষ্ঠুভাবে চলে না। এ কাজে হিন্দু বেনিয়াদের কোন জুড়ি নেই—তারা বরাবরই মুসলমান সুলতান ও বাদশাহদের ব্যাঙ্কারের কাজ করেছে। তাদের সহযোগিতা লাভের জন্য মীরকাশিম জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদকে স্তোকবাক্যে প্রলুব্ধ করে মুঙ্গেরে নিয়ে গেলেন। তাঁর ভাই স্বরূপচাঁদ গেলেন। কয়েকজন বিশিষ্ট জমিদারও গেলেন। মুঙ্গের পুরাপুরি রাজধানীর রূপ ধারণ করল।

ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ

ইংরাজকে পরিহারের জন্য মীরকাশিম দূরে সরে গেলেও তাঁর সকল উদ্যোগ আয়োজনের সংবাদ কলকাতায় তাদের কাছে এসে পৌঁছাচ্ছিল। তাঁকে বেশী বাড়তে দিলে সমূহ বিপদ বুঝে তারাও যুদ্ধের জন্য তৈরী হোতে লাগল। সমুদ্র পথে কলকাতায় নূতন নূতন অস্ত্র এল—কিছু সৈন্যও এল। গুপ্তচরের মুখে সব খবরই মীরকাশিমের কানে পৌঁছাচ্ছিল। তাঁর প্রস্তুতিও তরান্বিত হোতে লাগল।

জুন মাসের মাঝামাঝি কোম্পানীর কয়েকখানি অস্ত্রবোঝাই জাহাজ কলকাতা থেকে পাটনায় যাবার পথে মুঙ্গেরে পৌঁছালে মীর কাশিমের আদেশে সেগুলি আটক করা হয়। তাঁর কর্মচারীরা জাহাজগুলি সার্চ করে দেখে যে প্রতিটি জাহাজ সমরাস্ত্রে পরিপূর্ণ। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করবার সংবাদ পেয়ে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট মীরকাশিমের কাছে একখানি প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে দেন। তিনি সেটি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বাজেয়াপ্ত অস্ত্রশস্ত্র গুরগণ খাঁর হস্তে সমর্পণ করেন।

যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। ২৪শে জুন গভীর রাত্রে মেজর এলিস তাঁর রেজিমেণ্ট নিয়ে পাটনা দুর্গ আক্রমণ করলেন। নবাবী ফৌজ যথেষ্ট সংখ্যাধিক্য হোলেও তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারায় ইংরাজরা দুর্গটি অধিকার করে নিল। কিন্তু অপরাহ্নের দিকে একটি ফরাসী রেজিমেণ্ট এসে নবাবী ফৌজের শক্তি বৃদ্ধি করলে মেজর এলিস পরাজিত হোলেন।

দুর্গ অধিকারের পর নবাবী ফৌজ ইংরাজ সৈন্যদের এক অংশকে বন্দী করে। বাকি অংশ নিয়ে মেজর এলিস মহেন্দ্রু ঘাটের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছালে সেখানেও উভয় পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। শেষ পর্য্যন্ত ইংরাজরা এখানেও পরাজিত হয়ে নৌকাযোগে গঙ্গার ওপারে ছাপরার দিকে চলে যায়। বন্দীদের মুঙ্গেরে মীরকাশিমের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মীরজাফরের পুনরাভিষেক

পাটনার পরে কলকাতা। এই দীর্ঘ পথের মধ্যে আর কোথাও কোম্পানীর কোন সৈন্য ছিল না। বাইরে থেকে কোন নূতন সৈন্য আসবার সম্ভাবনাও

ছিল না। কারণ ইউরোপে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ তখনও চলছে—দাক্ষিণাত্যেও চলছে। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট দেখলেন, যে মুষ্টিমেয় সৈন্য তাঁর হাতে রয়েছে তাদের নিয়ে যুদ্ধ চালান সম্ভব নয়। তাই তিনি কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলবার উদ্দেশ্যে ৬ই জুলাই মীরজাফরকে নবাব পদে পুনঃস্থাপিত করে তাঁর সঙ্গে নূতন করে এক সন্ধিপত্র সম্পাদিত করেন। জাফর আল খাঁ পুনরায় নবাব বলে স্বীকৃতি পেলেন!

আর একবার নবাবী পেয়ে মীরজাফর ঘোষণা করলেন, বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ—মুঙ্গের নয়; যে সেখানকার তখ্‌তে বসবে সেই হবে তিন সুবার অধীশ্বর। এই উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে তিনি যখন ১৭ই জুলাই একটি ইংরাজ রেজিমেণ্টসহ মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হন মীরকাশিম তখন সসৈন্যে কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছেন। তবে সরাসরি এখানে না এসে ইংরাজের কাশিমবাজার কুঠি অধিকারের পর তিনি নিজে গঙ্গার পশ্চিম তীর ও তাঁর সহকর্মী তকি খাঁর ফৌজ গঙ্গার পূর্ব তরা ধরে অগ্রসর হবার আয়োজন করছেন এমন সময়ে উভয় শিবিরে খবর পৌছাল যে মীরজাফর সসৈন্যে মুর্শিদাবাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তিনি এখন শুধু নবাবীর দাবীদার নন—পুরাপুরি নবাব!

মীরকাশিমের অগ্রগতির সংবাদ পেয়ে একটি ইংরাজ রেজিমেণ্ট অগ্রদ্বীপে গিয়ে মীরজাফরের সঙ্গে মিলিত হোল। তাঁর স্বপক্ষীয় যে যেখানে ছিল সবাই সেখানে চলে এল। এই সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে অজয় নদের তীরে মীর-কাশিমের যে যুদ্ধ হয় তাতে তিনি পরাজয় বরণ করে গঙ্গার ওপারে তকি খাঁর শিবিরের দিকে পালিয়ে যান।

পলাশীর দ্বিতীয় যুদ্ধ

তকি খাঁর ফৌজ সেই সময়ে পলাশীতে শিবির সন্নিবেশ করে শত্রুর অপেক্ষায় বসেছিল। এই সেই পলাশী প্রান্তর যেখানে ছয় বৎসর পূর্বে ক্লাইভের হাতে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটেছিল। সেই পলাশী আছে—সেই আম বাগানও আছে। কিন্তু সেটিকে অপয়া বিবেচনা করে তকি খাঁ আধ মাইল দক্ষিণে একটি খোলা জায়গায় ছাউনি ফেলেছিলেন। কয়েক দিন পরে মীরকাশিমী

ফৌজ গঙ্গা পার হয়ে সেখানে এসে পৌছালে তিনি সম্মিলিত বাহিনীসহ পরিখা খনন করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হোতে লাগলেন।

পলাশীর প্রথম যুদ্ধে মীরজাফর ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যাধ্যক্ষ— এখন তিনি নিজেই নবাব। তখন ইংরাজরা ছিল তাঁর প্রচ্ছন্ন সমর্থক এখন তারা প্রকাশ্যে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে। তিনি নিজেকে নবাব বলে দাবী করছেন, আবার তাঁর জামাতা একই দাবী নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন। কে যে প্রকৃত নবাব তা নির্দ্ধারিত হবে আসন্ন যুদ্ধের শেষে।

সে যুদ্ধ শুরু হোল ২৯শে জুলাই সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে। দুই নবাবের ফৌজ সর্বশক্তি দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করতে লাগল। মীরকাশিমী ফৌজ যথেষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠ হোলেও ইংরাজদের আধুনিক রণনীতি ও সমান আধুনিক সমরাস্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে সক্ষম হচ্ছিল না। তাঁর বহু সৈন্য হতাহত হোল। শেষ পর্য্যন্ত অপরাহ্নের দিকে প্রতিপক্ষের একটি গুলি লেগে তকি খাঁ ধরাশায়ী হোলে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। মীরজাফর তাদের অনুসরণে বিরত থেকে সোজা মুর্শিদাবাদ চলে গিয়ে আর একবার মসনদে আরোহণ করলেন।

ইংরাজ বাহিনী বিধ্বস্ত

তকি খাঁর মৃত্যুতে মীরকাশিম অসহায় হয়ে পড়লেও যুদ্ধ চলতে লাগল। স্বনির্বাচিত স্থানে ইংরাজদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষার জন্য তিনি ভাগীরথী পার হয়ে সুতির বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নূতন করে ব্যূহ বিন্যাস করলেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নূতন নূতন সৈন্যদল এসে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগল। ইংরাজরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে বাসুলাই নদী পার হয়ে এলে ওই নদী ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে তাদের পিষে মারবেন, এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। তাঁর হিসাবে কোন ভুল হয় নি। ইংরাজ ফৌজ যখন নিকটবর্তী গিরিয়া প্রান্তরে এসে উপস্থিত হোল মীরকাশিমী ফৌজ তখন পরিখা খনন করে তাদের প্রতীক্ষায় বসেছিল। তারা এসে পৌছালে যথারীতি যুদ্ধ সুরু হয়ে গেল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তাদের অফিসাররা দেখলেন, যে উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র ও আধুনিক রণবিদ্যার বলে তাঁরা এত দিন শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করছিলেন গিরিয়ায়

তা কর্য্যকরী হচ্ছে না। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর মীরকাশিমী ফৌজ তাদের ঠেলতে ঠেলতে একেবারে বাঁস্‌লাই নদীর তীরে চলে এল। সেখানেও তারা বীর বিক্রমে লড়ল, কিন্তু তাদের অধিকাংশ অশ্বারোহী নদীর অতল জলে ডুবে প্রাণ হারালে সৈন্যাধ্যক্ষদের চক্ষের সামনে অন্ধকার নেমে এল (১৭৬১; আগষ্ট ২)।

এত বড় বিপর্য্যয়ের পরও দেখা গেল যে বিধাতা ইংরাজদের সহায়। বিজয়ী মীরকাশিমী সৈন্যরা যখন উৎসবের আয়োজন করছে সেই সময়ে মীরজাফর প্রেরিত এক ডিভিসন সৈন্য এসে রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হওয়ায় নূতন করে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মীরকাশিমের বিজয়োৎসব বিষাদাশ্রুতে পরিণত হোল। তিনি পরাজিত হয়ে ভাগলপুরের কাছাকাছি উধুয়ানালা দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিলেন (আগষ্ট ২৩)।

বৃটিশ শাসনের সূত্রপাত

ভারতে বৃটিশ শাসন সুরু হয় যেই দিন গিরিয়ার প্রান্তরে ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট — ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর রণাঙ্গনে নয়। গিরিয়ায় যদি মীরজাফরী সৈন্যরা এসে মীরকাশিমকে পরাজিত না করত তাহোলে বাংলা থেকে ইংরাজের নাম পর্য্যন্ত মুছে যেত। ইউরোপে ও দাক্ষিণাত্যে তখন তাদের যা দশা তাতে কোন স্থান থেকে কোন সাহায্য আসত না। মীরজাফরের ফৌজ এসে মরণোন্মুখ ইংরাজের দেহে প্রাণ সঞ্চার করায় মীরকাশিমের মন এক অনির্বচনীয় আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে পড়ে। পরিবারবর্গ ও ধনরত্ন রোহ্‌টাস দুর্গে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি সসৈন্যে উধুয়ানালায় গিয়ে আর একবার নূতন করে ব্যূহ বিন্যাসের আয়োজন করলেন। সে কাজ সম্পূর্ণ হবার পূর্বে স্থলপথে মীরজাফরী ফৌজ ও জলপথে ইংরাজ ফৌজ সেখানে এসে দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ সুরু করে।

গিরিয়ায় পরাজয় সত্ত্বেও মীরকাশিমের সামরিক বল তখনও শত্রুর তুলনায় অনেক বেশী। তার উপর উধুয়ানালার দুর্গ যথেষ্ট সুরক্ষিত। এ সব কথা ভাল করে জানা থাকায় মীরজাফর নিজে সেখানে এসে সরাসরি দুর্গ আক্রমণের পরিবর্তে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে সেটি দখল করবার আয়োজন করতে লাগলেন।

অতি সঙ্গোপনে জামাতার দুই আর্মানী সৈন্যাধ্যক্ষ মার্কার ও আরাটুনকে কাঞ্চনমূল্যে বশীভূত করায় তাঁরা গভীর রাত্রে দুর্গদ্বার খুলে দিলেন। সেই দ্বার দিয়ে তাঁর সৈন্যরা দুর্গে প্রবেশ করে বহু নিদ্রিত মীরকাশিমী সৈন্যকে শমন সদনে পাঠিয়ে দিলে হৃতসর্বস্ব মীরকাশিম পিছনের দরজা দিয়ে মুঙ্গেরে পালিয়ে গেলেন।

সেখানেও একই বিশ্বাসঘাতকতা। রাজধানী রক্ষার দায়িত্ব সেনাপতি গুরগন খাঁর উপর অর্পণ করে মীরকাশিম পাটনায় চলে গেলে সুরু হয় সিপাহী বিক্ষোভ। এক দিন তারা বাকি বেতনের জন্য গুরগনের শিবিরের সম্মুখে সমবেত হয়ে সোরগোল সুরু করে দেয়; তাদের শান্ত করবার জন্য গুরগন বাইরে এলে প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁকে হত্যা করে।

বাকি রইলেন দুর্গরক্ষী মহম্মদ আরাবাই। রাজধানী রক্ষার দায়িত্ব এখন তাঁর। সে জন্য সামরিক বল কিছু কম ছিল না। কিন্তু যুদ্ধের গোলমালের মধ্যে না গিয়ে কিছু অর্থের বিনিময়ে তিনি ইংরাজের হাতে দুর্গ সমর্পণ করেন। ইংরাজ ফৌজ বিনা বাধায় দুর্গটি অধিকার করে নেয়। মীরকাশিমের চক্ষের সম্মুখে অন্ধকার নেমে আসে!

বীভৎস হত্যাকাণ্ড

তখনও পাটনা, হাজীপুর, রোহ্‌টাস প্রভৃতি শক্তিশালী দুর্গগুলি মীরকাশিমের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু তাঁর সৈন্যবাহিনীর এক অংশ শেষ হয়েছিল নেপাল যুদ্ধে, আর এক অংশ শেষ হয় গিরিয়ায়। তার উপর রাজকোষ শূন্য—সৈন্যরা বেতন পাচ্ছে না। জগৎশেঠ হাত গুটিয়েছেন, হিন্দু জমিদাররা রাজস্ব দেওয়া প্রায় বন্ধ করেছে। এসব কথা তিনি যতই ভাবেন ততই রক্তের চাপ বেড়ে যায়—ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। পলাশী যুদ্ধের পর যে মহাভীতি সিরাজউদ্দৌলাকে আচ্ছন্ন করেছিল তাঁকেও তাই করল। মুঙ্গেরে ফিরে গিয়ে তিনি জগৎশেঠ মহাতাবচাঁদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ দেবেন কিনা। ছয় বৎসর পূর্বে অনুরূপ অবস্থায় সিরাজউদ্দৌলার কাছে অক্ষমতা জ্ঞাপন করায় তিনি তাঁকে কয়েদ করেছিলেন—মীরকাশিম করলেন হত্যা। পরিবার পরিজনসহ তাঁর ভ্রাতা স্বরূপচাঁদকেও হত্যা করা হোল। জগৎশেঠ বংশ ধরাপৃষ্ঠ থেকে চিরতরে বিদায় নিল।

পূর্বে বলেছি যে হিন্দুরা মীরকাশিমের চক্ষের বিষ হয়ে উঠেছিল। কারণ, তিনি ভাল করে জানতেন যে সিরাজউদ্দৌলার অপসারণে ক্লাইভ উপলক্ষ হোলেও সামগ্রীক পরিকল্পনার রচয়িতা হিন্দু জমিদারগণ। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি বিহারের নায়েব-নাজিম রাজা রামনারায়ণ তখন মুঙ্গেরে—তাঁর কারাগারে। তাঁর আদেশে ঘাতক সেখানে গিয়ে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। তাঁর পরিবারবর্গও রেহাই পেল না—জহ্লাদের খড়্গে সবার শিরচ্ছেদ করা হোল। রাজা দুর্লভরামের পুত্র রাজবল্লভের মত অনুরক্ত ব্যক্তিরাও রেহাই পেল না। বৃদ্ধ রায় রায়ান উমেদরাম, ফতেসিংহ প্রভৃতি কোন হিন্দু জমিদাররা এই হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পান নি। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও বর্দ্ধমানরাজ তিলকচাঁদ প্রমুখ যাঁরা নবাবের নাগালের বাইরে ছিলেন তাঁরা প্রাণে বেঁচে যান।

মুঙ্গের ত্যাগ করবার সময়ে মীরকাশিমী ফৌজ যে সব যুদ্ধবন্দীকে সঙ্গে নিয়েছিল পাটনায় পৌঁছে তাঁর জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ সমরু* ১১ই নভম্বের তাদের সবাইকে শমন সদনে পাঠিয়ে দেন। ইংরাজদের কুঠীতে যে সব নারী ও শিশু ছিল তাদেরও হত্যা করা হয়।

রণক্ষেত্রে অযোধ্যা বাহিনী

ইংরাজ সেনাপতি মেজর এ্যাডামসকে সঙ্গে নিয়ে মীরজাফর পাটনায় পৌঁছে শোনেন যে হত্যাযজ্ঞ সমাপন করে জামাতা রোহ্‌টাস দুর্গে চলে গেছেন। বিনা যুদ্ধে পাটনা অধিকার করে রোহ্‌টাসে গিয়ে শোনেন যে আতঙ্কগ্রস্ত মীরকাশিম সেখানে সাময়িক বিশ্রামের পর বেগম ও অন্যান্য পরিজনসহ অযোধ্যার নবাব-উজীর সুজাউদ্দীনের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। পূর্বাহ্নে তাঁর কাছে বার্তা পেয়ে সুজাউদ্দীন লক্ষ্ণৌ থেকে এসে দুই সুবার সীমান্তে কর্মনাশা নদীর তীরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন।

মীরকাশিমের দুর্বিপাকের জন্য সুজাউদ্দৌল্লার কোন দরদ ছিল না, কিন্তু এই সুযোগে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অধিকার করবার উচ্চাশা নিয়ে তিনি মীরজাফর ও তাঁর ইংরাজ মিত্রদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য এগিয়ে এলেন। সঙ্গে কাশীরাজের শক্তিশালী বাহিনী। কর্মনাশা নদীর পূর্ব তীরে উভয় পক্ষে

*সমরুর প্রকৃত নাম ওয়ালটার রাইনহার্ট

মাসের পর মাস যুদ্ধ চলবার পর অযোধ্যা বাহিনী শত্রুকে পিছু হটাতে হটাতে পাটনা পর্য্যন্ত ঠেলে নিয়ে আসে। সেখানকার দুর্গ অধিকারের জন্য উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম শুরু হয়। কিন্তু এক দিন সুজাউদ্দীন শত্রুর গুলীতে আহত হওয়ায় তাঁর সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায় (১৭৬৪, মে ৩)।

বক্‌সারে পৌছে সুজাউদ্দীন নূতন করে ব্যূহ বিন্যাস করলেও তখন তাঁর সৈন্যদের আর পূর্বের শৃঙ্খলাবোধ বা মনোবল নেই। তাই যুদ্ধ ক্রমাগত তাঁর প্রতিকূলে যেতে লাগল। শেষ পর্য্যন্ত জয়ের আশা ত্যাগ করে তিনি মীরকাশিমের সঞ্চিত অর্থ হাতিয়ে নিয়ে স্বরাজ্যে ফেরবার উদ্দেশ্যে এক দিন তাঁকে নিজ তাঁবুতে ডেকে বললেন যে তাঁরা উভয়ে বাদশাহর হয়ে যুদ্ধ করছেন—নিজেদের জন্য নয়। সেই কারণে প্রথানুযায়ী যুদ্ধের ব্যয় উভয়কে হারাহারিভাবে বহন করতে হবে। প্রস্তাবটির পিছনে যুক্তি যাই থাকুক না কেন কোথায় পাবেন মীরকাশিম এত টাকা? কিন্তু উপায়ান্তরও তো নেই! নবাবী লাভের পর তিনি সিরাজউদ্দৌলার পরিত্যক্ত ধনভাণ্ডার থেকে ইংরাজের দেওয়া অর্থ ও মারাঠাদের দেওয়া চৌথ পরিশোধ করেছিলেন, এখন নিজস্ব ধনভাণ্ডার থেকে সুজাউদ্দৌলার দাবী মেটাতে অগ্রসর হোলেন। তাঁর তাঁবুতে রত্নালঙ্কার বাসন মোহর গিনি টাকা পয়সা যা কিছু ছিল সবই নিঃশেষ হয়ে গেল, কিন্তু তাতেও সুজাউদ্দৌলার দাবী মিটল না অথচ দাবীদার আরও আছে! বাকি বেতনের জন্য সমরু ও অন্যান্য অফিসাররা তাঁর উপর চাপ দিতে লাগলেন। উভয় পক্ষের নিপীড়নে বেগমদের সম্পূর্ণরূপে নিরাভরণ করে আশাভঙ্গ মীরকাশিম প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেলেন রোহিলখণ্ডে।

জামাতা বিজয়ী মীরজাফর মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে সুখে রাজ্যসুখ ভোগ করতে লাগলেন!

1 Mansur Ali Sayyad *Nawab-Nazims of Bengal p. 72-77*
2 Forrester G. W. *Life of Lord Clive*
3 Dodswell H. H. *Dupleix and Clive*

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড রূপে !

ক্লাইভের প্রত্যাবর্তন

পলাশী যুদ্ধের শেষে মীরজাফরকে মসনদে অভিষিক্ত করবার আড়াই বৎসর পরে রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী স্বদেশ যাত্রা করেন। সে যুদ্ধের পর পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী ও মীরজাফরের দেওয়া উপঢৌকন থেকে তিনি যে ৩৯ লক্ষ টাকা পেয়েছিলেন তার সবটাই পূর্বাহ্নে সেখানে পাঠান হয়েছিল। সেই অর্থ থেকে পিতামাতা ও ভগ্নীদের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে তিনি নিজের জন্য একটি বিরাট হর্ম ও জমিদারী ক্রয় করেন। এখন তিনি আর কোম্পানীর নগণ্য রাইটার নন, পলাশী-বিজয়ী বীর, ইংলণ্ডেশ্বরের লর্ড ও ভারত সম্রাটের ছয় হাজারী মনসবদার! সমগ্র ইংলণ্ডে তাঁর সমকক্ষ মর্য্যাদাশালী ব্যক্তি আর কে আছে? সহধর্মিণী মার্গারেটকে সঙ্গে নিয়ে লণ্ডনের খানদানি মহলে ঘোরাফেরা করেন ও স্বদেশের রাজনীতিতে গা ভাসিয়ে দেন। সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে কয়েকজন অনুচরসহ পার্লামেণ্টে নির্বাচিতও হন, কিন্তু ক্যাবিনেট গঠন করবার মত গরিষ্ঠতা পান না। জীবনতরী মন্দাক্রান্তা তালে চলতে থাকে!

বিপদ ঘটালেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়ারম্যান লরেন্স স্থলিভ্যান। তিনি ক্লাইভকে সাফ জানিয়ে দিলেন যে বাদশাহ শাহ আলম তাঁকে কলকাতা শহরটি জায়গীর দিলেও ওই শহরের উপর তাঁর কোন অধিকার থাকতে পারে না, কারণ বাংলার নূতন নবাবের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিবলে আগে থেকেই কলকাতাসহ সমগ্র চব্বিশ পরগণা জেলাটি কোম্পানীর। কি! বাদশাহর চেয়ে নবাব বড়? কুমড়োর চেয়ে বিচি? তারপর, কৃতজ্ঞতা বলে একটা কথা আছে তো! যে

কোম্পানীর জন্য তিনি এত করলেন তার কাছ থেকে এই ব্যবহার? স্নলিভ্যান কিন্তু নাছোড়বান্দা, কোম্পানীর দৌলতে ৩৫ বৎসর বয়স্ক যে যুবক এত উন্নতি করেছে তাকে তিনি আর বাড়তে দেবেন না। একজন প্রাক্তন রাইটারের প্রজা হয়ে কলকাতায় কুঠী রাখবার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না!

ক্রোধে ও ক্ষোভে ক্লাইভের মন অবসন্ন হয়ে পড়ল—তিনি একে একে কোম্পানীর সকল ডিরেক্টরের বাড়ীতে গিয়ে ধর্ণা দিলেন। কিন্তু মিষ্টি কথা ছাড়া কারও কাছ থেকে কিছু পেলেন না। অগত্যা তিন বৎসর অপেক্ষা করে কোম্পানীর নূতন ডিরেক্টর বোর্ড গঠনের সময়ে শেয়ারহোল্ডারদের প্রভাবিত করে স্নলিভ্যানের অপসারণ করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হোল না। লরেন্স স্নলিভ্যান পূর্বে যেমন চেয়ারম্যান ছিলেন তেমনি থেকে গেলেন। উপায়ান্তরবিহীন হয়ে ক্লাইভ তখন নিজের হকের জিনিস আদায় করবার জন্য এটর্নীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত চ্যান্সারী বা স্নপ্রীম কোর্টে কোম্পানীর নামে এক মামলা ঠুকে দিলেন। নামকরা কৌস্নলীরা উভয়পক্ষের কাগজ তৈরী করতে লাগলেন।

মামলাটি বেশী দূর গড়াবার পূর্বে কলকাতা থেকে একের পর এক ভয়াবহ খবর আসতে লাগল। নবাব মীরজাফরের জামাই মীরকাশিম নাকি শুধু শ্বশুরকে সরিয়ে ক্ষান্ত হয় নি, গিরিয়া যুদ্ধে ইংরাজ ফৌজকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করেছে এবং তারপর পাটনায় গিয়ে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল ইংরাজকে শমন সদনে পাঠিয়েছে। খবরটি একটু অতিরঞ্জিত হয়ে লণ্ডনে পৌছানয় লোকে জানল যে অন্ধকূপ হত্যার চেয়েও ভয়াবহ এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। সবাই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, মীরজাফরের মত শান্তশিষ্ট একজন ভদ্রলোককে সরিয়ে দিয়ে গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট এই নরাধমকে সমর্থন করেছিলেন কেন? কোম্পানীর ডিরেক্টররা তাঁর কাছে আদেশ পাঠালেন, তিনি যেন ফেরৎ জাহাজে দেশে চলে আসেন—জন স্পেনসার অস্থায়ীভাবে গভর্ণরের কাজ করবেন।

লর্ড ক্লাইভের উপর ডিরেক্টরদের আস্থা ফিরে এল। তাঁর বন্দোবস্ত বানচাল করবার ফলেই যে এই অনর্থ ঘটেছে সে বিষয়ে তাঁদের মনে সন্দেহ রইল না। সমস্ত ঘটনা পর্য্যালোচনা করবার জন্য শেয়ারহোল্ডারদের বিশেষ সভা আহূত হোল এবং তাঁদের নির্দেশে চেয়ারম্যান স্নলিভ্যান নিজের প্রেস্টিজের কথা আপাততঃ শিকায়

তুলে রেখে বাংলার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য ক্লাইভকে অনুরোধ জানালেন। তিনি রাজী, তবে একটি শর্তে! বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর জায়গীরটি ফিরিয়ে দিতে হবে। তিনি যে শুধু ইংলণ্ডেশ্বরের লর্ড তা নয়, হিন্দুস্থানের মহামান্য বাদশাহ শাহানশাহ শাহ আলমের ছয় হাজারী মনসবদার সাবুৎ জঙ্গ বাহাদুর এই সহজ সত্য কথাটি সব সময়ে স্মরণ রাখতে হবে। কোম্পানী তাঁর সকল শর্তে রাজী হওয়ায় উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সুপ্রীম কোর্ট থেকে মামলাটি তুলে নেওয়া হোল এবং তিনি আর একবার বাংলায় এসে ১৭৬৫ খৃস্টাব্দের ৩রা মে স্পেনসারের কাছ থেকে কার্য্যভার বুঝে নিলেন।

রায় দুর্লভ পরিকল্পনা

দীর্ঘ চার বৎসর পরে কলকাতায় ফিরে এসে ক্লাইভ শোনেন যে তাঁর নিজের তৈরী নবাব মীরজাফর মসনদ ফিরে পাবার চার মাস পরে দেহরক্ষা করেছেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণের বজ্রাঘাতে মৃত্যু হওয়ায় অপর এক পুত্র নজ্‌মউদ্দৌলা এখন নবাব। তবে সমস্ত রাজশক্তি পরিচালিত করছেন রাজা দুর্লভরাম সোম। তিনি পূর্বের মতই দেওয়ান-ই-আলা পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। বাপকা বেটা এই দুর্লভরাম! তাঁর পিতা রাজা জানকীরাম সোম আলীবর্দী খাঁর সময়ে অতি যোগ্যতার সঙ্গে বিহারের নায়েব-নাজিমের কাজ করেছিলেন, তিনি নিজেও বিভিন্ন উচ্চ পদে যোগ্যতার পরাকাষ্ঠা দেখান। অর্থনীতি ও সঙ্গীতজ্ঞানের জন্য তাঁর খ্যাতি বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। একবার মারাঠাদের কারাগারে অবস্থানের সময়ে তাঁর সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে নাগপুররাজ রঘুজী ভোঁসলের মহিষী তাঁকে মুক্তির আদেশ দেন। মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে তিনি অতি দক্ষতার সঙ্গে কাজকর্ম চালাতে থাকেন।

সিরাজউদ্দৌলার অভিষেকের সময়েও দুর্লভরাম ছিলেন দেওয়ান-ই-আলা। কলকাতার দ্বিতীয় যুদ্ধের সময়ে সেই নবাব নিজের হঠকারিতার জন্য ক্লাইভকে পরাজিত করেও তাঁর সঙ্গে অসম্মানজনক সর্তে সন্ধি করায় দোষ দেন তাঁকে। সেজন্য তাঁকে পদে অবনমিত ও তাঁর ভ্রাতা রায় রাসবিহারীকে প্রবঞ্চনা করায় তিনি বিরোধীপক্ষে যোগ দিতে বাধ্য হন। মীরজাফরের অভিষেকের পর রায় দুর্লভ পূর্বে যেমন দেওয়ান ছিলেন তেমনি থাকলেন বটে

কিন্তু দেখেন যে অর্থকৃচ্ছতার দরুণ সমস্যা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী জটিল হয়েছে। মীরজাফরের সঙ্গে কোম্পানীর গোপন চুক্তির সর্তানুযায়ী এক কোটী পঁচাত্তর লক্ষ টাকার মধ্যে তিন কিস্তিতে এক কোটী তের লক্ষ টাকা প্রদান করবার পর রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এই জন্যই তিনি সেই সন্ধি সম্পাদনের সময়ে এত অর্থ প্রদানের বিরোধীতা করেছিলেন।

এই অর্থকৃচ্ছতার মধ্যেও রায় দুর্লভ রাজকার্য্য চালাতে পারতেন যদি তাঁর নবাব মীরজাফরের সাধারণ বিচারবুদ্ধি থাকত। কিন্তু এক দিকে তাঁর অযোগ্যতা, অন্য দিকে তাঁর জামাতা মীরকাশিমের উচ্চাকাঙ্খা এবং সব কিছু ছাড়িয়ে ইংরাজের অর্থগৃধ্নুতা তাঁকে প্রতিনিয়ত ভাবিয়ে তুলছিল। ইংরাজের তাগাদায় অস্থির হয়ে তিনি নবাবের সম্মতিক্রমে চব্বিশ পরগণা জেলাটি তাদের ফৌজের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রদান করেন। সংশ্লিষ্ট সনদে দস্তখত করেন নবাব মীরজাফর, তিনি ও তাঁর পুত্র রাজবল্লভ। কিন্তু তাতেও ইংরাজের ক্ষুধা মিটল না বা মীরকাশিমের চক্রান্ত শেষ হোল না। তিন দৈত্যের দ্বন্দ্বে ক্ষীর সমুদ্রে হলাহল উঠতে লাগল—কিন্তু অমৃতের সন্ধান পাওয়া গেল না। তাই দেখে দেওয়ান দুর্লভরাম বুঝলেন যে সমস্ত শাসন ক্ষমতা তাঁর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে রয়েছে সত্য, কিন্তু এই তিন পক্ষের মধ্যে সমন্বয় সাধিত না হোলে রাষ্ট্রতরীকে নিমজ্জনের হাত থেকে বাঁচান যাবে না। তাই সকল দিক বিবেচনা করে তিনি যে পরিকল্পনা রচনা করে নবাব মীরজাফর ও গভর্নর হলওয়েলের সম্মুখে উপস্থাপিত করেন তার সারমর্ম এই—

(১) বাদশাহ শাহ্ আলমকে তিন সুবার সর্বোচ্চ অধীশ্বর বলে মেনে নিয়ে তাঁর প্রাপ্য ক্ষমতা ও মর্য্যাদা প্রদান করা হোক। তাঁকে এভাবে কোণঠাসা করে রেখে কারও লাভ হচ্ছে না।

(২) কোম্পানী তার বর্তমান ভূমিকা ত্যাগ করে তিন সুবার শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করুক।

(৩) কোম্পানী একাধারে নাজিম, দেওয়ান ও বক্সির কাজ করুক—তবে বাদশাহর প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিরূপে এবং দিল্লী দরবারের নিয়ন্ত্রণাধীনে।

(৪) মীরজাফর কোম্পানীর অধীনে তিন সুবার নায়েব-নাজিম এবং মীর-কাশিম নায়েব-দেওয়ানের কাজ করুন।

(৫) তিনি, দেওয়ান দুর্লভরাম, স্বেচ্ছায় কোম্পানীর অনুকূলে নিজের পদ পরিত্যাগ করে কোম্পানীর অধীনে তিন সুবার বক্সির কাজ করবেন।

মীরজাফর পরিকল্পনাটির উপর বিশেষ গুরুত্ব না দিলেও হলওয়েল এই নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করেন। রায় দুর্লভ উভয় পক্ষকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তাঁরা যদি এই পরিকল্পনা সমর্থন করেন তাহোলে তিনি নিজে দিল্লীতে গিয়ে বাদশাহর অনুমোদন লাভের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। যদি হলওয়েল আর কিছু দিন স্বপদে বহাল থাকতেন তা হোলে পরিকল্পনাটি হয় তো গৃহীত হোত, কিন্তু তাঁর প্রস্থানের পরই মীরকাশিম পরবর্তী গভর্ণর ভেরেলেষ্টকে মোটা টাকা নজরানা দিয়ে শ্বশুরের স্থলাভিষিক্ত হন—রায় দুর্লভ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ

কলকাতায় ফিরে এসে ক্লাইভ রায় দুর্লভ পরিকল্পনা বিশ্লেষণ করে বুঝলেন যে এই সুচিন্তিত পরিকল্পনাটি গ্রহণ করলে মীরকাশিমের এত বাড়বাড়ন্ত হোত না, পাটনায় এতগুলি ইংরাজ নরনারীর জীবনাবসান ঘটত না। কিন্তু এটিকে রূপ দেবার জন্য দুর্লভরামকে সুযোগ না দিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদে চলে গিয়ে নূতন নবাব নজমউদ্দৌলাকে অনেক সান্ত্বনার কথা শোনালেন, তাঁর অভিন্নহৃদয় সুহৃদ মহম্মদ জাফর আলীর খাঁর মৃত্যুতে যে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছেন সে কথা জানিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, নবাব নবাবী করবেন—কোন ঝামেলার মধ্যে যাবেন কেন? সে জন্য তো কোম্পানী রয়েছে। কোম্পানী থাকতে নবাবের আরামে বিঘ্ন ঘটায় কে? নজমউদ্দৌলা বুঝলেন কথাটা সত্য, দেওয়ান-ই-আলা রায় দুর্লভ তাঁর পিতাকে এইরূপ কথাই বলেছিলেন। তখন তাঁর কথা নিলে ভগ্নিপতি এত ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারত না।

পূর্ব বৎসর বক্সার যুদ্ধে সুজাউদ্দীনের পরাজয়ের পর ইংরাজ অফিসারদের নেতৃত্বে মীরজাফরের ফৌজ এলাহাবাদ ও কোরা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে ওই অঞ্চল দুইটি কোম্পানীর অধিকারভুক্ত রয়েছে। এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিয়ে যে কি করা যায় ভ্যান্সিটার্ট বা তাঁর পরবর্তী গভর্ণর স্পেনসার কিছু স্থির করতে পারেন নি। তাঁরা মীরজাফরকে মসনদ ফিরে পেতে সাহায্য করেছিলেন

বটে, কিন্তু তাঁর রাজ্য সম্প্রসারণের দায়িত্ব তো নেন নি। আবার কোম্পানীর পক্ষে রাজ্য জয়ের প্রশ্নই ওঠে না—ডিরেক্টরদের কাছ থেকে সেরূপ কোন নির্দেশ নেই। ভূভাগটির স্থিতাবস্থা বজায় রেখে স্পেনসার বিদায় নিলে ক্লাইভ দাবার চাল চালতে বসলেন। তাঁর কাছ থেকে অঞ্চল দুটি ফিরে পাবার আশায় সুজাউদ্দীন ও কাশীরাজ মূল্যবান উপঢৌকন পাঠালেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ না করে চলে গেলেন বাদশাহর দরবারে।

অঞ্চল দুটি হয়ে দাঁড়াল ক্লাইভের তুরুপের তাস। বাদশাহ শাহ্ আলমের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানালেন যে তাঁর ছয় হাজারী মনসবদার হিসাবে অযোধ্যার অবাধ্য নবাব ও কাশীর কুচক্রী রাজার কাছ থেকে তিনি ভূভাগ দুইটি কেড়ে নিয়েছেন বটে, কিন্তু নিজের বা কোম্পানীর জন্য নয়। বাদশাহর রিয়াসতের উপর তাঁর কোন লালচ নেই। বেইমানদের হাত থেকে শাহান্ শাহ বাদশাহর হকের জিনিষ উদ্ধার করে তাঁর হাতে তুলে দিতে পারলে তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করবেন। মহামান্য বাদশাহ যদি মেহেরবানি করে জেলা দুটি গ্রহণ করেন তাহোলে খাদেম কৃতার্থ হবে! ফিরিঙ্গী মনসবদারদের এই রাজভক্তি দেখে বাদশাহর হৃদয় গলে গেল। ক্লাইভ বলে চললেন: বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় যে বে-বন্দোবস্ত চলছে বাদশাহর খিদমদের জন্য তিনি তার মোকাবিলা করতে চান। নজ্মউদ্দৌলা নবাব আছেন—থাকুন। কিন্তু আলীবর্দী খাঁর পর থেকে সেখানে যে সব গোলমাল সুরু হয়েছে তা দূর না হোলে না বাদশাহ না কোম্পানী কারও ভালাই হবে না। খাজনা যা আদায় হয় তাতে শাসনকার্য্যের ব্যয় সংকুলান হয় না—বাদশাহ একটি কৌড়ীও পান না। কোম্পানীকে যদি দেওয়ানের কাজ করতে দেওয়া হয় তাহোলে তিনি দেখিয়ে দেবেন ওই তিন সুবা থেকে কত টাকা আমদানী হোতে পারে।

শাহ্ আলম দেখলেন যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নামেই তাঁর সাম্রাজ্যের তিনটি সুবা হয়ে রয়েছে। উড়িষ্যা আবার মারাঠাদের বেদখলে রয়েছে। তাঁর পক্ষে ওই সুবা তিনটির উপর নিজ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা আপাততঃ সম্ভব নয়। ফিরিঙ্গী বেনিয়াদের দ্বারা হয় তো সে কাজ হতে পারে ভেবে ১৭৬৫ সালের ১১ই আগষ্ট ক্লাইভকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা পেশকাসের বিনিময়ে তিন সুবার দেওয়ান নিযুক্ত করলেন। ক্লাইভ বললেন, তিনিও যা কোম্পানীও তাই। মহামান্য

বাদশাহর ছয় হাজারী মনসবদার হিসাবে তিনি দরকারের সময় লড়াই করবেন, কিন্তু কোম্পানী চালাবে লেনদেনের কাজগুলো। সেই কারণে দেওয়ানীর দায়িত্বটি যেন কোম্পানীর হাতে অর্পণ করা হয়। বাদশাহ বললেন : তথাস্তু।

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিল !

1 Forrester G. W. *Life of Lord Clive*

2 Dodwell H. H. *Dupliex and Clive*

উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়

মধ্যযুগের অবসান

পট পরিবর্তন

বাদশাহ শাহ আলম প্রদত্ত সনদের বলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দৃশ্যতঃ প্রাক্তন দেওয়ান দুর্লভরামের স্থলাভিষিক্ত হোলেও দুই নিয়োগের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল। আলীবর্দী খাঁর সময় থেকে রায় দুর্লভ পর পর তিনজন নবাবের অধীনে দেওয়ানের কাজ করেছিলেন বটে কিন্তু তাঁর চাকুরী নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট নবাবের মর্জির উপর। পক্ষান্তরে কোম্পানী ছিল বাদশাহর দেওয়ান, তার উপর খবরদারি করবার অধিকার নবাবের ছিল না। এই অপরূপ ব্যবস্থায় শাহ আলম সহজে সম্মতি দেন নি। তাই তাঁকে খুসী করবার জন্য ক্লাইভ এইভাবে সনদের মুসাবিদা তৈরী করেন যে নবাবেরও একটি নিজামত থাকবে এবং তার পরিচালনা করবেন তাঁর নিজস্ব দেওয়ান। সেজন্য বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা অর্থেরও বরাদ্দ করা হয়েছিল, কিন্তু দুই দেওয়ানের অধিকার ও দায়িত্বের সীমারেখা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকায় মহা সমস্যার সৃষ্টি হয়।

বাদশাহী সনদ লাভের পরই কোম্পানী তার কলকাতা অফিসে তিন সুবার শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ খোলে এবং বিভিন্ন কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ করে। মুন্সী নবকৃষ্ণ ছিলেন ক্লাইভের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ব্যক্তি—তাঁর উপর চব্বিশ পরগণা জেলার রাজস্ব আদায় ব্যতীত আরও কয়েকটি দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অনুরূপ আর এক ব্যক্তি ছিলেন মহারাজা নন্দকুমার; তাঁর সাহায্য না পেলে ইংরাজ ফৌজের পক্ষে চন্দননগর অধিকার বা পলাশীতে পৌছান সম্ভব হোত না। সে

কথা স্মরণ করে ক্লাইভ তাঁকে নিজের একান্ত সচিব নিয়োগ করেন আরও বহু ব্যক্তি বহু উচ্চ.পদে নিযুক্ত হন।

সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদের উৎখাত করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। রাজা মানিকচাঁদের উপর ক্লাইভের জাতক্রোধ ছিল, কারণ কলকাতা ও পলাশীতে তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। সেই কারণে তাঁকে রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করতে হয়, তাঁর পুত্ররা বালি-উত্তরপাড়া ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করে। দুর্লভরাম স্বপক্ষীয় হোলেও মীরজাফরের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিলেন বলে ক্লাইভ তাঁকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। তার উপর সকল বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রভাব ও প্রতিভাশালী। এরূপ লোককে বাড়তে দিলে কোম্পানীর যাত্রাপথ সুগম হবে না বুঝে তাঁকে সুকৌশলে অপসারিত করে মহম্মদ রেজা খাঁকে নবাব নজ্‌মউদ্দৌলার দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়।

এইভাবে কলকাতায় বাস করতে থাকে বাদশাহর দেওয়ান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী, আর মুর্শিদাবাদে বাস করতে থাকে নবাবের দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ। দুই দেওয়ানের চাপে জনজীবন বিড়ম্বিত হয়ে ওঠে!

সাহেব-বিবি-গোলাম সমাজের উদ্ভব

তখনও রাজধানী মুর্শিদাবাদে থাকলেও দিন যত এগোতে লাগল ততই প্রতিভাত হোল যে ওই নগরীকে রাহুতে গ্রাস করছে—কলকাতার জৌলুস দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজের সাম্রাজ্যিক প্রয়োজনে এই নগরীতে একটি নূতন সমাজ গড়ে উঠছে। পুরাপুরি দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ দিয়ে গঠিত এই সমাজটি হয়ে দাঁড়ায় নির্মায়মাণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ; সেই সাম্রাজ্যকে অবলম্বন করে এই নূতন সমাজও ফুলেফেঁপে ওঠে। আবার দুই শতাব্দী পরে তার ক্ষয়প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজটিও ক্ষয় হয়ে যায়। পরগাছা যেমন মূল বৃক্ষের গুণ পায় না এরাও তেমনি ইংরাজের মহৎ গুণগুলি বেশী আয়ত্ব করতে পারে নি, অথচ দোষগুলি ভালভাবে অনুকরণ করে।

এই সমাজের. পুরোধা নবকৃষ্ণ ব্যাবহর্তা ছিলেন মুড়াগাছা পরগণার এক দরিদ্র প৷রিবারের সন্তান। রাজ সরকারে চাকুরী লাভের আশায় ভাল করে

ফার্সী শিখে তিনি কোম্পানীর জনৈক কেরাণী ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রাইভেট টিউটর হিসাবে জীবন সুরু করেন। উভয়ে সমবয়স্ক হওয়ায় ধীরে ধীরে তাঁদের মধ্যে যথেষ্ট সখ্যও স্থাপিত হয়। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সময়ে পত্রালাপের গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ক্লাইভ কোম্পানীর মুসলমান মুন্সী তাজউদ্দীন খাঁকে বিদায় দিয়ে নবকৃষ্ণকে সেই কাজে নিযুক্ত করায় তাঁর জীবনে নূতন অধ্যায় সুরু হয়। ক্লাইভের নির্দেশে মীরজাফরের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিপত্র থেকে সুরু করে বাদশাহ শাহ আলম প্রদত্ত দেওয়ানীর সনদ পর্য্যন্ত সকল দলিলের মুসাবিদা করেন তিনি। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ক্লাইভ বাদশাহকে ধরে তাঁকে মহারাজা উপাধি পাইয়ে দেন। কেউ কেউ বলেন, মনসবদারীও পাইয়ে দিয়েছিলেন। একথা সত্য হোলে সমগ্র মোগল যুগে তিনিই একমাত্র বাঙালী মনসবদার।

মীরজাফরের অভিষেকের পর ক্লাইভ ও অন্যান্য ইংরাজরা যখন মুর্শিদাবাদ রাজকোষ থেকে পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্য টাকা বুঝে নিচ্ছিলেন সেই সময়ে নবকৃষ্ণ, রামচাঁদ রায় ও আমীর বেগ খাঁ মীরজাফরের সঙ্গে নবাব প্রাসাদে প্রবেশ করে নবাবের নিজস্ব ধনাগার থেকে কয়েক লক্ষ টাকার রত্নালঙ্কার সরিয়ে ফেলেন। এই আলাদীনের প্রদীপ স্পর্শে ষাট টাকা বেতনের মুন্সী নবকৃষ্ণ রাতারাতি ধনকুবের হয়ে বসেন! সেই অর্থ দিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর শোভাবাজার রাজবংশ ও রামচাঁদ রায়ের আন্দুল রাজবংশ।

কলকাতার সকল প্রাচীন বংশের ইতিহাস এই। মুন্সী, গোমস্তা, নায়েব, ছোট ব্যবসায়ী প্রভৃতি স্তর থেকে উদ্ভূত এই বংশগুলি ইংরাজের কাঁধে ভর করে বেড়ে ওঠে। কিন্তু ইংরাজ যখন জাতিকে নূতন করে গড়ে তুলছিল তখন এদের সকল শক্তি নিবদ্ধ ছিল নিজেদের স্বার্থসাধন প্রচেষ্টায়। নীতিজ্ঞানের ধার এরা বিশেষ ধারত না। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়েও প্রজাপীড়ন করে অর্থ আদায় করতে এদের কারও বাধে নি। অর্থের জৌলুসে মহারাজা নবকৃষ্ণ সাত-সাতটি সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন; তা সত্ত্বেও তাঁর নামে একবার আদালতে নারী ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। কিন্তু তাঁর বিচার করবে কে? তিনি ছিলেন নূতন বৃটিশ শক্তির বৃহত্তম স্তম্ভ—সাহেব-বিবি-গোলাম সমাজের অন্যেরাও ছিলেন এক একটি ক্ষুদ্রতর স্তম্ভ।

এই দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সমাজের সামাজিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণরা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় ও তাঁদের অনুসরণ করে অন্যেরা আসে। সবাই মিলে বিলাসবাহুল্যে কলকাতার সমাজ জীবন আবিলতাময় করে তোলে। কিন্তু প্রাথমিক উদ্দামতা দূর হবার পর এই সমাজের মধ্য থেকে নূতন একটি শ্রেণী আবির্ভূত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে নূতন রূপ দেয়।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

পূর্বে বলেছি যে তিন সুবায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তনের ফলে জনসাধারণ মহা অনর্থের সম্মুখীন হয়। এক দিকে নবাবের কর্মচারীরা তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে, আবার অন্য দিকে কোম্পানীর লোকজন রাজকরের জন্য তাগাদা দেয়। বণিকের নৈপুণ্য—কোথাও কোন ফাঁক থাকে না, কেউ এক পয়সা ফাঁকি দিতে পারে না। কোম্পানীর কর্মচারীরা যেখানে পারে নিজেরা আদায় করে, যেখানে পারে না সেখানে নবাব নজ্মউদ্দৌলার দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁর উপর চাপ দেয়। তার উপর প্রকৃতি বিমুখ হয়ে মানুষের জীবন দুর্বিসহ করে তোলে। '১১৭৪ সালে ভাল ফসল হয় নাই, সুতরাং ১১৭৫ সালে চাল কিছু মহার্ঘ হইল—লোকের ক্লেশ হইল, কিন্তু রাজা কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব বুঝিয়া লইল। রাজস্ব কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিয়া দরিদ্ররা এক সন্ধ্যা আহার করিল। ১১৭৫ সালের বর্ষাকালে বেশ বৃষ্টি হইল। লোকে ভাবিল দেবতা বুঝি কৃপা করিলেন। আনন্দে রাখাল আবার মাঠে গান গাহিল, কৃষক পত্নী আবার রূপার পৈচার জন্য স্বামীর কাছে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। অকস্মাৎ আশ্বিন মাসে দেবতা বিমুখ হইলেন। আশ্বিনে ও কার্ত্তিকে বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পড়িল না, মাঠে ধান্যসকল শুকাইয়া খড় হইয়া গেল, যাহা দুই এক কাহন ফলিয়াছিল রাজপুরুষেরা তাহা সিপাহীদের জন্য কিনিয়া রাখিলেন। লোকে আর খাইতে পাইল না। প্রথমে এক সন্ধ্যা উপবাস করিল, তারপর এক সন্ধ্যা করিয়া আধপেটা খাইতে লাগিল, তারপর দুই সন্ধ্যা উপবাস করিল।

'মহম্মদ রেজা খাঁ রাজস্ব আদায়ের কর্তা, মনে করিল, আমি এই সময়ে সরফরাজ হইব। একেবারে শতকরা দশ টাকা রাজস্ব বাড়াইয়া দিল। বাংলায় বড় কান্নার রোল পড়িয়া গেল।......অনেকে পলাইল, যাহারা পলাইল, তাহারা

বিদেশে গিয়া অনাহারে মরিল। যাহারা পলাইল না তাহারা অখাদ্য খাইয়া, না খাইয়া, রোগে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল।'

আনন্দমঠ বর্ণিত এই মহা মন্বন্তরের হাত থেকে বিহারও রক্ষা পায় নি। দিবাকর বলেন, জনৈক ইংরাজ কুঠিয়ালের হিসাব মতে এপ্রিল মাসে কেবলমাত্র পাটনা শহরে ১৫০ জনেরও অধিক নরনারী প্রতি দিন অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। কোম্পানী ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের ৯ই মে এক পত্রে ডিরেক্টরদের জানায় যে পূর্ণিয়ার মত শস্যসম্ভরা জেলাতেও এক-তৃতীয়াংশ অধিবাসী অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করেছে। পূর্ণিয়া কুঠির অধ্যক্ষ ডুকারেল ২৮শে এপ্রিল তারিখে এক রিপোর্টে জানান, এই সেদিন পর্য্যন্ত যে পূর্ণিয়া খাদ্যশস্যে বাড়তি জেলা ছিল এখন তাকে চেনা যায় না। দরিদ্রদের দুর্দশা বর্ণনাতীত। এমন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না যে দিন ৩০।৪০ জন লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ না করে।...আলমগড় বাজারে লোক-সংখ্যা এতই হ্রাস পেয়েছে যে শহরের একটি বড় অংশ বন্য জীবজন্তুর আবাসভূমিতে পরিণত হয়েছে।*

বৃটিশ সরকারের অনুপ্রবেশ

বাঙালীরা সেই মহামন্বন্তর মুখ বুজে সহ্য করলেও নবজাগ্রত দেশ ইংলণ্ডে সংবাদটি পৌছালে জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। সবাই বলতে থাকে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রাজকীয় চার্টার দেওয়া হয়েছিল প্রাচ্য দেশে গিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য চালবার জন্য, কোন দেশের শাসনব্যবস্থায় খবরদারী করবার জন্য নয়। বাংলায় সে কাজ হাতে নিয়ে কোম্পানী এই যে লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করাল তার ক্ষতিপূরণ কি ভাবে হবে? চার দিক থেকে দাবী উঠল, কোম্পানীকে সংযত করা হোক—কোম্পানী কোম্পানী থাকুক, কোন দেশের শাসনব্যবস্থায় যেন নাক না গলায়।

রাজনীতিকরা এখন যেমন ধুরন্ধর ব্যক্তি তখনও তাই ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ দেখলেন যে অ্যামেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ইংরাজ বাহিনীর পরাজয়ের ফলে তাঁর সরকারের যে মর্য্যাদাহানি ঘটেছে এই জন-বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে ভারতের ঘাড় থেকে তা সুদে আসলে উশুল করে

* Diwakar R. R. *Bihar through the ages*, p. 588-89

নেওয়া যাবে! অ্যামেরিকা হাতছাড়া হওয়ায় তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত নেই। যখন রাজপ্রাসাদের যান তখন দেখেন রাজা তৃতীয় জর্জের মুখ গম্ভীর; আবার পার্লামেণ্টে গিয়ে বার্কের (Edmund Burk) জ্বালাময়ী বক্তৃতায় অস্থির হয়ে ওঠেন। ফক্সও (C. J. Fox) তাঁর বিরোধী—মাঝে মাঝে টিপ্পনী কাটেন। কেবলমাত্র এডওয়ার্ড থুরলো ও উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণের উপর নির্ভর করে তাঁর মন্ত্রিসভা কোনক্রমে টিকে রয়েছে। শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা এমন হয়ে পড়ল যে ফক্সকে দলে টেনে নিয়ে লর্ড নর্থ তাঁর মন্ত্রীসভা সম্প্রসারিত করতে বাধ্য হোলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নিয়ন্ত্রিত করবার দায়িত্ব অর্পিত হোল তাঁর উপর। একই সঙ্গে কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ ও তার কাঁধে ভর করে ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে ফক্স তাঁর ইণ্ডিয়া বিল রচনা করেন।

বিলটি যথারীতি ক্যাবিনেটে আলোচিত হবার পর পার্লামেণ্টের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হয়। বিষয়বস্তুর গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকারী ও বিরোধী উভয়পক্ষের প্রায় সকল সদস্য সেই অধিবেশনে এসে যোগ দেন, কিন্তু সবার প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে কেউ কোন দিন ভারতবর্ষ দেখেন নি; দেশটির সঠিক অবস্থান সম্বন্ধেও অনেকের কোন স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। কিন্তু এসব তুচ্ছ কারণে রাজনীতিকরা ঘাবড়ে যান না; তাঁরা চিরদিনই ত্রিকালদর্শী—সর্বজ্ঞ! বিলটির আলোচনার সময়ে একের পর এক সভ্য উঠে বক্তৃতার খই ফোটাতে লাগলেন এবং এরূপ দুর্ভিক্ষের যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার দাবী জানালেন। সরকারপক্ষীয় অনেকে বললেন যে কোম্পানীকে অতিরিক্ত স্বাধীনতা দিয়ে লর্ড নর্থ ভাল কাজ করেন নি। কিন্তু বিরোধীরা অত সহজে ছাড়বে কেন? তাঁরা সোজা বলে দিলেন যে বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য লর্ড নর্থই দায়ী! তিনি যদি সময়মত ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন তাহোলে লক্ষ লক্ষ নরনারী অনাহারে প্রাণ হারাত না। কি! এত বড় কথা! জনৈক উৎসাহী সরকার-পক্ষীয় সদস্য দাঁড়িয়ে বললেন যে নর্থ সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য বিরোধীরা কোম্পানী মারফৎ সমস্ত খাদ্যশস্য সরিয়ে ফেলেছিল বলে অতগুলি লোক প্রাণ হারিয়েছে।

এইভাবে দুদিন ধরে বাদানুবাদের পর ফক্সের ইণ্ডিয়া বিল ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যেভাবে পার্লামেণ্টে গৃহীত হয় তার বিধান অনুসারে

ভারতের বৃটিশ অধিকৃত (!) অঞ্চলের শাসনকার্য্য পরিচালনার জন্য একজন গভর্ণর জেনারেল থাকবেন এবং তাঁর দায়িত্ব হবে এক দিকে কোম্পানীর স্বার্থরক্ষা এবং অন্য দিকে সুচারুরূপে শাসনকার্য্য পরিচালনা করা। বিলটি গৃহীত ও পরে যথারীতি রাজা তৃতীয় জর্জের সম্মতি লাভ করলেও বার্ক প্রমুখ বহু বিরোধী সদস্যের সমালোচনা তাতে শেষ হয় নি। বাদশাহ শাহ আলম প্রদত্ত সনদ থেকে তাঁরা দেখান যে কোম্পানীকে তিন সুবার দেওয়ানী দেওয়া হয়েছে—কোন অঞ্চলের উপর সার্বভৌম অধিকার দেওয়া হয় নি। সেক্ষেত্রে বৃটিশ পার্লামেণ্টে পাশ করা আইন সে দেশের উপর জারী হয় কিভাবে ?

এই বিরোধীতার ফলে নর্থ মন্ত্রীসভার পতন হয় এবং লর্ড নর্থ রাজনীতি থেকে চিরবিদায় নেন। কিন্তু ইণ্ডিয়া বিল বহাল থাকে এবং তার বলে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ভারতের গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন।

ওয়ারেন হেষ্টিংস

পলাশীর প্রান্তরে যে কয়জন ইংরাজ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তখন তাঁর বয়স ২৫ বৎসর। সেই যুদ্ধের পরিকল্পনায় তাঁর কোন হাত না থাকলেও যুদ্ধ শেষে মুর্শিদাবাদ রাজকোষের অর্থ যখন পূর্ব চুক্তি অনুযায়ী ভাগাভাগি হয় তখন তিনি একটা মোটা অংশ পান। যুদ্ধের সময়ে ক্লাইভ তাঁর শৌর্য্যের পরিচয় পেয়ে তাঁকে মীরজাফরের দরবারে কোম্পানীর এজেণ্ট নিযুক্ত করেন। সে কাজে অর্থোপার্জনের সুযোগ বিশেষ ছিল না, কিন্তু পরে মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে তিনি কোম্পানীর ফৌজের জন্য ষাঁড় ও জ্বালানী কাঠ সরবরাহের কণ্ট্রাক্ট নিয়ে মোটা টাকা উপার্জন করেন।

হেষ্টিংসের জন্ম হয় ইংলণ্ডের অক্সফোর্ডশায়ার জেলার চার্চিল গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে। জন্মের পরই জননী পরলোক গমন করায় পিতা তাঁকে এক পিতৃব্যের কাছে সমর্পণ করে পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চলে যান। এই পিতৃব্যের তত্ত্বাবধানে গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা সমাপনের পর তিনি ওয়েষ্টমিনিষ্টার মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখানে কবি কাউপার, ইলাইজা ইম্পে, চার্লস চার্চিল,

এডওয়ার্ড থুরলো ও লর্ড সেলবার্ণ তাঁর সহধ্যায়ী ছিলেন। ভবিষ্যৎ কালে এই তরুণগণ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অতি উচ্চ স্তরে আরোহণ করেন। পিতৃব্যের অকাল মৃত্যুর জন্য হেষ্টিংসকে এই মনীষীগণের সাহচর্য্য ত্যাগ করে ভারতে চলে আসতে হয় কোম্পানীর রাইটারের চাকুরী নিয়ে।

কলকাতার প্রথম যুদ্ধের সময়ে তিনি কোম্পানীর কাশিমবাজার কুঠীতে নিযুক্ত ছিলেন; সেই যুদ্ধে পরাজয়ের পর অন্যান্য পলাতক ইংরাজদের সঙ্গে ফলতায় গিয়ে আশ্রয় নেন। সেখানে তাঁর এক সহকর্মী জন বুকাননের বিধবা পত্নীর সঙ্গে বিবাহ হয়। দুইটি সন্তানও জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু চার বৎসরের মধ্যে উভয় সন্তান ও স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় সুখের নীড় ভেঙ্গে যায়!

মনের দুঃখে কয়েক মাসের ছুটি নিয়ে হেষ্টিংস ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরে যান। সেখানে ক্লাইভের সুপারিশে মাদ্রাজ কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হয়ে ভারতে ফেরবার সময়ে জাহাজে আলাপ হয় ব্যারণ ইমহোপ ও তাঁর সুন্দরী স্ত্রী মেরিয়ার সঙ্গে। যদিও লেডি মেরিয়া বয়সে হেষ্টিংসের চেয়ে আট বৎসরের বড় ও দুই সন্তানের জননী, তবু তাঁর রূপলাবণ্য ও উদ্দাম প্রকৃতি তাঁর মনে মাদকতা জাগায়। ব্যারনেসেরও একই অবস্থা! গোড়ার দিকে ইমহোপ উভয়ের এই অন্তরঙ্গতা দেখেও দেখেন নি, নিজের চিত্রাঙ্কণের মধ্যে ডুবে থাকতেন। কিন্তু এক দিন দেখেন যে তাঁর লেডির মন এত দূরে সরে গেছে যে তাকে ধরে রেখে লাভ হবে না। দুষ্টা ভার্য্যা বিষধর সর্পের মতই ভয়ঙ্কর!

হেষ্টিংসকে নিভৃতে ডেকে ইমহোপ বললেন: বাপু, তুমি যে এমন মিটমিটে ডান তা তো আমি জানতাম না। জন্মের পরই তোমার মা মারা গেছেন এবং এখন স্ত্রীপুত্ররাও পরলোকে দেখে তোমাকে এত স্নেহ করতাম, কিন্তু মায়ের চেয়ে না হোলেও খুড়ীর চেয়ে বয়সে বড় আমার লেডির দিকে যে নজর দেবে এমন কথা আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি। ব্যাপারটা যখন অনেক দূর গড়িয়েছে তখন এ নিয়ে আর লোক হাসাহাসি করবার দরকার নেই। আমার মেমসাহেবকে যদি নিতেই হয় নাও, তবে সেজন্য যথোচিত কাঞ্চনমূল্য দিতে হবে। টাকা পেলে আমি তোমার পথ সাফ করে দেব! তুমি তো ইণ্ডিয়া থেকে কম টাকা কামাও নি, তার একটা অংশ দিলে আমার আর কিছু বলবার থাকবে না—আমি মনের সুখে ছবি আঁকব। টাকা

দিতে হেষ্টিংস রাজী, তবে পরিমাণটা শুনে তাঁর চক্ষু কপালে উঠল। কিন্তু ব্যারণ এক পয়সাও কমাতে রাজী নন, যেখানে তাঁর ইজ্জতের প্রশ্ন সেখানে দর কষাকষি চলবে না! অগত্যা হেষ্টিংস তাতে সম্মত হোলে তিনি জার্মানীতে চলে গিয়ে অতি সঙ্গোপনে পত্নীকে তালাক দেন। নববধূকে নিয়ে হেষ্টিংস আবার সংসার পাতেন।

ক্লাইভের মত হেষ্টিংসও এদেশে এসেছিলেন কোম্পানীর কেরাণী হয়ে। তাঁরও প্রথম কর্মস্থল ছিল মাদ্রাজ। অন্ধকূপ হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে যে সব ইংরাজ বাংলায় এসেছিল তিনি ছিলেন তাদের একজন। কলকাতা, চন্দননগর ও পলাশীর রণক্ষেত্রে সাহসিকতা দেখিয়ে তিনি ক্লাইভের সুনজরে পড়েন এবং সেই সূত্র ধরে তাঁর জীবনের উন্নতি সুরু হয়। ক্লাইভেরই সুপারিশে মাদ্রাজ কাউন্সিলের সভ্যপদ লাভ করে তিনি ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে আবার ভারতে আসেন।

ইতিমধ্যে বাংলায় বহু পরিবর্তন হয়ে গেছে। কোম্পানী এখন তিন সুবার দেওয়ান। সেই কারণে শাসনকার্য্যের বহু দায়িত্ব তার ঘাড়ে এসেছে। ছিয়াত্তরে মন্বন্তরের খবরে ইংল্যাণ্ডের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলে সেই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবার জন্য কোম্পানী যখন নূতন রক্তের সন্ধান করছিল সেই সময়ে ক্লাইভ ডিরেক্টরদের কাছে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নাম সুপারিশ করেন। তাঁরা সে সুপারিশ গ্রহণ করায় তিনি কলকাতায় এসে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল জন কার্টিয়ারের কাছ থেকে গভর্ণরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তার পরই বৃটিশ সরকার কোম্পানীর কাজ কারবারে হস্তক্ষেপ করে ও ফক্সের ইণ্ডিয়া বিল পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের গুণাবলী পর্য্যালোচনা করে লর্ড নর্থ যখন বুঝলেন যে তাঁর উপর দায়িত্ব অর্পণ করা চলে তখন তাঁর পদোন্নতি করে ভারতের প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত করেন। বেতন বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র হেষ্টিংসের মধ্যে ক্লাইভের সামরিক প্রতিভা না থাকলেও কূটনীতিজ্ঞান কিছু কম ছিল না। শাসনভার গ্রহণের পর তিনি কর্মদক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখান। মীরজাফর ও মীরকাশিমের মত তাঁকেও শূন্য রাজকোষ নিয়ে শাসনকার্য্য সুরু করতে হয়েছিল বলে অর্থ

সংগ্রহের জন্য তিনি বহু জবরদস্তিমূলক কাজ করেন, কিন্তু তাঁর পূর্বসূরী নবাবরা যেমন দিল্লীশ্বরকে অগ্রাহ্য করতেন তিনি নিজের নিয়োগকারী কোম্পানী ও রাজা তৃতীয় জর্জকে কোন দিন তা করেন নি। এক দিকে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ দেখতেন এবং অন্য দিকে বৃটেনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে শাসিতদের আশা আকাঙ্খার প্রতি মর্য্যাদা দেখাতেন।

কোম্পানীর শাসনব্যবস্থা বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে এক দিন যে দমকা হাওয়া এসে অট্টালিকাকে ধূলিসাৎ করে দেবে একথা বুঝে নিয়ে হেষ্টিংস মহীশূর ও মারাঠা শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সঙ্গে সঙ্গে নিজ অধিকারের মধ্যে শাসনযন্ত্রকে ঢেলে সাজান ও রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধন করেন। তাঁর অদ্ভুত কর্মশক্তির ফলে যে বাংলার আর্থিক সঙ্গতি মুর্শিদ কুলী খাঁর পর থেকে নিম্নগামী হোতে হোতে মীরকাশিমের সময়ে শূন্যাঙ্কের নীচে নেমে গিয়েছিল তিন দশকের মধ্যে পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময়ে তা স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অধমর্ণ উত্তমর্ণে পরিণত হয়।

বাংলায় রেনেসাঁ

ওয়েষ্টমিনিষ্টার বিদ্যালয়ের মুক্ত হাওয়ার লালিত পালিত হেষ্টিংস সঙ্গে করে এনেছিলেন স্বদেশের গৌরবদীপ্ত ঐতিহ্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী যাযাবররা এসে যখন গৌড়ের আবহাওয়া আবিলতাময় করে তুলছিল তাঁর দেশবাসীরা তখন রাজাকে দিয়ে ম্যাগ্না কার্টায় স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। রাজা স্বীকার করেন যে রাষ্ট্র পরিচালনায় জন প্রতিনিধিদের মতামত শেষ কথা—তার বিরোধিতা করবার অবাধ অধিকার তাঁর নেই। দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো কথাটি ইংল্যাণ্ডে কোন দিন চলে নি। সে দেশের অধিবাসীরা রাজাকে চির দিন উচ্চ মর্য্যাদা দিয়েছে, কিন্তু তিনি জনস্বার্থের বিরোধিতা করলে তাঁর শিরশ্ছেদ করতে দ্বিধা করে নি। এই ঐতিহ্য বহন করে এনেছিলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস ও তাঁর পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেলগণ। তাঁদের কার্য্যকলাপের ফলে বাঙালী প্রথম বুঝতে পারে যে সে রাষ্ট্রের ভারবাহী পশু নয়—তার কল্যাণ সাধন রাষ্ট্র পরিচালনার একেবারে গোড়ার কথা।

ইংরাজ শাসন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর জাতীয় জীবনে জোয়ার দেখা দেয়। বাংলার সাহিত্য, শিল্প, অর্থনীতি নূতন রূপ পরিগ্রহ করে। বহির্বিশ্বের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ পেয়ে সে এক স্বাস্থ্যসমুজ্জ্বল জীবনের সন্ধান পায়—জোয়ারের জল বাঁধ ছাপিয়ে দুই কূলকে প্লাবিত করে। এত দিন উত্তর ভারত থেকে রাজপুরুষরা এসে শাসনদণ্ড চালাত, এখন সে নিজে চলল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সেই দণ্ড হাতে নিয়ে। সাগর পারেও তার স্থান মিলল। তাদের মাথার উপর থাকত মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরাজ সিভিলিয়ান, কিন্তু খুঁটিনাটি কাজকর্ম চালাত তারা। সর্বত্র উচ্চতর বৃত্তিগুলিতে তাদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, বিভিন্ন অঞ্চলে বহু জমিদারী তাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে যায়। এই রাজনৈতিক প্রভাব ও আর্থিক স্বচ্ছলতা প্রতিফলিত হয় সমাজ জীবনের সকল স্তরে। যুগযুগান্তরের অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজ উজ্জ্বল দিবালোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

রেণেল-গ্ল্যাডউইন-ইম্পে

দেওয়ানী লাভের পর ক্লাইভ দেখেন, তিন সুবার বিভিন্ন অঞ্চলেব ভৌগলিক পরিচয় অত্যন্ত অস্পষ্ট। সুবা আছে, সরকার আছে, পরগণা আছে, মহল আছে, আছে সব -কিন্তু সবই আবছা আবছা। এই অবস্থা বহু দিন ধরে চলে আসছে। আইন-ই-আকবরীতে আবুল ফজল লিখে গেছেন যে সুবা বাংলার পূর্বে সমুদ্র ও পশ্চিমে পর্বত। জাহাঙ্গীর তাঁর তুজুকে লিখেছেন, পূর্বে বন্দর চাটগাঁ থেকে পশ্চিমে গাঢ়ি পর্য্যন্ত বিস্তৃত বাংলার দৈর্ঘ্য ৪২৫ ক্রোশ অর্থাৎ ৮৫০ মাইল এবং উত্তরে পর্বতমালা থেকে দক্ষিণে মান্দারণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত প্রস্থ ২২০ ক্রোশ অর্থাৎ ৪৪০ মাইল। ঔরঙ্গজেব আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আসাম, আরাকান ও ত্রিপুরাকে সুবা বাংলার তিনটি সরকার বলে ধরে নিয়েছেন। চির দিন দেশে আমিন ছিল এবং বিভিন্ন অঞ্চলের জরিপ কার্য্য তারা চালাত, কিন্তু সেগুলিকে সন্নিবেশিত করে কোন সুসম্পুর্ণ মানচিত্র কখনও তৈরী হয় নি। এরূপ স্বচ্ছ ভৌগলিক বিবরণ নিয়ে নূতন দেশের শাসনকার্য্য সুষ্টুভাবে চালান সম্ভব হবে না বুঝে জর্জ রেণেল প্রমুখ একদল জরীপকারীকে ক্লাইভ কলকাতায় আনেন।

পুরাতন নথীপত্র দেখে ও বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে রেণেলের লোকজন মাঠঘাট

নদীনালা হাটবাজার দোকানগোলা সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জরীপ করে যে সব খণ্ড-মানচিত্র প্রস্তুত করেন সেগুলির ভিত্তির উপর গড়ে ওঠে বাংলার ভৌগলিক বিবরণ। রেণেলের মানচিত্রের অধিকাংশ নাম এখন দুর্বোধ্য এবং বহু অঞ্চলের ভৌগলিক পরিচয়ের মধ্যে যথেষ্ট অসম্পূর্ণতা থাকলেও উত্তরকালের ভৌগলিক ও জরীপকারীগণ সেগুলিকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করেন।

ভূগোলের সঙ্গে সঙ্গে নূতন দেশের ইতিহাসও জানা চাই। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন প্রমুখ একদল ঐতিহাসিকের উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করেন রবার্ট ক্লাইভ। কয়েকজন ভারতীয় অনুবাদকের সাহায্যে তাঁরা বহু ঐতিহাসিক গ্রন্থ ফারসী থেকে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। এই গবেষকগণের মধ্যে একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন উইলিয়াম জোন্স। তাঁর উদ্যোগে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধুনিক বিচারব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন ওয়ারেন হেষ্টিংস। দেওয়ানী লাভের পর থেকে কোম্পানী কলকাতায় কোয়ার্টার কোর্ট নামে একটি আদালত প্রতিষ্ঠিত করে সকল রকম মামলা মোকদ্দমার বিচারের ব্যবস্থা করেছিল। বৎসরে চারবার করে সেই কোর্টের অধিবেশন হোত এবং বিচার যা হোত তা পূর্বতন কাজীর বিচারের চেয়ে বিশেষ উন্নত ছিল না। এই প্রহসন আর বেশী দূর গড়াতে না দিয়ে হেষ্টিংস কলকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপন করেন। ফক্সের ইণ্ডিয়া বিলে সেরূপ নির্দেশও ছিল। তাঁর শৈশবের সহপাঠী স্যার ইলাইজা ইম্পের তখন আইন জ্ঞানের জন্য লণ্ডনে খুব নামডাক। তাঁর সুপারিশে বৃটিশ সরকার ইম্পেকে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি করে পাঠান।

ওয়ারেন হেষ্টিংস নিজে গভর্ণর জেনারেল ও তাঁর বাল্যবন্ধু ইম্পে প্রধান বিচারপতি হওয়ায় কলকাতায় উভয়ের দিন ভালই কাটত। মহারাজা নবকৃষ্ণ মাঝে মাঝে এসে তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যোগ দিতেন। তিনি ছিলেন হেষ্টিংসের তারুণ্যের সুহৃদ। কিন্তু বাজে গল্পগুজবে সময় নষ্ট করবার লোক তাঁরা কেউ ছিলেন না। স্যার ইলাইজা ইম্পে সমগ্র বিচার ব্যবস্থাকে স্বদেশের ছাঁচে ঢেলে সাজান এবং ভারতবাসীরা যাতে ন্যায় বিচার পায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তাঁর বিচারে মহারাজা নন্দকুমারকে ফাঁসী কাঠে ঝুলতে হোলেও তিনি যে

ভারতে আধুনিক বিচারব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

এই নূতন বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে গিয়ে ইলাইজা ইম্পের সম্মুখে সমস্যা দেখা দেয় এই যে বিচারকার্য্য কোন সূত্র ধরে পরিচালিত হবে? মুসলমানদের জন্য শরীয়ৎ আছে, কিন্তু হিন্দুদের স্মৃতিগ্রন্থগুলি বিচ্ছিন্ন ও বহু বিষয়ে পরস্পরবিরোধী। সেগুলির সমন্বয় সাধনের জন্য তাঁর নির্দেশে হেষ্টিংস ভাটপাড়া নিবাসী কালীকিঙ্কর ও কৃষ্ণকেশর এবং গুপ্তিপাড়া নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রমুখ এগারো জন স্মার্তের একটি কমিটি গঠন করেন। এই স্মার্ত কমিটির অধ্যাবসায়ের ফলে 'বিবদার্ণবসেতু' নামে একটি স্মৃতিসার সংকলিত হয় এবং তার সূত্র ধরে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয়বিধ মামলার বিচারকার্য্য চলতে থাকে। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলার জন্য দ্বাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর বিজয়সেনের প্রাঢ়বিবাক জীমূতবাহনের দায়ভাগ প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গৃহীত হয়।

বিবর্দাণবসেতু ইংরাজ যুগের প্রথম সিভিল ও পিনাল কোড। তখনও লোকসভা বা বিধানসভা প্রতিষ্ঠিত হয় নি, নূতন আইন প্রণয়নের মত অনুরূপ কোন সংগঠন ছিল না। একাদশ স্মার্ত সঙ্কলিত এই গ্রন্থের সূত্রে ধরে সবপ্রকার বিচারকায্য পরিচালিত হোত। ইংরাজ বিচারকদের জন্য সংস্কৃত থেকে ইংরাজীতে তর্জমা করতেন দোভাষীরা এবং প্রয়োজনের সময় তাঁদের সাহায্য করতেন জজ-পণ্ডিতগণ। এই প্রণালীতে কিছু দিন কাজ চললেও ধীরে ধীরে দেখা গেল যে গ্রন্থখানির মধ্যে অসামঞ্জস্য অনেক রয়েছে। বহু জটিল মামলায় সংশ্লিষ্ট ধারার ভাষ্যের জন্য প্রতিষ্ঠাবান স্মার্তদের স্মরণাপন্ন না হোলে চলে না। এই অসম্পূর্ণতার কথা বিবেচনা করে হেষ্টিংস প্রতিষ্ঠাবান স্মার্ত ত্রিবেনী নিবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে অনুরোধ করেন বিতণ্ডাবিহীন একখানি নূতন স্মৃতিসার সঙ্কলনের জন্য। যে ন্যায় বিচারের জন্য ইংলণ্ডের এত খ্যাতি ভারতে এসে যেন তা ক্ষুণ্ন না হয়।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন তখন অশীতিপর বৃদ্ধ। যৌবনে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বর্দ্ধমানাধিপতি রাজা ত্রিলোকচাঁদের কাছ থেকে মূল্যবান ব্রহ্মোত্তর ও নবাব

আলীবর্দীর কাছ থেকে প্রচুর আর্থিক পুরস্কার ছাড়া একখানি ইষ্টক নির্মিত বাসগৃহ উপহার পেয়েছিলেন। ভাস্কর পণ্ডিতও তাঁকে সম্মান দেখিয়েছিলেন। হেষ্টিংসের কাছ থেকে অনুরোধ পেয়ে তিনি বিভিন্ন বিচারক ও জজ-পণ্ডিতদের সঙ্গে পরামর্শ করে বিবাদার্ণবসেতুর আমূল সংস্কার সাধন করেন। তার ফলে 'বিবাদভঙ্গার্ণব' নামে যে স্মৃতিগ্রন্থ রচিত হয় প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পের নির্দেশক্রমে সকল আদালত সেটিকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করে। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে স্থরু করে বৃটিশ ভারতের ছোটবড় সকল আদালতে বহু কাল এই 'বিবাদভঙ্গার্ণবে'র সূত্র ধরে বিচারকার্য্য পরিচালিত হয়।

ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়

রাজকন্যা ঘুমিয়ে পড়েছিল। রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেষ্টিংস এসে তাকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে তোলেন যখন তাঁরা ঘুনধরা মোগল সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানছিলেন তখন দিল্লীতে বসে অক্ষম বাদশাহ শাহ আলম বাঙালীর উপর নিষ্ফল আধিপত্য দাবী করছিলেন এবং তার ঘরের মধ্যে বসে আরব, ইরানী, মাড়ওয়ারী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি রবাহুতের দল দেশের ভাগ্য নিয়ে দাবার চাল চালছিল। তারা নিজেরা ছিল মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন, নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের কথা তাদের মনে ওঠে নি। সেই যুগযুগান্তরের মোহনিদ্রা ভেঙে দেয় সাত সমুদ্র তের নদী পার থেকে এসে ইংরাজ বণিকগণ।

আজ লোকে সিরাজউদ্দৌলার জন্য অশ্রু বিসর্জন করে আর ক্লাইভকে দেয় অভিশাপ। সে সময়কার কেউ এমন কথা বলে নি। সেই নবাবের স্বধর্মীয়দের মধ্যেও তাঁর শুভাকাঙ্খী বেশী ছিল না। তাঁর অনাচার থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য ক্লাইভের প্রতি সকলে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল। তিনি ও তাঁর মন্ত্রশিষ্য ওয়ারেন হেষ্টিংস বাঙালীকে আধুনিকতার দীক্ষা দেন। তের বৎসর রাষ্ট্র পরিচালনার পর হেষ্টিংস যখন ভারত ত্যাগ করেন তখন মধ্য যুগের অবসান হয়েছে, উদীয়মান সূর্য্যের অরুণ আভায় দিকচক্রবাল আলোকিত হয়ে উঠেছে। বাংলার নূতন যুগের সেই অগ্রদূতরা স্বদেশীয়দের কাছে ধিক্কার ও বিদেশীদের কাছে ঔদাসীন্য ছাড়া আর কিছু পান নি। কিন্তু ভবিষ্যতের ঘটনাবলী দেখিয়ে দিয়েছে যে ভারতভাগ্যবিধাতা মহাসিন্ধুর ওপার থেকে তাঁদের

বাংলার কোলে টেনে এনেছিলেন। মুক্ত বাঁধের ভিতর দিয়ে অবরুদ্ধ জলরাশি উদ্দাম বেগে বইতে থাকে, রাষ্ট্র শক্তির জাড্যের ফলে যে প্রতিভার আত্মপ্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল তা ফলেফুলে বিকশিত হয়। পাঁচ শতাব্দীর অমানিশার অবসান ঘটে, বিপুল বিশ্বের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় হয়। এই নূতন যুগের মহাকবির ভাষায় ভারত ভাগ্যবিধাতার উদ্দেশে প্রণতি জানিয়ে গ্রন্থের উপসংহার করি—

ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়—
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদারি উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারই হউক জয়॥

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়—
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়—
তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য্য, এসেছ রুদ্রসাজে
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে,
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্ত-মাঝে,
মৃত্যুর হোক লয়।
তোমারই হউক জয়॥

—:০:— —

শব্দসূচী

শব্দসূচী